সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাবিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

কলিকাতা

২৪৩।১নং অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২২

[গ্রাহক পক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [মফস্বলে ৩।৵০ তিন টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ বার আনা।

দ্বাবিংশ ভাগের সূচী

শোক-সংবাদ

বিগত ১৯শে চৈত্র শনিবার প্রাতঃকালে ৫টার সময় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ৪৭ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই নিদারুণ ঘটনায় আমরা যে কি প্রকার মর্ম্মাহত হইয়াছি, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। ৺ব্যোমকেশ বাবুর ন্যায় পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি সাংসারিক নানা জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া এবং নিজের সর্ব্ববিধ কাজের প্রতি উপেক্ষা করিয়া পরিষদের জন্য একাগ্রচিত্তে যে ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত খাটিয়াছেন, তাহা সকলেরই সুপরিচিত। পরিষৎ স্থাপনা অবধি পরিষদের প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার অধ্যবসায়, তাঁহার আন্তরিক যত্ন এবং তাঁহার কার্য্য-কুশলতার ফল সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। পরিষদের পূজায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; পরিষৎকেই তিনি প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ দেখিতেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমানে যে উন্নত অবস্থায় পদার্পণ করিয়াছেন, ইহার অধিকাংশই তাঁহার অবিশ্রান্ত উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। নানা শাখা-প্রশাখা-সম্বলিত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে আজ একটি প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছেন, তাহার মূল কারণ ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এবং তাঁহার ন্যায় কতিপয় মহাশয়ের অসাধারণ একাগ্রতা ও একনিষ্ঠ সেবা। এই একনিষ্ঠ মিত্রকে হারাইয়া পরিষৎ নিতান্ত দীন হইয়াছেন, সন্দেহ মাত্র নাই; বিশেষতঃ যাঁহারা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও যাঁহারা ইহার শৈশবে ইহার পুষ্টি সাধনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবুর মৃত্যু অতীব শোকাবহ ঘটনা। নিজের সাংসারিক কাজ, এমন কি, নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করিয়া ৺ব্যোমকেশ বাবু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতি যে প্রকার একনিষ্ঠ সেবার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি বহু দিন রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু-শয্যাতেও পরিষদের বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয় ভাবিতেন না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যত দিন থাকিবে, তত দিন উহার সহিত ৺ব্যোমকেশ বাবুর স্মৃতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত থাকিবে, এই কথা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান সময়ে ৺ব্যোমকেশ বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারের কথা মনে হইয়া আমাদের মনে আরও অশান্তি উপস্থিত হইতেছে। ৺ব্যোমকেশ বাবু তাঁহার জীবিত সময়ে নিজের স্বার্থের দিকে আদৌ দৃক্‌পাত করেন নাই; পরিষদের জন্যই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ মূল্যবান্ সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন। এখন আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য হইতেছে যে, তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাংসারিক ক্লেশাপনোদন জন্য আমরা যত্নবান্ হই। তিনি পরিষদের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এখন আমাদের উচিত যে, তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আমরা পালন করি। ভরসা করি, পরিষদের সদস্য সকলেই এ বিষয়ে আমাদের সহিত একমত হইবেন। পরিশেষে আমরা শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার চির-শান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(দ্বাবিংশ ভাগ)

বৰ্দ্ধমানের কথা

যে বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছে—এই বৰ্দ্ধমান কত দিনের? কোন্ সময় হইতে বর্দ্ধমান নামকরণ হইয়াছে? বর্দ্ধমানের কোন্ অংশে সর্ব্বপ্রথম সভ্যতালোক প্রবেশ করে? কোন্ কোন্ স্থান প্রাচীন ও অতীত গৌরবের নিদর্শন? বর্ত্তমান সম্মেলনে তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার জন্য বর্দ্ধমানের অভ্যর্থনা-সমিতি আমার উপর ভারার্পণ করেন। আমিও সমিতির আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া প্রথমে বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশ পরিদর্শনে বাহির হই। কিন্তু যে যে স্থান দর্শন করিব আশা করিয়াছিলাম, দৈব বাধা-বিপত্তিতে ও সময়াভাবে তাহার অনেক স্থানই দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। নানা অন্তরায় ও বিপদের মধ্যে সমিতির আদেশ প্রতিপালন-উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র বিবরণী প্রকাশিত হইল। রাঢ়ভূমির হৃদয়স্বরূপ বর্দ্ধমান-ভূভাগের প্রকৃত পরিচয় দান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। সমগ্র বর্দ্ধমান-বিভাগ-পরিদর্শন,—বহুকালসাধ্য অতীত গৌরব-কীর্ত্তি রক্ষার আয়োজন, আমার বা এই অস্থায়ী সমিতির সাধ্যায়ত্ত নহে। সম্মুখে যে অনন্ত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া আছে, আমাদের অতীত গৌরবের স্পর্দ্ধা করিবার নানা সম্পদ্ বর্দ্ধমানের নানা স্থানে যাহা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেই সকলের পরিচয় দিতে হইলে রাঢ়বাসীর সমবেত উদ্যোগ আবশ্যক। এই মহান্ উদ্দেশ্য সুসাধনকল্পে রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্য এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হয় নাই। আমাদের সর্ব্বজন-মান্য অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, আমাদের পূজ্যপাদ সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও সমিতির অধিকাংশ সদস্যই বর্ত্তমান সম্মেলন-ব্যাপারে জড়িত আছেন। আশা করা যায়, সম্মেলন-উৎসব সুসম্পন্ন হইবার পরই অনুসন্ধান-সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন।

বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির উৎসাহে গত ৬ই ফাল্গুন হইতে ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দর্শন করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল—

কাঁটোয়া, দাঁইহাট, জগদানন্দপুর, অগ্রদ্বীপ, ঘোড়াইক্ষেত্র, বেগে, দেবগ্রাম, বিক্রমপুর, বিল্বেশ্বর, কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্টহাস। আমার পরিদর্শন-কার্য্য অতি সত্বর সমাধা করিবার

অভিপ্রায়ে আমাদের রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধি-রাজ বিজয়চন্দ মহ্‌তাব্‌ বাহাদুর এবং অগ্রদ্বীপের জমিদার শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় স্ব স্ব হস্তী দিয়া আমার এই কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রসূন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয় কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্টহাসে আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং কাঁটোয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার এই অনুসন্ধান-কার্য্যে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই সুযোগে আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সময়াভাবে অপরাপর বহু স্থান দর্শনের যেমন সুযোগ ঘটে নাই, যে যে স্থান পরিদর্শন করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবারও সুবিধা হয় নাই। যে বিবরণ মুদ্রিত হইল, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ পরিচয় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

অভ্যর্থনা-সমিতির অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয়ের লিখিত 'বর্ত্তমান বর্দ্ধমান' শীর্ষক প্রবন্ধ বিবরণীর সহিত প্রকাশিত হইল। অল্প দিনের উদ্যোগের ফল এই অসম্পূর্ণ বিবরণী পাঠ করিয়া কেহ যেন নিরুৎসাহ বা আমাদের উপর অসন্তুষ্ট না হন, ইহাই এই অধমের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

বর্দ্ধমানের পুরাকথা

মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৫৮।১৪) ভারতবর্ষরূপ কূর্ম্মের মুখদেশে তাম্রলিপ্ত ও একপাদপদেশের পরই বর্দ্ধমানের উল্লেখ আছে। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতাতেও ভারতের পূর্ব্বদিকে তাম্রলিপ্তের সহিত এই বর্দ্ধমানের প্রসঙ্গ পাইতেছি।[১] এদিকে মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রের সহিত সুহ্মের উল্লেখ আছে,[২] কিন্তু বর্দ্ধমানের উল্লেখ নাই। ভীমের পূর্ব্ব-দিগ্বিজয় উপলক্ষে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, 'পাণ্ডববীর (ভীম) মোদাগিরিস্থিত অতিবলশালী

বর্দ্ধমান নাম কত দিনের

রাজাকে মহাসমরে বাহুবলে নিহত করিলেন। পরে তীব্র-পরাক্রম ও মহাবাহু পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব এবং কৌশিকীকচ্ছ-নিবাসী রাজা মহৌজা এই দুই নৃপতিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন। সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন নরপতিকে পরাজয় করিয়া তাম্রলিপ্তরাজ, কর্ব্বটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও সাগরবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।'[৩] কালিদাসের রঘুবংশে লিখিত আছে, 'জয়ী রঘু পূর্ব্বদিকে সমস্ত জনপদ আক্রমণ করিয়া মহাসাগরের তালীবনশ্যামল উপকূলে উপনীত হইলেন। সুহ্মগণ বেতলতার মত জড়সড় হইয়া উদ্ধতগণের উন্মূলনকারী রঘুর নিকট নত হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। পরে (রঘুবীর) নৌবলসম্পন্ন বঙ্গদেশীয় ভূপালগণকে বাহুবলে উৎখাত করিয়া গঙ্গাপ্রবাহ-মধ্যবর্ত্তী দ্বীপের উপর জয়স্তম্ভ সকল

---

(১) বৃহৎসংহিতা ১৪।৭, ১৬।৫।

(২) মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১০৪ অঃ।

(৩) "অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেণ নিজঘান মহামৃধে॥
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ॥"

(সভাপর্ব্ব ৩০।২৯—২৪)

স্থাপন করিয়াছিলেন।'[৪] পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'বিষয়' শব্দের জনপদ অর্থ-প্রসঙ্গে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্রের একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[৫]

সিংহলের বৌদ্ধ ইতিহাস দীপবংশ ও মহাবংশ হইতে জানিতে পারি, বুদ্ধদেবের সমকালে লালের রাজধানী সিংহপুর হইতে বিজয় নির্ব্বাসিত হইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহা হইতেই সিংহল সভ্যতালোকে আলোকিত হইয়াছিল।

জৈনদিগের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্র পাঠে জানা যায়,—(২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীর বা) বর্দ্ধমানস্বামী 'লাঢ়'দেশে 'বজ্জভূমি' ও 'সুব্ভভূমি'র মধ্যে অতিকষ্টে ১২ বর্ষ কাটাইয়াছিলেন। তৎকালে বজ্জভূমিতে কুকুরের বড় উৎপাত ছিল। অনেক সন্ন্যাসী কুকুর তাড়াইবার জন্য দণ্ড লইয়া বেড়াইতেন। জৈন সূত্রকার লিখিয়াছেন যে, লাঢ়দেশে ভ্রমণ করা কঠিন।[৬] জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাসূত্রেও আর্য্য বা পুণ্যভূমিসমূহের মধ্যে কোটিবর্ষ ও রাঢ়দেশের উল্লেখ আছে।[৭]

জৈনদিগের সর্ব্বপ্রাচীন অঙ্গ আচারাঙ্গসূত্রে যে বজ্জভূমি ও সুব্ভভূমির উল্লেখ আছে, তাহাই আমাদের পুরাণে বর্দ্ধমান ও সুহ্ম নামে পরিচিত হইয়াছে এবং সেই সুপ্রাচীন কালে প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সুহ্ম ও বর্দ্ধমান রাঢ়দেশেরই অন্তর্গত ছিল। মহাভারত-টীকাকার নীলকণ্ঠ সুহ্মেরই অপর নাম 'রাঢ়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৮] এদিকে মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ও মহাভারতের শ্লোক একত্র পাঠ করিলে সুহ্ম ও বর্দ্ধমান অভিন্ন বলিয়াই যেন মনে হইবে। কিন্তু বরাহমিহির রাঢ়ের উল্লেখ না করিলেও সুহ্ম ও বর্দ্ধমান পৃথক্ ভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। উপরি উক্ত প্রমাণগুলি একত্র আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, বরাহমিহিরের সময়ে যে স্থান সুহ্ম ও বর্দ্ধমান নামে পরিচিত ছিল, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে সেই উভয় স্থানই

---

(৪) "পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥
অনম্রাণাং সমুদ্ধর্ত্তুস্তস্মা সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্॥
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥"
(রঘুবংশ ৪।৩৪-৩৬)

(৫) "বিষয়াভিধানে জনপদে লুব্ বহুবচনবিষয়াৎস্তস্যঃ। অঙ্গানাং বিষয়ো দেশঃ অঙ্গাঃ। বঙ্গাঃ। সুহ্মাঃ। পুণ্ড্রাঃ।" (মহাভাষ্য ৪।২।১)

(৬) আয়ারঙ্গসুত্ত ১।৮।৩।

(৭) "কোড়িবরিসং ব লাঢ়া"—পন্নবণা।

(৮) "সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ"—মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৩৩।২৪ নীলকণ্ঠটীকা।

একত্র রাঢ় বলিয়া পরিচিত হইয়াছে,—তবে সুহ্ম নাম অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়াই মনে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বকালে সুহ্ম, রাঢ় ও বর্দ্ধমান বলিলে সময় সময় এক স্থানই বুঝাইত।

যাহা হউক, আমরা বুঝিতেছি যে, বর্দ্ধমান নামটী নিতান্ত আধুনিক নহে, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীরও বহুপূর্ব্বে মার্কণ্ডেয়পুরাণের সময় হইতেই বর্দ্ধমান নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ২৪শ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানস্বামী এখানে দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করায় জৈনসমাজে এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বর্দ্ধমানস্বামীর পুণ্য সমাগমে এই স্থান বর্দ্ধমান নামে পরে পরিচিত হইয়া থাকিবে।

আচারাঙ্গসূত্রের মতানুসারে বলিতে হয় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাঢ়দেশ বজ্রভূমি ও সুহ্ম এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল, তৎপরে কিছুকাল এক হইয়া যায়। গুপ্ত-সম্রাট্‌গণের প্রভাব খর্ব্ব হইলে নানা সামন্তগণের স্বাধীনতা-গ্রহণের সহিত খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতে রাঢ়ের অন্তর্গত সুহ্ম ও বর্দ্ধমান আবার স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া গণ্য হইতে থাকে।

বর্দ্ধমানের প্রাচীন ভূ-সংস্থান

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দশকুমারচরিতে দামলিপ্তকে সুহ্মের অন্তর্গত[৯] বলা হইয়াছে, এ অবস্থায় বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার কতকটা তৎকালে সুহ্ম বা রাঢ় বলিয়া পরিচিত ছিল। গঞ্জাম্ হইতে আবিষ্কৃত ২য় মাধবরাজের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, কোঙ্গোদপতি মাধবরাজ কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্করাজকে আপনার অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এ অবস্থায় বলিতে পারা যায় যে, কর্ণসুবর্ণ বা বর্দ্ধমানপতি শশাঙ্করাজের সময় সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত[১০] ও উৎকল পর্য্যন্ত রাঢ়দেশ বিস্তৃত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই কারণেই সম্ভবতঃ দক্ষিণরাঢ়ের সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত ময়ূরভঞ্জ অদ্যাপি অধিবাসিগণের নিকট রাঢ় বলিয়া পরিচিত।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এই বর্দ্ধমান জেলায় যে স্থানে সাতশত ঘর ব্রাহ্মণের উপনিবেশ ছিল ও ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য চলিত—সেই স্থানই সাতশতকা বা সাতশইকা পরগণা নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ গৌড়াধিপপ্রদত্ত অধিকাংশ শাসন গ্রাম এই বর্দ্ধমান জেলায় লাভ করিয়া গ্রামীণ বা গ্রামাধিপ হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণ তত্তৎগ্রামীণ বা গাঞী নামেই পরিচিত। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে এই স্থান বিভিন্ন রাজবংশের শাসনে ও সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্যে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় এই দুই খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়। উত্তররাঢ়ের পালবংশের অধিকারে বৌদ্ধপ্রভাব, এবং দক্ষিণরাঢ়ে শূর ও দাস প্রভৃতি বংশের কর্ম্মনিষ্ঠতায় ব্রাহ্মণপ্রভাবের সন্ধান পাই। সম্ভবতঃ এই সাম্প্রদায়িক ও রাজনীতিক পার্থক্য হইতেই রাঢ়দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণীবিভাগ ঘটিয়াছিল।

---

(৯) দশকুমারচরিত, ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

(১০) জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ 'পন্নবণা' বা প্রজ্ঞাপনাসূত্রের মতে "তামলিত্তি বঙ্গায়" অর্থাৎ বঙ্গের মধ্যে তাম্রলিপ্ত। এই প্রমাণে বলা যাইতে পারে যে, কোন সময়ে তাম্রলিপ্ত বঙ্গের মধ্যেও পরিগণিত হইত

খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ পাল, বর্ম্ম ও চন্দ্রবংশের শাসনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রভুক্তি, শ্রীনগরভুক্তি ও তীরভুক্তি এই তিনটী ভুক্তি বা Province এর উল্লেখ পাইয়াছি। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহারাজ বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনে আমরা সর্ব্বপ্রথম বর্দ্ধমানভুক্তির সন্ধান পাই। এখন বর্দ্ধমান বিভাগ বলিলে যতটা বুঝায়, পূর্ব্বকালে ইহার অধিকাংশ বর্দ্ধমানভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। তবে মহাভারত ও রঘুবংশ-রচনা-কালে বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগের সর্ব্ব নিম্ন দক্ষিণ অংশের কতকটা সমুদ্রতরঙ্গ বিধৌত বা জাঙ্গলরূপে পরিগণিত ছিল, পূর্ব্বোদ্ধৃত ভীমের দিগ্বিজয় এবং রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গ হইতে তাহার কিছু কিছু আভাস পাইতেছি।

আবার বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনের সমকালে লিখিত ধোয়ী কবির 'পবনদূত' কাব্যে সুহ্মের মধ্যে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুর কীর্ত্তিত হইয়াছে। এ অবস্থায় সেনরাজবংশের রাজত্বকালে সুহ্ম বর্দ্ধমানভুক্তির মধ্যেই ছিল বলা যাইতে পারে। যাহা হউক উপরি উক্ত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝিতেছি যে, বর্দ্ধমান নামটীও অতি প্রাচীন ও বহু পূর্ব্বকাল হইতেই একটী স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। তবে রাঢ় বলিলে তদপেক্ষা বৃহৎ জনপদও বুঝাইত। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ লিখিয়া গিয়াছেন, "গঙ্গার দুই ধারে লখ্‌নৌতীরাজ্যের দুইটী পক্ষ, পূর্ব্বদিকে রাল (রাঢ়), এই ধারেই লখ্‌নোর নগর এবং পশ্চিম বরিন্দ (বরেন্দ্র) নামে খ্যাত, এই ধারেই দেওকোট নগর।" মিন্‌হাজের এই উক্তি হইতে মনে হয় বর্ত্তমান বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগণা, ও হুগলী জেলা তৎকালে রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল।

উপরে বর্দ্ধমানের যে সীমা দিলাম, তাহা ঠিক কতটা ছিল তাহা বলা কঠিন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রেনেল সাহেব যে বাঙ্গালার মানচিত্র প্রকাশ করেন, সেই মানচিত্রে বর্দ্ধমানের উত্তরে

বর্দ্ধমানের পূর্ব্ব আয়তন

বীরভূম, দক্ষিণে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা, পূর্ব্বে হুগলী, কৃষ্ণনগর ও রাজসাহী জেলা এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট, বিষ্ণুপুর ও মেদিনীপুর জেলা পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে রচিত—ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড[১১] নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—'পুণ্ড্রদেশ সপ্ত প্রদেশে বিভক্ত—গৌড়, বরেন্দ্র, নিবৃত্তি, নারীখণ্ড, বরাহভূমি, বর্দ্ধমান ও বিন্ধ্যপার্শ্ব। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমান মণ্ডল ২০ যোজন।'[১২] খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে রচিত দিগ্বিজয়-প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থের মতে—'অজয়নদের দক্ষিণভাগে, শিলাবতী নদীর উত্তরে, গঙ্গার পশ্চিমপারে এবং দারিকেশি নদীর পূর্ব্বে দৈর্ঘ্য ১১ যোজন ও প্রস্থে ৮ যোজন পরিমিত বর্দ্ধমান দেশ।'[১৩] 'ইহার মধ্যভাগে দামোদর প্রবাহিত হইতেছে, পূর্ব্বদিকে যে সমস্ত

---

(১১) হ হ উইলসন্ সাহেবের মতে এই গ্রন্থ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের পর রচিত হয়। Indian Antiquary, 1891. Vol XX. p. 419 দ্রষ্টব্য।

(১২) ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ৬।২।

(১৩) বিশ্বকোষ, ১৭শ ভাগ ৬১২-৬২৮ পৃষ্ঠায় মূল বচন দ্রষ্টব্য

নদী আছে, তন্মধ্যে মুণ্ডেশ্বরী, বকুলা ও সরস্বতী নদীই প্রধান। দক্ষিণেও বড় নদী আছে।' ব্রহ্মখণ্ডের মতে, 'বৰ্দ্ধমানের মধ্যে বহুসংখ্যক নগর ও গ্রাম আছে, তন্মধ্যে এই কয়টী প্রধান—খাটুল, দারিকেশিনদীর পার্শ্বে জানাবাদ, মায়াপুর, শঙ্কর-সরিৎপার্শ্বে গরিষ্ঠ গ্রাম, মুণ্ডেশ্বরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণনগর (খানাকুল), এখানে অভিরামপ্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর, দামোদরের পার্শ্বে রাজবল্লভ, ভাগীরথীর পার্শ্বে বিদ্যাস্থান নবদ্বীপ—গৌরাঙ্গের জন্মস্থান, নালাজোর, একলক্ষক, রাঘববাটিকা, অম্বিকা, বালুগ্রাম, মীরগ্রাম, ভূরিশ্রেষ্ঠিক, সেনাপি, জনাম্নি, স্ফুরণ, আঙ্কন, তট, স্বর্ণটীক, বৰ্দ্ধমানের দক্ষিণে পাকুল, কুমারবীথিকা, কুলক্ষিপ্তা, কপল, লৌহপুর, গোবৰ্দ্ধন, হস্তিক, শ্রীরামপুর, বেলুন, অগ্রদ্বীপ, পাটলি, কর্ণগ্রাম, জোতিবনি, চন্দ্রপুর, বলিহারিপুর, বচ্ছিকবালা, কুশমান, গঙ্গচারি, জাবট, চন্দ্রলেশ ও জাঙ্গলের নিকট রসগ্রাম। এ ছাড়া ৮টী পত্তনের নাম যথা—বৈদ্যপুর, পাটলি, শিলাবতীনদীর পার্শ্বে লোহদা, দামোদরের নিকট চন্দ্রবাটী, বৰ্দ্ধমানের পশ্চিমাংশে বৃশ্চিকপত্তন, ত্রিবক্রসরিৎপার্শ্বে হাটকনগর, ভাগীরথীর পশ্চিমে বিল্বপত্তন এবং বৰ্দ্ধমানের ত্রিশক্রোশ দূরে সামন্তপত্তন।'[১৪]

উদ্ধৃত গ্রাম ও নগরাদির অবস্থান আলোচনা করিলে বলিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বৰ্দ্ধমান জেলা ব্যতীত বর্ত্তমান হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, পাবনা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কতকাংশ পূর্ব্বে বৰ্দ্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, জৈন আচারাঙ্গসূত্রের মধ্যে বজ্জভূমির পথে কুকুরের উৎপাত উল্লেখ পাইয়া কেহ কেহ বলিতে চান যে, ২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর সময় বজ্জভূমি বা বৰ্দ্ধমান জনপদ বন্যজন্তুর বিহারক্ষেত্র ও অসভ্য লোকের বাসস্থান বলিয়াই গণ্য ছিল।

বৰ্দ্ধমানের সভ্যতা

বাস্তবিক সে সময় বৰ্দ্ধমান সেরূপ বন্য ও অসভ্য ছিল না। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই এ অঞ্চলে উচ্চ সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়বীরগণের বাস ছিল, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরেও যে তাঁহারা স্ব স্ব বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, মহাভারতেই তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। মহাবীর স্বামীর সময়েই শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাব। সিংহলের পালি-মহাবংশেই প্রকাশ যে, তৎকালে সিংহপুরে রাঢ়ের রাজধানী ছিল এবং তথায় সিংহবাহু রাজত্ব করিতেছিলেন। দুষ্কর্ম্মের জন্য তিনি আপন প্রিয়পুত্র বিজয়কে তাঁহার সাত শত অনুচরসহ নির্ব্বাসন করেন। তৎকালেও রাঢ়বাসী যে, সমুদ্রগামী নৌকা ব্যবহার করিতেন এবং মহাসমুদ্রের ঊর্ম্মিমালা ভেদ করিয়া সমুদ্রান্তরে ভিন্ন দেশে যাতায়াত করিতে সমর্থ ছিলেন, ঐ মহাবংশ হইতেই তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

তৎকালে বৰ্দ্ধমান, রাঢ় বা সুহ্মপ্রদেশের পার্শ্ব ভূভাগ সমুদ্র-তরঙ্গ বিচুম্বিত ছিল। বৰ্দ্ধমানস্বামীর আগমনকালে যে স্থান বজ্জভূমি নামে পরিচিত ছিল, তাহাই মার্কণ্ডেয়-পুরাণে ও বরাহমিহিরের গ্রন্থে 'বৰ্দ্ধমান' নামে সম্ভবতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ

(১৪) ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ৭ম অধ্যায়।

শতাব্দীতে গ্রীকরাজদূত মেগস্থিনিস্ Gangaridæ নামে একটী বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী জনপদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'যে বিস্তৃত জনপদের রাজধানী পাটলিপুত্র সেই প্রাচ্য জনপদের পূর্ব্বদিকে উক্ত 'গঙ্গারিডি' জনপদ।'[১৫] প্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক দিওদোরস্ মেগস্থিনিসের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন,—'গঙ্গানদী গঙ্গারিডির পূর্ব্ব সীমা হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে।' আবার প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমীর মতে 'গঙ্গার মোহানার অদূরস্থিত প্রদেশে গঙ্গারিডিগণের বাস। এখানকার রাজা 'গঙ্গে' নগরে বাস করেন।'[১৬] সুপ্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকের উক্তি হইতে বেশ মনে হইবে যে, বর্ত্তমান ভাগীরথীর পশ্চিম কূল হইতে প্রাচীন মগধের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত রাঢ়দেশই 'গঙ্গারিডি' নামে পরিচিত ছিল। প্লিনি লিখিয়াছেন,—'গঙ্গার শেষাংশ গঙ্গারিডি-কলিঙ্গির মধ্য দিয়া গিয়াছে।'[১৭] প্লিনির এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, কলিঙ্গের উত্তরাংশ বা উৎকলের কতকটা তৎকালে রাঢ়দেশের অন্তর্গত ছিল। কাহারও মতে গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গালীই গ্রীক্-ভাষায় গঙ্গারিডি হইয়াছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক দিওদোরাস্ বলিতেছেন,—'গঙ্গারিডিগণের অসংখ্য রণদুর্ম্মদ হস্তী থাকায় কখন কোন বিদেশীয় রাজা তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারে নাই। কারণ অপর দেশের লোকেরা সকলেই সেই হস্তীকে ভয় করে।' প্লিনি লিখিয়াছেন—'সর্ব্বদা ৬০০০০ পদাতি, ১০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০ হস্তী সুসজ্জিত থাকিয়া সেই রাজ্যের নরপতির দেহরক্ষা করিতেছে। রাজধানীর নাম পর্থলিস্ বা পরতালিস্'। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে পেরিপ্লস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'গঙ্গে বন্দর হইতে শ্রেষ্ঠ মস্‌লিন, প্রবাল, ও নানা দ্রব্য রপ্তানী হইত।' রোমের মহাকবি ভার্জ্জিল খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দীতে উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, 'তিনি জন্মস্থানে ফিরিয়া যাইবেন, তথায় মর্ম্মরের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন, তন্মধ্যে রোমসম্রাটের মূর্ত্তি রাখিবেন,—মন্দিরের দ্বারদেশে স্বর্ণ ও গজদন্তের গঙ্গারিডিগণের অপূর্ব্ব যুদ্ধের চিত্র ও সম্রাট্ কুইরিনাশের লাঞ্ছন আঁকিবেন।'[১৮] সিংহলের কবি-ঐতিহাসিকের মহাবংশ ও গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাঢ়দেশ সভ্যতার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিল।

বর্দ্ধমান বা রাঢ়ের প্রাচীন রাজধানী

সিংহলের মহাবংশে পাইতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে 'সিংহপুর' নামক স্থানে লাল বা রাঢ়ের অধীশ্বর সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। তৎকালে এখানে সিংহের বড়ই উৎপাত ছিল, তাহা হইতে অথবা সিংহবাহুর বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিবার জন্য মহাবংশকার রাঢ়াধীশ্বরকে সিংহীর দুগ্ধে প্রতিপালিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সেরগড়পরগণায় সিংহারণ নামে যে নদী আছে, কেহ কেহ মনে করেন ঐ

---

(১৫) McCrindle's Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, p. 58.
(১৬) McCrindle's Ptolemy, p. 172.
(১৭) McCrindle's Megasthenes, p. 135.
(১৮) Georgics, III, 27.

নদীর তীরে সিংহপুর রাজধানী ছিল,—এখানে সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। সিংহপুর ধ্বংস হইলে এই স্থান 'সিংহারণ্য' নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই সিংহারণ্য হইতেই 'সিংহারণ' নদীর নামকরণ হইয়া থাকিবে।

তৎপরে গ্রীক ও রোমকদিগের বিবরণী হইতে পাইতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ হইতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যে বৰ্দ্ধমানপ্রদেশে পরতালিস্ (Portalis), গঙ্গৈ (Gangai) ও কাটাদপা (Katadupa) নামে তিনটী প্রধান নগর বা বন্দর ছিল। ফরাসীপুরাবিদ্ সেণ্টমার্টিন বৰ্ত্তমান বৰ্দ্ধমান সহরকেই Parthalis বা Portalis স্থির করিয়াছেন। এই নামটী দেশীয় 'পরতাল' শব্দেরই বিকৃত রূপ বলিয়া মনে হয়। দিগ্বিজয়প্রকাশে সপ্তজাঙ্গলের বিবরণের পর বঙ্গাল-পরতালের প্রসঙ্গ আছে। এই প্রসঙ্গ অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, বৰ্ত্তমান রাঢ় ও পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যস্থলে 'পরতাল' বলিয়া কোন প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং বিক্রমপুরে সেই পরতালরাজের প্রমোদভবন ছিল।[১৯] যদি দিগ্বিজয়প্রকাশের 'পরতাল' এবং গ্রীক ঐতিহাসিকগণের Parthalis বা Portalis এক হয়, তাহা হইলে বৰ্ত্তমান সহরকে Portalis বলিয়া ধরিয়া লইতে সন্দেহ হয়। যাহা হউক এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক।

'গঙ্গৈ' বন্দর কোথায় ছিল, তাহা এখন স্থির করা কঠিন। তৎকালে যেখানে গঙ্গাসাগরসঙ্গম ছিল, সেই স্থানেই 'গঙ্গৈ' বন্দর হওয়া সম্ভবপর। কণ্টপদ্বীপ বা কাঁটাদীয়ার অপভ্রংশে 'কাটাদপা' হইয়া থাকিবে, এখন কাঁটোয়া নামেই পরিচিত।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক রাঢ়দেশে আগমন করেন। তিনি এখানকার সমৃদ্ধির কথা উজ্জ্বল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে সুহ্ম, রাঢ় বা বৰ্দ্ধমানভুক্তি কর্ণসুবর্ণ নামে পরিচিত ছিল। তৎকালে এই স্থান বহু জনাকীর্ণ, বহু ধনকুবের ও বিদ্যানুরাগী জনগণের বসবাস ছিল। তৎকালে এখানকার রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ১০টী মাত্র বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, কিন্তু নানা সম্প্রদায়ের ৫০টী দেবমন্দির ছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, এখানে বৌদ্ধসম্প্রদায় অপেক্ষা অপর সম্প্রদায়ের লোকই বেশী ছিল। তখনকার এই কর্ণসুবর্ণ বা রাঢ়ের রাজধানী লইয়া মত ভেদ আছে। কেহ বলেন, বৰ্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঙ্গামাটী বা কাণসোণা নামক স্থানে, আবার কেহ বলেন যে, বৰ্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী কাঞ্চন-নগরেই কর্ণসুবর্ণের প্রাচীন রাজধানী ছিল। বলা বাহুল্য এই দুইটী স্থানই এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও রাঢ়ীয় সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল এবং এখনও উভয় স্থানেই সেই অতীত কীর্ত্তির নিদর্শন বিদ্যমান। উক্ত উভয় স্থান ব্যতীত এই বৰ্দ্ধমান জেলার মধ্যে সিংহারণ, প্রদ্যুম্নপুর, শূরনগর, মন্দারণ, ভুরসুট প্রভৃতি শত শত

---

(১৯) "বিদ্বজ্জনানাং বাসশ্চ বিক্রমপুর্য্যাশ্চ ভূরিশঃ।
পরতালভূমিপস্থ তোষিস্থলং বিদুবু্র্ধাঃ॥" দিগ্বিজয়প্রকাশ ৯২)

স্থানে পূর্ব্ব-ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার যথেষ্ট নিদর্শন ছড়াইয়া রহিয়াছে। আশা করি, রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি সেই সকল কীর্ত্তির তত্ত্বোদ্ধারে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে সমগ্র রাঢ়দেশ শূরবংশীয় নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। তৎপরে পালরাজগণের প্রভাববিস্তারের সহিত তাঁহাদের অধিকারভুক্ত স্থান উত্তররাঢ় এবং শূর ও দাসবংশের অধিকারভুক্ত স্থান দক্ষিণরাঢ় নামে পরিচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশে ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অদ্যাপি উত্তররাঢ়ীয়দিগের আদি সমাজস্থান এবং বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণাংশে এবং হুগলী জেলা ও ২৪ পরগণার মধ্যে দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের সমাজস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বর্দ্ধমানজেলাস্থ শূরনগর, প্রদ্যুম্নপুর ও গড়মন্দারণ নামক স্থানে বিভিন্ন শূররাজের এবং হুগলীজেলাস্থ ভূরস্থট নামক স্থানে দাসবংশের ও তৎপরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণরাজবংশের রাজধানীর চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, জৈনদিগের প্রজ্ঞাপনাসূত্র নামক উপাঙ্গে রাঢ়দেশ পুণ্যভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কল্পদ্রুমকালিকা নামে জৈন কল্পসূত্রের টীকায় পাওয়া যায় যে, মহাবীর স্বামী এখানকার কেবল সুসভ্য জাতি বলিয়া নহে, অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও ধর্ম্মালোক বিতরণ করিয়াছিলেন। এই বর্দ্ধমানস্বামীর পুণ্য-সংস্রবে সম্ভবতঃ অতি পূর্ব্বকাল হইতেই জৈনসমাজে বর্দ্ধমান পুণ্যভূমি বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

ধর্ম্মপ্রভাব

শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবও রাঢ়দেশে অল্পদিন হয় নাই। বশিষ্ঠের সিদ্ধিস্থান তারাপীঠ ও কিরীটেশ্বরী বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার বাহিরে হইলেও বর্দ্ধমানভুক্তি বা রাঢ়দেশের মধ্যেই অবস্থিত। রাঢ় বা বর্দ্ধমানপ্রদেশ এক সময়ে শৈব ও শাক্তগণের লীলাস্থান বলিয়া গণ্য ছিল, তাহার কারণ ৫১টী পীঠের মধ্যে এই রাঢ়দেশেই ৯টী ডাকার্ণব পীঠ অবস্থিত। কুব্জিকাতন্ত্রের ৭ম পটলে কর্ণস্বর্ণ বা কর্ণসুবর্ণ, ক্ষীরগ্রাম, বৈদ্যনাথ, বিল্বক, কিরীট, অশ্বপ্রদ বা অশ্বতীর্থ, মঙ্গলকোট ও অট্টহাস এই আটটী সুপ্রাচীন সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, মুসলমান-আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই ঐ সকল স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[২০] ঐ সকল স্থান বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে এখনও প্রাচীন কীর্ত্তির বহু নিদর্শন বাহির হইতে পারে।

আরও কত শাক্তস্থান আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ অসম্ভব। এইরূপ যে সকল শৈব-কীর্ত্তি আছে তন্মধ্যে বৈদ্যনাথ ও বক্রেশ্বর সর্ব্বপ্রাচীন ও প্রধান। এইরূপ ভক্তপ্রবর জয়দেবের লীলাস্থলী কেন্দুবিল্ব—বৈষ্ণবজগতে আজও প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া

---

(২০) তন্ত্রচূড়ামণি নামক পরবর্ত্তী সংগ্রহ গ্রন্থে (রাঢ়দেশের মধ্যে) বহুলা, উজানী, ক্ষীরখণ্ড, কিরীট, নলহাটী, বক্রেশ্বর, অট্টহাস ও নন্দিপুর এই ৯টীকে মহাপীঠ স্থান বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু তৎপরে রচিত শিব-চরিতসংগ্রহ গ্রন্থে অট্টহাস, নলহাটী ও নন্দিপুর উপপীঠ মধ্যে গণ্য এবং তৎপরিবর্ত্তে সুগন্ধা, রণখণ্ড ও বক্রনাথ এই তিনটী মহাপীঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপ মতভেদস্থলে অতিপ্রাচীন কুব্জিকাতন্ত্রের মতই গ্রহণীয়।

কীৰ্ত্তিত হইতেছে। রাঢ়দেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ধৰ্ম্মপূজার অল্প-বিস্তর প্রচার আছে। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয় এই ধৰ্ম্মপূজাই বৌদ্ধধৰ্ম্মের শেষ নিদর্শন বলিয়া বহুদিন প্রমাণ করিয়াছেন। তাহা অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। মুসলমানপ্রভাবকালে সাধু ও ভক্তপ্রভাবে যে সকল অসংখ্য পীঠ ও পাটের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত পুরাতত্ত্ব মধ্যে সে সকলের আর উল্লেখ করিলাম না। "বৰ্ত্তমান বৰ্দ্ধমান" প্রসঙ্গে তাহার কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

———

বর্ত্তমান বর্দ্ধমান

অবস্থান

বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বে ভাগীরথী। ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে নবদ্বীপের চতুঃপার্শ্বস্থ কিঞ্চিৎ ভূভাগ ভিন্ন নদীয়া জেলার সমস্ত অংশ ভাগীরথীর পূর্ব্ব-তীরে অবস্থিত। দক্ষিণে হুগলী জেলা, পশ্চিমে বাঁকুড়া ও মানভূম। উত্তরে সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ। পূর্ব্বের সীমা-রেখা যেমন ভাগীরথী, উত্তরে তেমনই কোন কোন স্থানে অজয় এবং পশ্চিমে দামোদর ও বরাকর।

আয়তন ও লোক-সংখ্যা

বর্দ্ধমান জেলার আয়তন ২৬৯১ বর্গ-মাইল। লোকসংখ্যা ১৫৩৮৩৭১। সদর, আসানশোল কাঁটোয়া ও কালনা এই চারিটি মহকুমা। ৬টি মিউনিসিপালিটি, ১৭টি থানা এবং ২৭৬১ গ্রাম আছে। জেলার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ১২২০৫৫১ ও মুসলমানের সংখ্যা ২৯০৩৮১।

জেলার সমস্ত লোকের মধ্যে শতকরা ১০ জন শিক্ষিত। শিক্ষায় বাঙ্গলার জেলার মধ্যে বর্দ্ধমান ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। সমস্ত বাঙ্গলায় শতকরা ৩·১ ইংরাজী শিক্ষিত, বর্দ্ধমান জেলায় ৩।

বর্দ্ধমান জেলায় ২৭টি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে ৩টি বর্দ্ধমান নগরে। তদ্ভিন্ন বর্দ্ধমান নগরে একটি ২য় শ্রেণীর কলেজ ও একটি টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে।

বিভিন্ন জাতি

বর্দ্ধমান জেলায় ৯৪টি জাতি আছে। ইহার মধ্যে বাগ্‌দির সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। ব্রাহ্মণ, বাউরি ও সদ্‌গোপদিগের সংখ্যা প্রত্যেকের এক লক্ষের অধিক। তদ্ভিন্ন উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ, ডোম, গোয়ালা, হাড়ি, কৈবর্ত্ত, কলু, মুচি ও তিলি জাতির সংখ্যা ২০০০০এর অধিক।

সমস্ত বাঙ্গলার উগ্রক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শতকরা ৭৭·৫ জন বর্দ্ধমান জেলায় বাস করে। তদ্ভিন্ন বাগ্‌দি, বারুই, ভুঁইয়া, ডোম, গন্ধবণিক, কলু, কোরা, মুচি ও সাঁওতাল জাতির সংখ্যা বাঙ্গলার অন্যান্য জেলা অপেক্ষা বর্দ্ধমানে অধিক। কেবল মেদিনীপুরে ব্রাহ্মণ ও সদ্‌গোপ জাতির সংখ্যা বর্দ্ধমান অপেক্ষা অধিক।

নাম

অধুনা বিভাগ, জেলা ও প্রধান নগরের নাম বর্দ্ধমান। মুসলমানদিগের আমলে বর্দ্ধমান নামে নগর, মহাল, পরগণা ও চাকলা ছিল। হিন্দুদিগের সময়ে নগর ও ভুক্তি বর্দ্ধমান নামে অভিহিত হইত। 'রাজ্যের এক এক বৃহৎ ভাগকে ভুক্তি বলিত। সেকালের ৬টি ভুক্তির

নাম পাওয়া যায়—বর্দ্ধমান, দণ্ড, তীর, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, জেজা ও শ্রীনগর। এক সময়ে সমস্ত মগধ ও বাঙ্গলা দেশ কোন রাজা বা সম্রাট্‌বিশেষের অধীনে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

প্রাকৃতিক বিবরণ

দামোদর, অজয় ও ভাগীরথী ভিন্ন বৃহৎ নদ নদী আর নাই। বরাকর, সিংহারণ, খড়ি, বাঁকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদীও জেলার মধ্যে আছে। খড়ি ও বাঁকার উৎপত্তি স্থান দেখিয়া বোধ হয়, এগুলিও কাণানদীর ন্যায় এককালে দামোদরের শাখা ছিল। বল্লুকা ও গাঙ্গুড় নদীর শুষ্ক খাত বর্দ্ধমানের সন্নিকটে বর্ত্তমান আছে। ধর্ম্মমঙ্গলে প্রথমটির ও মনসামঙ্গলে দ্বিতীয়টির উল্লেখ আছে।

বর্দ্ধমানে পাহাড়-পর্ব্বত নাই, তবে পশ্চিমাংশে প্রস্তরময় ভূমি আছে, যাহা হইতে বর্দ্ধমানের "রাঙ্গামাটী" নাম। এই অংশে "লেটারাইট"-প্রস্তর ও তজ্জাত ভূমি আছে। নিম্নে কয়লার খনি। এখানকার ভূমিতে যথেষ্ট লৌহ আছে। সদর, কালনা ও কাঁটোয়া মহকুমার ভূমি পল্বলময় ও যথেষ্ট উর্ব্বরা।

উৎপন্ন দ্রব্য

ধান্য ও কয়লা বর্দ্ধমানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাণীগঞ্জে কাগজ ও বার্ণ্ কোম্পানীর মৃন্ময় দ্রব্যের কারখানা আছে। জেলায় কয়েকটি তেলের ও চাউলের কল আছে। কাঞ্চন-নগরের ছুরী-কাঁচি, বনপাশের পিত্তলনির্ম্মিত দ্রব্য ও বামের দেশীধুতি বিখ্যাত। মিহিদানা ও সীতাভোগ নামক মিষ্টান্নের জন্য বর্দ্ধমান নগর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন

রাঢ়প্রদেশে বর্দ্ধমান-ভুক্তির কতদূর বিস্তৃতি ছিল, জানিবার উপায় নাই। আইন্-ই-আকবরী গ্রন্থে শরিফাবাদ সরকারে বর্দ্ধমান একটি মহাল বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭২২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলা দেশকে ২৩ চাকলায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে বর্দ্ধমান এক চাকলা। ১৭৪০ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমানের রাজা চিত্রসেন রায় এই বর্দ্ধমান চাকলার রাজরূপে দিল্লীর বাদশাহের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। মীরকাশিম নবাব হইয়া ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান চাকলা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন। তখন বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার সমস্ত এবং বীরভূম ও হুগলী জেলার কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। ১৮২০ খৃঃ অব্দে বাঁকুড়া ও ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে হুগলী জেলা পৃথক্ হইয়া যায়।

প্রাকৃতিক উৎপাত

১৮৫৫ খৃঃ অব্দে রেলওয়ে খুলিবার পরে বর্দ্ধমান স্বাস্থ্যনিবাস হয়। কিন্তু ১৮৬২-৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর অত্যাচারে বর্দ্ধমানের পল্লী ও নগর প্রায় জনশূন্য

হইয়াছিল। এখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সেরূপ না থাকিলেও বাঙ্গলার কোন অংশ অপেক্ষা অত্যাচার এখানে কম নয়।

দামোদরের বন্যায় মধ্যে মধ্যে লোকের সর্ব্বনাশ হয়। ১৭৭০, ১৭৮৭, ১৮২৩, ১৮৫৫ ও ১৯১৩ খৃঃ অব্দে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার বহু স্থান প্লাবিত হয়। ইহাতে বহু সম্পত্তি নষ্ট হয় এবং বহু লোক ও গবাদি পশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পরগণা

বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান জেলায় বহু পরগণা আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি নাম মুসলমান-যুগে প্রদত্ত; যথা,—শাহাবাদ, হাভেলি, মজঃফরশাহী, আমিরাবাদ, আজমতশাহী, জাহাঙ্গীরাবাদ, শেরগড়, শিলামপুর প্রভৃতি। আর কতকগুলি হিন্দু-যুগের নাম; যথা,—বর্দ্ধমান, সাতশইকা, খণ্ডঘোষ, গোপভূম, সেনভূম, শিখরভূম, সেনপাহাড়ী, চম্পানগর, ইন্দ্রাণী ইত্যাদি।

প্রবাদ

এই চম্পানগরে চাঁদসদাগরের বাটী ছিল। গাঙ্গুড় বা বেহুলা নদী দিয়া বেহুলা লখিন্দরের শবদেহ কলার মান্দাসে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। গোপভূম এককালে সদ্‌গোপদিগের রাজ্য ছিল। বর্দ্ধমান জেলার মানকরের সন্নিকটে গোপরাজ মহেন্দ্রনাথের গড় ছিল। ইহা উমরার গড় নামে প্রসিদ্ধ। সেনপাহাড়ীতে লাউসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ইছাইঘোষের রাজধানী ছিল। সেনভূম সম্ভবতঃ লাউসেনের পিতা কর্ণসেনের বা তদীয় বংশধরগণের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

গড়

বর্দ্ধমান জেলায় বহু প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কতকগুলি হিন্দু-যুগের আর কতকগুলি দুর্গ মুসলমানেরা নূতন নির্ম্মাণ করে অথবা হিন্দু-নির্ম্মিত গড়গুলিই নিজেরা ব্যবহার করিত। কয়েকটি গড়ের নাম নিম্নে লিখিত হইল,—

১, তালিতগড় বা মহবৎগড়—বর্দ্ধমানের এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহারই নিকটে নবাবের হাটে ১০৮ শিবমন্দির অবস্থিত। ২, খাঁজাহানখাঁর গড়—বর্দ্ধমানের দক্ষিণস্থ উচালনের নিকট। ৩, শক্তিগড়—ই, আই, কোম্পানীর ষ্টেশন। ৪, রামচন্দ্রগড়—ভাঁটাকুলের নিকট। ৫, নরপালগড়—কামারকিতার নিকট। ৬, উমরারগড়—মানকরের নিকট। ৭, শেরগড়—রাণীগঞ্জের নিকট। ৮, সমুদ্রগড়। ৯, পানাগড়। ১০, রাজগড় ও আরও দুই একটি গড়ের চিহ্ন কাঁকসার নিকটে আছে। ১১, কুলীনগ্রামের গড়। ১২, মঙ্গলকোট। ১৩, গড় সোণাডাঙ্গা। ১৪ ও ১৫, দিঘা ও চুরুলিয়ার গড়। ১৬, কালনার গড়।

সম্ভ্রান্তবংশ

(১) বৰ্দ্ধমান-রাজবংশ, (২) শিয়ারশোল-রাজবংশ, (৩) চকদীঘির সিংহরায়, (৪) বৈষ্ণপুরের নন্দী, (৫) দেবীপুরের সিংহ, (৬) শ্রীবাটীর চন্দ, (৭) কাইগ্রামের মুন্সী, (৮) বৰ্দ্ধমানের তেওয়ারি এবং (৯) কুসুমগ্রাম, বোহার প্রভৃতি স্থানের মিঞাবংশ জেলার মধ্যে সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত।

বর্দ্ধমান-রাজবংশ

বৰ্দ্ধমান-রাজবংশের স্থাপয়িতা সঙ্গমসিংহ প্রথমে বৰ্দ্ধমান হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরে বৈকুণ্ঠপুরে বাস করিতেন। বল্লুকানদী তীরস্থ বৈকুণ্ঠপুর তখন বাণিজ্যের স্থান ছিল। এখনও এই রাজবংশের গড়খাই করা বৃহৎ বাটীর ভগ্নাবশেষ বৈকুণ্ঠপুরের প্রান্তে দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গমরায়ের পুত্র বঙ্কুবিহারী রায়। তৎপুত্র আবুরায় ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে বৰ্দ্ধমান চাকলার ফৌজদারের অধীনে বৰ্দ্ধমান নগরের অন্তর্গত পেকাবে বাগান বা রেখাবে বাজারের কোতোয়াল ও চৌধুরী নিযুক্ত হন। তৎপুত্র বাবুরায় বর্দ্ধমান পরগণা ও অন্য তিনটি মহালের অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ঘনশ্যাম রায় ও তৎপুত্র কৃষ্ণরাম রায়। ইনি কয়েকটি নূতন মহাল হস্তগত করিয়া বাদশাহ আওরঙ্গজেবের নিকট প্রথম সনন্দ প্রাপ্ত হন (১৬৮৯ খৃঃ অব্দ)। ইঁহারই সময়ে ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে চিতুয়া বরদার জমীদার শোভাসিংহ পাঠান-সর্দ্দার রহিমখাঁর সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া ইঁহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। তৎপুত্র জগৎরাম রায় দিল্লীর বাদশাহের নিকট ২য় সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ১৭০২ খৃঃ অব্দে শত্রুকর্ত্তৃক কৃষ্ণশায়র পুষ্করিণীতে নিহত হন। ইঁহারই পুত্র বিখ্যাত যোদ্ধা কীর্ত্তিচন্দ্র। তিনি চন্দ্রকোণা, বর্দ্দা, বালিগড়ি ও বিষ্ণুপুরের রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য হস্তগত করেন। পরে বিষ্ণুপুরের রাজার সহিত সন্ধি করিয়া নবাব আলিবর্দ্দীর পক্ষে মার্হাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৭৪০ খৃঃ অব্দে তৎপুত্র চিত্রসেন রায় বাদশাহের ৩য় সনন্দে প্রথম রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে রাজ্যলাভ করেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে তিনি দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদশাহের নিকট ৪র্থ সনন্দ প্রাপ্ত হন ও কিয়দ্দিন পরে মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার আমলে বৰ্দ্ধমান চাকলা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত হইলে ইনি বীরভূমের রাজার সহিত বিদ্রোহী হন। দুইবার ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া তৃতীয় বার স্বয়ং পরাজিত হন। তৎপরে ১৭৬০ ও ১৭৬১ খৃঃ অব্দে তিনি কোম্পানীকে স্বয়ং রাজস্ব প্রদান করেন। ১৭৬২ হইতে ১৭৭৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানী বৰ্দ্ধমান জমিদারী খাস দখলে রাখিয়া বৰ্দ্ধমান রাজকে মালিকানা প্রদান করিতেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে মহারাজ তিলকচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র তেজচন্দ্র রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৭৭১-১৮৩২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহারাজ তেজচন্দ্র রাজত্ব করেন। বৰ্দ্ধমান জমীদারীর রাজস্ব আদায়ের জন্য মহারাজ নবকৃষ্ণ সাঁজোয়াল হইয়া ১৭৮০-১৭৮২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধমানে ছিলেন। মহারাজ তেজচন্দ্রের সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

বর্দ্ধমানরাজ-কর্ত্তৃক পত্তনী-প্রথার প্রচলন হইলে ১৮১৯ খৃঃ অব্দে পত্তনী-আইন বিধিবদ্ধ হয়। মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু হইলে মহাতাপচাঁদ পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হন। মহারাজ মহাতাপচাঁদ ১৮৩৩-১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি মহাভারত ও হরিবংশ বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া বিতরণ করেন। তিনি নামের পূর্ব্বে হিস্ হাইনেস্ (His Highness) লিখিবার অধিকার পাইয়াছিলেন ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কবি

বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঠিক করিয়াছেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের ৫৬ গাঁইএর মধ্যে ২৪টি গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়ায় সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ড, কুলীন গ্রাম প্রভৃতি স্থানে বহু বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমান জেলাকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। কড়চা-প্রণেতা গোবিন্দদাস বর্দ্ধমানের কাঞ্চননগর পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ঝামটপুরে, চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দ আমাইপুরে ও চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা লোচনদাস কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অভয়ামঙ্গল বা চণ্ডী-প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও কাশীরামদাস বর্দ্ধমানের দামুন্যা ও সিঙ্গি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা ঘনরাম চক্রবর্ত্তী খণ্ডঘোষ থানার অধীন কৃষ্ণপুরে জন্ম গ্রহণ করেন ও মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। মহারাজ তেজচন্দ্রের গুরু সাধক কমলাকান্ত অম্বিকায় জন্ম গ্রহণ করিয়া চান্নায় বাল্যকাল অতিবাহিত করেন ও শেষ বয়সে বর্দ্ধমান নগরে বাস করিয়াছিলেন। রামরসায়ন-প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী মানকরের সন্নিকটে সাড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ বর্দ্ধমান জেলার লোক ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, দাশরথি রায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, মতিলাল রায়, চিরঞ্জীব শর্ম্মা ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর জন্মস্থানও বর্দ্ধমান জেলায়।

বিখ্যাত গায়ক দেওয়ান মহাশয় ও "সখি! শ্যাম না আইল" গানের রচয়িতা রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান রাজ-সংসারে চাকরী করিতেন।

বর্দ্ধমান নগরের কথা

শায়র বা পুষ্করিণী

নগরে প্রবেশ করিতেই যে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়, তাহা রাণীশায়র, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জননী রাণী ব্রজসুন্দরী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ ঘাটে শিলালিপি আছে। ইহার পশ্চিমে শামশায়র, ঘনশ্যাম রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার পশ্চিমে কৃষ্ণশায়র, কৃষ্ণরাম রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

কাঞ্চননগর পল্লীই পুরাতন বর্দ্ধমানের বাণিজ্যের স্থান ছিল। এই কাঞ্চননগরের ছুরী-কাঁচি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে রথযাত্রার সময়ে মেলা হয়। মহারাজাদিগের

দুইটি কাষ্ঠের বৃহৎ রথ আছে। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে রাস্তার উপর বারদ্বারী নামে একটি ফটক আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বিষ্ণুপুর-রাজকে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তি-চিহ্ন স্বরূপ এই ফটক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে ইদিলপুর। বর্দ্ধমান খাসে থাকিবার সময় এখানে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছারী ছিল।

পল্লী

কাঞ্চননগরের উত্তরে বাঁকা নদীর পরপারে রাজগঞ্জের মহন্ত-মহারাজের "অস্থল"। এই সন্ন্যাসিগণ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্ত্তমান মহন্ত-মহারাজ আনুমানিক দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ইহার উত্তর-পশ্চিমে লাকুর্ডি। এখানে জলের কল আছে, ১৮৮৪-৮৫ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। নিকটেই বর্দ্ধমানের উত্তর-মশান-স্থিত দুর্ল্লভাকালীর মন্দির। দামোদরের তীরে ও ইদিলপুরের পূর্ব্বে দক্ষিণ-মশান-স্থিত তেজগঞ্জের কালীর মন্দির। ইহাতেই অনুমান হয়, পুরাতন বর্দ্ধমান ইহারই মধ্যে অবস্থিত ছিল।

লাকুর্ডির পূর্ব্বে টিকরহাট ও কোটালহাট। টিকরহাটের দামোদরকুণ্ড নামক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় বহু দেবমূর্ত্তি ও স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল। কোটালহাটে সাধক কমলাকান্ত বাস করিতেন।

টিকরহাটের পশ্চিমোত্তরে কাজীর বেড় ও কাজীর হাট। তাহার পশ্চিমে মুসলমান-প্রধান গোদাপল্লী। প্রবাদ এইরূপ, পাঠানগণ প্রথমে গোদার রাজাকে পরাজিত করিয়া বর্দ্ধমান অধিকার করে। প্রথমে মুসলমানগণ পরাজিত হয়, পরে কৌশলে 'জীওতকুণ্ড' নষ্ট করিয়া জয় লাভ করে। যে স্থানে প্রথমে মুসলমান নিহত হইয়াছিল, তাহা সহিদতলা নামে বিখ্যাত। সেখানে একটি পুরাতন মস্‌জিদ আছে। নিকটে গোদা-রাজার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। গোদার উত্তর-পূর্ব্বে প্রান্তর মধ্যে মহারাজের দিলকুশা বা গোপালবাগ অবস্থিত।

রাজবাড়ীর উত্তর-পূর্ব্বাংশে বোরহাটে মহারাজাদিগের পুরাতন জেলখানা ছিল। অপরাধীর কারাবাসের ব্যবস্থা ১৭৯০ খৃঃ অব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বয়ং গ্রহণ করেন ও এই স্থানেই বহু দিন কোম্পানীর কাছারী ছিল। ইহারই সন্নিকটে মহারাজ নবকৃষ্ণ দুই বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তেওয়ারীদিগের বসত বাটী ইহারই সন্নিকটে।

রাজবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজ-কলেজ। ইহা প্রথমে বাঙ্গলা ও ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে ১৮১৭ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ইহা ২য় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। সন্নিকটে রাধাবল্লভ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি ৩টি দেবায়তন আছে।

রাজ-কলেজের পূর্ব্বে পুরাতন চক। ইহার উত্তরাংশে আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুশ্বানের চারি বৎসর বর্দ্ধমানে অবস্থিতির সময় তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত জুমা-মস্‌জিদ আছে। পুরাতন চকের দক্ষিণে পীর বহরাম, শের আফ্‌গান ও কুতুব উদ্দীনের সমাধি আছে। বহরাম সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গুরুর আদেশে

পীর বহরাম

মক্কায় পিপাসিত তীর্থযাত্রীদিগকে সুশীতল বারি পান করাইতেন, তজ্জন্য শক্কা উপাধি পান। তিনি বাদশাহ আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বর্দ্ধমানে কিছুদিন অবস্থান করেন। যোগী জয়পালকে অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া তাঁহার আশ্রম প্রাপ্ত হন। তাঁহার রচিত কবিতার অনুলিপি বর্ত্তমান মাতোয়ালির নিকটে আছে। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার লোকান্তর হয়। বাদশাহ জাহাঙ্গীর শের আফ্‌গানকে মারিবার জন্য নিজের দুধ-ভাই কুতুব উদ্দীনকে বাঙ্গলার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। রাজমহলে শের আফ্‌গানকে মারিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পরে শের বর্দ্ধমানে আসিয়া বাস করেন। এখানেও কুতুব উদ্দীন আগমন করিলে শের সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে কুতুবের সঙ্গিগণ তাঁহাকে অপমান করেন। শের কুতুবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কুতুবকে হত্যা করিলে কুতুবের অনুচরগণ শের আফ্‌গানকে একযোগে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন (১৬০৬ খৃঃ অব্দে)। কাহারও মতে এই ঘটনা স্বাধীনপুরে (সাধনপুর) সংঘটিত হয়। সাধনপুর পল্লী বর্দ্ধমান ষ্টেশনের উত্তরে।

এই পুরাতন চকের দক্ষিণাংশে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপের খিলানের উপরি ভাগকে লোকে সুন্দরের সুড়ঙ্গ বলিয়া দেখায়। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তাহা বোধ করি এখন সকলেই স্বীকার করিবেন।

রাজবাড়ীর পূর্ব্বাংশ আঞ্জমান বা কাছারী, মধ্যাংশ অন্তঃপুর ও পশ্চিমাংশ প্রাসাদ। এই পশ্চিমাংশের দক্ষিণ-ভাগে খক্কর সা নামক ফকীরের সমাধি আছে। এই অংশের পূর্ব্বে বরহান বাজার ছিল।

রাজবাড়ীর পূর্ব্বে শ্যামবাজারে হাস্যরসের অবতার স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথের বাসবাটী আছে। ইহারই নিকটে জনৈক রাজপুরোহিত কর্ত্তৃক ১১৬৮ সালে স্থাপিত বহু শিব-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে।

শ্যামবাজারের পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বমঙ্গলার সুবৃহৎ মন্দির অবস্থিত।

রাজবাড়ীর ঠিক পূর্ব্বে বড়বাজার ও তৎপূর্ব্বে রাণীগঞ্জ বাজার। বড়বাজার রাস্তার পার্শ্বে চার্চ্চ মিশনারি সোসাইটীর প্রথম মিশনারি ওয়েটব্রেট সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন রূপে একটি হল ও মহারাজ আফ্‌তাবচাঁদ কর্ত্তৃক স্থাপিত "বর্দ্ধমান রাজ ফ্রি পাব্‌লিক লাইব্রেরী" অবস্থিত। ইহারই পূর্ব্বে "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" গেট। লর্ড কার্জ্জনের বর্দ্ধমানে আগমনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ইহা বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইহার পূর্ব্বদিকে ১৮২০ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত গৃহ। দক্ষিণে মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাবচাঁদের জনক-বংশ গোপালবাবুর সম্পূর্ণ ব্যয়ে নির্ম্মিত সুবৃহৎ টাউন-হল। টাউনহলের দক্ষিণে বীরহাটা নামক পল্লী। ভারতচন্দ্রের "আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার"এর মধ্যে ৫টি হাট বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। রাজবাড়ীর পূর্ব্বাংশ সমস্তই মুরাদপুর নামে পরিচিত ছিল। বাঁকানদীর উত্তরে বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের অধিকাংশ

অবস্থিত। তেজগঞ্জের উত্তর-পূর্ব্বে ও বাঁকার দক্ষিণ তীরে খাজানর বেড়, জগৎ বেড় ও মিঞার বেড় অবস্থিত। বেড় সম্ভবতঃ গড়খাইকরা স্থানের নাম। ১৭৪০-১৭৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মার্হাট্টাগণ বর্দ্ধমানে অত্যন্ত উপদ্রব করে। সেই সময়ে এই বেড়গুলি নির্ম্মিত হয়।

খাল ও নদী

বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের মধ্যে কেবল কাঞ্চননগর, ইদিলপুর, তেজগঞ্জ ও সদরঘাট পল্লী দামোদরের সন্নিকটে অবস্থিত। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দামোদরের বাঁধ প্রস্তুত হইলে দামোদরের শাখা কাণা নদীর মুখ বন্ধ হওয়ায় কাণা নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামে জলকষ্ট উপস্থিত হয়। তন্নিবারণকল্পে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে একটি সাময়িক খাল কাটা হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ইডেন খাল কাটা হয়। ইহা জুজুতি হইতে নির্গত হইয়া জলের কলের নিকট বাঁকায় মিলিত হইয়াছে, তৎপরে দামোদরের বাঁধের উত্তর পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

বাঁকা নদীর উপর ৩টি পুল আছে। প্রথম রাধাগঞ্জের পুল। ইহা ১৮২১ খৃঃ অব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ২য় পুল সর্ব্বমঙ্গলার ঘাটের নিকট, মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক অল্পদিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। ৩য় বীরহাটার পুল। ইহা ১৮০২ খৃঃ অব্দে কোম্পানী কর্ত্তৃক বর্ত্তমান গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোডের উপর ২০০০০৲ ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়।

বাঁকার দক্ষিণ-তীরস্থ পল্লী

খাজানর বেড় খাজা আনোয়ার শব্দের অপভ্রংশ। খাজা আনোয়ার আজিমুখানের মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। রহিম খাঁ চাতুরী করিয়া সন্ধির অছিলায় খাজা আনোয়ারকে ৫ জন অনুচরসহ সাক্ষাৎ করিতে বলিলে, খাজা আনোয়ার যেমন রহিম খাঁর নিকটে আগমন করিলেন, অমনই অসতর্কভাবে বহু সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন। আজিমুখানের পুত্র ফরোখশিয়ার বাদশাহ হইয়া খাজা আনোয়ারের সমাধির জন্য দুই লক্ষ মুদ্রা ও কয়েকখানি গ্রাম ব্যয় স্বরূপ প্রদান করেন। তাহাতেই খাজা আনোয়ারের ও তাঁহার ৪ জন অনুচরের সমাধি সমন্বিত বেড়ের নবাববাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বাটীর সমস্ত গৃহগুলি খিলানে নির্ম্মিত। ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত জালায়ন-গুলি দ্রষ্টব্য। গম্বুজ ব্যতীত এখানে হস্তিপৃষ্ঠের ন্যায় ২টি খিলান আছে। বৃহৎ গজগিরি পুষ্করিণীতে ১টি জলটুঙ্গি আছে।

খাজা আনোয়ার

খাজানর বেড়ের সন্নিকটে রম্‌পুর, গোলাহাট ও ভাতশালা নামক তিনটি মুসলমান-প্রধান পল্লী। খাজানর বেড়ের পূর্ব্বে জগৎ বেড় ও তাহার পূর্ব্বে নীলপুর। এই নীলপুরের সন্নিকটে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোডের পার্শ্বে কানাই নাটশালের দুইটি কুঠী আছে। যেটি মিউনিসিপ্যাল সীমানার বাহিরে, সেটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী ছিল। নিকটেই বাম নামক পল্লীতে কোম্পানীর আমলে বহু তন্তুবায় বাস করিত। এখনও বামে সুন্দর দেশী ধুতি প্রস্তুত হয়। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে বা তাহার পূর্ব্বে কোম্পানী ব্যবসা বন্ধ করিলে মুকলের কুঠীর ম্যানেজার টাপ

সাহেবের স্থাপিত ডেভিড্ আর্স্কিন কোম্পানী এই কুঠী ক্রয় করিয়া নীলকুঠীতে পরিবর্ত্তিত করে। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে ইহাদের ব্যবসা ফেল হইলে, এই কুঠী বিক্রীত হয়। ইহার বর্ত্তমান অধিকারী চকদীঘির সুপ্রসিদ্ধ জমীদার রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহরায় বাহাদুর।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্ম্মচারী কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট ১৮১৬ খৃঃ অব্দে চার্চ্চ মিশন সোসাইটী স্থাপন করেন। এই মিশন কর্ত্তৃক এই সময়ে ২টি বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া পরে ১০টি পর্য্যন্ত হয়, ইহাতে ছাত্রসংখ্যা ১০০০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর পশ্চিম পার্শ্বে এই মিশনের একটি আড্ডা ছিল। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে ছাত্র-সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া যায়।

অন্যান্য বিবরণ

বর্দ্ধমান নগরের দৈর্ঘ্য ৩·৮ মাইল ও বিস্তার ২·৩ মাইল; আয়তন ৮·৭১৬ বর্গ-মাইল; লোক সংখ্যা ৩৫৯২১, তন্মধ্যে হিন্দু ২৬৫৩১ ও মুসলমান ৯১৫৮।

বর্দ্ধমান নগর বিষুবরেখার ২৩° ১৪′ ১০″ উত্তরে অবস্থিত। বর্দ্ধমান নগরের কিঞ্চিৎ উত্তর দিয়া জেলার মধ্যে মকরক্রান্তি গিয়াছে। গ্রীনিচের অক্ষরেখা হইতে পূর্ব্বদিকে ৮৭° ৫৩′ ৫৫″ দূরে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০৪ ফুট উচ্চ।

বর্ত্তমান গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোড নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন কালনা, কাঁটোয়া, বাঁকুড়া ও জাহানাবাদ যাইবার বড় রাস্তা বর্দ্ধমান হইতে বাহির হইয়াছে। কাঁটোয়ার রাস্তার সহিত গৌড় হইতে বাদশাহী রাস্তা মিলিত হইয়া বর্দ্ধমান নগরের মধ্য দিয়া জাহানাবাদ অঞ্চলে গিয়াছে।

মুসলমান-যুগের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ

পাঠানেরা বঙ্গ-বিজয়ের প্রথম অবস্থায় বর্দ্ধমান জেলা অধিকার করে। তজ্জন্য ইহার অধিকাংশ শরিফাবাদ সরকারের অন্তর্গত বলিয়া আইন্-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা দাউদ খাঁর পরিবারবর্গ বর্দ্ধমান নগরে ধৃত হয়। বর্দ্ধমান শের আফ্গানের জায়গীর ছিল। সাহাজাদা খুরম বিদ্রোহী হইয়া বর্দ্ধমান অধিকার করিয়াছিলেন। শোভাসিংহের বিদ্রোহের পর অরঙ্গজেবের আদেশে সাহাজাদা আজিমুশ্বান বিদ্রোহ দমন ও পরে শান্তি স্থাপনের জন্য বর্দ্ধমানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় ৪ বৎসর বাস করেন। সুফী বায়াজিদ নামক ফকীর বর্দ্ধমানে বাস করিতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য তিনি স্বীয় পুত্র ফরোখশিয়ার ও করিম উদ্দীনকে প্রেরণ করেন। ফরোখশিয়ার স্বীয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ফকীরের পাদ বন্দনা করিলে ফকীর আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তুমি দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিবে।" আজিমুশ্বান বাদশাহী লাভের আকাঙ্ক্ষা নাই জানাইলে, ফকীর স্বীয় আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না বলিয়া অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন।

ফকীরের ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইয়া ছিল, তাহা ইতিহাসের পাঠক জানেন। ফরোখশিয়ারের ব্যয়ে নির্ম্মিত মস্‌জিদ ও ফকীরের সমাধি কালনা রোডের পার্শ্বে খাঁপুকুরের সন্নিকটে অবস্থিত।

বৰ্দ্ধমান নগরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে নবাবের হাট নামক স্থানে মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের জননী মহারাণী বিষ্ণুকুমারী কর্ত্তৃক কয়েকটি মন্দির ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হয়। মন্দিরগুলি আয়ত-ক্ষেত্রাকারে অবস্থিত।

কালনার ১০৮ শিব মন্দির বৃত্তাকারে দুই পংক্তিতে অবস্থিত। কালনায় কীর্ত্তিচন্দ্রের পরবর্ত্তী কয়েকজন মহারাজের "সমাজ" আছে। দাঁইহাটে কীর্ত্তিচন্দ্রের ও পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজদিগের "সমাজ" আছে।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

স্থান-পরিচয়

কাঁটোয়া

কাঁটোয়া বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে একটী অতি প্রাচীন বন্দর। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক আরিয়ানের গ্রন্থে কাঁটাদীয়া বা কণ্টকদ্বীপের অপভ্রংশে 'কাঁটাদুপা' (Katadupa) নামে এই স্থান পরিচিত হইয়াছে। গঙ্গা ও অজয়-নদের সঙ্গমে অবস্থিত বলিয়া পূর্ব্বকালে দূরদেশ হইতে সমুদ্রপোত বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া এখানে আগমন করিত। যদিও এখানে এখনও জেলার মহকুমা থাকায় এই স্থান এককালে শ্রীহীন হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বকালের তুলনায় প্রাচীন সমৃদ্ধির কিছুই নাই। পূর্ব্বতন কীর্ত্তিরাশির অধিকাংশই গঙ্গা ও অজয়ের গর্ভশায়ী। পূর্ব্বে এই স্থান 'কাঁটাদীয়া' নামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের একটী প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। মুসলমান-বিপ্লবে সেই সমাজ ভঙ্গ হয়। এই স্থানের সমৃদ্ধি ও অবস্থান লক্ষ্য করিয়া নদীয়া-বিজয়ের পরই মুসলমানেরা এখানে আসিয়া কেন্দ্র স্থাপন করেন। তজ্জন্য ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনেকে পূর্ব্ববঙ্গ আশ্রয় করেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়কালে এই স্থানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের আশ্রম ছিল। মহাপ্রভু এই কাঁটোয়ায় আসিয়া কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষিত হন। তাহার স্মৃতি লইয়া বর্ত্তমান কাঁটোয়া সহরে 'মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের বাড়ী' বলিয়া একটী বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। (১ চিত্র দ্রষ্টব্য) এই মন্দিরটী বেশীদিনের প্রাচীন না হইলেও তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন স্মৃতি এখনও বিদ্যমান। এই গৌরাঙ্গ-বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই পশ্চিমদিকে মহাপ্রভুর মস্তকমুণ্ডনের স্থান। এখানে অনেক বৈষ্ণব ভক্ত আসিয়া মাথা মুড়াইয়া কেশ দিয়া যান। এই মুণ্ডন-স্থানের পূর্ব্বদিকে মহাপ্রভুর কেশ-সমাধি ও গদাধর দাসের সমাধি রহিয়াছে। গদাধর দাস জাতিতে কায়স্থ, বাটী আঁড়িয়াদহ। তিনি চৌষট্টি মোহন্তের মধ্যে একজন। ভক্তিরত্নাকরে তাঁহার পরিচয় আছে। তিনিই এখানকার গৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গদাধর দাসের সমাধি ছাড়াইয়া বামদিকে ঘেরা প্রাচীর মধ্যে কেশব ভারতীর সাধনা ও সিদ্ধি-স্থান। তথায় মহাপ্রভুর দীক্ষার আসন, গুরু-শিষ্যের পদচিহ্ন ও তাহার সম্মুখে মধু নাপিতের সমাধি আছে। (২ চিত্র দ্রষ্টব্য) দীক্ষা-স্থানের পশ্চিমে এখানকার গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবাইত বেণীমাধব ঠাকুরের সমাধি। তৎপরে বাড়ীর ভিতর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে গদাধর দাস-প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর মূর্ত্তি। (৩ চিত্র দ্রষ্টব্য) তাঁহার পার্শ্বে পরবর্ত্তী কালে প্রতিষ্ঠিত নিত্যানন্দের মূর্ত্তি আছেন। মহাপ্রভুর প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গত ১২৮৮ সালে সেই প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে। ইহার সম্মুখে নাটমন্দির ও পার্শ্বে ভোগমন্দির। গদাধর দাস তাঁহার প্রিয় শিষ্য যদুনন্দন ঠাকুরকে গৌরাঙ্গের সেবার ভার দিয়া যান। এই যদুনন্দন ঠাকুরই প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব-গ্রন্থরচয়িতা। যদুনন্দন ঠাকুরের বংশধর রাঢ়ীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণগণই এখানকার

সেবাইত। ভেট দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা চলে, কোন দেবোত্তর নাই। গৌরাঙ্গ-বাড়ী ছাড়াইয়া কিছু দূর গেলে গঙ্গা-অজয়-সঙ্গম। এই সঙ্গম ছাড়াইয়া কিছু দূর আসিয়া গৌরাঙ্গ-ঘাট, এখন সেই প্রাচীন স্থান গঙ্গা-গর্ভে। এই খানেই কেশব ভারতীর আশ্রম ছিল। এই স্থান ছাড়াইয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে মাধাই-তলা।

কাঁটোয়া সহর মধ্যে বড়-প্রভুর আখড়া, ফরুখশিয়ারের মস্‌জিদ ও গড়খাই,* পলাশী যাইবার সময় ক্লাইব যেখানে শিবির করিয়াছিলেন, সেই স্থান এবং কেরি সাহেবের কুঠী—এই গুলি দেখিবার জিনিস।

দাঁইহাট

কাঁটোয়া সহরের সাড়ে চারি মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে দাঁইহাট। এক সময় কাঁটোয়া হইতে দাঁইহাট পর্য্যন্ত একটী বৃহৎ সংলগ্ন সহর ছিল ও লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল। অদ্যাপি সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির ক্ষীণ স্মৃতি বর্ত্তমান দাঁইহাট হইতে কাঁটোয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমান। এক সময় যে এই স্থান মধ্যে কত হাট, কত মন্দির, কত ঘাট ছিল, অদ্যাপি সেই সমুদায়ের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের অদূরে কাঁটোয়া হইতে দাঁইহাট যাইবার রাস্তার ধারে পড়িয়া রহিয়াছে। এক সময় এই স্থানেই ইন্দ্রাণী পরগণার কেন্দ্র ছিল। তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে কবি কাশীরাম এই ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥"

এই দ্বাদশ তীর্থের মধ্যে অধিকাংশ কাঁটোয়া হইতে দাঁইহাট আসিবার রাস্তার ধারে অবস্থিত ছিল, এখন সেই তীর্থের ঘাট বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে, গঙ্গা তাহার এক মাইলেরও দূরে সরিয়া গিয়াছেন। কাঁটোয়া হইতে আসিবার সময় ঘোষহাটে ঘোষেশ্বর, পাতাই-হাটে পাতাই-চণ্ডী ও একাই-হাটে একাই-চণ্ডী প্রথমে নয়নগোচর হয়। ইন্দ্রাণী পরগণার রাজা ইন্দ্রেশ্বর গঙ্গাতটে যে সুবৃহৎ শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মুসলমান-হস্তে তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছে। যেখানে সেই শিব-মন্দির বা রাজবাটী ছিল, সেই স্থান আজও "রাজার ডাঙ্গা" নামে পরিচিত। তাহার নিকটে একটি মস্‌জিদ রহিয়াছে। এই মস্‌জিদের সম্মুখে ইন্দ্রেশ্বরের দ্বারের চৌকাটের মাথার প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। এই সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-খণ্ড দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চ ও প্রস্থে দেড় ফুট, ইহার মধ্য ভাগে এক দ্বিভুজ গণেশ মূর্ত্তি। (৪ চিত্র দ্রষ্টব্য) এই সুন্দর ও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইন্দ্রেশ্বরের প্রস্তর-মন্দির কত বৃহৎ ও কিরূপ সুন্দর ছিল! উক্ত মস্‌জিদের ভিত্তি ও প্রাঙ্গণে এখনও পূর্ব্বতন

---

* গেজেটিয়ারে উক্ত গড় ও মস্‌জিদ মুর্শিদকুলী খাঁর (ওরফে জাফর খাঁর) কীর্ত্তি বলিয়া ধরা আছে (Burdwan District Gazetteer, 1910, p. 200) কিন্তু কাঁটোয়াবাসী ইহাকে ফরুখশিয়ারের কীর্ত্তি বলিয়াই জানে।

প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন-স্বরূপ কত কাটা-পাথর রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই ইন্দ্রেশ্বরের অতীত গৌরবের কতকটা সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। ঐ স্থানের পার্শ্ব দিয়া যে ভাগীরথী বহিতেন—এখন তিনি প্রায় এক মাইলেরও বেশী দূরে সরিয়া গিয়াছেন। মস্‌জিদ হইতে ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জনসাধারণে 'ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট' দেখাইয়া থাকেন। এখানে প্রাচীন ইষ্টক-স্তূপ রহিয়াছে। আজও কেবল ইন্দ্রদ্বাদশীর দিন ইন্দ্রেশ্বরের ঘাটে বহু যাত্রী স্নান করিতে আসেন। মস্‌জিদ, তাহার নিকটস্থ 'রাজার ডাঙ্গা' এবং 'ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট' পুরাবিদ্‌গণের অনুসন্ধের প্রাচীন স্থান।

ইন্দ্রেশ্বরের ঘাটের নিকট সিদ্ধেশ্বরী-তলার মধ্যে রামানন্দের পাট। (৫ চিত্র দ্রষ্টব্য) সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের উত্তরে রামানন্দ সিদ্ধি লাভ করেন। এখানে তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে। এই রামানন্দই "শ্যামা দিগম্বরি রণমাঝে নাচো গো মা !" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গান-রচয়িতা। মন্দিরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে "কেশেগ'ড়ে"। এখানকার কেহ কেহ এই কেশেগ'ড়কে কাশীরাম দাসের স্মৃতি-জ্ঞাপক মনে করেন, কিন্তু কাশীরামের জন্মস্থান সিঙ্গি গ্রাম এই স্থান হইতে বহু দূর।

বর্ত্তমান দাঁইহাটের উত্তরাংশে দেওয়ানগঞ্জ। পূর্ব্বে এখানে বহুলোকের বসতি ও একটী বৃহৎ হাট ছিল। এখনও এখানে অনেক বড় বড় ভাঙ্গা বাড়ী পড়িয়া আছে। হাটও দাঁইহাট গ্রামের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে। গঙ্গাও এখান হইতে ১ মাইলের উপর সরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেওয়ানগঞ্জের হাটের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা বহিতেন এবং এই স্থানে বহুলোকের বাস ও যথেষ্ট জাঁকজমক ছিল। বিজয়রাম বিশারদের তীর্থমঙ্গল-গ্রন্থ হইতে তাহার বেশ পরিচয় পাইয়াছি। সে সময়ে এখানে 'মাণিকচাঁদের ঘাট' প্রসিদ্ধ ছিল।* এখানকার স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায় যে, এখানে 'পাতালঘর' আছে। পূর্ব্বে বড় বড় পাথরের মন্দির ছিল, তাহারই কতক অংশ লইয়া বর্ত্তমান 'বদরশার কবর' প্রস্তুত হইয়াছে। এই দরগার সম্মুখ-দ্বারে প্রাচীন দেবমন্দিরের শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত প্রস্তর বিদ্যমান, তাহা দেখিলেই প্রাচীন হিন্দু মন্দিরেরই নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়। একটী বৃহৎ স্তূপের উপর বদরশার দরগা উঠিয়াছে। ইহার নিকট এখনও বহু পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে। ঐ দরগার সেবাইত আমায় জানাইলেন যে, বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান মাণিকচাঁদ বদরশাহ আউলিয়াকে এই স্থান দান করেন। সুতরাং যে সময়ে দেওয়ান মাণিকচাঁদ ছাড় দেন, তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুর এই দেবস্থান ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। দেওয়ান মাণিকচাঁদ হইতেই 'দেওয়ানগঞ্জ' নাম হইয়াছে।

দাঁইহাটের পূর্ব্ব গৌরবের শেষ চিহ্ন ভাস্করবংশ এখনও বিদ্যমান। ভাস্কর শিল্পনৈপুণ্যে এখানকার ভাস্করবংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। দাঁইহাটের পার্শ্বে জগদানন্দপুরে উত্তররাঢ়ীয়

---

* তীর্থমঙ্গল ১০১১ শ্লোক (সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ)

৪। ইন্দ্রেশ্বরের দ্বারের মাথার অংশ।
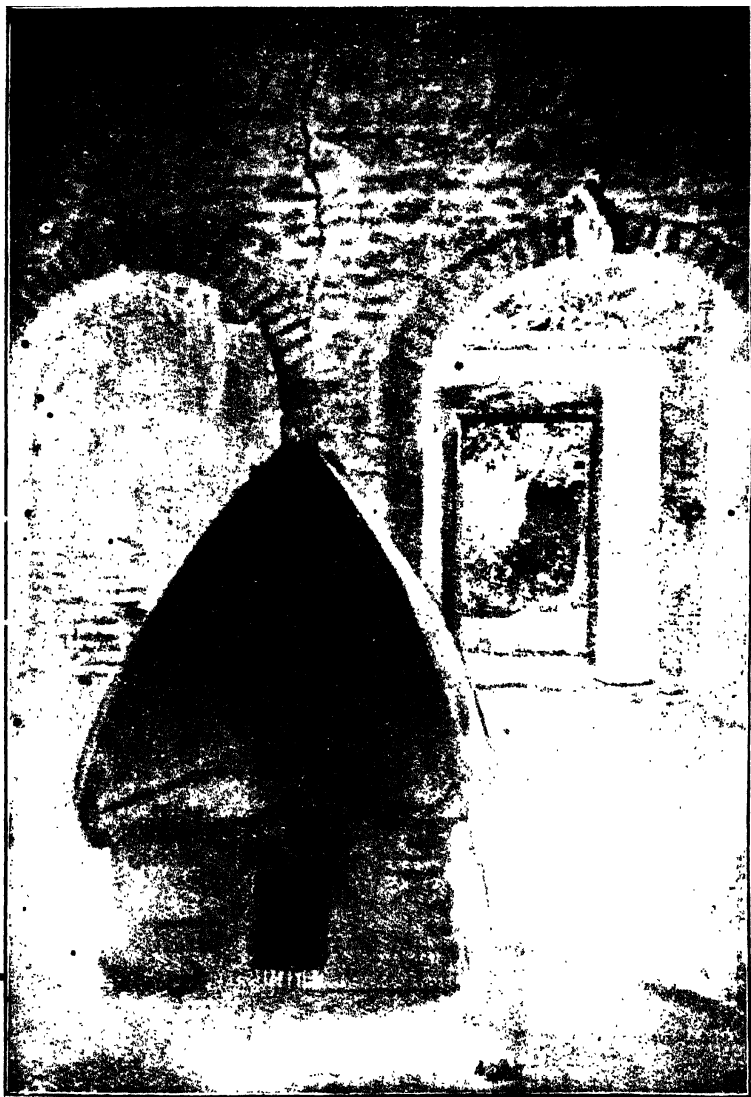
৫। দাঁইহাটের নিকটবর্ত্তী সিদ্ধেশ্বরীর ভগ্ন মন্দির ও রামানন্দের সিদ্ধিস্থান

ঘোষচৌধুরীবংশের প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ রাধাগোবিন্দের মন্দির আছে। কাশী, মৃজাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে নানা বর্ণের পাথর আনাইয়া তদ্দ্বারা এই সুন্দর মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এরূপ ভাস্কর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত চমৎকার বৈষ্ণব-মন্দির রাঢ়দেশে বিরল। (৬ চিত্র দ্রষ্টব্য) কএকটী প্রাচীন নিদর্শন ব্যতীত দাঁইহাটের পাইকপাড়ার পার্শ্বে জঙ্গল শাহের গড়ের চিহ্ন এবং প্রাচীন গঙ্গা-গর্ভের অদূরে বর্দ্ধমানরাজের সমাজবাড়ী বিদ্যমান। (৭ চিত্র দ্রষ্টব্য) বর্ত্তমান বর্দ্ধমান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুরায় হইতে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানাধিপগণের ঐ সমাজ-বাড়ী মধ্যে অস্থিসমাধি আছে।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, গঙ্গা দাঁইহাট হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু গত বর্ষ হইতে গঙ্গা-প্রবাহ ধীর মন্থর গতিতে আবার যেন পূর্ব্ব গর্ভে ফিরিয়া আসিতেছেন।

বিল্বেশ্বর ও কুলাই

কাঁটোয়া সহর হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয়ের তীরে প্রাচীন কুলাই গ্রাম। কাঁটোয়া হইতে ২৷৷০ ক্রোশ দূরে কুলাই যাইবার পথে বিল্বেশ্বর। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতে দেখা যায়—অট্টহাসে যে ফুল্লরা শক্তি আছেন, বিল্বেশ্বর বা বিল্বনাথ তাঁহারই ভৈরব। বিল্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির নষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে শিবরাত্র ও চড়ক-সংক্রান্তির সময় বহু জনতা হয়। এই বিল্বেশ্বর হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে কুলাই। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা মহাপ্রভুর পার্ষদ বাসুদেবঘোষ ঠাকুরের জন্মস্থান বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এই স্থান প্রসিদ্ধ। ঘোষঠাকুরের পিতামহ গোপাল ঘোষ ফতেসিংহ পরগণাস্থ রসোড়া হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র বল্লভ ঘোষ বাইশটী করণ করিয়া উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

"রসোড়া ছাড়িয়া গোপাল কুলায়ে বসতি।
বাইশ বল্লভঘোষ নাম হইল খ্যাতি॥" (কুলপঞ্জী)

এই বল্লভঘোষের ৯ পুত্র—১ম পক্ষে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব, ২য় পক্ষে দনুজারি, কংসারি ও মীনকেতন এবং ৩য় পক্ষে জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দ। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ চৈতন্যদেবের অনুবর্ত্তী হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। এই গোবিন্দ ঘোষই অগ্রদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ গোপীনাথ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। অগ্রদ্বীপ-প্রসঙ্গে তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কংসারি ঘোষের সন্তানেরা অদ্যাপি কুলাই গ্রামে বাস করিতেছেন। এই ঘোষবংশেই দিনাজপুরের মহারাজ সর্ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এবং রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর জন্মলাভ করিয়াছেন।

কুলাই গ্রামে অজয়ের তীরে গৌরাঙ্গের বিশ্রামস্থান ও উহার এক পোয়া উত্তরে গ্রামের মধ্যে বাসুদেব ঘোষঠাকুরের সাধনার স্থান এবং বাসুদেব, গোবিন্দ, মাধব প্রভৃতির বাসচিহ্ন

আছে। এখানে বাসুদেবঘোষ যে নিম্ববৃক্ষতলে বসিয়া সাধনা করিতেন, সেই নিম্ববৃক্ষ লইয়া গিয়াই মহাপ্রভুর বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রস্তুত হয়। কাহারও মতে সেই বিগ্রহ কাটোয়ায়, কাহারও মতে শ্রীখণ্ডে বর্ত্তমান।

কেতুগ্রাম

(বহুলাপুর)

ফুলাই হইতে দেড় ক্রোশ দূরে কেতুগ্রাম। কেতুগ্রামের পটী বহুলাপুরে বহুলাদেবী একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি এই স্থান হইতে এক মাইল দূরে মরাঘাটে ছিলেন, পরে তাঁহাকে সেখান হইতে আনিয়া গ্রাম মধ্যে রাখা হয়, অল্প দিন হইল বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, বহুলা এই গ্রাম মধ্যেই বরাবর ছিলেন, তাঁহারই দেবসেবার জন্য বহুলাপুর নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাঁহার নাম হইতেই কেতুগ্রামের পটী বহুলাপুরের নামকরণ হইয়াছে। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতের মতেও এই স্থানের নাম 'বহুলা' এবং এখানে ভগবতীর বামবাহু পতিত হওয়ায় এই স্থান মহাপীঠ মধ্যে ধরা হইয়াছে। বাস্তবিক বহুলাদেবী এবং তাঁহার বর্ত্তমান মন্দিরের পার্শ্বস্থ পুষ্করিণীর ঘাটে যে সকল পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলেই এই স্থান যে বহুদিনের পুরাতন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। বহুলার পুরোহিত মহাশয়ের নিকট শুনা গেল, এই গ্রামের পশ্চিমে ভূপাল-রাজার পাথরের দালান ছিল, বহুলার পুষ্করিণীর ঘাটে যে সকল কাটা-পাথর পাওয়া যায়, তাহা উক্ত দালানের ধ্বংসাবশেষ হইতে আনা হইয়াছে।

এখানে প্রবাদ আছে যে, কেতুগ্রামে চন্দ্রকেতু রাজা রাজত্ব করিতেন, এই চন্দ্রকেতু হইতেই কেতুগ্রাম নামের উৎপত্তি। চন্দ্রকেতুর রাজপ্রাসাদের নিকট এক পুষ্করিণীর সহিত অপর এক পুষ্করিণীর মধ্যে যাতায়াতের সুড়ঙ্গ ছিল। রাজবাটী পাথরের ছিল। তাঁহার সময়ে এখানে বিস্তর অট্টালিকা ও পাকা রাস্তা ছিল। এখনও এ অঞ্চলে সর্ব্বত্র মৃত্তিকা মধ্যে পুরাতন ইট পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কেতুগ্রাম থানার নিকট পুরাতন ভাঙ্গা ইটের ঢিবি আছে এবং তাহার চারিদিক খনন করিলেই বহু পুরাতন ইট বাহির হয়।

বহুলাদেবীর (বহুলাক্ষীর) পরিমাণ উচ্চতায় ৷৷৹ হাত, কালপাথরে গড়া, অতি সুন্দর মূর্ত্তি—দেখিলে নয়ন-মন মুগ্ধ হয়। দেবীর ডান পার্শ্বে গণেশ ও বাম পার্শ্বে শক্তিধর। মূল মূর্ত্তি সর্ব্বদাই কাপড়ে ঢাকা থাকেন। বহু অনুরোধের পর মূল মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ ঘটিলেও ছবি তুলিবার সময় পুরোহিত মহাশয় এককালে কাপড় সরাইতে রাজী হইলেন না। (৮ চিত্র দ্রষ্টব্য) এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির ধ্যান—

"ধ্যায়েচ্ছ্রীবহুলাং নগেন্দ্রতনয়াং পদ্মাসনস্থাং শুভাম্।
দোর্ভিঃ কঙ্কতিকাং বরাভয়যুতাং (ত্রিনয়নাং) বামে স্বপুত্রান্বিতাম্॥
* * * *
গৌরাঙ্গীং মণিহারকণ্ঠনমিতাং চিন্ত্যাং সুখাং কামদাম্॥"

৮। কেতুগ্রামের বহুলাক্ষী

২০। বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের অপর ধার।
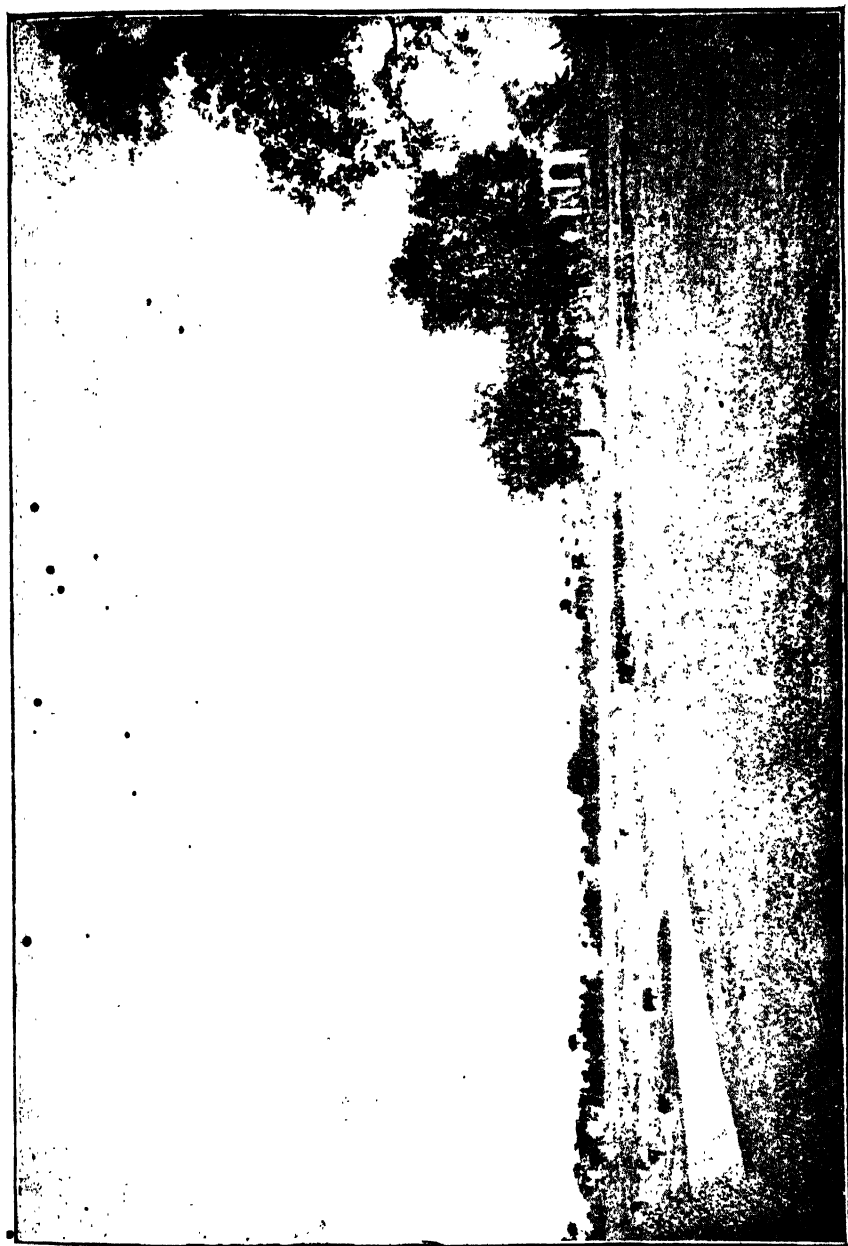
৯। কেতুগ্রামের পার্শ্বস্থ মরাঘাট—বহুলাপীঠস্থান।

অর্থ—হিমালয়সুতা পদ্মাসনস্থিতা মঙ্গলা শ্রীবহুলাকে ধ্যান করিবে। (তাঁহার চারি হাতের মধ্যে এক হাতে) কাঁকুই, (অপর দুই হাতে) বর ও অভয়, বাম পার্শ্বে নিজ পুত্র। গৌরাঙ্গী, মণিহার দ্বারা নমিত কণ্ঠ, আনন্দময়ী, কামদাকে চিন্তা করিবে।

এই ধ্যানের মাত্র তিনটী চরণ পাওয়া যাইতেছে। ধ্যানে তিনটী হস্তের বর্ণনা আছে, বাকি চতুর্থ হস্তের কোন কথা নাই। কিন্তু মূর্ত্তির চতুর্থ হস্তে দর্পণ আছে। ধ্যানে আছে, 'বামে স্বপুত্রান্বিতাম্'। কিন্তু পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, মূর্ত্তির এক পার্শ্বে কার্ত্তিকের ও এক পার্শ্বে গণেশ আছেন। ধ্যানের অপ্রাপ্ত চরণটী পাওয়া গেলে এই সকল গোল মিটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়।

পুরোহিত মহাশয় উক্ত অসম্পূর্ণ-ধ্যানেই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। স্থানীয় লোকেরা শ্রীখণ্ডের ভূতনাথকে বহুলাক্ষীর ভৈরব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবরচিত উভয় গ্রন্থের মতেই বহুলাক্ষীর ভৈরবের নাম ভীরুক।

(মরাঘাট)

স্থানীয় আধুনিক লোকের বিশ্বাস, এখানকার বহুলাক্ষী ও অট্টহাসের ফুল্লরা এই উভয় লইয়া যুগ্মপীঠ। বাস্তবিক তাহা নহে। যাঁহাকে তাঁহারা এখন বহুলাক্ষী বলিতেছেন, তাঁহার প্রকৃত নাম বহুলা, উদ্ধৃত ধ্যানেই প্রকাশ। বহুলা ও বহুলাক্ষী দুই ভিন্ন দেবীমূর্ত্তি। শিবচরিতে বহুলা ও বহুলাক্ষী দুইটী বিভিন্ন পীঠশক্তি বলিয়া ধরা হইয়াছে। শিবচরিত-মতে 'যেখানে ভগবতীর ডান কুনুই পড়িয়াছিল, সেই স্থানের নাম রণখণ্ড, সেখানকার শক্তির নাম বহুলাক্ষী ও ভৈরবের নাম মহাকাল। আর যেখানে ভগবতীর বামবাহু পড়িয়াছিল সেই স্থানের নাম বহুলা, শক্তির নামও বহুলা, ভৈরবের নাম ভীরুক। বহুলা ও বহুলাক্ষী-উভয় লইয়াই যুগ্মপীঠ। শিবচরিতে যে স্থান 'রণখণ্ড' নামে উক্ত হইয়াছে, সেই স্থানই এখন মরাঘাট নামে পরিচিত। (৯ চিত্র দ্রষ্টব্য) পূর্ব্বোক্ত বহুলা দেবীর মন্দির হইতে এক মাইল মধ্যে এখানে বহুলাক্ষী ছিলেন, এখন সেই মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে শক্তির ভৈরব মহাকাল এখানে নূতন গৃহে বিদ্যমান। এই মরাঘাটে উত্তরবাহিনী 'কাঁদড়' আছে, ব্রহ্মখণ্ডে এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীই 'বকুলা' বা 'বহুলা' নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অদ্যাপি এই মহাশ্মশানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী আগমন করিয়া থাকেন।

অট্টহাস

পূর্ব্বোক্ত মরাঘাট হইতে ১ মাইল দূরে অট্টহাস। এই মহাপীঠ অতি প্রাচীন। কুব্জিকা-তন্ত্রের মতে, এই পীঠে চামুণ্ডা ও মহানন্দা দেবী অবস্থান করিতেছেন। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিত-মতে এখানে ভগবতীর ওষ্ঠাংশ পতিত হয়, এখানকার শক্তি ফুল্লরা ও ভৈরব বিশ্বেশ বা বিশ্বনাথ। অদ্যাপি অট্টহাস মহাজাগ্রৎ মহাপীঠ বলিয়া পরিচিত। এই স্থানের পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির কিছুই নাই। ভগবতীর মূর্ত্তিও নাই। মুসলমান-বিপ্লবে সমস্তই নষ্ট হইয়াছে।

মূলপীঠস্থানে কিছুদিন পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র কুঠরী ছিল, অল্পদিন হইল তাহারই উপর খেড়ুয়ার জমিদার দেবীদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী পাকাঘর (১০খ চিত্র দ্রষ্টব্য) ও রান্নাঘর প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। ইহার অদূরে একটী উচ্চ স্তূপ রহিয়াছে, স্থানীয় লোকেরা এখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু এই স্তূপটী এখানকার পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়। ইহার উপর ও চারিপাশে বহু পাতলা ও ভাঙ্গা পুরাতন ইট পাওয়া যায়। এই স্তূপের নিকট শিবানন্দের সিদ্ধিস্থান ও রটন্তীর ভগ্ন মন্দির আছে।

এই পীঠে প্রত্যহই শিবাবলি হয়। দেবীর পূজার পর ভোগ লইয়া ডাকিলেই দলে দলে শিবা আসে। শনি ও মঙ্গলবারে এখানে বহু লোকে পূজা দিতে আসেন। দেবীর কৃপায় অনেকেরই অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, শুনা যায়। পীঠের পশ্চিম ধারে উত্তরবাহিনী 'কাঁদড়' বা স্রোতস্বতী আছে।

এখানকার পীঠদেবী ফুল্লরার জয়দুর্গার ধ্যানে পূজা হয়। যথা—

"কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥"

কিন্তু কুব্জিকাতন্ত্র-বর্ণিত চামুণ্ডা বা মহানন্দার সহিত এই ধ্যানের কোন সম্বন্ধ নাই।

দেবালয়ের বামপার্শ্বে একটী অতি পুরাতন পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণী হইতে একটী ভগ্ন দেবী-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। (১০ক চিত্র দ্রষ্টব্য) মূর্ত্তিটী ভাঙ্গা হইলেও এমন সুন্দর ও অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত দেবীমূর্ত্তি আমরা বড় একটা দেখি নাই। রাঢ়ে—বর্দ্ধমান-জেলায় ভাস্করশিল্পের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটী তাহার অতীত সাক্ষীর সামান্য নিদর্শন। ইহা কোন্ দেবীর মূর্ত্তি তাহা এখনও তন্ত্রশাস্ত্র খুঁজিয়া বাহির করিবার সুযোগ ঘটে নাই। দেবীর পাদদেশে একটী গর্দ্দভের আকৃতি থাকায় কেহ কেহ ইঁহাকে রাসভস্থা শীতলা মূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শীতলার ধ্যানের সহিত অপর কোন অংশে এই দেবীর মূর্ত্তির মিল নাই। দেবীর পাদদেশে যে অস্পষ্ট মূর্ত্তি আছে, তাহা শিবারও রূপ হইতে পারে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ভগবতীর যে জরতীবেশের উল্লেখ আছে, ঐ মূর্ত্তি যেন সেই ভাবের চণ্ডীদেবী বলিয়া মনে হয়। কুব্জিকাতন্ত্রে যে চামুণ্ডা বা মহানন্দার উল্লেখ আছে—এই সুপ্রাচীন মূর্ত্তিটী তাহার অন্যতর হইতে পারে।

অট্টহাসের সেবার জন্য বর্দ্ধমানরাজ হইতে ১০ বিঘা বাগান ও ২০ বিঘা চাষের জমি দেওয়া আছে।

অগ্রদ্বীপ

অগ্রদ্বীপ কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে একটী প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। পূর্ব্বতন অগ্রদ্বীপ বর্ত্তমান অগ্রদ্বীপের

১০ক। অট্টহাসের চামুণ্ডা বা মহানন্দা।

১২। দেবগ্রাম—কুলাই-চণ্ডী (প্রাচীন মঞ্জুশ্রী)

১৪। দেবগ্রাম—দেবকুণ্ড হইতে প্রাপ্ত বাসুদেব

৬। জগদানন্দপুর—রাধাগোবিন্দের প্রস্তর-মন্দির।

প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে ছিল, গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত গ্রামও ক্রমে সরিয়া আসিয়াছে। মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই অগ্রদ্বীপ সুপ্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য। দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে, বারাণসীতে গঙ্গাস্নান করিলে যেরূপ ফল হয়, বারুণীর দিন অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিলে সেইরূপ ফল হয়। এখানকার ফল-মাহাত্ম্যের জন্য রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। আজও বারুণী উপলক্ষে এখানে ১৫ দিনব্যাপী বড় মেলা হয়, তাহাতে প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

অধুনা গোপীনাথ-বিগ্রহের জন্যই এই স্থান প্রসিদ্ধ। কুলাই গ্রামের বিবরণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-ঘোষবংশে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব প্রভৃতি নয় ভাই জন্মগ্রহণ করেন। কাশীপুর বিষ্ণুতলায় সিংহ-বংশে গোবিন্দঘোষের বিবাহ হয়। পত্নীর মৃত্যুর পর সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি অগ্রদ্বীপের নিকট গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। এক দিবস মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া ভাগীরথী-সলিলে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নবীন সন্ন্যাসীর তেজোময় অপূর্ব্ব মুখশ্রী দেখিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইলেন, মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "প্রভো! আমি সংসার চাই না, ধন মান ঐশ্বর্য্য চাই না, আত্মীয় স্বজন চাই না, কেবল তোমার ঐ চরণকমল সেবা করিতে চাই।"

এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গদেব গোবিন্দকে সংসারের নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে সংসারে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গোবিন্দ কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন, "ধন মান ঐশ্বর্য্য সমস্ত দূর হউক, উহারা আমাকে আর জ্বালাইতে পারিবে না। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিন্।" এই বলিয়া তিনি চৈতন্যের পা জড়াইয়া ধরিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও গোবিন্দকে প্রকৃত ভক্ত জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, "যদি নিষ্কাম ব্রত পালন করিতে পার, তাহা হইলে আমার সহিত থাকিতে পাইবে।" গোবিন্দ ইহা শুনিয়া মহানন্দে চৈতন্যের পদরেণু গ্রহণ করিলেন এবং নিষ্কাম ব্রত পালনে সম্মত হইলেন। পরে কিছুদিন তিনি মহাপ্রভুর সহিত মহানন্দে কাটাইলেন।

একদিন মহাপ্রভু আহারান্তে মুখশুদ্ধি না পাইয়া ভক্তগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ আর মুখশুদ্ধি হইল না।" শিষ্যগণ নীরব রহিলেন। গোবিন্দ অমনি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুর সম্মুখে যাইয়া কহিলেন, "প্রভো! আমার নিকট একটী হরীতকী আছে; যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আপনার সেবার জন্য অর্পণ করি।" এই কথায় শ্রীচৈতন্য হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "গোবিন্দ! তোমার ভক্তির সামগ্রী আমি আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।" গোবিন্দের মস্তকে যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেব! দাস এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্য এ কঠোর আদেশ করিলেন?"

চৈতন্যদেব কহিলেন, "গোবিন্দ! তুমি যথার্থ ভক্ত ও হরিপূজায় অধিকারী। কিন্তু নিষ্কাম ব্রত পালনে উপযুক্ত নও, এখনও তোমার বিষয়-বাসনা দূর হয় নাই, এখনও তোমার সঞ্চয়-স্পৃহা আছে। তাই বলিতেছি, গৃহে ফিরিয়া যাও, হরির আরাধনা করিও, তাহাতেই মুক্তি হইবে।" "আমি কিছু চাই না, সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছি, আর সংসারে ফিরিব না"—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে গোবিন্দ এই কএকটী কথা বলিলেন।

চৈতন্যদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ! তুমি যথার্থই সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু এখনও তোমার সম্মুখে বিষম কণ্টক রহিয়াছে। আজ একটী হরীতকী সঞ্চয় করিয়াছ, কাল আবার আর একটী সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইবে, পরশ্ব আর একটী। এইরূপ কামনাই নিষ্কাম ব্রত-পালনের ঘোর অন্তরায় জানিবে। সেই জন্য বলিতেছি, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। যেদিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিবে, সেই দিন আবার আমার দর্শন পাইবে। যদি কোন অলৌকিক দ্রব্য পাও, যত্নসহকারে রাখিয়া দিও। তোমার আশা পূর্ণ হইবে।" মহাপ্রভু এই প্রকারে গোবিন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে আসিয়া "আবার কবে প্রভুর দর্শন পাইব"—এই আশায় নির্ভর করিয়া রহিলেন।

এইরূপে বহুদিন গত হইল। শুভ মধুমাস আসিল। এক দিন ভক্তপ্রবর গোবিন্দ জাহ্নবীসলিলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কি একটা জিনিস আসিয়া তিনবার তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। তিনি চাহিয়া দেখেন, শবদাহের এক খণ্ড ক্ষুদ্র কাষ্ঠ। তিনি সেই কাঠখানি তীরে তুলিয়া রাখিলেন। কিন্তু তুলিবার সময় বুঝিলেন যে, ঐ কাঠখানি স্বাভাবিক গুরুত্ব অপেক্ষা শতগুণ ভারী। একি হইল! বিস্ময়ে গোবিন্দের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু মনের সেই অপার্থিব ভাব কিছুতেই দূর হইল না—এই চিন্তায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, শঙ্খচক্রগদাধর যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, "গোবিন্দ! ভুল না, ভুল না, সেই কাঠখানি তুলিয়া আনিয়া গৃহে রাখ। মহাপ্রভু আসিতেছেন, আসিলে তাঁহাকে দিও।"

গোবিন্দের নিদ্রা ভাঙ্গিল, দেখিলেন চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। তিনি সেই নিবিড় অন্ধকারে যেন কোন কুহকের বলে আকৃষ্ট হইয়া গঙ্গাতীরে আসিলেম, এখানে আসিয়া দেখিলেন, সেই কাঠখানি যথাস্থানে পড়িয়া আছে। গোবিন্দ অতি যত্নে কাঠখানি স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে কুটীরে আনিয়া রাখিলেন। সে রাত্রি আর তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। ক্রমে প্রভাত হইল। গোবিন্দ অরুণের আলোকে দেখিতে পাইলেন, সেখানি শবদাহের কাষ্ঠ নয়—এক খানি সমুজ্জ্বল কৃষ্ণ-প্রস্তর। গোবিন্দ চমকিয়া উঠিলেন। চৈতন্যদেবের কথাগুলি তাঁহার স্মরণ হইল।

বেলা দ্বিপ্রহর সময়ে গোবিন্দ গ্রাম-মধ্যে ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইলেন। ভিক্ষান্তে কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, কুটীর-দ্বারে চৈতন্যদেব। ভক্তপ্রধান গোবিন্দ চৈতন্যদেবকে

১১। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ।

দেখিয়া পুলকে পুরিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের ভক্তিদর্শনে চৈতন্যেরও প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কিছু হইয়াছে?" গোবিন্দ সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন। তখন চৈতন্যদেব বলিলেন, "গোবিন্দ! তোমার আর কোন চিন্তা নাই। ভগবান্ তোমার মঙ্গলের জন্য ঐ শিলা পাঠাইয়াছেন। কল্য এক ভাস্কর আসিয়া ঐ শিলা হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবে। সেই বিগ্রহ আমি প্রতিষ্ঠা করিব ও তুমি তাঁহার সেবাইত হইবে।"

পর দিন যথাকালে এক অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত ভাস্কর আসিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সকলের অসাক্ষাতে চলিয়া গেল। সকলেই দেখিলেন—নবদূর্ব্বাদলশ্যাম বঙ্কিম কৃষ্ণবিগ্রহ প্রস্তুত হইয়াছে। চৈতন্যদেব তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং গোবিন্দ ঘোষ তাঁহার পূজক নিযুক্ত হইলেন। ঐ কৃষ্ণবিগ্রহের নামই গোপীনাথ। (১১ চিত্র দ্রষ্টব্য) গোবিন্দ ঘোষই পরে 'ঘোষ-ঠাকুর' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

গোপীনাথ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পর ঘোষ-ঠাকুর বহু দিন জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি বহুসংখ্যক শিষ্য ও বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমি চলিলাম, আজ আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তোমরা যথারীতি প্রভুর সেবা করিও। মহাপ্রভুর আজ্ঞা—আমার প্রাণ বাহির হইলে যথাসময়ে গোপীনাথদেব যেন আমার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। আমার দেহ দাহ করিও না, গ্রামের এক পার্শ্বে সমাধি দিও।" এই বলিয়া ভক্তবর গোবিন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। প্রবাদ এইরূপ, সেই দিন গোপীনাথের চক্ষেও বিন্দু বিন্দু জল দেখা দিয়াছিল। চৈত্রমাসে কৃষ্ণা একাদশীতে গোপীনাথ শ্রাদ্ধীয় বাস ও কুশাঙ্গুরী পরিয়া সেবকের পুত্ররূপে শ্রাদ্ধ করিলেন। এখনও প্রতি বৎসর ঐ দিনে গোপীনাথ কর্ত্তৃক ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গোপীনাথ দর্শন করিবার জন্য বহু দূরদেশ হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ এখানে আগমন করিতেন। তাহাতে যথেষ্ট আয় হইত। ঘোষ-ঠাকুরের ভ্রাতৃবংশধরগণ আসিয়া সেবা চালাইতেন। ক্রমে তাঁহাদের প্রভাব রাঢ় ছাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গে পঁহুছিল। পূর্ব্ববঙ্গের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের কাহারও কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তাঁহারাও শিষ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য অনেকে পূর্ব্ববঙ্গ আশ্রয় করিলেন। এই সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ে গোপীনাথ-বিগ্রহ লইয়া যাইবার আশা বলবতী হইল। কিন্তু তাঁহাদের যে সকল সরিক রাঢ়ে ছিলেন, তাঁহারা গোপীনাথকে ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। পূর্ব্ববঙ্গগামী ঘোষবংশীয়গণ একদিন গোপনে গোপীনাথকে লইয়া চলিলেন, জ্ঞাতিগণ সংবাদ পাইয়া পথ আটকাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে বেশী লোকজন থাকায় জ্ঞাতিগণ ফিরিয়া আসিলেন এবং তৎকালের পাটুলীর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থরাজের নিকট বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পাটুলীর রাজারা তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য পাঠাইয়া কুষ্টিয়ার নিকট

হইতে গোপীনাথকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং পাটুলীর রাজবাটীতেই কিছুকাল রাখিয়া দিলেন। এইরূপে গোপীনাথ ঘোষবংশের হাতছাড়া হইলেন। পাটুলীর রাজা অগ্রদ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী জমিদারী গোপীনাথের সেবার জন্য অর্পণ করেন এবং চৈত্র-একাদশীর দিন অগ্রদ্বীপে গোপীনাথকে পাঠাইয়া পূর্ব্ববৎ শ্রাদ্ধাদি উৎসব নির্ব্বাহ করিতেন। একবার মেলায় বহু লোকের জনতায় কতকগুলি লোক মারা যায়। এ সংবাদ পাইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব স্থানীয় জমিদারকে কারণ দর্শাইতে হুকুম দেন। মুর্শিদাবাদসরকারে পাটুলীর পক্ষে যিনি উকীল ছিলেন, তিনি নিজ প্রভুর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া ভয়ে কিছুই বলিলেন না। মোকদ্দমার ডাক হইলে নদীয়া-রাজের উকীল উঠিয়া বলিলেন, 'হুজুর! সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হয়। এত ভিড়ের মধ্যে দুই চারি জন মরিবে, তাহা কিছু অসম্ভব নহে। তবে আমার প্রভু নবদ্বীপরাজ ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হইবেন।' উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া নবাব সন্তুষ্ট হইলেন। নবদ্বীপের উকীলের কৌশলে সেই দিন হইতে গোপীনাথসহ অগ্রদ্বীপ-জমিদারী নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত হইল। যেখানে গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি ছিল, তাহারই পার্শ্বে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোপীনাথের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

ভূকৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ১১৭১ সালে ত্রিস্থলী করিয়া ফিরিবার সময় অগ্রদ্বীপে নামিয়াছিলেন। সহযাত্রী কবি বিজয়রাম তীর্থমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

"অগ্রদ্বীপ আসি নৌকা হৈল উপস্থিত ॥ ১০১২
সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর।
অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ বাটী দেখিতে সুন্দর ॥ ১০১৩
রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী আছেন গোপীনাথ।
দর্শন না পায়্যা যাত্রী মাথে মারে হাত ॥" ১০১৪

কলিকাতার শোভাবাজার-রাজবাটীতে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধে অথবা তাঁহার গোবিন্দজী প্রতিষ্ঠাকালে রাঢ়বঙ্গে যত বিষ্ণুবিগ্রহ ছিলেন, রাজা নবকৃষ্ণ সে সকলকেই নিজ প্রাসাদে আনাইয়া ছিলেন। কার্য্যান্তে সকল দেবই ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু গোপীনাথের মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি আর তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন না। এই বিগ্রহ লইয়া নবদ্বীপাধিপতির সহিত মহারাজ নবকৃষ্ণের বিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু অগ্রদ্বীপে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবকৃষ্ণ গোপনে গোপীনাথ বিগ্রহ কলিকাতায় লইয়া যান। সমসাময়িক ইংরাজলেখক ওয়ার্ডসাহেব কিন্তু লিখিয়াছেন—

"গোপীনাথের অধিকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজা নবকৃষ্ণের নিকট তিন লক্ষ টাকা ধারিতেন। সেই জন্য রাজা নবকৃষ্ণ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে লইয়া যান। অবশেষে কৃষ্ণনগরপতি মোকদ্দমা করিয়া সেই মূর্ত্তি উদ্ধার করেন।"*

* Ward's History of the Hindoos, Vol. I. p. 205-206.

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে গোপীনাথের সেবার জন্য প্রত্যহ ৫০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তৎপরে ২৫৲ টাকা হয়, ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়া এখন দৈনিক ॥০ আনা ব্যবস্থা হইয়াছে।

তীর্থমঙ্গলে গোপীনাথের যে "অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ বাটী"র উল্লেখ আছে, ভীষণ ভূমিকম্পে তাহার অধিকাংশই ভগ্ন হইয়াছে। সংস্কারাভাবে মূল-মন্দিরের উভয় পার্শ্বে নাটমন্দির ও ভোগগৃহ ধ্বংসপ্রায়। মূল-মন্দির সামান্য সংস্কারের ফলে এখনও দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত সংস্কার না হইলে শীঘ্রই ধ্বংসমুখে পতিত হইবে।

অগ্রদ্বীপ গ্রামে বাগানের মধ্যে মেলা হয়। গ্রামের মধ্যে ও মেলাস্থানের নিকট বর্দ্ধমানরাজদত্ত মহাপ্রভুর সেবা আছে। তাহারই নিকট রাধাকান্তজী আছেন, নাটোর-রাজদত্ত বৃত্তিতে তাঁহার সেবা চলে। এখানে সকল জাতির বাস আছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

ঘোড়াইক্ষেত্র

অগ্রদ্বীপ হইতে ৩ মাইল উত্তরে ঘোড়াইক্ষেত্র নামক প্রাচীন স্থান। বিজয়রামের তীর্থমঙ্গল-পাঠে জানিতে পারি যে, দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে এই ঘোড়াইক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন—

"কাশীপুর ঘোড়াইক্ষেত্র কন্যা গাজীপুর।
ডাহিনে রাখিয়া চলে ঘোষাল ঠাকুর॥
সন্ধ্যার সময় সবে আইলা গোটপাড়া।
গুড় গুড় গুড় গুড় দামায় পড়ে সাড়া॥
সেই স্থানে কালুরায় মহাশয়ের ঘর।
সোয়ারীতে কৃষ্ণচন্দ্র গেলা শীঘ্রতর॥"

(তীর্থমঙ্গল ১০১৭—১০১৯ শ্লোক)

বর্ত্তমান ঘোড়াইক্ষেত্র হইতে গঙ্গা প্রায় ১ ক্রোশ দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছেন। ঘোড়াই-ক্ষেত্রের বর্ত্তমান কালীতলার পার্শ্ব দিয়াই গঙ্গা বহিতেন। গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত এই স্থান নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়, অল্প দিন হইল জঙ্গল কাটা হইয়াছে। ইহার অপর পারে নোহাসায় কালুর ঘাট। এখানকার নোহাসার বিল প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের পরিচয় দিতেছে। এই বিল বরাবর গোটপাড়ায় গিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে।

বহু পূর্ব্ব হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র তান্ত্রিকপ্রধান স্থান ছিল। কুব্জিকাতন্ত্রে যে অশ্বতীর্থ বা অশ্বপদ পীঠের উল্লেখ আছে, কালীতলার নিকট সেই প্রাচীন পীঠ ছিল, বহু কাল হইল গঙ্গা সেই স্থান আপনার কুক্ষিগত করিয়াছেন। তৎপরেও এখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। কিন্তু গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনের সহিত ইহার মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে এখনও পীঠস্থান ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে কালীতলায় সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে।

দেবগ্রাম*

বর্ত্তমান নদীয়া জেলার উত্তরাংশে রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ-রেলপথের দেবগ্রাম ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে এবং অগ্রদ্বীপ হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে দেবগ্রাম অবস্থিত।

বর্ত্তমান দেবগ্রাম বাগড়ীবিভাগের মধ্যে পড়িয়াছে, ইহার আয়তন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ হাজার বিঘা। এই ভূভাগের উত্তরসীমা পাণিঘাটা ও গোবিন্দপুর, দক্ষিণে সাতবেগে, ভাগা, চাঁদপুর ও বনপলাসী, পূর্ব্বে বরেয়া ও দিক্‌বরেয়া, পূর্ব্ব-দক্ষিণে জয়নগর এবং পশ্চিমে সেওড়াতলা ও হাটগাছা। উত্তর-সীমার মধ্যে লুপ্ত গঙ্গার খাত পাগলাই-চণ্ডীর দহ বা পাণিঘাটার দহ, পাণিঘাটার দক্ষিণে ও দেবগ্রামের উত্তরপশ্চিমসীমায় দেবগ্রামের পাড়া পাথরজলা বা নূতনগ্রামের গড়। গ্রামবাসী বৃদ্ধ ভদ্রমহোদয়গণের বিশ্বাস যে, গোবিন্দপুর ও গড়ের পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বকালে গঙ্গা প্রবাহিত হইতেন, গঙ্গার খাদের উপরই বর্ত্তমান মীরেগ্রাম। এখানে শুকুইআরা, ডোথলঘাট, ধোবাঘাট প্রভৃতি স্থান আছে। দেবগ্রামের উত্তর ও পূর্ব্বে যেখানে গঙ্গার গর্ভে জল থাকে, সেই স্থান অদ্যাপি দহ বা বিল নামে পরিচিত। শুষ্ক গঙ্গাগর্ভ বর্ষাকালে ডুবিয়া যায়। দেবগ্রামের পূর্ব্বে (বর্ত্তমান দেবগ্রাম ষ্টেশনের পার্শ্বে) দুর্গাপুর, তাহার পার্শ্বে গহড়াপোতা; ইহার মধ্যে নৌকাঘাটা বা 'নাঘাটার মাঠ'—এখানে বর্ষাকালে ৮।১০ হাতের উপর জল চলে।

দেবগ্রামের অবস্থান

দেবগ্রাম অতি পূর্ব্বকাল হইতে একটী মহাসমৃদ্ধিশালী লোকালয় বলিয়া পরিচিত ছিল। পূর্ব্বকালে যখন ইহার পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত ছিল, তৎকালে বর্ত্তমান সাঁওতার পূর্ব্বোত্তরে নাঘাটা বা নৌকাঘাটা নামক স্থানে বড় বড় বাণিজ্যপোত আসিয়া লাগিত। সাঁওতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই তৎকালে বহু লোকের বাস ছিল, দক্ষিণে বিক্রমপুর ও উত্তরে মীরে বা মীরগ্রাম † এবং পশ্চিমে কালীগঞ্জ হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান সাতবেগে ‡ এই বিস্তীর্ণ

দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব

* এই প্রাচীন স্থানের পরিচয় পূর্ব্বে বড় প্রকাশ ছিল না। ইহার প্রাচীনত্বের সন্ধান পাইয়া আমি ক্রমান্বয়ে চারিবার ঐ স্থানে গিয়াছিলাম। প্রথম দুইবারে ঐ স্থানের প্রাচীন অধিবাসী কৃষকদিগের নিকট এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বারে গ্রামবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট স্থানীয় কিংবদন্তী শুনিয়া প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও পুরাকীর্ত্তিগুলি দর্শন করি। ৪র্থ বারে (গত ১৩ই চৈত্র ১৩২১) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও পুরাতত্ত্বানুরাগী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার সঙ্গে এই দেবগ্রাম ও বিক্রমপুর পরিদর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলেন। এই কএক বারের অনুসন্ধানের ফলে এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মজুমদার প্রভৃতি গ্রামবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে যেরূপ কিংবদন্তী সংগৃহীত হইয়াছে এবং আমরা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিত হইল।

† ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে দেবগ্রামের উল্লেখ না থাকিলেও এই মীরগ্রামের উল্লেখ আছে।

‡ পূর্ব্বকালে একটী বেগেই ছিল, কিছু দিন হইল উহার সাতভাগ হইয়াছে। এই সাতবেগের নাম পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যথাক্রমে ১ চিনিমিনি বেগে, ২ স্থাপন বেগে, ৩ চক বেগে, ৪ গড়ের বেগে, ৫ আড়ার বেগে, ৬ খোয়দ বেগে ও ৭ পালিত বেগে।

১৩। দেবগ্রাম—বিভক্ত দেবকুণ্ড।

দেবগ্রাম হইতে প্রাপ্ত মাহেশ্বরী (?) মূর্তিযুক্ত প্রস্তর।
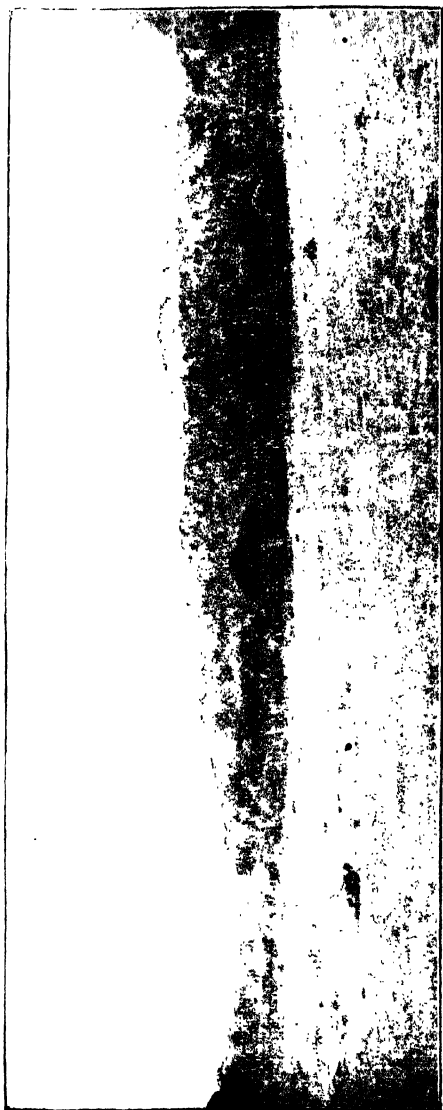
নগরীর মধ্যেই ছিল। এই ভূভাগের মধ্যে এখনও স্থানে স্থানে বহু প্রাচীন ইষ্টকাদির নিদর্শন ও বহু সংখ্যক সুপ্রাচীন মজা পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। দেবগ্রামের সর্ব্বপ্রাচীন স্মৃতি সম্ভবতঃ মঞ্জুশ্রী।* এখন ইনি কুলুইচণ্ডী নামে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীরূপে সকলের পূজা পাইতেছেন। এখানে যে এক সময় বৌদ্ধপ্রভাব ছিল, এই মঞ্জুশ্রীই তাহার নিদর্শন। (১২ চিত্র দ্রষ্টব্য)

দেবকুণ্ড

দেবগ্রামে যত পুষ্করিণী আছে, তন্মধ্যে দেবকুণ্ড সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্ববৃহৎ—পূর্ব্বে প্রায় দেড়শত বিঘায় জল থাকিত। তাহার পশ্চিমে ফুলবাগান এবং অপর তিন দিকে লোকের বাস ও মধ্যে মধ্যে দেবালয় ছিল। এখন দেবকুণ্ডের অধিকাংশই ভরাট হইয়াছে, যেটুকু জল আছে, তাহা তিনটী পুষ্করিণী, ৪টী জোল এবং দক্ষিণে একটী লম্বা জোলে বিভক্ত রহিয়াছে। (১৩ চিত্র দ্রষ্টব্য) উত্তরাংশ অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে এখন অনেক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন ফুলবাগান এখন নামমাত্র—একটী পাড়া হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান দেবকুণ্ড-সংস্কারকালে ইহার মধ্য হইতে নানা লোকে নানা দেবমূর্ত্তি পাইয়াছে, তাহার কতকগুলি দেবকুণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ-গৃহে আছে, কতক কতক স্থানান্তরে গিয়াছে। কিছুদিন হইল, এই দেবকুণ্ড হইতে কষ্টিপাথরের একটী অতি সুন্দর বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া যায়। সেই মূর্ত্তিটী দেবগ্রামভব স্বনামধন্য ডাক্তার উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনার কলিকাতার বাসায় আনিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সাহিত্যসম্মেলনে প্রদর্শন ও তৎপরে সাহিত্য-পরিষদে রক্ষা করিবার জন্য অর্পণ করিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তি এক্ষণে সাহিত্য-পরিষদে আছে। (১৪ চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই মূর্ত্তির শিল্পনৈপুণ্য ও গঠন দেখিলে ৬।৭ শত বর্ষের প্রাচীন মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইবে।

পচা-দীঘী.

গ্রামের উত্তরাংশে 'লালদীঘী' নামে একটী প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, পূর্ব্বে ইহার 'পচাদীঘী' নাম ছিল। ১২৮০ সালে এই দীঘীর সংস্কার-কালে ব্রহ্মাণী বা মাহেশ্বরী মূর্ত্তিযুক্ত একখণ্ড পাথর† (১৫ চিত্র দ্রষ্টব্য), হাতীর মাথা এবং ইষ্টকস্তূপ বাহির হয়। এই স্তূপ হইতে এত পুরাতন ইট উঠিয়াছিল যে, তাহাতে ইহার নিকট একটী পাকা কোটা প্রস্তুত হইয়াছে। ওরূপ দেবীমূর্ত্তিশোভিত প্রস্তরফলক সাধারণতঃ দেবমন্দিরের বহির্গাত্রে সংলগ্ন থাকে এবং তাহা হইতে মূল মন্দির কত বড় ছিল, তাহাও কতকটা বুঝা যায়।

দেবগ্রামের গড়

দেবগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং উত্তরে এখনও সুপ্রাচীন গড়ের চিহ্ন বিদ্যমান। উত্তরের গড়টী প্রায় দৈর্ঘ্যে ১ মাইল, প্রস্থে প্রায় দুইশত ফুট এবং ইহার বর্ত্তমান উচ্চতা ৬ ফুট হইতে ১৫ ফুট পর্য্যন্ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

---

* শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মূর্ত্তিটীকে "মহারাজলীল মঞ্জুশ্রী" বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধ তন্ত্রে মঞ্জুশ্রীর যেরূপ সাধন লিখিত আছে, তাহার সহিত মিল নাই। তবে মূর্ত্তিটী যে সহস্রাধিক বর্ষের প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

† এই মূর্ত্তির বাহন ও লাঞ্ছন অস্পষ্ট হওয়ায় ইনি ব্রহ্মাণী কি মাহেশ্বরী তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এক্ষণে সাহিত্য-পরিষদে এই প্রস্তর-ফলক বিদ্যমান।

ইহার দুই পার্শ্বেই পরিখার চিহ্ন রহিয়াছে। (১৬ চিত্র দ্রষ্টব্য)। দক্ষিণপশ্চিমাংশের গড়টী 'বেগের গড়' বা 'গড়বেগে' নামে পরিচিত। প্রবাদ—এই গড়ে পাতালঘর আছে। তাহাতে এখানকার পূর্ব্বতন নৃপতির গুপ্তধন রক্ষিত আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

দেবগ্রামের অবস্থান দেখিয়া প্রাচীন লোকেরা মনে করেন যে, ইহার দুই পার্শ্বে গড় ও দুই পার্শ্বে স্রোতস্বতী এই স্থানকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিল। এখন এই স্থান বাগড়ীর মধ্যে পড়িলেও যে সময়ে ইহার পূর্ব্ব দিয়া গঙ্গা বহিতেন, সেই সময় এই স্থানের কতকাংশ রাঢ় ও কতকাংশ বাগড়ীর সামিল ছিল। রামচরিতে পাইয়াছি—

"**দেবগ্রাম**প্রতিবদ্ধ-বসুধাচক্রবাল-**বালবলভী**তরঙ্গবহল-গলহস্তপ্রশস্তহস্তবিক্রমো **বিক্রমরাজঃ**"।

রামচরিতের বিক্রমরাজ যে, বর্ত্তমান দেবগ্রাম অঞ্চলে আধিপত্য করিতেন, তাহার আলোচনা পরে করিব। তবে এখানে বলিয়া রাখি, রামচরিত হইতে আমরা পাইতেছি যে, পালবংশের অধিকারকালে খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে এই দেবগ্রাম একটী প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল।

পূর্ব্বোক্ত গহড়াপোতার নিকট (বর্ত্তমান দেবগ্রামের পূর্ব্বভাগে) দমদমা। এখানে একটী উচ্চ স্তূপ বা ঢিবি আছে—স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সাবেক অধিবাসিমাত্রই ঐ ঢিবিকে 'বল্লালের ভিটা' বা 'বল্লালসেনের বাড়ী' বলিয়া থাকে। এই স্থানে এবং ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে ভীষণ জঙ্গল ছিল, অনেকে এখানে আসিয়া বাঘ শীকার করিত। অল্প দিন হইল জঙ্গল পরিষ্কার হইয়াছে। (১৭ চিত্র দ্রষ্টব্য) ইহারই পার্শ্বে সাঁওতার দীঘী। ইহার উপর দিয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের যত্নে বহরমপুররোড হইবার পূর্ব্বে বল্লালের ভিটা ও সাঁওতার দীঘী পাশাপাশি ছিল, এই জন্য প্রাচীন লোকেরা ঐ দীঘী বল্লালের অন্তঃপুরস্থ দীঘী বলিয়া মনে করেন। দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের অনেক বনিয়াদী লোকের মুখে এই দীঘীর অপর নাম "বল্লাল-দীঘী" শুনা গিয়াছে। এই সাঁওতা হইতে দুইটী

বল্লালের ভিটা

প্রাচীন জাঙ্গাল বা রাস্তা বাহির হইয়া একটী পশ্চিমদিক্ দিয়া বরাবর ভাগা, চাঁদপুর, বরগাছী হইয়া বিক্রমপুরের 'জিতের মাঠ' দিয়া যথাক্রমে ভবানীপুর, সুখপুকুর, রাজাপুর হইয়া বিল্বগ্রামের দক্ষিণ দিকে নবদ্বীপ অভিমুখে গিয়াছে। অপর জাঙ্গাল বা প্রাচীন রাস্তা পূর্ব্বদিক্ দিয়া চাঁদপুর, কালীনগর, ধুবী ও সেনপুর হইয়া মুনীর দক্ষিণ ও মালুমগাছার পার্শ্ব দিয়া গবীপুর পর্য্যন্ত গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। গবীপুরের প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ জাঙ্গাল পূর্ব্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ক্রমে কৃষকগণের কৃপায় সে সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত উভয় জাঙ্গালই 'রাজার জাঙ্গাল' বা 'বল্লাল-সেনের জাঙ্গাল' নামে স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট পরিচিত। ঐ জাঙ্গালের ধারে ধারে ৩।৪ ক্রোশ অন্তর বড় বড় পুরাতন পুষ্করিণী দেখা যায়, তন্মধ্যে সাঁওতা, ভাগা, বরগাছী, বিক্রমপুর, ভবানীপুর, রাজাপুর, বিল্বগ্রাম ও নবদ্বীপের অপর পারস্থ পুষ্করিণী প্রসিদ্ধ। ভবানীপুর ও নব-

বল্লালসেনের জাঙ্গাল

১৭। বল্লালসেনের ভিটা বা দমদমার স্তূপ।

২১। বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত স্তম্ভাংশ।
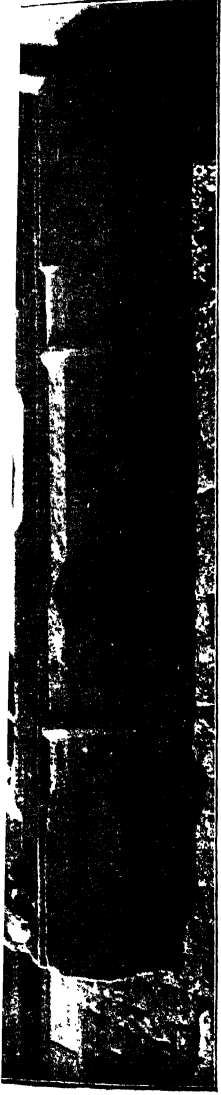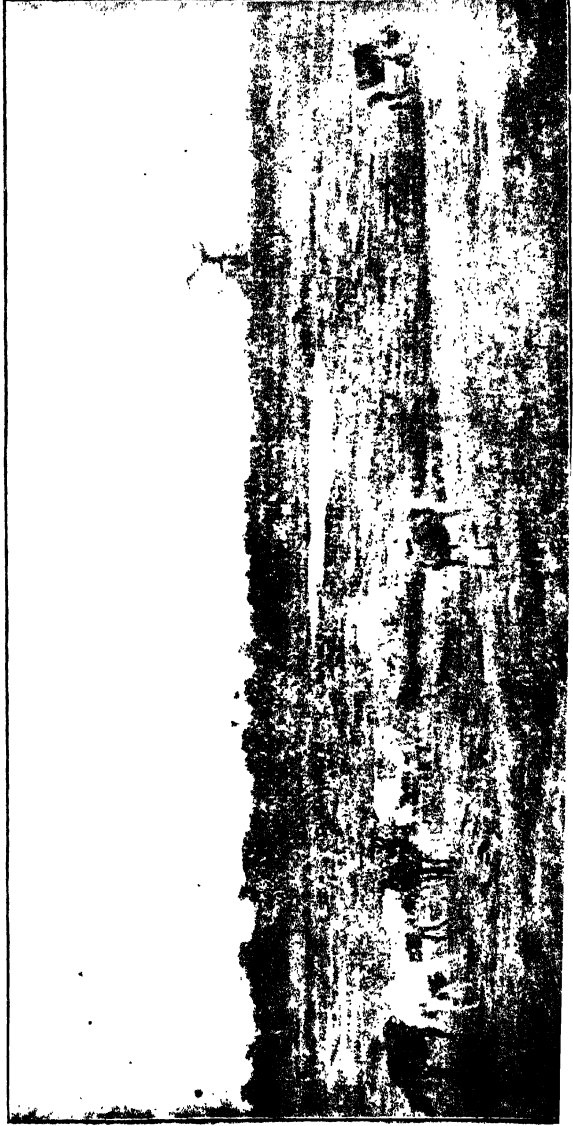
দ্বীপের পুষ্করিণী আজও "বল্লালের দীঘী" নামেই পরিচিত। আজও কেহ কেহ অপর স্থানের মজা পুকুরগুলিকে বল্লালসেনের নামের অপভ্রংশে 'বল্‌লামসেনের কীর্ত্তি' বলিয়া মনে করেন।

পূর্ব্বে এই স্থান বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার অধীন ছিল। প্রায় ৫০ বর্ষ হইল, কাঁটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ৺ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় কার্য্যগতিকে দেবগ্রামে আসিয়া কিছু দিন অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি স্থানীয় জমিদার ৺বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহায্যে "বল্লালের ভিটা" খনন করাইয়াছিলেন। দেবগ্রামের প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন — খননকালে ঐ স্তূপ হইতে বহুতর কাটা-পাথর, ভগ্ন পাথরের মূর্ত্তি (১৮ চিত্র দ্রষ্টব্য), ভাস্কর-কার্য্যযুক্ত পাথরের চৌকাট, পদ্ম ও নরনারী মূর্ত্তিযুক্ত পাথর (১৯।২০ চিত্র দ্রষ্টব্য), ৪।৫ হাত লম্বা পাথরের থাম (২১ চিত্র দ্রষ্টব্য), পাথরের মকরমুখ' নর্দ্দামা, দৈর্ঘ্যে তিন হাত ও প্রস্থে দুই হাত লিপিযুক্ত একখণ্ড প্রস্তরফলক এবং কটি হইতে জানু পর্য্যন্ত মালকোচা করিয়া কাপড়পরা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। ৺ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিপিযুক্ত প্রস্তরফলক ও কতকগুলি ভাঙ্গা মূর্ত্তি মিউজিয়মে পাঠাইবার জন্য কাঁটোয়ায় লইয়া যান। বামনদাস বাবু অনেক পাথর তাঁহার একডালার কাছারীতে পাঠাইয়া দেন। সে সময়ে এখানকার মডেল-স্কুলের শিক্ষক ৺দীননাথ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় তাঁহার স্বগ্রাম সালুগাঁ দোগাছিয়া গ্রামে এখান হইতে মকরমুখ' নর্দ্দামা ও কএকটী মূর্ত্তি লইয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামস্থ নানা লোকে সেই সকল কাটা-পাথর স্ব স্ব গৃহে আনিয়া নানা কাজে ব্যবহার করিতেছেন। মালকোচা করিয়া কাপড়পরা ভগ্ন মূর্ত্তিটী বহু দিন কুলাইচণ্ডীতলায় পড়িয়াছিল। উহা ওজনে প্রায় ২ মণ হইবে, অনেক বলবান্ ব্যক্তি সেই ভগ্ন মূর্ত্তিটী তুলিয়া স্ব স্ব বলপরীক্ষা করিত। স্থানীয় লোকের নিকট তাহা "বল্লালসেনের বুক" বা "বল্লালসেনের ধড়" বলিয়া পরিচিত ছিল। কিছুদিন হইল বৈরামপুর গ্রামে সেই ধড়টী লইয়া গিয়াছে। এই ধড়টীর অনুসন্ধান আবশ্যক। এখনও "বল্লালের ভিটা" রীতিমত খনন করিলে অনেক পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। যখন 'বহরমপুর-রোড' প্রস্তুত হয় নাই, তখন এই ভিটার ধ্বংসাবশেষ সাঁওতার দীঘীর উত্তর পাড় হইতে আরম্ভ হইয়া বরাবর প্রায় অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত ছিল। এখনও ঐ অংশ খনন করিলেই মধ্যে মধ্যে পুরাতন ইট বাহির হয়। পূর্ব্বে এই সাঁওতার দীঘী প্রায় ৪০ বিঘা ছিল, ইহার উপর দিয়াই 'বহরমপুর-রোড' গিয়াছে, কিন্তু এখন ইহার অধিকাংশই শুষ্ক গোচারণ মাঠ হইয়া পড়িয়াছে। (২২ চিত্র দ্রষ্টব্য)।

বল্লালভিটার সংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়ার পশ্চিমাংশে যে পুরাতন পুষ্করিণী আছে*, তাহার উত্তর পার্শ্বে দেবগ্রামের বয়োবৃদ্ধগণ ৪০ বর্ষ পূর্ব্বেও চারি হাত মোটা চৌকা থামের গোড়া দেখিয়া-ছিলেন, এখন তাহা চাপা পড়িয়াছে।

দেবগ্রামের প্রাচীন লোকের বিশ্বাস, সাঁওতার উচ্চ জমিতে পূর্ব্বকালে বহু লোকের বাস

* অল্প দিন হইল গ্রামের কলুরা এই পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করায় ইহার নাম 'কলুপুকুর' হইয়াছে।

ছিল—নানা নৈসর্গিক কারণে ও মুসলমানবিপ্লবে তাঁহারা পূর্ব্ব স্থান ছাড়িয়া উত্তরে দেবকুণ্ড-তীরে আসিয়া বাস করেন।†

বিক্রমপুর

বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম দেবগ্রামের ৪ মাইল দক্ষিণে ও সোণাডাঙ্গা হইতে ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। রেনেল সাহেবের প্রাচীন মানচিত্রে এই বিক্রমপুরের উল্লেখ আছে। এই বিক্রমপুর প্রাচীন বিক্রমপুরের অংশমাত্র। এখানকার জমিদারের কাগজ হইতে জানা যায় যে, পার্শ্ববর্ত্তী বরগাছী, কালীনগর, বিক্রমপুরহাট‡, বিক্রমপুরকুঠী প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুর মৌজারই সামিল। দেবগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী ডিঙ্গেলগ্রামের দক্ষিণে যে জোল বা নিম্নভূমি আছে, বিক্রমপুরের উত্তরপূর্ব্ব-সীমা ততদূর বিস্তৃত।

---

† কেহ কেহ দেবগ্রামকে দেবলরাজার রাজধানী ও উহার প্রাচীন কীর্ত্তিগুলিকে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম যে, দেবল রাজার সহিত এই দেবগ্রামের কোন সম্বন্ধ নাই। নদীয়া জেলার মধ্যে বর্ত্তমান রাণাঘাট-বনগ্রাম-লাইনে গাংনাপুর ষ্টেসন হইতে ১ ক্রোশ দূরে আর একটী প্রাচীন দেবগ্রাম বা দেবগ্রামের গড় রহিয়াছে। ঐ গড় আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। এই গড়ের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি এই স্থানের ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের স্ত্রীপুরুষ সকলেই 'দেবলরাজার গড়' বা 'দেপাল রাজার রাজধানী' বলিয়া জানেন। সম্ভবতঃ নদীয়া জেলার এই দক্ষিণাংশস্থিত দেবগ্রামের সর্ব্বজনবিদিত প্রবাদ অধুনাতন কালে নদীয়া জেলার উত্তরাংশস্থিত আমাদের আলোচ্য দেবগ্রামের উপর চাপান হইয়াছে। বাস্তবিক নদীয়া জেলার এই দক্ষিণাংশস্থিত দেবগ্রামের গড়টী আমাদের আলোচ্য দেবগ্রাম অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। রাঢ়ীয় ও বঙ্গসমাজের দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে এই স্থান একটী প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এখন এই দেগাঁ বা দেবগ্রামে ৩।৪ ঘর মাত্র ভদ্রলোকের বাস ঘটে, কিন্তু নিকটবর্ত্তী গ্রাম-বৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্ব্বেও এখানে ৫০।৬০ ঘর আচার্য্য ব্রাহ্মণের বাস ছিল।

খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে—

"দেবগ্রামভবা ধন্যা দেবীয় তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতরূপা।
দেবকীব তস্মাদ্গোপালপ্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমম্।"

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুরবমিশ্রের মাতুলালয় ছিল বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন।

এই দেবগ্রামের প্রাচীনতা ও প্রসিদ্ধি অবগত হইয়া এই স্থানই রামচরিতোক্ত দেবগ্রাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা ৪ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।) কিন্তু এখন দেখিতেছি, এই দেবগ্রাম বালবলভী বা বাগড়ী ভূভাগের অন্তর্গত নহে, এ অবস্থায় এই দেবগ্রাম রামচরিতোক্ত দেবগ্রাম নহে। এখন স্থির হইল, রামচরিতোক্ত দেবগ্রামই পলাশীর দক্ষিণে অবস্থিত বাগড়ীর অন্তর্গত আমাদের আলোচ্য দেবগ্রাম এবং এই স্থানের সহিত দেবল রাজার কোন সম্বন্ধ নাই।

‡ বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

বিক্রমপুরের মধ্যে যে 'জাঙ্গীর খাল' আছে, সেই খাল দিয়া পূর্ব্বে ভাগীরথীর স্রোত বহিত। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের পশ্চিমে একটী প্রকাণ্ড মাঠ আছে, উহার নাম 'জিতের মাঠ'। এখানে 'জিতের পুষ্করিণী' নামে একটী সুপ্রাচীন ও বৃহৎ পুষ্করিণী রহিয়াছে। প্রবাদ—উক্ত জিতের মাঠে বহু পূর্ব্বে সহর ছিল। পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে এখনও লোকাবাসের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে অল্প মাটী খুঁড়িলেই বহু পুরাতন লৌহমল এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রাদি 'কুমারের সাজ' পাওয়া যায়। এই স্থান দেখিলেই মনে হইবে যে, বিলুপ্ত সহরের কতকটা পূর্ব্ব দিয়া এক সময়ে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তিরাজির অধিকাংশই ভাগীরথীর তরঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান বিক্রমপুরের ষষ্ঠীতলায় কএক খণ্ড পাথর পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একখানিতে সামান্য খোদাই কাজ আছে। সাঁওতার বল্লালের ভিটা হইতে যেরূপ কাটা-পাথর বাহির হইয়াছে, এখানকার পাথর সেই ধরণের। নিকটবর্ত্তী গবীপুরে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। প্রবাদ—পুরাকালে এখানে এক রাজার বাড়ী ছিল।

বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্ত্তী সেনপুর ও ঘুনীর মধ্যে অতিপ্রাচীন 'ট্যাংড়ার পুষ্করিণী' আছে। প্রবাদ—উহা বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত।

'বল্লালসেনের জাঙ্গালের' কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তাহাও সাঁওতা হইতে আরম্ভ হইয়া এই বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই রামচরিতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, গৌড়াধিপ রামপালের সময় বিক্রম নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-তরঙ্গবহল-বালবলভী প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত অগ্রদ্বীপে শুনিয়া আসিয়াছি

বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব

যে, বিক্রম নামে এক রাজা প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। বর্দ্ধমানের নূতন গেজেটিয়ারেও লিখিত হইয়াছে যে, উজানী হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে আসিয়া গঙ্গা-স্নান করিতেন।* পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, দেবগ্রাম ও বিক্রমপুর কাঁটোয়া মহকুমার মধ্যেই ছিল। বিক্রমপুর ও দেবগ্রামের প্রাচীন ভূসংস্থান ও ভাগীরথীর গতি হইতে বেশ মনে হইবে যে, বর্ত্তমান অগ্রদ্বীপের মত দেবগ্রাম এবং বিক্রমপুরের কতকটা এক সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে অর্থাৎ রাঢ়দেশের মধ্যে ও কতকটা বাগ্‌ড়ীর মধ্যে ছিল। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর হইতে মঙ্গলকোট পর্য্যন্ত প্রায় ১২ ক্রোশ ভূভাগ বিক্রম নামক নৃপতির শাসনাধীন থাকা কিছু বিচিত্র নহে। দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাজই সম্ভবতঃ উজানী-মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে

---

* Burdwan District Gazetteer by J. C. Peterson, 1913, p. 183. এখানে সাহেব ভ্রমক্রমে উজানীকে রাজপুতানায় লইয়া ফেলিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার অধীন উজানী-মঙ্গলকোটের বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎই উক্ত প্রবাদের নায়ক বলিয়া বোধ হয়।

বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান বিক্রমপুরের পার্শ্বে যে সুবিস্তীর্ণ 'জিতের মাঠ' বা 'জিতের পুষ্করিণী' বিদ্যমান, তাহা 'বিক্রমজিতের মাঠ' বা 'বিক্রমজিতের পুষ্করিণী' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার নিকট যে সুপ্রাচীন বিক্রমপুর সহর ছিল, তাহা যে রাজা বিক্রমজিতের প্রতিষ্ঠিত বা তাঁহার নামানুসারেই বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত, তাহাও অসম্ভব নহে।

বিজয়সেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, তিনি বিক্রমপুরের প্রাসাদ হইতে 'শাসন' প্রদান করিতেছেন। এদিকে বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনে তৎপিতা বিজয়সেনের পরিচয়-প্রসঙ্গে নিবদ্ধ হইয়াছে—

"তস্মাদভূদখিলপার্থিবচক্রবর্ত্তী নির্ব্যাজবিক্রমতিরস্কৃত-**সাহসাঙ্কঃ**।
দিক্‌পালচক্রপুটভেদনগীতকীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতির্বিজয়সেনপদপ্রকাশঃ॥"

'তাঁহা (হেমন্তসেন) হইতে অখিল পার্থিব-চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। অকপট বিক্রমে **সাহসাঙ্ক** অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যও যাঁহার নিকট লজ্জিত সেই (দিক্)পালচক্রের নগরেও তাঁহার কীর্ত্তি গীত হইত।'

অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, একে একে পালরাজগণের সামন্তচক্র নষ্ট করিয়াই মহারাজ বিজয়সেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল।* রামচরিতে দেবগ্রাম-বালবলভীপতি বিক্রমরাজও রামপালের সামন্তচক্র মধ্যেই কথিত হইয়াছেন। এই বিক্রমরাজও এক জন অতিবিক্রমশালী নৃপতি ছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ প্রশস্তিকার ভারতপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুল্যজ্ঞান করিয়া 'সাহসাঙ্ক'† নামেই পরিচিত করিয়া থাকিবেন। তাঁহাকে যিনি পরাজিত করিয়াছিলেন, এখন বিক্রমশালী নৃপতিকেও বিজয়সেন পরে পরাজয় করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের প্রশস্তি-সম্বলিত তাম্রশাসন বিক্রমপুরের রাজবাটী হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। বল্লালসেনের তাম্রশাসনে 'দিক্‌পালচক্রপুটভেদনগীতকীর্ত্তিঃ'-প্রসঙ্গে যেন তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে প্রায় ৫।০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত সীতাহাটী গ্রামে ভূমি-খননকালে বল্লালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। বল্লালসেন এই তাম্রশাসন লিখিয়া যে ভূভাগ দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ভূভাগ সীতাহাটী হইতে বেশী দূর নয়।‡ এই তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈর্ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ"

অর্থাৎ যে সেনবংশ প্রৌঢ় রাঢ়দেশকে অতুল প্রভাব দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা।

† জটাধরের সুপ্রাচীন সংস্কৃত কোষ অভিধানতন্ত্রে 'সাহসাঙ্ক' বিক্রমাদিত্যের নামান্তর বা পর্য্যায় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

‡ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩১৭, ৪র্থ সংখ্যা, ২৩২ পৃষ্ঠা।

২৩। বিক্রমপুরের প্রাচীন ভগ্ন দরগা।

বল্লালসেনের তাম্রশাসন হইতেই মনে হয় যে, রাঢ়দেশই সেনবংশের পূর্ব্বলীলাস্থল। এই তাম্রশাসনখানি "শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার" হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ণিত বল্লালের ভিটা, বল্লালের দীঘী ও বল্লালের জাঙ্গাল সম্বন্ধীয় প্রবাদ এবং দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান হইতে মনে হয় যে, বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনবর্ণিত "বিক্রমপুরজয়স্কন্ধাবার" বর্ত্তমান দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের মধ্যেই ছিল।

চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত আনন্দভট্টের বল্লালচরিতেও লিখিত আছে—বল্লালসেন কখন গৌড়ে, কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন।* চারি শত বর্ষের এই প্রবাদ-বাক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেন্দ্রের মধ্যে গৌড় নগরে, রাঢ় দেশে বা তন্নিকটে অবস্থিত বিক্রমপুরে এবং বঙ্গদেশে সুবর্ণগ্রামে বল্লালসেন রাজকার্য্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে যে যে স্থানে হিন্দুরাজের রাজধানী ছিল, আজ কাল সেই সেই স্থানেই অধিকাংশ মুসলমানের বাস দেখা যায়। বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রামে বা মৌজায় হিন্দুর বাস বেশী নাই, শতকরা ৯০ জন মুসলমান। কেবল ভাগীরথীর তরঙ্গাঘাত নহে—মুসলমান-হস্তেও যে এখানকার সমুদয় হিন্দু-কীর্ত্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বিক্রমপুর গ্রাম ও বিক্রমপুর হাটের কতকগুলি পুরাতন ও ভগ্ন দরগাই (২৩ চিত্র দ্রষ্টব্য) পূর্ব্বতন মুসলমান-প্রভাবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

দেবগ্রাম-বিক্রমপুর সম্বন্ধে স্থানীয় বয়োবৃদ্ধগণ যেরূপ প্রবাদ বরাবর শুনিয়া আসিতেছেন, প্রয়োজনবোধে তাঁহাদের পত্রখানি পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। †

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

---

* "বসতিস্ম নৃপঃ শ্রীমান্ পুরা গৌড়ে পুরোত্তমে।
কদাচিদ্বা যথাকামং নগরে বিক্রমে পুরে॥
স্বর্ণগ্রামে কদাচিদ্বা প্রাসাদে সুমনোহরে।
রমমাণঃ সহ স্ত্রীভির্দিবীব ত্রিদিবেশ্বরঃ॥"—বল্লালচরিত, ১ম অধ্যায়।

† দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, সেই জন্য এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে করিলাম না। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এই বিক্রমপুর সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিব।

দেবগ্রাম-বিক্রমপুরসম্বন্ধে দেবগ্রামবাসীর পত্র

আমরা—নিম্নস্বাক্ষরকারী দেবগ্রামের অধিবাসিগণ—বংশপরম্পরাক্রমে এই প্রবাদই শুনিয়া আসিতেছি, যে দেবগ্রামস্থ দম্‌দমা নামক স্থানে যে প্রাচীন স্তূপ অদ্যাপি বিদ্যমান, উহা সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ বঙ্গাধিপ বল্লালসেনের রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। উক্ত স্তূপসন্নিহিত বিশাল দীর্ঘিকাটি (যাহা 'সাঁওতা দীঘী' বলিয়া পরিচিত এবং এক্ষণে যাহা প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে) বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই জানি। দেবগ্রাম-সাঁওতা হইতে যে "জোড়া জাঙ্গাল" বাহির হইয়াছে এবং যাহার একটি বরাবর নবদ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়াছে, উহাও বল্লাল-সেনের সময়ে নির্ম্মিত রাস্তা বলিয়া এতদঞ্চলে খ্যাত। বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্ত্তী "ভবানীপুর" গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে, উহা 'বল্লালদীঘী' বলিয়াই পরিচিত।

দেবগ্রাম হইতে ২ মাইল দূরবর্ত্তী "গড়ের বেগে" গ্রামে যে গড়ের নিদর্শন রহিয়াছে, শুনিয়াছি, উহা বল্লালসেনের গড়ের ধ্বংসাবশেষ। এতদঞ্চলে বল্লালসেন সম্বন্ধে বহু প্রাচীন কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

ইতঃপূর্ব্বে সাময়িক পত্রিকায় পূর্ব্ববঙ্গবাসী শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় যে সুদীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন*, আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাতে তিনি দেবগ্রাম-দম্‌দমার ভিটাকে "দেবলরাজার ভিটা" এবং সাঁওতার দীঘীকে "দেবলরাজার দীঘী" বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু, বলিতে কি, আমরা এ সম্বন্ধে "দেবলরাজার" নামও কখন শুনি নাই। 'দেবলরাজার' নামটি অলীক কল্পনা মাত্র, সত্যের সহিত উহার কোন সংশ্রব নাই। রায় মহাশয় ইহাও লিখিয়াছিলেন* যে, আমাদের কেহ কেহ তাঁহাকে "দেবলরাজার" কথা বলিয়াছিলাম; কিন্তু উহা আদৌ সত্য নহে। আমরা তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিতেছি। ইতি।

স্বাক্ষর—

শ্রীজানকীনাথ চক্রবর্ত্তী (বয়স ৮১ বৎসর)

শ্রীযদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৭২ বৎসর)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৬৭ বৎসর)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৬২ বৎসর)

শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দেবগ্রাম (নদীয়া)
১৩ বৈশাখ, ১৩২২।

---

* গত ১৩২১ সালের ১২ই চৈত্রের হিতবাদী এবং বিক্রমপুর নামক মাসিক পত্র ২য় বর্ষ, ৩৭৭-৩৮৪ পৃষ্ঠা।

আচার্য্য দিঙ্‌নাগ।

ভ্রম-সংশোধন।

২১শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা পত্রিকায় "বৌদ্ধ-ন্যায়" প্রবন্ধে "আচার্য্য দিঙ্‌নাগ" নামে যে ছবিখানি ছাপা হইয়াছিল, উহা আচার্য্য দিঙ্‌নাগের প্রতিমূর্ত্তি নহে, ভ্রমবশতঃ অন্য একখানি ছবি ছাপা হইয়াছিল। এই বার আচার্য্য দিঙ্‌নাগের ছবি দেওয়া হইল।

বৌদ্ধ ন্যায়

(২১শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

৭। এই ব্যক্তি রাগী,
যেহেতু ইনি বক্তা,
যেমন কোন একটি পুরুষ।

এ স্থলে "কোন একটি পুরুষ" উদাহরণাভাস; যে হেতু ইহা দ্বারা রাগিত্ব ও বক্তৃত্ব এতদুভয়ের পরস্পর অন্বয় বোধিত হইতেছে না। অতএব ইহা অনন্বয় উদাহরণ।

৮। শব্দ অনিত্য,
যেহেতু উহা উৎপাদশীল,
যেমন ঘট।

এ স্থলে "ঘট" উদাহরণাভাস; যে হেতু উৎপাদশীলত্ব ও অনিত্যত্বের মধ্যে পরস্পর অন্বয় প্রদর্শিত হয় নাই। অন্বয় দেখাইতে হইলে অনুমানটি এইরূপে প্রকাশ করা উচিত,—

শব্দ অনিত্য,
যেহেতু উহা উৎপাদশীল,

যে সকল বস্তু উৎপাদশীল, তাহারা সকলেই অনিত্য, যেমন ঘট।

এইরূপভাবে অন্বয় প্রদর্শন না করায় উদাহরণটি অপ্রদর্শিতান্বয় হইয়াছে।

৯। শব্দ উৎপাদশীল,
যেহেতু উহা অনিত্য,
অনিত্য বস্তু মাত্রই উৎপাদশীল, যেমন ঘট।

এ স্থলে "ঘট" উদাহরণাভাস। কারণ, হেতু ও সাধ্য এতদুভয়ের বিপরীতান্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। যথার্থান্বয় এইরূপে প্রকাশ করা উচিত;—

উৎপাদশীল বস্তু মাত্রই অনিত্য, যেমন ঘট।

বিপরীত ভাবে অন্বয় প্রদর্শিত হওয়ায় উদাহরণটি বিপরীতান্বয় হইয়াছে।

বৈধর্ম্ম্য উদাহরণাভাসও নয় প্রকার।

দূষণ

উপরে পক্ষাভাস, হেত্বাভাস ও উদাহরণাভাস—এই ত্রিবিধ দোষের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষের অনুমানে ইহার কোন একটি দোষ প্রদর্শন করিতে পারিলেই উহাকে দূষণ বলে। যে স্থলে দোষ নাই, তাহাতে যদি দোষের আরোপ করা হয়, তাহা হইলে উহাকে দূষণাভাস বলে। জাতি (বা জাত্যুত্তর) সকল দূষণাভাস।

তিব্বতীয় ভাষায় যে ন্যায়বিন্দু গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তাহার শেষভাগে ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায় ;—

যেমন শাক্যমুনি মারের সেনাসমূহকে পরাভূত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মকীর্ত্তি সমস্ত তীর্থিককে পরাজিত করেন ; সূর্য্য যেমন অন্ধকারসমূহকে দূরীভূত করেন, ন্যায়বিন্দুও তেমনি আত্মক-দর্শনকে নিরস্ত করিয়াছে।

ধর্ম্মকীর্ত্তির হেতুবিন্দুবিবরণ

"হেতুবিন্দুবিবরণ" নামে ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত অপর একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; যথা—(১) স্বভাবহেতু, (২) কার্য্যহেতু ও (৩) অনুপলব্ধি হেতু। এই তিন পরিচ্ছেদে হেতু ও সাধ্যের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে।

ধর্ম্মকীর্ত্তির বাদন্যায়

"বাদন্যায়" বা "তর্কন্যায়" নামে ধর্ম্মকীর্ত্তির রচিত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থ উদ্দ্যোতকরাচার্য্য স্বীয় ন্যায়বার্ত্তিক গ্রন্থে বাদবিধি নামে উল্লিখিত করিয়াছেন। বাদবিধির মত খণ্ডন করিতে যাইয়া উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন ;—

যদপি বাদবিধৌ সাধ্যাভিধানং প্রতিজ্ঞেতি প্রতিজ্ঞালক্ষণমুক্তম্।

—(ন্যায়বার্ত্তিক, ১ম অধ্যায়, ৩৩ সূত্র)।

এই বাদন্যায় বা বাদবিধি গ্রন্থ জ্ঞানশ্রীভদ্র নামে একজন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার সাহায্যে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। তদনন্তর বঙ্গদেশীয় বিক্রমণী-পুরের বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত দেশে গমন করিয়া অনুমান ১০৩৮ খৃঃ অব্দে বাদন্যায় বা বাদবিধি গ্রন্থের অনুবাদে যে সকল ভ্রম ছিল, তাহা সংশোধন করেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তির সন্তানান্তরসিদ্ধি

সন্তানান্তরসিদ্ধি নামে ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত অপর একখানি দার্শনিক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে।

ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধপরীক্ষা

ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত অপর একখানি দার্শনিক গ্রন্থের নাম সম্বন্ধপরীক্ষা। ইহা তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। জ্ঞানগর্ভ নামক কোন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধপরীক্ষাবৃত্তি

সম্বন্ধপরীক্ষাবৃত্তি নামে ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত অপর একখানি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহা পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধপরীক্ষার টীকা মাত্র।

দেবেন্দ্রবোধি (৬৫০ খৃঃ অব্দ)

দেবেন্দ্রবোধি ধর্ম্মকীর্ত্তির সমসাময়িক। প্রমাণবার্ত্তিকপঞ্জিকা নামে দেবেন্দ্রবোধি-প্রণীত একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থ ধর্ম্মকীর্ত্তিকৃত প্রমাণ-বার্ত্তিক গ্রন্থের টীকা। সুভূতিশ্রী নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। প্রমাণবার্ত্তিকপঞ্জিকার রচনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় ;—

ধর্ম্মকীর্ত্তি স্বীয় প্রমাণবার্ত্তিকের টীকা প্রণয়ন করিবার জন্য দেবেন্দ্রবোধিকে অনুরোধ করেন। দেবেন্দ্রবোধি প্রমাণবার্ত্তিকের টীকা লিখিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির সমক্ষে উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মকীর্ত্তি ঐ টীকা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া লিখিত পত্রগুলি জলসেকপূর্ব্বক মুছিয়া ফেলিলেন। দেবেন্দ্রবোধি দ্বিতীয় বার টীকা রচনা করিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি উক্ত টীকা পাঠ করিয়া উহা অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। দেবেন্দ্রবোধি তৃতীয় বার টীকা প্রণয়ন করিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন,—"পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই অযোগ্য এবং জীবনও ক্ষণিক। আমি যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছি, উহা দ্বারা অল্প-বুদ্ধি লোকসমূহের উপকার হইতে পারে।" দেবেন্দ্রবোধির কাতর বচনে সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম-কীর্ত্তি এইবার টীকা-গ্রন্থখানি রাখিয়া দিলেন।

শাক্যবোধি (৬৭৫ খৃঃ অব্দ)

শাক্যবোধি দেবেন্দ্রবোধির শিষ্য। ইনি অনুমান খৃষ্টীয় ৬৭৫ অব্দে জীবিত ছিলেন। ইহাঁর প্রণীত প্রমাণবার্ত্তিকটীকা তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। ইহা প্রমাণ-বার্ত্তিক-পঞ্জিকার টীকা মাত্র। তিব্বতীয় নৃপের লামা কর্তৃক এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।

বিনীতদেব (খৃষ্টীয় ৭০০ অব্দ)

বিনীতদেব নালন্দায় গোবিচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্দ্রের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। ধর্ম্ম-কীর্ত্তি গোবিচন্দ্রের রাজত্বকালে দেহত্যাগ করেন। গোবিচন্দ্রের পিতা বিমলচন্দ্র মালবের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভর্ত্তৃহরির ভগিনীকে বিবাহ করেন। ই-চিঙ্ নামক চীন পরিব্রাজকের মতে ভর্ত্তৃহরি ৬৫২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। অতএব গোবিচন্দ্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। গোবিচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্দ্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগের লোক। সুতরাং ললিতচন্দ্রের সমসাময়িক বিনীতদেব অনুমান খৃষ্টীয় ৭০০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। উদ্দ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক গ্রন্থে বিনীতদেবের বাদন্যায়ব্যাখ্যা বা বাদবিধান টীকার উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, বিনীতদেবের অভ্যুদয়কালে উদ্দ্যোতকর জীবিত ছিলেন। বিনীতদেব সময়ভেদোপরচনচক্র নামে একখানি মহাযান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কয়েকখানির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিনীতদেবের ন্যায়বিন্দুটীকা

বিনীতদেব ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রণীত ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের এক টীকা বিরচন করেন ; উহার নাম ন্যায়-বিন্দুটীকা। জিনমিত্র নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় নৃপের লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

বিনীতদেবের হেতুবিন্দুটীকা

বিনীতদেব হেতুবিন্দুটীকা নামে ধর্ম্মকীর্ত্তির হেতুবিন্দুগ্রন্থের উপর একখানি টীকা বিরচন করেন। ইহার তিব্বতীয় অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। প্রজ্ঞাবর্ম্ম নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় রাজার অনুবাদক লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

বিনীতদেবের বাদন্যায়-ব্যাখ্যা

ধর্ম্মকীর্ত্তির বাদন্যায় বা তর্কন্যায় গ্রন্থের উপর বিনীতদেব বাদন্যায়ব্যাখ্যা নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। তিব্বতীয় ভাষায় এই গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে বিনীতদেব লিখিয়াছেন ;—

"যিনি বাদবিধিতে স্বয়ংসিদ্ধ এবং ক্ষান্তি, দয়া, দান এবং সংযমে যিনি পরম মহান্, সেই নৈয়ায়িকচূড়ামণি বুদ্ধদেবের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক এই বাদন্যায়ব্যাখ্যা বিরচন করিতেছি।"

বাদন্যায়ব্যাখ্যা গ্রন্থ উদ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক গ্রন্থে বাদবিধানটীকা নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা ;—যদপি বাদবিধানটীকায়াং সাধয়তীতি শব্দস্য স্বয়ং পরেণ চ তুল্যত্বাৎ স্বয়মিতি বিশেষণম্।—(ন্যায়বার্ত্তিক, ১৩৩)।

বিনীতদেবের সম্বন্ধপরীক্ষাটীকা

ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধপরীক্ষা গ্রন্থের উপর বিনীতদেব সম্বন্ধপরীক্ষাটীকা নামে এক টীকা বিরচন করেন। এই টীকা তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। জ্ঞানগর্ভ নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় রাজার অনুবাদক লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে বিনীতদেব লিখিয়াছেন ;—

"যিনি সংসারে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত হইয়াও সংসারের পরমগুরু-পদবাচ্য, সেই ভগবান্ বুদ্ধদেবের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক এই সম্বন্ধপরীক্ষাটীকা বিরচন করিতেছি।"

বিনীতদেবের আলম্বনপরীক্ষাটীকা

বিনীতদেব আলম্বনপরীক্ষাটীকা নামে দিঙ্নাগ-প্রণীত আলম্বনপরীক্ষা গ্রন্থের উপর একখানি উপাদেয় টীকা বিরচন করেন। এই টীকা-গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। শাক্যসিংহ নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতের রাজার অনুবাদক লামার সহ-

যোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে বিনীতদেব লিখিয়াছেন ;—

"করুণাময় সর্ব্বজ্ঞদেবকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া এবং অবনতমস্তকে তাঁহার চরণে প্রণিপাত-পূর্ব্বক আমি এই আলম্বনপরীক্ষাটীকা বিরচন করিতেছি।" গ্রন্থের শেষে এইরূপ লিখিত আছে ;—

আলম্বনপরীক্ষাটীকা সমাপ্ত হইল। আচার্য্য বিনীতদেব সর্ব্ববিধ আলম্বন (চিন্তার বিষয়) পরীক্ষা করিয়া এই বিমল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাদিগজকেশরী বিনীতদেব তীর্থিকগণের মস্তক বিচূর্ণ করিয়াছেন।

বিনীতদেবের সন্তানান্তরসিদ্ধিটীকা

ধর্ম্মকীর্ত্তির সন্তানান্তরসিদ্ধি গ্রন্থের উপর বিনীতদেব এক টীকা প্রণয়ন করেন। উহার নাম সন্তানান্তরসিদ্ধিটীকা। এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। বিশুদ্ধসিংহ নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় রাজার লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

চন্দ্রগোমি (৭০০ খৃষ্টাব্দ)

জীবন-চরিত

চন্দ্রগোমি বারেন্দ্র-ভূমিতে ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান রাজসাহী জেলায় পদ্মা নদীর তীরে উঁহার বাসভূমি ছিল। ইনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ও খ্যাতি ছিল। ইনি আচার্য্য স্থিরমতির নিকট সূত্র ও অভিধর্ম্মপিটক অধ্যয়ন করেন এবং বিদ্যাধর আচার্য্য অশোক কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। আচার্য্য অশোক 'সামান্যদূষণদিক্‌প্রকাশিকা' নামে একখানি ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আর্য্য অবলোকিতেশ্বর ও আর্য্য তারার প্রতি চন্দ্রগোমির সবিশেষ ভক্তি ছিল। যখন চন্দ্রগোমি জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় বারেন্দ্রভূমির রাজার সহিত নালন্দার রাজার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। নালন্দার রাজা স্বীয় কন্যা চন্দ্রগোমিকে সম্প্রদান করিবেন স্থির করিয়া বারেন্দ্রের রাজার নিকট প্রস্তাব করেন। বারেন্দ্রের রাজার অনুরোধে চন্দ্রগোমি বিবাহ করিতে সম্মত হন। কিন্তু যখন শুনিতে পাইলেন যে, যে কন্যাকে বিবাহ করিতে যাইতেছেন, উহার নাম তারা, তখন তিনি ভয়ে কম্পিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, তারা তাঁহার উপাস্য দেবতা, তাঁহার ভবিষ্যৎ পত্নীকে সেই নামে তিনি কি করিয়া সম্বোধন করিবেন ? অতএব তিনি রাজকন্যার পরিণয়ে অস্বীকৃত হইলেন। বারেন্দ্রের রাজা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া চন্দ্রগোমিকে একটি সিন্দুকে পুরিয়া গঙ্গায় (পদ্মায়) নিক্ষেপ করিলেন। সিন্দুক ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গা (পদ্মা) ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে আসিয়া প্রতিরুদ্ধ হইল।

চন্দ্রগোমি ভক্তিভরে ভগবতী আর্য্য-তারার স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে তিনি সিন্ধুক হইতে বহির্গত হইয়া সন্নিহিত দ্বীপে উপস্থিত হইলেন ও তথায় বাস করিতে লাগিলেন। চন্দ্রগোমির নামানুসারে ঐ দ্বীপ চন্দ্রদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইল। চন্দ্রগোমি চন্দ্রদ্বীপে অবলোকিতেশ্বর ও তারার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। চন্দ্রদ্বীপে প্রথমতঃ কেবল কৈবর্ত্ত জাতির বসতি ছিল; ক্রমে অন্যান্য জাতিরও সমাগম হয়। চন্দ্রদ্বীপ ক্রমশঃ একটি বৃহৎ নগরে পরিণত হয়। চন্দ্রদ্বীপ কোথায়, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, উহা কাশ্মীরে অবস্থিত। কিন্তু আমার বোধ হয়, উহা বঙ্গদেশের বাখরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।

আবির্ভাব-কাল

চন্দ্রগোমির আবির্ভাব-কাল অনুমান ৭০০ খৃষ্টাব্দ। চন্দ্রগোমি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তখন সিংহ নামক একজন লিচ্ছবিবংশীয় রাজা বারেন্দ্রভূমিতে রাজত্ব করিতেন। মহারাজ শ্রীহর্ষের পুত্র শীলও ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন। শ্রীহর্ষ সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙ্‌এর সমসাময়িক; অতএব খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। সুতরাং তাঁহার পুত্র শীল ও তৎসমসাময়িক চন্দ্রগোমি সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জৈন হেমচন্দ্র 'শব্দানুশাসন' নামক স্বীয় সংস্কৃত ব্যাকরণে চন্দ্রগোমির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ৬৬১ খৃষ্টাব্দে জয়াদিত্য পাণিনির যে কাশিকাবৃত্তি প্রণয়ন করেন, উহাতে চন্দ্র-ব্যাকরণের মত উদ্ধৃত হয় নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, চন্দ্রগোমি জয়াদিত্যের পরে ও হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগোমির চন্দ্রব্যাকরণ

চন্দ্রদ্বীপে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া চন্দ্রা-গোমি সিংহলে গমন করেন। তথায় তাঁহার যত্নে একটি সুবৃহৎ বিহার ও একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সিংহলের রাজা চন্দ্রগোমিকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তাঁহার শিষ্যবর্গের অবস্থানের জন্য তিনি বিস্তর ভূমি দান করেন। সিংহল হইতে প্রত্যাগমনকালে চন্দ্রগোমি দাক্ষিণাত্যে বররুচি নামক একজন ব্রাহ্মণের গৃহে পাণিনি ব্যাকরণের পাতঞ্জল ভাষ্য দেখিতে পান। উহা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতীতি হয় যে, উহাতে বহু শব্দ আছে, কিন্তু অর্থ অতি অল্প। এই হেতু তিনি স্বয়ং পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্য-স্বরূপে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, উহার নাম চন্দ্রব্যাকরণ। উহার মঙ্গলাচরণ-শ্লোক এই;—

> সিদ্ধং প্রণম্য সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বীয়ং জগতো গুরুম্।
> লঘুবিস্পষ্টসম্পূর্ণমুচ্যতে শব্দলক্ষণম্॥

চন্দ্রব্যাকরণ ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তিব্বতের শাসনকর্ত্তা, জেতকর্ণ নামক একজন নেপালী ব্রাহ্মণ ও তিব্বতের একজন লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয়

ভাষায় অনুবাদিত করেন। তিব্বতের থরপালিঙ্‌ নামক স্থানে এই অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। অনুবাদ-গ্রন্থের শেষে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"যত দিন চন্দ্র ও সূর্য্য থাকিবে, তত দিন এই গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকুক।"

চন্দ্রগোমি ও চন্দ্রকীর্ত্তি

দাক্ষিণাত্য হইতে চন্দ্রগোমি বিহারের অন্তর্গত নালন্দা নামক স্থানে আগমন করেন। ঐ সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় জগদ্বিখ্যাত ছিল। নালন্দায় আসিয়া তাঁহার চন্দ্রকীর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়। চন্দ্রকীর্ত্তি একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বৈয়াকরণ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত মাধ্যমিকা বৃত্তি ও সংস্কৃত ব্যাকরণ বৌদ্ধ-জগতে সুপরিচিত। চন্দ্রকীর্ত্তি মাধ্যমিক দর্শনের মত অনুবর্ত্তন করিতেন, কিন্তু চন্দ্রগোমি যোগাচারমতাবলম্বী ছিলেন। যখন চন্দ্রগোমির সহিত চন্দ্রকীর্ত্তির শাস্ত্রীয় বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন সন্নিহিত লোক-সকল বলিয়া উঠিয়াছিল,—"অহো! মাধ্যমিক দর্শনের মত কাহারও পক্ষে ঔষধ এবং কাহারও পক্ষে বিষ; কিন্তু যোগাচার-দর্শনের মত সকলের পক্ষেই অমৃতময়।" চন্দ্রগোমি বৌদ্ধ গৃহস্থ ছিলেন, তিনি ভিক্ষু হন নাই। তিনি নালন্দায় আগমন করিলে তত্রত্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাঁহাকে গৃহস্থ মনে করিয়া ভিক্ষু-জনোচিত সমাদর প্রদর্শন ও অভ্যর্থনা করিতে অনিচ্ছুক হন। চন্দ্রকীর্ত্তি চন্দ্রগোমির প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। চন্দ্রকীর্ত্তি তিনখানি সুবৃহৎ রথ আনাইয়া নগরের প্রান্তভাগে স্থাপন করিলেন। মধ্যস্থিত রথে বিদ্যার অধিষ্ঠাতা দেব মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী রথদ্বয়ে চন্দ্রকীর্ত্তি ও চন্দ্রগোমি অধিরোহণ করিয়া মঞ্জুশ্রীর প্রহরিরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রথ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে টানিয়া আনা হইল। পথের দুই ধারে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি দ্বারা মঞ্জুশ্রীর স্তব ও পূজা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রগোমি মনে করিলেন, তাঁহারই অভ্যর্থনার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সমাগত হইয়াছেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবার পর চন্দ্রগোমি চন্দ্রকীর্ত্তির সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। চন্দ্রকীর্ত্তির প্রতিভা দর্শন করিয়া চন্দ্রগোমির আত্ম-ধিক্কার উপস্থিত হয়। চন্দ্রকীর্ত্তির সংস্কৃত ব্যাকরণ অবলোকন করিয়া চন্দ্রগোমির মনে হয়, তাঁহার চন্দ্রব্যাকরণ অকিঞ্চিৎকর বস্তু। তিনি ঐ গ্রন্থ বিলুপ্ত করিবার জন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কোন কূপমধ্যে উহা নিক্ষেপ করেন। তখন মঞ্জুশ্রী তথায় উপস্থিত হইয়া চন্দ্রগোমিকে বলেন,—"হে বৎস, তুমি এরূপ করিও না; তোমার প্রণীত চন্দ্রব্যাকরণ অমূল্য গ্রন্থ। যখন চন্দ্রকীর্ত্তির ব্যাকরণ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে, তখনও তোমার ব্যাকরণের সমাদর অক্ষুণ্ণ রহিবে।" অনন্তর মঞ্জুশ্রী স্বয়ং কূপ হইতে ব্যাকরণখানি তুলিয়া উপরে আনিলেন। প্রবাদ আছে যে, ঐ কূপের জল পান করিয়া বা স্পর্শ করিয়া অনেকে মহাপাণ্ডিত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নালন্দার এই কূপ চন্দ্রকূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

চন্দ্রগোমির ন্যায়ালোক-সিদ্ধি

চন্দ্রগোমি 'আর্য্যতারা-অন্তর্বলিবিধি' নামে একখানি তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রগোমি-প্রণীত ন্যায়ালোক-সিদ্ধি নামে একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। শ্রীসিতপ্রভ নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতের রাজার অনুবাদকের সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।*

রবিগুপ্ত (৭২৫ খৃষ্টাব্দ)

রবিগুপ্ত কাশ্মীরদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন অসাধারণ কবি, তার্কিক এবং তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি স্বদেশে ও মগধে দ্বাদশটি ধর্ম্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রবিগুপ্ত বারেন্দ্রের রাজা ভর্ষের সমসাময়িক ; অতএব চন্দ্রগোমির কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী। ৭০০ খৃষ্টাব্দে ভর্ষের পিতা সিংহ বারেন্দ্রভূমিতে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং রবিগুপ্ত অনুমান ৭২৫ খৃষ্টাব্দের লোক। রবিগুপ্তের প্রধান শিষ্যের নাম সর্ব্বজ্ঞমিত্র। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। অনুমান ৭৫০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বজ্ঞমিত্র স্রগ্ধরাস্তোত্র নামে একখানি তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রবিগুপ্ত প্রমাণবার্ত্তিকবৃত্তি নামে একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ বিরচন করেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রমাণবার্ত্তিক-কারিকা নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই টীকা মাত্র। প্রমাণবার্ত্তিকবৃত্তির তিব্বতীয় অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে।

জিনেন্দ্রবোধি (৭২৫ খৃষ্টাব্দ)

জিনেন্দ্রবোধি বোধিসত্ত্বের স্বদেশীয় লোক। তিনি বিশালামলবতী-নাম-প্রমাণসমুচ্চয়-টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকার তিব্বতীয় অনুবাদ বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জিনেন্দ্রবোধি নামে এক বৈয়াকরণ পাণিনি ব্যাকরণের "ন্যাস" টীকা প্রণয়ন করেন। বোধ হয়, এই ন্যাস-প্রণেতা ও বিশালামলবতীনামপ্রমাণসমুচ্চয়-টীকা-প্রণেতা একই ব্যক্তি।

শান্তরক্ষিত (৭৪৯ খৃষ্টাব্দ)

শান্তরক্ষিত জহোরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, তিনি গোপালের রাজত্ব-কালে খৃষ্টীয় ৭০৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে ৭৬২ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি স্বতন্ত্রমাধ্যমিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিব্বতের রাজা খ্রি-স্রোঙ্-দেউ-চনের আহ্বানে তিনি তিব্বতদেশে গমন করেন। তাঁহার সাহায্যে তিব্বত-রাজ ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মাণ করেন।

---

* চন্দ্রগোমির সম্বন্ধে এ স্থলে যে বিবরণ প্রদত্ত হইল, উহা তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। ইহার কতক অংশ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি "কায়স্থ-সংহিতা"য় প্রকাশ করিয়াছিলাম। চন্দ্রব্যাকরণ-প্রণেতা চন্দ্রগোমি ও ন্যায়ালোক-সিদ্ধি-প্রণেতা চন্দ্রগোমি একই ব্যক্তি, ইহা তিব্বতীয় ঐতিহাসিকগণের মত। কিন্তু কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমিকে খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন। এ বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা অন্যত্র প্রকাশিত হইবে।

ইহার নাম সাম্‌-য়ে অর্থাৎ অচিন্ত্য বিহার। ইহা মগধের ওদন্তপুর বিহারের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বিহার তিব্বতের সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধবিহার এবং শান্তরক্ষিত ইহার সর্ব্বপ্রথম অধিনায়ক ছিলেন। শান্তরক্ষিত ত্রয়োদশ বর্ষ অর্থাৎ ৭৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিব্বতে বাস করেন। তিব্বতে তিনি আচার্য্য বোধিসত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শান্তরক্ষিতের বাদন্যায়-বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ

শান্তরক্ষিত বাদন্যায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ নামে ধর্ম্মকীর্ত্তির বাদন্যায় গ্রন্থের উপর এক টীকা বিরচন করেন। কুমার শ্রীভদ্র নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতদেশে গমন করিয়া তদ্দেশের দো জেলার দুই জন লামার সাহায্যে সাম্‌-য়ে বিহারে বসিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। বাদন্যায়-বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"যিনি বহু বিশুদ্ধ সদ্‌গুণরাশির প্রভায় নিয়ত অন্ধকার বিদূরিত করিয়া অনন্ত জীবের অভিলাষ সফল করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন এবং যিনি পরমানন্দে সমগ্র জগতের উপকার সাধন করিয়াছিলেন, সেই মঞ্জুশ্রীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আমি এই সংক্ষিপ্ত এবং নির্দ্দোষ বাদন্যায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ প্রণয়ন করিতেছি।"

শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহকারিকা

তত্ত্বসংগ্রহকারিকা নামে শান্তরক্ষিত-প্রণীত অপর একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। গুণাকর শ্রীভদ্র নামক কাশ্মীরীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতদেশে গমন করিয়া, তিব্বতীয় রাজার লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। ইহাতে সাংখ্য, জৈন প্রভৃতি বহু দর্শনের মত সমালোচিত হইয়াছে।

তত্ত্বসংগ্রহকারিকার অপর নাম তর্কসংগ্রহ। কমলশীল নামক শান্তরক্ষিতের এক শিষ্য ইহার এক টীকা প্রণয়ন করেন। সটীক তত্ত্বসংগ্রহকারিকার অপর নাম কমলশীলতর্ক। জসল্মির প্রদেশের পার্শ্বনাথ-মন্দিরে কমলশীলতর্কের একখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। উহার সহিত তিব্বতীয় অনুবাদ-গ্রন্থের কোনই প্রভেদ নাই।

তত্ত্বসংগ্রহকারিকা একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। যথা ;—(১) স্বভাবপরীক্ষা। (২) ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা। (৩) উভয়পরীক্ষা। (৪) জগৎস্বভাববাদপরীক্ষা। (৫) শব্দব্রহ্মবাদপরীক্ষা। (৬) পুরুষপরীক্ষা। (৭) ন্যায়-বৈশেষিক-পরিকল্পিত-পুরুষপরীক্ষা। (৮) মীমাংসক-কল্পিত আত্মপরীক্ষা। (৯) কপিলপরিকল্পিত আত্মপরীক্ষা। (১০) দিগম্বর-পরিকল্পিত আত্মপরীক্ষা। (১১) উপনিষৎকল্পিত আত্মপরীক্ষা। (১২) বাৎসীপুত্রকল্পিত আত্মপরীক্ষা। (১৩) স্থিরপদার্থ-পরীক্ষা। (১৪) কর্ম্মফলসম্বন্ধপরীক্ষা। (১৫) দ্রব্যপদার্থপরীক্ষা। (১৬) গুণশব্দার্থপরীক্ষা। (১৭) কর্ম্মশব্দার্থপরীক্ষা। (১৮) সামান্যশব্দার্থপরীক্ষা। (১৯) বিশেষশব্দার্থপরীক্ষা। (২০) সমবায়শব্দার্থপরীক্ষা। (২১) শব্দার্থপরীক্ষা। (২২) প্রত্যক্ষলক্ষণপরীক্ষা। (২৩) অনুমান-

পরীক্ষা। (২৪) প্রমাণান্তরপরীক্ষা। (২৫) বিবর্ত্তবাদপরীক্ষা। (২৬) কালত্রয়পরীক্ষা। (২৭) সংসারসন্ততিপরীক্ষা। (২৮) বাহ্যার্থপরীক্ষা। (২৯) শ্রুতিপরীক্ষা। (৩০) স্বতঃপ্রামাণ্য-পরীক্ষা। (৩১) অতীন্দ্রিয়াতীতার্থদর্শনপুরুষপরীক্ষা।

গ্রন্থের প্রারম্ভে শান্তরক্ষিত বুদ্ধকে প্রণামপূর্ব্বক লিখিয়াছেন ;—

প্রকৃতীশোভয়াত্মাদি-ক্রিয়য়া রহিতং চলম্।
কর্ম্ম তৎফলসম্বন্ধ-ব্যবস্থাদিসমাশ্রয়ম্॥
গুণ-দ্রব্যক্রিয়াজাতি-সমবায়াদ্যুপাধিভিঃ।
শূন্যমারোপিতাকারশব্দপ্রত্যয়গোচরম্॥
স্পষ্টলক্ষণসংযুক্তপ্রমাদ্বিতয়নিশ্চিতম্।
অণীয়সাপি নাংশেন মিশ্রীভূতাপরাত্মকম্॥
অসংক্রান্তিমনাদ্যন্তং প্রতিবিম্বাদিসংনিভম্।
সর্ব্বপ্রপঞ্চসন্দোহনির্ম্মুক্তমগতং পরৈঃ॥
স্বতন্ত্রশ্রুতিনিঃসঙ্গো জগদ্ধিতবিধিৎসয়া।
অনল্পকল্পাসংখ্যেয়-সাত্মীভূতমহোদয়ঃ॥
যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদং জগাদ বদতাং বরঃ।
তং সর্ব্বজ্ঞং প্রণম্যায়ং ক্রিয়তে তর্কসংগ্রহঃ॥

কমলশীল (৭৫০ খৃষ্টাব্দ)

কমলশীল শান্তরক্ষিতের শিষ্য। ইনি কমলশ্রীল নামে প্রসিদ্ধ। কমলশীল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তন্ত্র-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিব্বতের রাজা খ্রি-স্রোঙ্-দেউ-চন কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কমলশীল তিব্বতে গমন করেন। তথায় গুরু পদ্মসম্ভব ও শান্তরক্ষিতের ধর্ম্মমতের সমর্থনপূর্ব্বক তিনি চীনদেশীয় মহাযান হোসাঙ্ নামক যতিকে পরাভূত করেন। তাঁহার খ্যাতি বহুবিস্তৃত ছিল এবং তৎপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকদ্বয় বৌদ্ধ-জগতে সুপরিচিত।

ন্যায়বিন্দুপূর্ব্বপক্ষে সংক্ষিপ্ত

কমলশীল-প্রণীত ন্যায়বিন্দুপূর্ব্বপক্ষে সংক্ষিপ্ত নামক একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থ ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের সমালোচনা মাত্র। বিশুদ্ধসিংহ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা

কমলশীল-প্রণীত তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা বা তর্কসংগ্রহ-পঞ্জিকা একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ। শান্তরক্ষিত-প্রণীত তত্ত্বসংগ্রহকারিকা গ্রন্থের ইহা একখানি প্রধান টীকা। ভারতীয় বৌদ্ধ

পণ্ডিত দেবেন্দ্রভদ্র তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

কল্যাণরক্ষিত (৮২৯ খৃষ্টাব্দ)

কল্যাণরক্ষিত একজন অসাধারণ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। ইনি ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের গুরু। মহারাজ ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে অনুমান খৃষ্টীয় ৮২৯ অব্দে কল্যাণরক্ষিতের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রসিদ্ধ।

বাহ্যার্থসিদ্ধিকারিকা

বাহ্যার্থসিদ্ধিকারিকা নামে কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থে বৈভাষিক মত অবলম্বন করিয়া বাহ্য জগতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিব্বতীয় অনুবাদ বিদ্যমান আছে। কাশ্মীরের জিনমিত্র নামক বৈভাষিক গুরু তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

শ্রুতিপরীক্ষা

শ্রুতিপরীক্ষা নামে কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহাতে শ্রুতির প্রামাণ্য নিরাকৃত হইয়াছে। ইহা অনষ্টুপ্ ছন্দে লিখিত। মূল গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কিন্তু ইহার অনুবাদ এখনও তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে।

অন্যাপোহবিচারকারিকা

অন্যাপোহবিচারকারিকা কল্যাণরক্ষিতের অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ। ইহাও অনুষ্টুপ্ ছন্দে লিখিত। ইহাতে অপোহবাদের সূক্ষ্ম পরীক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ঈশ্বরভঙ্গকারিকা

কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত ঈশ্বরভঙ্গকারিকা নামে অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহা অনুষ্টুপ্ ছন্দে লিখিত। ইহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণ দার্শনিক উদয়নাচার্য্য এই গ্রন্থের মত নিরাকরণ করিবার জন্যই বোধ হয়, কুসুমাঞ্জলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য (৮৪৭ খৃষ্টাব্দ)

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য কাশ্মীরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কল্যাণরক্ষিত ও ধর্ম্মাকর দত্তের শিষ্য। যখন বনপাল বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন, সেই সময়ে অনুমান খৃষ্টীয় ৮৪৭ অব্দে ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। জৈন দার্শনিক মল্লবাদী ৮৮৪ শকে অর্থাৎ ৯৬২ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের ন্যায়বিন্দু টীকার উপর এক টিপ্পনী বিরচন করেন। ইহার নাম ধর্ম্মোত্তর-টিপ্পনক। ১১৮১

খৃষ্টাব্দে রত্নপ্রভ সূরি নামক সুপ্রসিদ্ধ জৈন দার্শনিক স্বীয় স্যাদ্বাদরত্নাবতারিকা গ্রন্থে ধর্ম্মোত্তরের মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন ;—

অত্র ধর্ম্মোত্তরানুসারী প্রাহ। প্রয়োজনমাদিবাক্যেন সাক্ষাদাখ্যায়তে ইতি ন ক্ষমে। —(স্যাদ্বাদরত্নাবতারিকা, পৃঃ ১০)।

ন্যায়বিন্দুটীকা

ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের উপর ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য যে টীকা বিরচন করেন, উহার নাম ন্যায়বিন্দুটীকা। কাম্বের শান্তিনাথ জৈন-মন্দিরে ন্যায়বিন্দুটীকার একখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটী দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে। জ্ঞানগর্ভ নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় ন্যায়বিন্দুটীকা গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। পরে সুমতিকীর্ত্তি নামক একজন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই অনুবাদ সংশোধিত করেন। ন্যায়বিন্দুটীকার প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে ;—

জয়ন্তি জাতিব্যসনপ্রবন্ধপ্রসূতিহেতোর্জ্জগতো বিজেতুঃ।
রাগাদ্যরাতেঃ সুগতস্য বাচো মনস্তমস্তানবমাদধানাঃ॥

—(ন্যায়বিন্দুটীকা, প্রথম পরিচ্ছেদ)।

"যিনি জন্ম, জরা প্রভৃতি বিপৎসমূহের উৎপাদক সংসারকে জয় করিয়াছেন এবং যিনি রাগাদির শত্রু, সেই বুদ্ধের বাক্য আমাদের মানসিক অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া জয় লাভ করুক।"

প্রমাণপরীক্ষা

প্রমাণপরীক্ষা নামে ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহার মূল সংস্কৃত প্রতিলিপি পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহার অনুবাদ তিব্বতীয় ভাষায় রহিয়াছে। লো-দেন্‌-শে-রাব্‌ নামক একজন তিব্বতীয় লামা এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অপোহ-নাম-প্রমাণপ্রকরণ

অপোহ-নাম-প্রমাণ ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের অপর একখানি গ্রন্থ। কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত ভাগ্যরাজ তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে কাশ্মীরে বসিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

পারলোকসিদ্ধি

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, ইহার নাম পারলোকসিদ্ধি। কাশ্মীরীয় পণ্ডিত ভাগ্যরাজ তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের রাজত্বকালে (১০৮৯-১১০১ খৃষ্টাব্দে) কাশ্মীরে এই অনুবাদ-কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"জন্মের পূর্ব্ব হইতে মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত আমাদের যে চিৎসন্ততি থাকে, পারলোকে ঐ সন্ততির বিচ্ছেদ হয়, ইহা কোন কোন দার্শনিকের মত।" ইত্যাদি।

ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি

ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ। ইহাতে বস্তুর ক্ষণিকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভাগ্যরাজ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে।

প্রমাণবিনিশ্চয়টীকা

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, উহার নাম প্রমাণবিনিশ্চয়-টীকা। ইহা ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থের ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিতভদ্র নামক কাশ্মীরীয় পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের পরিশেষে লিখিত আছে;—

"সকল বিতণ্ডাবাদিগণের পরাভবকর্ত্তা ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।"

মুক্তাকুম্ভ (৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পর)

মুক্তাকুম্ভ নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি গ্রন্থের এক টীকা বিরচন করেন। উহার নাম ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিব্যাখ্যা। বিনায়ক নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। মুক্তাকুম্ভ ধর্ম্মোত্তরের পরবর্ত্তী কালের লোক। অতএব তিনি ৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

অর্চ্চট (৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পর)

অর্চ্চট কাশ্মীরদেশীয় একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরিশেষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। জৈন দার্শনিক গুণরত্ন সূরি ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ষড়্দর্শনসমুচ্চয়বৃত্তি গ্রন্থের বৌদ্ধদর্শন পরিচ্ছেদে অর্চ্চট-প্রণীত তর্কটীকার উল্লেখ করিয়াছেন। ১১৮১ খৃষ্টাব্দে রত্নপ্রভ সূরি নামক অপর একজন জৈন দার্শনিক স্যাদ্বাদরত্নাবতারিকা গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে অর্চ্চটের নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন;—

"অর্চ্চটচর্চ্চচতুরঃ পুনরাহ। ইহ প্রেক্ষাবতাং প্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনবত্তয়া ব্যাপ্তা।"

—(স্যাদ্বাদরত্নাবতারিকা, ১ম পরিচ্ছেদ)।

ন্যায়াবতারবিবৃতি গ্রন্থে ধর্ম্মোত্তর ও অর্চ্চট উভয়ের নামই উল্লিখিত আছে; যথা,— "অভিধেয়াদিসূচনদ্বারোৎপন্নার্থসংশয়মুখেন শ্রোতারঃ শ্রবণং প্রতি প্রোৎসাহ্যন্তে ইতি

ধর্ম্মোত্তরো মন্যতে। অর্চ্চটস্তু আহ। ন শ্রাবকোৎসাহকমেতৎ প্রামাণ্যাভাবাৎ তেষাং চাপ্রমাণাদপবৃত্তেঃ।—(ন্যায়াবতারবিবৃতি, ১ম পরিচ্ছেদ)

উদ্ধৃত স্থল দেখিয়া বোধ হয়, অর্চ্চট ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের পরে অর্থাৎ ৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

অর্চ্চটের হেতুবিন্দুবিবরণ

ধর্ম্মকীর্ত্তির হেতুবিন্দু গ্রন্থের উপর অর্চ্চট যে টীকা প্রণয়ন করেন, উহার নাম হেতুবিন্দু-বিবরণ। এই গ্রন্থ চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত; যথা,—(১) স্বভাব, (২) কার্য্য, (৩) অনুপলব্ধি এবং (৪) ষড়্‌লক্ষণব্যাখ্যা।

গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, অর্চ্চট ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে যে, কাশ্মীর নগর জম্বু দ্বীপের সার। এখানে অর্চ্চট ধর্ম্মকীর্ত্তির গ্রন্থ রোপণ করিয়া যে ফল উৎপন্ন করিলেন, মূর্খেরাও উহার রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হইবে।

দানশীল (৮৯৯ খৃষ্টাব্দ)

যখন মহীপাল বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অনুমান ৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দানশীল বা দানশ্রীল কাশ্মীর দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরহিতভদ্র, জিনমিত্র, সর্ব্বজ্ঞদেব এবং তিলোপার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি তিব্বতদেশে গমন করিয়া তদানীন্তন নরপতিকে সংস্কৃত পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার বহু সহায়তা করেন।

তাঁহার প্রণীত "পুস্তকপাঠোপায়" একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। দানশীল স্বয়ং এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

জিনমিত্র (৮৯৯ খৃষ্টাব্দ)

জিনমিত্র কাশ্মীর দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞদেব, দানশীল ও অন্যান্য বৌদ্ধ পণ্ডিতের সহ তিব্বত দেশে গমন করিয়া বহু সংস্কৃত পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। তিনি যে সময়ে তিব্বত দেশে গমন করেন, সেই সময়ে খ্রী-রল্‌ তিব্বতদেশে ও মহীপাল বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, জিনমিত্র অনুমান ৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

তিনি ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক ন্যায়বিন্দুপিণ্ডার্থ নামে একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুরেন্দ্রবোধি নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

প্রজ্ঞাকরগুপ্ত (৯৪০ খৃষ্টাব্দ)

যখন মহীপাল বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে ৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রজ্ঞাকরগুপ্ত প্রাদুর্ভূত হন। প্রজ্ঞাকরগুপ্ত উপাসক ছিলেন। তিনি ও প্রজ্ঞাকরমতি এক ব্যক্তি নহেন।

প্রজ্ঞাকরমতি ভিক্ষু ছিলেন। তিনি মহারাজ চণকের রাজত্বকালে ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণদ্বারের রক্ষক ছিলেন। প্রজ্ঞাকরগুপ্ত-প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রসিদ্ধ।

প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কার

ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিক গ্রন্থের প্রজ্ঞাকরগুপ্ত যে টীকা বিরচন করেন, উহার নাম প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কার। ভাগ্যরাজ নামক কাশ্মীরদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। তদনন্তর সুমতি নামক কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই অনুবাদ সংশোধন করেন। বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পণ্ডিত এই অনুবাদ-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। মহাপণ্ডিত সুনয়শ্রী মিত্র এবং কাশ্মীরের মহাপণ্ডিত কুমারশ্রী এই অনুবাদ-কার্য্যে তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

সহাবলম্ভনিশ্চয়

সহাবলম্ভনিশ্চয় প্রজ্ঞাকরগুপ্ত-প্রণীত অপর একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। নেপালদেশীয় পণ্ডিত শান্তিভদ্র তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় তিব্বতের "দো" জেলার অন্তর্গত সেঙ্কর গ্রামে বসিয়া এই গ্রন্থ অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

তর্কভাষা

প্রজ্ঞাকরগুপ্ত-প্রণীত তর্কভাষা একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। তর্কভাষা তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত; যথা—(১) প্রত্যক্ষ, (২) স্বার্থানুমান এবং (৩) পরার্থানুমান। গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে;—

"ধর্ম্মকীর্ত্তির তর্কশাস্ত্র সুকুমারমতি বালকগণের বোধগম্য করিবার জন্য ভগবান্ লোকনাথ বুদ্ধকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আমি এই তর্কভাষা প্রণয়ন করিতেছি।"

আচার্য্য জেতারি (৯৪০-৯৮০ খৃষ্টাব্দ)

আচার্য্য জেতারি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম গর্ভপাদ। তিনি বারেন্দ্রভূমির রাজা সনাতনের রাজধানীতে বাস করিতেন। সনাতন মগধের পালবংশীয় রাজগণের অধীনে সামন্ত-রাজা ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া জেতারি বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং মঞ্জুশ্রীর আরাধনা করিতে থাকেন। তাঁহার প্রসাদে অল্পকালমধ্যেই তিনি মহাবিদ্বান্ হইয়া পড়েন। তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের "পণ্ডিত" এই উপাধিসূচক পত্র স্বয়ং রাজা মহাপালের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ জেতারির নিকট পঞ্চবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাপাল ৯৪০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দীপঙ্কর ৯৮০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব

আচার্য্য জেতারি অনুমান খৃষ্টীয় ৯৪০—৯৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। জেতারি-প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অতি প্রসিদ্ধ।

হেতুতত্ত্ব উপদেশ

আচার্য্য জেতারি-প্রণীত হেতুতত্ত্ব-উপদেশ একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। কুমার-কলস নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে।

ধর্ম্মধর্ম্মিবিনিশ্চয়

আচার্য্য জেতারি-প্রণীত ধর্ম্মধর্ম্মিবিনিশ্চয় একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। এই গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে।

বালাবতার-তর্ক

বালাবতার-তর্ক নামে জেতারি-প্রণীত অপর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। এই গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার অনুবাদ তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। নাগরক্ষিত নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতের কোন লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। এই গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত; যথা,—(১) প্রত্যক্ষ, (২) স্বার্থানুমান এবং (৩) পরার্থানুমান। বালাবতার-তর্ক গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে,—"যিনি স্বীয় উপদেশের প্রভায় অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিয়াছেন এবং যিনি ত্রিলোকের একমাত্র প্রদীপ, সেই ভগবান্ বুদ্ধদেব চিরকাল বিজয়ী থাকুন।"

জিন (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ)

জিন একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহার নাম প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কারটীকা। বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত দীপঙ্কর তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে অনুমান ১০৪০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

কোঙ্কণ প্রদেশে জিনভদ্র নামক এক বৌদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন। বোধ হয়, তিনি ও প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কারটীকা-প্রণেতা একই ব্যক্তি। ইনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত বাগীশ্বরকীর্ত্তির সমসাময়িক, অতএব অনুমান ৯৮৩ খৃষ্টাব্দের লোক।

জ্ঞানশ্রী (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ)

জ্ঞানশ্রী মিত্র গোড়দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। জ্ঞানশ্রীভদ্র নামক একজন নৈয়ায়িক কাশ্মীরে বিদ্যমান ছিলেন। গৌড়ের জ্ঞানশ্রীমিত্র ও কাশ্মীরের জ্ঞানশ্রীভদ্র এক ব্যক্তি কি না, বলা যায় না। জ্ঞানশ্রীমিত্র প্রথমতঃ শ্রাবক যানের অনুবর্ত্তন করিতেন, পরে তিনি মহাযানমতে শ্রদ্ধাবান্ হন। দীপঙ্কর বা শ্রীজ্ঞান

অতীশ জ্ঞানশ্রীমিত্রের নিকট অনেক বিষয়ে সবিশেষ ঋণী ছিলেন। মগধের রাজা চণকের রাজত্বকালে অনুমান ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানশ্রীমিত্র বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বাররক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে হিন্দু দার্শনিক মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের বৌদ্ধ-দর্শন-প্রস্তাবে জ্ঞানশ্রীর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ; যথা,—

তদুক্তং জ্ঞানশ্রিয়া—

যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ সন্তশ্চ ভাবা অমী
সত্তাশক্তিরিহার্থকর্ম্মণি মিতেঃ সিদ্ধেষু সিদ্ধা ন সা।
নাপ্যেকৈব বিধান্যথা পরকৃতেনাপি ক্রিয়াদির্ভবেৎ
দ্বেধাপি ক্ষণভঙ্গসন্ততিরতঃ সাধ্যে চ বিশ্রাম্যতি ॥

—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

জ্ঞানশ্রী-প্রণীত নিম্নলিখিত ন্যায়গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ;—

প্রমাণবিনিশ্চয়টীকা

প্রমাণবিনিশ্চয়টীকা একখানি প্রামাণিক ন্যায়গ্রন্থ। ইহা জ্ঞানশ্রীভদ্র-প্রণীত। ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থের ইহা টীকা মাত্র। এই গ্রন্থ জ্ঞানশ্রীভদ্র স্বয়ং তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

কার্য্যকারণভাবসিদ্ধি

কার্য্যকারণভাবসিদ্ধি একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। জ্ঞানশ্রীমিত্র এই গ্রন্থের প্রণেতা। কুমার কলস নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। তদনন্তর নেপালদেশীয় পণ্ডিত অনন্তশ্রী পূর্ব্বোক্ত লামার সহযোগিতায় অনুবাদগ্রন্থ সংশোধিত করেন।

রত্নবজ্র (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ)

কাশ্মীরদেশে ব্রাহ্মণকুলে রত্নবজ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ তৌথিক শাস্ত্রে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তাঁহার পিতা হরিভদ্র বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রত্নবজ্র উপাসক ছিলেন। তিনি ৩৬ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বৌদ্ধসূত্র, মন্ত্র প্রভৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। তদনন্তর তিনি মগধ ও বজ্রাসনে আগমন করিয়া চক্রসংবর, বজ্রবরাহী প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবতার মুখাম্বুজ অবলোকন করিতে সমর্থ হন এবং ঐ সকল দেবতার সাহায্যে সমগ্র বৌদ্ধ-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া পড়েন। তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার-রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তদনন্তর তিনি কাশ্মীরে প্রত্যাগমন করিয়া উদ্যানের (কাবুলের) পথে তিব্বতে গমন করেন। তিব্বতে তিনি "আচার্য্য" এই নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যে সময়ে রাজা চণক মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে রত্নবজ্র প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।—

যুক্তিপ্রয়োগ

রত্নবজ্রকৃত যুক্তিপ্রয়োগ একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। শ্রীসুভূতিশান্ত নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।

রত্নাকরশান্তি (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ)

রত্নাকরশান্তি তিব্বত দেশে আচার্য্য শান্তি বা শান্তিপ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ওদন্তপুরের সর্ব্বাস্তিবাদ-সম্প্রদায়ের মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে জেতারি, রত্নকীর্ত্তি প্রভৃতি অধ্যাপকের নিকট সূত্র ও তন্ত্র অধ্যয়ন করেন। মগধের রাজা চণক অনুমান ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে রত্নাকরশান্তিকে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার-রক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি বহু তীর্থিককে তর্ক-যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সিংহলের রাজার আহ্বানে সিংহলদ্বীপে গমন করেন এবং তথায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচার সাধন করেন।

রত্নাকরশান্তির গুরু রত্নকীর্ত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। রাজা বিমলচন্দ্রের সময়ে এক রত্নকীর্ত্তি জীবিত ছিলেন। তিনি মধ্যমকাবতারটীকা, কল্যাণকাণ্ড এবং ধর্ম্মবিনিশ্চয় গ্রন্থ বিরচন করেন। অপোহসিদ্ধি ও ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি এই দুই গ্রন্থের প্রণেতা রত্নকীর্ত্তি অবশ্য ভিন্ন ব্যক্তি। স্থিরদূষণ এবং বিচিত্রাদ্বৈতসিদ্ধি বোধ হয়, এই শেষোক্ত রত্নকীর্ত্তিই বিরচন করিয়াছেন। তিনিই বোধ হয়, রত্নাকরশান্তির গুরু।

রত্নাকরশান্তি ছন্দোরত্নাকর নামে একখানি ছন্দোগ্রন্থ বিরচন করেন। ইহার তিব্বতীয় অনুবাদ বিদ্যমান আছে।

বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধি

রত্নাকরশান্তি-প্রণীত বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধি একখানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ। নেপালদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তিভদ্র তিব্বতদেশের দো জেলার কোন বিদ্বান্ লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে।

অন্তর্ব্যাপ্তি

রত্নাকরশান্তির অন্তর্ব্যাপ্তিও একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। কুমারকলস নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। মূল সংস্কৃত অন্তর্ব্যাপ্তি গ্রন্থের প্রতিলিপি নেপালে বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ নাম অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন।

বাগ্ভট (৯৮৩ খৃষ্টাব্দ)

বাগ্ভট-প্রণীত সর্ব্বজ্ঞসিদ্ধিকারিকা একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। বাগ্ভট ও বাগীশ্বরকীর্ত্তি একই ব্যক্তি কি না, বলা যায় না। বাগ্ভট সম্ভবতঃ ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

যমারি (১০৫০ খৃষ্টাব্দ)

যমারি ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। তিনি পরিবার ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ হইয়া একদা বজ্রাসনে (বুদ্ধগয়ায়) আগমন করেন। তথায় তিনি এক যোগীর নিকট তাঁহার দারিদ্র্যের বিষয় বর্ণন করিলে যোগী উত্তর করেন,—"আপনারা পণ্ডিত, এই অহঙ্কারে যোগীদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করেন না। অতএব আপনাদের দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী।" এই কথা বলিয়া যোগী বসুধর মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র যমারির অতুল ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হইল। তিনি সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি স্বীয় বিদ্যাবত্তায় বিক্রমশিলা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করেন। যমারি নয়পাল রাজার সমসাময়িক। অতএব ১০৫০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কারটীকা

প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কারটীকা যমারিপ্রণীত একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। প্রজ্ঞাকরগুপ্ত প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কার নামে যে গ্রন্থ বিরচন করিয়াছিলেন, ইহা তাহার টীকা মাত্র। সুমতি নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় হ্লাসা নগরের সন্নিকটে বসিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে ;—

"আমি এই টীকা বিরচন করিয়া যে অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়াছি, তাহার ফলে সংসারের লোকসমূহ পরম শত্রু মৃত্যুকে পরাভব করিয়া অবিনশ্বর পরিনির্ব্বাণ লাভ করুক।"

শঙ্করানন্দ (১০৫০ খৃষ্টাব্দ)

কাশ্মীরের কোন ব্রাহ্মণ-বংশে শঙ্করানন্দের জন্ম হয়। তিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ধর্ম্মকীর্ত্তিকে পরাভূত করিয়া একখানি মৌলিক ন্যায়গ্রন্থ লিখিবার বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বপ্নে তাঁহার প্রতি আদেশ হইল,—"ধর্ম্মকীর্ত্তি একজন আর্য্য। তাঁহাকে পরাভূত করা কাহারও সাধ্য নহে। ধর্ম্মকীর্ত্তির গ্রন্থে যদি তুমি কোন ভ্রম দেখিয়া থাক, ইহা তোমার বুদ্ধির ভ্রম।" এই উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া শঙ্করানন্দের মনে অনুতাপ উৎপন্ন হইল। তিনি ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিক গ্রন্থের এক টীকা বিরচন করিলেন। যখন নয়পাল বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অনুমান ১০৫০ খৃষ্টাব্দে শঙ্করানন্দ কাশ্মীরদেশে জীবিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ;—

প্রমাণবার্ত্তিকটীকা

শঙ্করানন্দ-প্রণীত প্রমাণবার্ত্তিকটীকা একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিক গ্রন্থের ইহা একখানি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা। ইহা সাত পরিচ্ছেদে বিভক্ত। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে।

সম্বন্ধপরীক্ষানুসার

শঙ্করানন্দ-প্রণীত সম্বন্ধপরীক্ষানুসারও একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। ইহা ধর্ম্মকীর্ত্তির সম্বন্ধ-পরীক্ষা গ্রন্থের টীকা মাত্র। পরহিতভদ্র নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"যিনি সংসারের সহিত সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহাতে অহঙ্কার ও মমকারের লেশমাত্র নাই এবং যিনি সমস্ত ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র, সেই বুদ্ধদেবকে আমি নমস্কার করি।"

অপোহসিদ্ধি

শঙ্করানন্দ-প্রণীত অপোহসিদ্ধি একখানি অমূল্য ন্যায়গ্রন্থ। মনোরথ নামক কাশ্মীর-দেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় কাশ্মীরে বসিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"যিনি সকল ভ্রান্তি হইতে পরিমুক্ত এবং যিনি সর্ব্বকালে জীবের হিতসাধনে রত, সেই সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া ও তাঁহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া আত্ম ও পর—এতদুভয়ের সম্বন্ধসূচক অপোহবাদ ব্যাখ্যা করিতেছি।"

প্রতিবন্ধসিদ্ধি

শঙ্করানন্দ-প্রণীত প্রতিবন্ধসিদ্ধিও একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে। ভাগ্যরাজ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

শ্রীবিক্রমপুর

শ্রীবিক্রমপুর কোথায়? হরিবর্ম্মদেব, ভোজবর্ম্মা, শ্রীচন্দ্র, বিজয়সেন, বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেন প্রমুখ বঙ্গ-রাজগণের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার কোথায়? জ্যোতিবর্ম্মা, বজ্রবর্ম্মা, জাতবর্ম্মা, শ্যামলবর্ম্মা, বিশ্বরূপসেন, কেশবসেন প্রভৃতি রাজন্যবর্গের স্মৃতি-বিজড়িত বিক্রমপুর কোন্ স্থানে অবস্থিত? এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মনে করিত এবং সমুদয় ঐতিহাসিকগণই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ঢাকা-বিক্রমপুরেই বঙ্গ-রাজগণের জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সম্বন্ধে কেহ কখনও অবিশ্বাসের রেখাপাতও করেন নাই। সম্প্রতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় নদীয়া জেলায় দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের সন্ধান পাইয়া, দেবগ্রামের "দমদমার ভিটাকেই" বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন-বর্ণিত বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন(১)। সুতরাং এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে, "বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার" কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল? উহা কি ভীম-প্রবাহা, ভীষণ-তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মা-মেঘনাদের সলিল-সিক্ত ঢাকা-বিক্রমপুর প্রদেশের কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল, না পূত-সলিলা জাহ্নবীর প্রাচীন প্রবাহের তীরদেশে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরমধ্যেই সংস্থাপিত ছিল? এত কাল কি আমরা পুরুষপরম্পরাক্রমে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই ঢাকা-বিক্রমপুরকে বঙ্গাধিপতিগণের লীলা-নিকেতন বলিয়া বিনা বিচারেই গ্রহণ করিয়াছি, না উহা সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? যাহা হউক, কথাটা যখন একবার উঠিয়াছে, তখন ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়াই সঙ্গত। "সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক অথবা প্রচলিত মতের বিরোধীই হউক, তাহার জন্য ভাবিব না"। বিনা প্রমাণে আমরা কিছুই বিশ্বাস করিব না এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না।

এখানে বলিয়া রাখি যে, "হিতবাদী" ও "অমৃতবাজার" পত্রিকায় নগেন্দ্র বাবুর এই অভিনব আবিষ্কারের কাহিনী পাঠ করিয়াই আমার দেবগ্রাম-বিক্রমপুর সন্দর্শন করিবার স্পৃহা জন্মে। ফলে গত ২৯শে ফাল্গুন তারিখে ঐ স্থানে গমন করিয়া দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি এবং দেবগ্রামের সপ্ততিবর্ষবয়স্ক কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ বৃদ্ধের নিকট অনুসন্ধান করিয়া, "দমদমার ভিটা" (এই ভিটাকেই নগেন্দ্র বাবু বল্লালের ভিটা বলিয়া প্রমাণ করিতে সমুৎসুক), সাওতার দীঘী, দেবকুণ্ড, কুলইচণ্ডী প্রভৃতির

(১) অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক সম্পাদিত "বর্দ্ধমানের ইতিকথা" নামক পুস্তকে বসুজ মহাশয়ের প্রমাণাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। দেবগ্রামের প্রাচীন অধিবাসিগণ দমদমার ভিটাকে "দেবল রাজার ভিটা" বলিয়াই জানেন, বল্লালের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ থাকার বিষয় তাঁহারা একেবারেই অনবগত। গত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের বাচনিক অবগত হইয়াছি যে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির অনুসন্ধানের ফলেও দমদমার ভিটার সহিত বল্লালের কোন সম্বন্ধ নির্ণীত হয় নাই। যাহা হউক, এতৎ-সম্পর্কে হিতবাদী পত্রিকার স্তম্ভে বিস্তর আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আমার এই আলোচনায় সম্ভবতঃ কাহারও কাহারও মনোবেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে দেবগ্রামনিবাসী কতিপয় প্রৌঢ় ভদ্রলোক হিতবাদী পত্রিকায় আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া আমার ক্ষীণ বুদ্ধিতে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, আমি অকপটে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি, পরন্তু কাহারও মনে ক্লেশ দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রথমতঃ বর্দ্ধমানের ইতিকথা নামক পুস্তকের স্থান-পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত—"দেবগ্রাম-বিক্রমপুর" শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া, উপসংহারে শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারের অবস্থান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

আলোচ্য পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠার ১৯শ ও ২০শ সংখ্যক চিত্রের পাদদেশে লিখিত "বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের এক ধার", "বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের অপর ধার" সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদ। কারণ, এই প্রস্তরখণ্ড দেবগ্রামের জনৈক ভদ্রলোকের অন্তঃপুরস্থিত একটি ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারদেশে রক্ষিত আছে এবং ইহা তাঁহার অন্তঃপুরের একটি কূপ খনন করিবার সময়ে ভূগর্ভমধ্যে পাওয়া গিয়াছিল।

নগেন্দ্র বাবু, গোপালভট্ট এবং আনন্দভট্টের এজমালীতে লিখিত এবং পূজ্যপাদ মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বল্লাল-চরিতের—

> "বসতিস্ম নৃপঃ শ্রীমান্ পুরা গৌড়ে পুরোত্তমে।
> কদাচিদ্বা যথাকামং নগরে বিক্রমে পুরে ॥
> স্বর্ণগ্রামে কদাচিদ্বা প্রাসাদে সুমনোহরে।
> রমমাণঃ সহ স্ত্রীভির্দ্দিবীব ত্রিদিবেশ্বরঃ ॥"

এই শ্লোকদ্বয় অধ্যাহার করিয়া লিখিয়াছেন,—"চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত আনন্দভট্টের বল্লাল-চরিতেও লিখিত আছে—বল্লালসেন কখন গৌড়ে, কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন। চারি শত বর্ষের এই প্রবাদ-বাক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেন্দ্রের মধ্যে গৌড় নগরে, রাঢ়দেশে বিক্রমপুরে এবং বঙ্গদেশে সুবর্ণ গ্রামে বল্লালসেন রাজ-

কার্য্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন।" বিক্রমপুর যে রাঢ়দেশে অবস্থিত, তাহা বল্লাল-চরিতের এই শ্লোকটি হইতে পাওয়া যায় না।

সাধারণতঃ দুইখানি বল্লাল-চরিত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একখানি ৺হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং অপরখানি পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। বলা বাহুল্য যে, উভয় বল্লাল-চরিতই গোপালভট্ট ও আনন্দভট্ট কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও এই উভয় পুস্তকের ভাষা ও বিষয়গত পার্থক্য যথেষ্ট রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই শ্লোক দুইটিও ৺হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন-প্রকাশিত বল্লাল-চরিতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং কোন্‌খানিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব? আচার্য্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় কেবলমাত্র একখানি হস্তলিখিত পুথি অবলম্বন করিয়াই বল্লাল-চরিত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এই পুথিও কাগজে লেখা, তালপাতায় নহে। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুঁথি যে প্রাচীন নহে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে, চুঁচুড়ায় এক সুবর্ণবণিকের বাড়ীতেও একখানি বল্লাল-চরিত আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সুবর্ণবণিক্ জাতির প্রাচীন সামাজিক মর্য্যাদা এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এ ক্ষেত্রে এই বইখানি যে পরবর্ত্তী কালে রচিত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? চুঁচুড়ায় প্রাপ্ত বইখানি কিন্তু এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ই রামচরিত গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। রামচরিতের ঐতিহাসিক তথ্য-গুলি যেরূপ সরল, বল্লাল-চরিতের কথাগুলি তদ্রূপ সরল নহে। ইহাতে বৃথা বাগাড়ম্বরেরও বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। রাম-চরিতে শত শত ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে এবং তাহার সমুদয়গুলিই তাম্রশাসন বা শিলালিপির প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু বল্লাল-চরিতে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই বলিলেই হয়। যাহাও দুই একটি আছে, তাহার সমর্থনকারী প্রমাণ অদ্যাবধি কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই। বল্লাল সেনের একখানি মাত্র তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং অপর পক্ষ যদি এ কথা বলেন যে, ভবিষ্যতে আরও খোদিতলিপি আবিষ্কার হইলে বল্লাল-চরিতোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির সমর্থন বাহির হইবে, তবে তাঁহাদের কথার উত্তরে বলিতে হয় যে, সমর্থক প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত বল্লাল-চরিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নয়।

রাম-চরিত সমসাময়িক ব্যক্তির লেখনী-প্রসূত। পক্ষান্তরে বল্লাল-চরিত বল্লালের মৃত্যুর প্রায় চারি শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। অতএব রাম-চরিতের কথা যেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়, বল্লাল-চরিতের কথা তেমন করিয়া বিশ্বাস করা উচিত নয়। অতএব বল্লাল-চরিতের ঐ শ্লোক দুইটির মূল্য অতি অল্প। বিশেষতঃ বল্লাল-চরিতেও এমন কোন কথা উল্লিখিত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমপুরকে অনায়াসে রাঢ়দেশে স্থাপিত করা চলে।

প্রাচীন বিক্রমপুর নগর যেখানে অবস্থিত ছিল, নগেন্দ্র বাবু সেখানে কখনও যান নাই।

দমদমার ভিটা হইতে বিক্রমপুরের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। এই দমদমার ভিটাতেই বল্লাল সেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার, রাজধানী বা প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া নগেন্দ্র বাবু প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহা হইলে তাম্রশাসনাদিতে দেবগ্রামের নাম উল্লিখিত না হইয়া বিক্রমপুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কেন? বিক্রমপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী দমদমার ভিটায় জয়স্কন্ধাবার বা রাজধানীই বা কেন প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল? নগেন্দ্র বাবু বলিতে পারেন যে, বিক্রমপুর সহর দমদমার ভিটা পর্য্যন্তই বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তাহা হইলে বিক্রমপুর ও দমদমার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে কোনও প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন নাই কেন? নগেন্দ্র বাবু হয় ত বলিবেন, রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে, কিন্তু রাজবাড়ী ছিল তাহা হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী দমদমায়। কিন্তু পুরাকালে রাজপ্রাসাদ নগরের কেন্দ্রস্থানেই নির্ম্মিত হইত, বড় জোর নগর-প্রাসাদের মধ্যেই অবস্থিত থাকিত। নগরের বাহিরে পাঁচ মাইল দূরে রাজ-প্রাসাদ, ইহা অশ্রুতপূর্ব্ব। সুতরাং যদি দমদমার ভিটা বল্লালের ভিটা বলিয়াই পরিচিত থাকে, তবুও উহা বল্লাল সেনের রাজধানী, রাজপ্রাসাদ বা জয়স্কন্ধাবার হইতে পারে না। দমদমার ভিটা ও সাওতার দীঘী হইতে দুইটি জাঙ্গাল রামপাল ও নবদ্বীপ পর্য্যন্ত যে সম্প্রসারিত ছিল, তাহা সত্য বটে এবং এই জাঙ্গাল হয় ত বল্লালসেনেরই নির্ম্মিত। কিন্তু তাহা দ্বারা কি প্রমাণিত হইবে যে, এই জাঙ্গাল যে স্থানে আসিয়াছে, সেই স্থানেই বল্লালের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল?

নগেন্দ্র বাবু "বিক্রম-তিরস্কৃত-সাহসাঙ্ক"পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেবগ্রামপতি বিক্রম-রাজকে বিক্রমাদিত্যের সমতুল্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ যে সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত হইতেন, তাহার প্রমাণ কি? এই সাহসাঙ্ক পদ ব্যবহার করিয়া প্রশস্তিকার হয় ত পুরাকালের বিক্রমাদিত্যকে অথবা চালুক্য-বংশের সাহসাঙ্ককে বিজয়সেন অপেক্ষা খাটো করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ সম্বন্ধীয় এরূপ কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে ভারত-প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য অথবা চালুক্যবংশীয় সাহসাঙ্ক নৃপতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সুতরাং এ স্থলে সাহসাঙ্ক পদ দ্বারা দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের কোনও ইঙ্গিত কল্পনা করা যায় না। সাহসাঙ্ক নামে একজন রাজা ছিলেন; তিনিও বিজয়সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামীকে কেন ধরিতে যাই?

দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভিপতি বিক্রমরাজই যে উজানী, মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর যে বিক্রমরাজ বা বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? বাঙ্গালার বহু স্থানেই ত "জিতের মাঠ" বা "জিতের পুষ্করিণী" রহিয়াছে, সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, তৎসমুদয়ের সহিতই বিক্রমজিৎ নামক এক রাজার বা বহু রাজার স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে।

'দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া নগেন্দ্র বাবু লিখিতেছেন,—"খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে গুড়বমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে*—

"দেবগ্রামভবা ধন্যা দেবীস্থ তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতরূপা।
দেবকীব তস্মাদ্‌গোপালপ্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমম্‌"॥

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন"।

নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত শ্লোক গরুড়স্তম্ভলিপিতে দৃষ্ট হয় না। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় গরুড়স্তম্ভলিপির একটি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল(১)। অবশেষে অধ্যাপক কিলহর্ণের অধ্যবসায়বলে একটি মূলানুগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল বটে(২), কিন্তু তাহাতেও সমুদয় সংশয়ের নিরসন হইয়াছিল না। পরে গৌড়লেখমালায় একটি বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে(৩)। কিন্তু কি এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, কি অধ্যাপক কিলহর্ণের পাঠ অথবা কি গৌড়লেখমালা-ধৃত পাঠ, কোথায়ও নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত শ্লোকটির সন্ধান পাইলাম না। গরুড়স্তম্ভলিপির ১৬শ ও ১৭শ শ্লোকে লিখিত আছে ;—

"দেবগ্রাম-ভবা তস্য পত্নী বব্বাভিধাঽভবৎ।
অতুল্যাচলয়া লক্ষ্ম্যা সত্যা চাপ্য(নপত্য) য়া॥
সা দেবকীব তস্মাৎ যশোদয়া স্বীকৃতং পতিং লক্ষ্ম্যাঃ।
গোপাল-প্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমং তনয়ং॥"

—গৌড়লেখমালা, ৭৪-৭৫ পৃঃ।

ইহা হইতে জানা যায় যে, গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় এক দেবগ্রামে ছিল। কিন্তু গরুড়স্তম্ভলিপি হইতেও নগেন্দ্র বাবুর দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয় না। বঙ্গদেশে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম রহিয়াছে। দেবগ্রাম নামক কোনও গ্রামের সন্ধান পাইলেই যে তাহাকে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় বলিয়া পরিচিত করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আলোচ্য দেবগ্রামেই যে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল, তাহার প্রমাণ কি ?

নগেন্দ্র বাবু রামচরিতের টীকায় রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে দেবগ্রামাধিপতি বিক্রম-

---

* বর্দ্ধমানের ইতিকথা—৫৫ পৃষ্ঠা।

(১) J. A. S. B. 1874. Pages 356-358.

(২) Epigraphia Indica Vol. II. Pages 161-164.

(৩) গৌড়লেখমালা—৭১-৭৬ পৃষ্ঠা।

রাজের(১) নাম উল্লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রামচরিতের দেবগ্রামই নদীয়া জেলায় অবস্থিত বিক্রমপুরের অনতিদূরবর্ত্তী দেবগ্রাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসরণ করিয়া তিনি বালবলভীকে বাগড়ি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন(২)। কিন্তু এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। "রামচরিতে" বালবলভীর বিবরণ দেখিয়া বোধ হয় যে, উক্ত দেশ নদীবহুল ছিল। হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরে আবিষ্কৃত প্রশস্তিতে বালবলভীর উল্লেখ সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি এবং রামচরিত ব্যতীত ভবদেব ভট্ট-বিরচিত "প্রায়শ্চিত্ত-নিরূপণ" ও "তন্ত্রবার্ত্তিকটীকা" নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার বালবলভীভুজঙ্গ উপাধিতে বালবলভীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম আছে, সুতরাং দেবগ্রাম বা বালবলভী যে নদীয়া জেলায় অবস্থিত ছিল, এ কথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না(৩)। যাহা হউক, বালবলভীকে বাগড়ি এবং দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভী-পতি বিক্রমরাজকে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয়ের যুক্তিই তাঁহার সিদ্ধান্তের অন্তরায় হইয়া উঠে। কারণ, দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাজ রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে অন্যতম ছিলেন। রামপাল ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে(৪)। সুতরাং ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যেই যে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরে রামপালের সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে যে বিক্রমপুরে রামপালের সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই বিক্রমপুরে বিজয়সেন, ভোজবর্ম্মা, শ্যামলবর্ম্মা, জাতবর্ম্মা, হরিবর্ম্মা ও শ্রীচন্দ্র প্রভৃতি নরপতির স্থান হইতে পারে না।

বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়ে তাম্রশাসনোক্ত "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে" এবং কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনোল্লিখিত "পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগ-প্রদেশে" প্রভৃতি উক্তিতে বিক্রমপুরের অবস্থান স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর, বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার, ভোজবর্ম্মা, শ্রীচন্দ্র ও হরিবর্ম্মার শ্রীবিক্রমপুর যে অভিন্ন,

---

(১) "দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবসুধাচক্রবালবালবলভীতরঙ্গবহলগলহস্তপ্রশস্তহস্তবিক্রমো বিক্রমরাজঃ"।
—রামচরিত, ২য় পরিচ্ছেদ, ৫ম শ্লোক, টীকা।

(২) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p. 14. বর্দ্ধমানের ইতিকথা—৫৫ পৃষ্ঠা। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য-কাণ্ড)—১৯৮ পৃষ্ঠা।

(৩) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৬০ পৃষ্ঠা।

(৪) নগেন্দ্র বাবুর মতে রামপাল ১০৫৭-১০৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু চণ্ডীমৌয়ের শিলালিপি তদীয় ৪২ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড, ২১৬পৃঃ ও বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৬৯ পৃঃ।

তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাম্রশাসনাদিতে এরূপ কোনই কথা পাওয়া যায় না, যাহাতে উপরোক্ত বিভিন্ন রাজবংশের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারকে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতে হইবে। বিশেষতঃ তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গদেশে (পূর্ব্ববঙ্গে) অবস্থিত, পক্ষান্তরে নগেন্দ্র বাবুর আবিষ্কৃত দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত এবং উহা বাগড়ী বা রাঢ়প্রদেশ-সংস্থ। সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর বিক্রমপুরকে তাম্রশাসনবর্ণিত বিক্রমপুর বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব।

ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তিতে গৌড় ও বঙ্গ স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথম ভবদেব গৌড়াধিপতির নিকট হইতে হস্তিনীভট্ট গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট (বালবলভীভুজঙ্গ) বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। এই ভবদেবের পিতামহ আদিদেবও বঙ্গরাজের রাজ্যলক্ষ্মীর বিশ্রামসচিব মহাপাত্র ও অব্যর্থ সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন(১)। বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মদেবও শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতজয়স্কন্ধাবার হইতেই তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছেন(২)। সুতরাং শ্রীবিক্রমপুরকে বঙ্গ ব্যতীত রাঢ় বা বাগড়ীতে স্থাপন করা যায় না।

রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র পরে বঙ্গরাজ হইয়াছিলেন বলিয়াই রাজকবি তাঁহার পিতাকে "হরিকেল-রাজ-ককুদ-ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াং আধারঃ" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন(৩)। এই শ্রীচন্দ্রও শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার যে হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীচন্দ্র রামপালের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা। তিনি রামপালের প্রপিতামহ প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক। সুতরাং তাঁহার তাম্রশাসনে যে বিক্রমপুরের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই বিক্রমপুর কখনও রামপালের সমসাময়িক বিক্রমরাজের স্থাপিত বিক্রমপুর হইতে পারে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে কথা হইতেছে, এই হরিকেল-রাজ্য কোথায়? খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র সূরিকৃত "অভিধান-চিন্তামণি"তে হরিকেল বঙ্গের (পূর্ব্ববঙ্গের) প্রাচীন নাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে(৪)। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং হরিকেল-রাজ্যে এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশমতে হরিকেল পূর্ব্বভারতের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত(৫)।

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (ব্রাহ্মণ-কাণ্ড, ১মাংশ) ৩০৪-৩১২ পৃঃ।

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (ব্রাহ্মণ-কাণ্ড, ২য়াংশ) ২১৫ পৃঃ।

(৩) সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৪০০-৪১০ পৃঃ।

(৪) "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়া"—ইতি হেমচন্দ্রঃ।

(৫) J Takakusu's I-Tsing P. XLVI & বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৪৭ পৃঃ।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ যে হরিকেলীয়ের অন্তর্গত ছিল, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। নগেন্দ্র-বাবুর বিক্রমপুর গঙ্গার পুরাতন খাড়ির পশ্চিম দিকে অবস্থিত, সুতরাং এই বিক্রমপুর হরিকেলীয় বা বঙ্গে অবস্থিত হইতে পারে না।

সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রামচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে,—"পূর্ব্বদিকের অধিপতি বর্ম্মরাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য উৎকৃষ্ট হস্তী ও স্বীয় রথ প্রদান করিয়া রামপালের আরাধনা করিয়াছিলেন"(১)। বেলাব তাম্রশাসনের প্রতিপাদয়িতা ভোজবর্ম্মাকেই এই প্রাগ্দেশীয় বর্ম্মরাজা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। এই ভোজবর্ম্মাও শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সন্ধ্যাকর নন্দীর বাসভূমি অথবা রামপাল বা মদনপালদেবের রাজধানী রামাবতী নগরী হইতে ভোজবর্ম্মার রাজ্য বা রাজধানী পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়াই রাজকবি ভোজবর্ম্মাকে প্রাগ্দেশীয় বর্ম্মরাজা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী আত্মপরিচয় প্রদানকালে বলিয়াছেন যে, তাঁহার কুলস্থান পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের সহিত প্রতিবদ্ধ ছিল; তাহা পুণ্যভূ ও বৃহদ্বটু বলিয়া পরিচিত ছিল এবং সমগ্র বসুধামণ্ডলের শীর্ষস্থানে অবস্থিত বরেন্দ্রীমণ্ডলের তাহাই চূড়ামণি ছিল(২)। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ডে করতোয়া-মাহাত্ম্যের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর ও বগুড়া জেলান্তর্গত মহাস্থানগড় অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন(৩)। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের দক্ষিণ দিকে এবং ঢাকা-বিক্রমপুর ইহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং ঢাকা-বিক্রমপুরকেই প্রাগ্দেশীয় ভূপতি ভোজবর্ম্মার জয়স্কন্ধাবার বলিয়া নির্দ্দেশিত করিতে হয়। রামপাল এবং তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের রাজ্যকালে রামাবতী যে গৌড়-রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহা রামচরিত এবং মদনপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। রামাবতীর অবস্থান লইয়া মতভেদ রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। নগেন্দ্র বাবু বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক স্থানে রামাবতীর অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন(৪)। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে রামাবতী সরকার জন্নতাবাদ বা গৌড়ের সীমামধ্যে অবস্থিত(৫)। রামাবতীর অবস্থান গৌড়মণ্ডলেই হউক বা বগুড়া জেলায়ই হউক, দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই উভয় স্থানেরই দক্ষিণ

---

(১) "স্বপরিত্রাণনিমিত্তং পত্যায়ঃ প্রাগ্দিশীয়েন।
বরবারণেন চ নিজস্যন্দনদানেন বর্ম্মণারাধে॥"—রাম-চরিত, ৩।৪৪

(২) "বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ॥"—রাম-চরিত, কবি-প্রশস্তি, ১

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য-কাণ্ড), ২০৫ পৃঃ।

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য-কাণ্ড), ২০৯ পৃঃ।

(৫) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৭২ পৃঃ।

দিকে এবং ঢাকা-বিক্রমপুর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার যে ঢাকা-বিক্রমপুরেই প্রতিষ্ঠাপিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

তাম্রশাসন ও সমসাময়িক গ্রন্থাদির আলোচনা করিলে শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারকে ঢাকা-বিক্রমপুরেই নিঃসন্দেহে স্থাপিত করিতে হইবে। বঙ্গদেশে বিক্রমপুর নামীয় বহু গ্রাম রহিয়াছে, সুতরাং কোনও স্থানের নাম বিক্রমপুর অথবা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কোনও স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তির কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেই যে, উহাকে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইবে, তাহার কোনই অর্থ নাই। মনে করিলে যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যাহা বলা যায়, তাহার যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার উপায় আছে কি না, তাহা পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখিলেই ভাল হয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়

শ্রীবিক্রমপুর

(প্রতিবাদের উত্তর)

কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, সেনরাজধানী বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার পূর্ব্ব-বঙ্গেরই কোন স্থানে; আমার নবপ্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ডে আমার সেই পূর্ব্ব-বিশ্বাসই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনন্তর বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসন ও ধোয়ী কবির পবনদূত পাঠ করিয়া আমার সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগে, তৎপরে নদীয়া জেলাস্থ দেবগ্রাম-বিক্রমপুর পরিদর্শন করিয়া আমার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়।

আমি চিরদিন সত্যাবিষ্কারের ভিখারী। নূতন নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের ফলে আমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া রাখিলে চলিবে না। বর্দ্ধমানের পত্রিকার সময়াভাবে বিস্তৃত আলোচনা করিবার সুযোগ হয় নাই। পরিষৎ-পত্রিকায় বর্ত্তমান সংখ্যায় কোন কোন অংশ সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইলেও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার অবকাশ পাই নাই। বিষয়টী নিতান্ত গুরুতর মনে করিয়া সকল দিক্ আলোচনা করিয়া একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিতেছি। সুতরাং আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর যতীন্দ্র বাবুর প্রতিবাদ শোভনীয় হইত। তিনি যে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, আমার প্রবন্ধে বিশদভাবে সেই সমুদয়ের আলোচনা করিয়াছি। তবে তিনি যখন আমার প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বেই প্রতিবাদ করিয়াছেন, তখন কএকজন বন্ধুর অনুরোধে অতি সংক্ষেপে তাঁহার প্রতি-বাদের উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি।

১। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় আনন্দভট্টের বল্লালচরিত—একখানি পুথি দেখিয়া সম্পাদন করেন নাই। দুইখানি প্রাচীন পুথির মধ্যে একখানি অরঙ্গজেব বাদশাহের মৃত্যুবর্ষে ও অপরখানি ১১৯৮ বঙ্গাব্দের লিপি। দুইখানি পুথিই বিভিন্ন জেলা হইতে পাওয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখবন্ধ পাঠ করিলেই জানিতে পারিতেন। বল্লালচরিত-রচয়িতা আনন্দ-ভট্টের পূর্ব্বপুরুষ সুবর্ণগ্রামের নিকটস্থ কাসার গ্রামের অধিবাসী। তাঁহার বল্লালচরিতের শ্লোক হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বল্লালসেনের অপর রাজধানী বিক্রমপুর পূর্ব্ববঙ্গে নহে, তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী সুবর্ণগ্রাম।

২। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান দেখিলে ইহা কতকাংশ বঙ্গের এবং কতকাংশ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয়, প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধেও এইরূপ।

৩। বর্ত্তমান দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বাগড়ীর মধ্যে। বলা বাহুল্য, গঙ্গা ও পদ্মার বদ্বীপাংশই বাগড়ী নামে পরিচিত। ইহা প্রাচীন বঙ্গেরই অন্তর্গত। রাঢ় বা বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত নহে।

৪। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরকে আমি কোথাও বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বলি নাই। প্রাচীন তাম্রশাসন আলোচনা করিলে দেখা যায়, গঙ্গার পশ্চিমকূল হইতে বর্দ্ধমান ভুক্তি এবং পূর্ব্বকূল হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি ধরা হইয়াছে। এ অবস্থায় গঙ্গার পূর্ব্বকূলে অবস্থিত দেবগ্রাম-বিক্রমপুর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত হইতেছে।

৫। দেবগ্রাম সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা পরিষৎ-পত্রিকায় ৩৪-৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। দেবগ্রামের দক্ষিণে ও বিক্রমপুরের উত্তরে দমদমা নামক স্থানে, যেখানে সাধারণে বল্লালের ভিটা ও বল্লালের দীঘি দেখাইয়া থাকে, সেই স্থান হইতেই যখন পূর্ব্ব-দক্ষিণমুখে ও পশ্চিম-দক্ষিণমুখে বল্লালসেনের দুইটী জাঙ্গাল বাহির হইয়া গিয়াছে এবং এখানে সকলেই যখন বল্লালের বৃহৎ রাজবাটীর উল্লেখ করিয়া থাকেন, তখন এই স্থানে যে বল্লালসেনের একটী রাজধানী ছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই বল্লালের ভিটার তিন মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমান বিক্রমপুরহাট। প্রাচীন গৌড় ও সুবর্ণগ্রাম রাজধানীর আয়তন ৪।৫ ক্রোশ বা ৮।১০ মাইলের অধিক ছিল, প্রাচীন বিক্রমপুরও সেইরূপ ৮।১০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া থাকাই সম্ভব। এরূপ স্থলে বল্লালের ভিটা প্রাচীন বিক্রমপুরের মধ্যে ছিল, সন্দেহ নাই।

৭। দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবালবলভীপতি বিক্রমরাজ রামপালের রাজত্বকালের প্রথমাংশে রাজা ছিলেন। তৎপরে তাঁহার অধিকার যথাক্রমে বর্ম্ম ও সেনবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বর্ম্ম, সেন ও চন্দ্রবংশের তাম্রলেখবর্ণিত বিক্রমপুর অভিন্ন। শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকারী রাধাগোবিন্দবাবু এই তাম্রশাসনের লিপিকাল আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"বর্ম্মবংশের পর শ্রীচন্দ্রের অভ্যুদয়।" যেমন কামরূপপতি ভাস্করবর্ম্মা অল্প-কালের জন্য কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়া কর্ণসুবর্ণ হইতে তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ চন্দ্রদ্বীপপতি শ্রীচন্দ্র অল্প দিনের জন্য হরিকেল অধিকার করিয়া বিক্রমপুর হইতে শাসন দান করিয়াছিলেন। ই-চিং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় এক বর্ষকাল অবস্থান করেন। তাঁহার বর্ণনায় পাইতেছি যে, হরিকেল চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এ অবস্থায় তৎকালে হরিকেল বা প্রাচীন বঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে গণ্য ছিল না। বরাহমিহির খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গ ও সমতট দুইটী ভিন্ন জনপদ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবুও তাঁহার ঢাকার ইতিহাসে লিখিয়াছেন—ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ ও ফরিদপুর জেলার পূর্ব্বাংশ লইয়াই সমতট (১৭ পৃঃ)। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন অনুসারে ঢাকা জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ বিক্রমপুর নামে অভিহিত (ঢাকার ইতিহাস, ১৬ পৃঃ)। আবার তিনিই প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঢাকা জেলার উত্তরাংশ বা অধিকাংশ প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপের অন্তর্গত ছিল (৫ পৃঃ)। বঙ্গাধিপ বর্ম্ম ও সেনবংশের অধিকারভুক্ত হইলে পর ঢাকা জেলা বা সমতটপ্রদেশ পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং ইচিং, বরাহমিহির ও যতীন্দ্র বাবুর গ্রন্থ হইতেই বুঝিতেছি

যে, এখন যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বলে, তাহা প্রাচীন সমতট বা প্রাগ্জ্যোতিষের অন্তর্গত ছিল, হরিকেল বা প্রাচীন বঙ্গ উহা হইতে ভিন্ন। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে রাঢ় ও বরেন্দ্র একত্র গৌড় নামে এবং বঙ্গ স্বতন্ত্র উক্ত হইয়াছে। এই তন্ত্র হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, গঙ্গার পূর্ব্বে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশেই প্রাচীন বঙ্গদেশ। বর্ত্তমান নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও ঢাকার পূর্ব্বদক্ষিণাংশ এবং ফরিদপুরের উত্তরপূর্ব্বাংশ এই বঙ্গের অন্তর্গত। তাই বহু কাল হইতে নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ঢাকা ও ফরিদপুরের অধিবাসী রাঢ়বাসীর নিকট "বাঙ্গাল" বলিয়া পরিচিত। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বর্ত্তমান নদীয়া জেলার অন্তর্গত, সুতরাং প্রাচীন বঙ্গের মধ্যেই হইতেছে। এ অবস্থায় নদীয়া জেলাস্থ বল্লালসেনের প্রবাদবিজড়িত বিক্রমপুরকে বর্ম্ম ও সেনবংশের বিক্রমপুর বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি কি? এই বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া বল্লালসেনের জাঙ্গাল অদ্যাপি বিদ্যমান।

বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের প্রথমাংশে যে সকল তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষাংশে প্রদত্ত তাম্রশাসনে ধার্য্যগ্রাম এবং তৎপুত্র কেশব ও বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারের পরিবর্ত্তে ফল্গুগ্রাম-জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ আছে। অথচ কেশব ও বিশ্বরূপ উভয়ের তাম্রশাসনেই "বিক্রমপুরভাগ" প্রদেশে ভূমিদানের কথা আছে। সকলেই জানেন, মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের নদীয়া-বিজয়ের পর সেনবংশ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াই আধিপত্য করিতে থাকেন। লক্ষ্মণসেন শেষাংশে এবং কেশব ও বিশ্বরূপ প্রথম হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার থাকিলে শেষোক্ত সেনরাজগণের তাম্রশাসনে কখনই বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারের পরিবর্ত্তে ফল্গুগ্রাম-জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ থাকিত না। বিশেষতঃ ঢাকার ইতিহাস-লেখক বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর নামে কোন সহর বা গ্রামের অস্তিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

বিজয়সেন ও বল্লালসেনের তাম্রশাসন এবং লক্ষ্মণসেনের সভাস্থ ধোয়ী কবির "পবনদূত" পাঠে মনে হইবে যে, রাঢ়দেশেই সেনবংশের পূর্ব্বলীলাস্থলী; গঙ্গার তীরেই বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল। এ দেশে ব্রাহ্মণ-কুলীনদিগের বিশ্বাস যে, বল্লালসেন তাঁহার বিক্রমপুর রাজধানী হইতেই কুলবিধি প্রচার করেন, তাঁহার কুল-ব্যবস্থায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র, এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্মানিত হইয়াছিলেন। যদি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বল্লাল কুল-ব্যবস্থা প্রচার করিতেন, তাহা হইলে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রের ন্যায় বঙ্গজ ব্রাহ্মণসমাজেরও একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর সৃষ্টি হইত। বলা বাহুল্য যে, পাটুলী, বেগে, কাঁটাদীয়া, সাগরদীয়া প্রভৃতি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রধান সমাজস্থানগুলি আলোচ্য বিক্রমপুরের নিকট। ঐ সকল সমাজস্থান কুল-ব্যবস্থার কালে সম্ভবতঃ নদীয়াজেলাস্থ এই বিক্রমপুর-সমাজের অন্তর্গত ছিল। মুসলমান-অধিকারের পর এ অঞ্চল হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববঙ্গের যে অংশে গিয়া বাস করেন, তাঁহাই পরে 'বিক্রমপুরভাগ' বা বিক্রমপুর পরগণা নামে খ্যাত হইয়া থাকিবে। কেবল ঢাকা

জেলা বলিয়া নহে, এখানকার কতকগুলি লোক সুদূর কাছাড়ে গিয়াও বাস করেন, সেখানেও তাঁহাদের বাস হইতে একটী স্বতন্ত্র 'বিক্রমপুর পরগণার' সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক, আজও পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরপরগণার রাঢ়ীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা পাটুলী প্রভৃতি উক্ত সমাজস্থানের নামেই স্ব স্ব পূর্ব্বপরিচয় দিয়া থাকেন এবং "আদৌ রাঢ়ে ততো বঙ্গে" বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। দেবগ্রামবাসী বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে প্রবাদ শুনিয়াছিলাম যে, বল্লালসেন যখন বিক্রমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে চলিয়া যান। সেই সময় পুত্রবধূর বিরহব্যঞ্জক শ্লোক পাঠ করিয়া সেই রাত্রিমধ্যে লক্ষ্মণ-সেনকে আনিবার জন্য রাজা বল্লালসেন কৈবর্ত্তদিগকে আদেশ করেন। কৈবর্ত্তেরা সেই রাত্রিমধ্যে লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুর রাজধানীতে আনিয়া দিয়াছিল। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বল্লালসেন কৈবর্ত্তদিগের জলচল করিয়া লয়েন। তদবধি গঙ্গাতীরস্থ কৈবর্ত্তগণ জলাচরণীয় হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর পরগণায় আজও কৈবর্ত্তগণের জল চলে নাই। এ অবস্থায় লক্ষ্মণসেন-ঘটিত প্রবাদের মূলে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, তাহা যে এই নদীয়া জেলার বিক্রমপুরেই হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

৮। রামচরিতের প্রাগ্দেশীয় বর্ম্মনৃপতিকে বঙ্গাধিপ ভোজবর্ম্মা বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা রামাবতীর পূর্ব্বে তৎকালে প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যই ছিল, সমতট বা বঙ্গ ছিল না। আমার কথার প্রতিবাদসূত্রে যতীন্দ্র বাবু যাহাই বলুন, তিনি তাঁহার ঢাকার ইতিহাসে নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (ঢা° ই° ৫ পৃঃ)। বলা বাহুল্য, প্রাগ্জ্যোতিষের বর্ম্মনৃপতিই রামচরিতকারের লক্ষ্য। সুতরাং ঢাকা-বিক্রমপুরের মধ্যে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার ছিল, তাহার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। আমি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি, এখানে স্থানাভাবে বিস্তৃত আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম।*

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

---

* যতীন্দ্র বাবুর যুক্তিগুলির সঙ্গে তুলনা করিয়া আমার যুক্তিগুলি পড়িলে পত্রিকার পাঠকগণের বিষয়টী বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া সংক্ষেপে কেবলমাত্র এই কয়টী কথা প্রকাশ করিলাম।—লেখক।

একখানি সত্যপীরের পুথি*

গ্রন্থারম্ভে আছে—"৺রাধাকৃষ্ণ"। তার পর "সত্যনারায়ণের পুস্তক লিক্ষ্যতে।"

"সত্যনারায়ণ-পদে মজাইয়া চিত।
শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত ॥"

ইহাতে বুঝা গেল যে, কবি রাধাকৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার নিজের পরিচয় কিছুই দেন নাই। পিতার নাম, বাড়ী কোথায়, কি জাতি, ইহা গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না।

বার বৎসর পূর্ব্বে ভাগলপুর কলেজের দর্শন-শাস্ত্রাধ্যাপক আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র সিংহ এম্ এ মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থ পাইয়াছিলাম; তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় কোনও গ্রামে উহা পান। আমার পরমবন্ধু সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত মৌলবী আবদুল করিমের সাহায্যে উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছি। পুথিখানি পুরাতন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা। ১১৬২ সালের লেখা অর্থাৎ দেড় শত বৎসরের পূর্ব্বে। কিন্তু এখনও এত পরিষ্কার আছে যে, প্রথমে দেখিলে মনে হয় যে, সহজে পড়া যাইবে। কিন্তু যাঁহাদিগের বাঙ্গালা পুরাতন অক্ষর পড়া অভ্যাস নাই, তাঁহাদের উহা পড়া নিতান্ত সুকঠিন।

গ্রন্থখানি পড়িলে বুঝা যায় যে, কবি সংস্কৃত এবং পারসি ভাষা ভাল জানিতেন। গ্রন্থের রচনা-চাতুর্য্য ও কবিত্ব-শক্তিও যথেষ্ট আছে। মানুষের মনের দুর্ব্বলতা, দ্বেষ, হিংসা—আবার উচ্চ ভাব, ভ্রাতৃপ্রেম ইত্যাদি বর্ণনায় কবি কারিকুরি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, সত্যনারায়ণ নাম দিয়া কবি সত্যপীরের পুথি লিখিয়াছেন।

আখ্যান

ইহার আখ্যানাংশ প্রায় অন্য সত্যপীরের পুথির ন্যায়। প্রায় বলিলাম এই জন্য যে, ইহাতে কিছু বিশেষত্ব আছে। সদানন্দ ও বিনোদ সদাগর রাজাজ্ঞায় বাণিজ্য করিতে গেলেন। যাইবার সময় ছোট ভাই মদনকে তাঁহাদের স্ত্রী সুমতি ও কুমতির হাতে দিয়া গেলেন। যাইবার সময় নদীতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন। শ্রীমন্ত দেখিয়াছিলেন কমলে কামিনী, ইঁহারা দেখিলেন;—

সদাগরে বিড়ম্বনা করেন খোদায়।
পাথরের গৌর এক ভাসায় দরিয়ায় ॥
নিত্য করে নিত্যকী কীররে গিত গায়।
দরিয়ার বিচেতে অপূর্ব্ব শোভা পায় ॥

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

মৃগছাল পাণির উপরে ডাল্যা দিয়া।
চারি ফকির নিমাজ করে পশ্চিম মুখ হয়্যা॥

সদাগরেরা যে দেশে গেলেন, সে দেশের রাজাকে ঐ সংবাদ দিলে, তাঁহার লোক-জনকে ঐ দৃশ্য দেখাইতে না পারায় সনাতন প্রথাক্রমে কারাবদ্ধ হইলেন।

এ দিকে সুমতি কুমতি এক তান্ত্রিকের হাতে পড়িয়া তন্ত্রমতে যোগ শিক্ষা আরম্ভ করিল এবং অল্প দিনের মধ্যে এমন সিদ্ধি লাভ করিল যে, গাছে চড়িয়া যেখানে সেখানে যাইতে পারিত। মদন বালক হইলেও তাহাদের এই কুক্রিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিত। এক দেশে এক রাজার মেয়ের খুব ধুমধামে বিবাহ হইতেছিল। সে সদাগরদিগের দেশ হইতে অনেক দূরে। সুমতি কুমতি পরামর্শ করিল, গাছে চড়িয়া সেই দেশে যাইয়া রাজকন্যার স্বয়ম্বর দেখিবে। পরামর্শ মদনও শুনিল। যে গাছে চড়িয়া যাইবে, তাহাতে একটি কোটর ছিল। সে তাহাতে লুকাইয়া রহিল। যথাসময়ে সেখানে পৌছিয়া পীরের কৃপায় মদনকে সেই রাজকন্যা বিবাহ করিল। অত দূর-দেশ হইতে মদন হাঁটিয়া আসিতে পারিবে না; সুতরাং রাত্রিশেষে রাজকন্যাকে ত্যাগ করিয়া গাছের কোটরে লুকাইয়া থাকিল। মদন, সুমতি ও কুমতি বাড়ী ফিরিল। কিন্তু যে রাজকন্যার বিবাহ হইল, সে দেশে প্রাতঃকালে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অপর দেশের রাজপুত্রগণ প্রত্যেকে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ধোপে টিকিল না, রাজকন্যার পরীক্ষায় কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। তাঁহারা সকলে আপন আপন দেশে ফিরিয়া গেলেন। রাজকন্যা পিতার সাহায্যে ডিঙ্গা সাজাইয়া আপন পতির অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং পীরের কৃপায় স্বামী পাইলেন। এখন মুসলমান পীর ও তন্ত্র-মতের ঘোর যুদ্ধ। যখন সুমতি কুমতি দেখিলেন যে, তাঁহাদের কুক্রিয়া সমস্তই মদন অবগত আছে, তখন তাঁহাদের ভয় হইল এবং মদন-কণ্টককে পথ হইতে সরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা হইল, তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তন্ত্রমতে মন্ত্রৌষধির দ্বারা তাঁহাকে পাখী করিয়া উড়াইয়া দিল। ও দিকে পীরের কৃপায় সদানন্দ ও বিনোদ কারামুক্ত হইল এবং রাজা তাহাদিগকে সাত ডিঙ্গা ধন-রত্ন দিলেন। বাড়ী যাইবার সময় সুমতি কুমতি যে অলঙ্কার চাহিয়াছিলেন, তাহা খরিদ করিলেন এবং মনে পড়িল যে, ভাই মদন একটি সাচান পক্ষী চাহিয়াছিল। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া একটি সাচান পক্ষী সংগ্রহ করা হইল। তাঁহারা বাড়ী আসিয়া শুনিলেন, মদন মরিয়া গিয়াছে। তাহার পর মদনের স্ত্রী পীরের কৃপায় পীরের সিন্নি দিলেন। সিন্নির সরঞ্জাম সামান্য।

খোদায় বলেন জদি কিছু নাই ঘরে।
সওয়া মুঠি খুদ আনি দেওনা আমারে॥
সওয়া মুঠি খুদ দিয়া পুর মনোরথ।
সদা মোর খুদে তুষ্ট গোবিন্দ জেমত॥

একিদা করিয়া তুমি খুদ দেহ মোরে।
মনের বাঞ্ছিত বর দিব গো তোমারে॥
সওয়া মুঠি খুদ আমি রাজার নন্দিনী।
একিদায় করে সত্যপীরের সিরিনি॥

তার পর সন্ধ্যাকালে হিন্দু-মুসলমান সকলে উপস্থিত হইলেন। নয়া হাঁড়িতে পুরিয়া সিন্নির মিঠাই রাখা হইল। পীরের কলমা পড়িলে সকলে উঠিয়া সেলাম করিলেন। তখন সকলকে সিন্নি বাটিয়া দেওয়া হইল।

"চাটিয়া খাইল হাত মুছিল শিরে"

আবার সিন্নির এত মহিমা যে,—

ভরমে সিরনি যদি জমিনে গিরিবে।
চাটিয়া খাইলে সে নিয়ত হাসিল হবে॥

অপর এক দিন, সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পূজা এক কি না এবং ইহার সহিত আকবর বাদশার কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, লিখিব। সত্যনারায়ণের পূজা বাঙ্গালা দেশে এক সময় এত প্রচার হইয়াছিল যে, প্রত্যেক গ্রামে সংক্রান্তি ও পূর্ণিমার দিন কাহারও না কাহারও বাড়ীতে এই পূজা হইত। এখন কোনও পূজাই হয় না; সুতরাং সত্যনারায়ণও বাদ পড়িয়াছেন। বেহার, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যভারত, এমন কি, বোম্বাই অঞ্চলে এখনও এই পূজার যথেষ্ট আদর আছে।

শ্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী

———

শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধধর্ম*

শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে যত পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, আমি বোধ করি, তত আর কাহারও সম্বন্ধে লিখিত হয় নাই। ইহার দ্বারা তিনি যে কিরূপ অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা বেশ প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার জীবনীতে তাঁহাকে পাষণ্ডদলনকারী বা বৌদ্ধ-নির্ব্বাসক বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা কত দূর সত্য, তাহারই নির্ণয়কল্পে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, তিনি ৩৮৮৯ কলি-অব্দে অথবা ৭১০ শকে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩২ বা ৩৮ বৎসর ধরাধামে বিরাজমান থাকিয়া স্বর্গারোহণ করেন। কাহারও মতে তিনি ২৬৩১ যুধিষ্ঠিরাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। আবার কাহারও মতে তিনি পূর্ণবর্ম্মা রাজার সময় প্রাদুর্ভূত হন। অন্য লেখকের মতে তিনি পূর্ণবর্ম্মা রাজার সময় (অর্থাৎ ৬০০-৬১৫ খৃঃ) ও প্রচলিত সময়ের (৭১০ শক বা ৭৮৮ খৃঃ) মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সকল সময়ের আনুসঙ্গিকতা ও বিরোধ বিচার করিয়া যেটি যথার্থ বলিয়া অবধারিত হইবে, আমরা তাহাই গ্রহণ করিতে পারি।

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গুরু-নামমালায় ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুকদেবের পরেই গৌড়পাদ গোবিন্দ যতি ও শঙ্করাচার্য্যের নাম কথিত হইয়া থাকে। তাঁহার নামের পরেই পদ্মপাদপ্রমুখ শিষ্য-পরম্পরার ধারাবাহিক নাম আছে। শঙ্করের সকল জীবনীতে গোবিন্দ যতি তাঁহার সন্ন্যাসগুরু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি বিন্ধ্যগিরিনিবাসী ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ যে, তাঁহারই অনুমতিক্রমে শঙ্কর ভগবদ্গীতা, উপনিষৎ ও বেদান্তদর্শনের ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। গৌড়পাদ শাঙ্কর-ভাষ্যের এক স্থলে পূজ্যাতিপূজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; সুতরাং তিনি যে শঙ্করের গুরুর গুরু ছিলেন, ইহা অনুমান করিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। তাহা হইলে শঙ্করের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই গুরুর নাম পাওয়া যাইতেছে। গোবিন্দ যতি কোন গ্রন্থ রচনা করেন কি না, তাহা প্রকাশ নাই। কিন্তু গৌড়পাদ যে গ্রন্থকার ছিলেন, তাহা তাঁহার সাংখ্যকারিকাভাষ্য ও মাণ্ডুক্যকারিকা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। শুনা যায়, সাংখ্যকারিকা-ভাষ্য চীন দেশের সম্রাট্ চুংএর রাজত্বকালে ৫৭০ এবং ৫৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। সুতরাং গৌড়পাদ যে উক্ত সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক, তাহা প্রকাশিত হইতেছে; কত পূর্ব্ব, তাহা শঙ্করের সময় নিরূপণের উপর নির্ভর করিতেছে।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, ৯ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শঙ্কর দাক্ষিণাত্যদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিবাস সম্ভবতঃ পশ্চিম-মালাবারে ছিল। শুনা যায়, তিনি অল্পজীবী ছিলেন; কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যে তিনি যত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা জনসাধারণের যেরূপ মত ও বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এক ভগবান্ বুদ্ধদেব ব্যতিরেকে সেরূপ অসম্ভব কার্য্য কেহ করিতে পারেন নাই এবং ভবিষ্যতে পারিবেন কি না, তাহারও নিশ্চয়তা নাই।

মূলে সত্য না থাকিলে কোন মত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। তাই বৌদ্ধমত ও শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদগর্ভ অদ্বৈত-মত অচিরকালমধ্যে দ্রুতগতিতে সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কোন মত একবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে স্বার্থপর ব্যক্তিগণ দ্বারা তাহাতে কুসংস্কার অনুপ্রবেশিত হয়। এই কারণে উহা কালসহকারে কলুষভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমান কালে কি নব্য, কি পুরাতন, সকল ধর্ম্মই এই কলঙ্ককালিমা দ্বারা কলুষিত হইয়া রহিয়াছে।

শঙ্কর দশখানি উপনিষদের, ভগবদ্গীতার ও বেদান্তদর্শনের ভাষ্য রচনা করেন। তিনি তাঁহার "পূজ্যাতিপূজ্য" গুরু গৌড়পাদের মাণ্ডুক্য-কারিকারও ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার ভাষ্যগুলি ধীরভাবে তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তিনি প্রথমে উপনিষদ্‌ভাষ্য রচনা করেন, তার পর বেদান্তদর্শন-ভাষ্য রচনা করেন এবং সর্ব্বশেষে ভগবদ্গীতার ভাষ্য-রচনা করেন। কারণ, ভগবদ্গীতার স্থলবিশেষে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত-মতই প্রযুক্ত হইয়াছে অথচ যথার্থতঃ সে স্থলে সেরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। এ স্থলে তিনি কোন প্রাচীন ভাষ্যকারের অর্থ খণ্ডনের প্রয়াস করিয়াছেন। আনন্দগিরি এ স্থলের টীকায় নীরব, কিন্তু নিঃস্বার্থ শ্রীধরস্বামী শঙ্করের ভাষ্যের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত না করিয়াই বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এ স্থলে প্রাচীন ভাষ্যকার ও শ্রীধরস্বামীর অর্থই যে সঙ্গত এবং শঙ্করের অর্থ যে অসঙ্গত, তাহা পক্ষপাতশূন্য পাঠকের চিত্তে অনায়াসে প্রতিভাত হইবে। জীবনীর মতে ভগবদ্গীতাভাষ্যই শঙ্করের প্রথম রচনা।

শঙ্করের সকল ভাষ্যেই একটি পাণ্ডিত্য-ভাব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার ভাষা সরল ও প্রসাদগুণে পূর্ণ। তাঁহার যুক্তিতর্ক শ্লাঘনীয় ও অনুকরণীয়। ইহার দ্বারা তাঁহার মনের উদারতার আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষ্যের স্থলবিশেষ পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট না হইলে তাঁহাকে ভগবান্ বুদ্ধদেবের সমকক্ষ বলিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।

পূর্ব্বে লিখিয়া আসিয়াছি, শঙ্কর মাণ্ডুক্য-কারিকার ভাষ্য লেখেন। ইহাতে গৌড়পাদ অদ্বৈত-মত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; উহা উপনিষৎপ্রোক্ত অদ্বৈত-মত না বৌদ্ধমত, তাহা ঠিক করিতে পারা যায় না। কারণ, তিনি আত্মা ও পরমাত্মার ভেদকে মায়াকৃত ও নিন্দনীয় বলিয়াছেন, আবার বিশ্বকে রজ্জু-সর্প-জ্ঞান ও মরীচিকা-জলজ্ঞানরূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং ইহা একরূপ বৌদ্ধমত, কারণ, তাঁহারাও অদ্বয়বাদী ও মায়াবাদী। তাঁহার সময়ের বৌদ্ধপ্রভাবের অবশ্যম্ভাবী ফলে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, না মহাভারত—অশ্বমেধ-

গর্ব্ব-বিবৃত নানারূপ ধর্ম্মমতের একটি অবলম্বনের ইহা পরিণাম, তাহা ঠিক বলা যায় না। যাহা হউক, তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য শঙ্কর তাঁহার মতই সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন।

ইহা যথার্থরূপে প্রাচীন ঋষিমত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কপিলদেব প্রকৃতি-পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়াছেন—পুরুষ দ্রষ্টা মাত্র ও নিরপেক্ষস্বভাব। প্রাচীন উপনিষদে প্রকৃতি স্বীকৃত, কিন্তু পুরুষ শুদ্ধ দ্রষ্টা নহেন, তিনি প্রকৃতির নিয়ন্তাও বটে। উভয় স্থলে প্রকৃতি-পুরুষের সংজ্ঞায় দ্বিভাবের অর্থ নিহিত রহিয়াছে। সাংখ্যকারিকার স্থলবিশেষে প্রকৃতি-পুরুষ মূল-প্রকৃতি ও পরমাত্মা অর্থে ব্যবহৃত। আবার কোন স্থলে প্রকৃতির অর্থ জড়-প্রকৃতি পৃথিবী বা চৈতন্যপ্রকৃতি স্ত্রীজাতিরূপে এবং পুরুষ জীবাত্মারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—এই জীবাত্মার মোক্ষই পরমব্রহ্ম। ভগবান্ ব্যাসদেবের গীতার সহিত এ মতের যেমন ঐক্য আছে, গীতার সহিত উপনিষদেরও তদ্রূপই সামঞ্জস্য আছে। সাংখ্য-মতে পুরুষ বা জীবাত্মা বহুসংখ্যক। কারণ, প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম-মৃত্যু, স্বভাব-চরিত্র, চিন্তা-কার্য্য ও গুণত্রয়ের সমাবেশ বিভিন্ন। উপনিষৎও ইহা সমর্থন করে, ভগবদ্গীতারও ঐ মত। কিন্তু ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় স্তরের লেখক যাজ্ঞবল্ক্য পুরুষ জীবাত্মাকে পরমাত্মা ও ব্রহ্মকে পুরুষোত্তম লিখিয়া পরবর্ত্তী ভাবুকগণের মস্তক ঘুরাইয়া দিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা জীবাত্মাকেও পরমাত্মা হইতে অখণ্ড ভাবিতে লাগিলেন। ইহার ফলে ভগবদ্গীতার তৃতীয় স্তর বা বাদরায়ণের মতের উৎপত্তি। সেই মতই গৌড়পাদ ও শঙ্করের হস্তে বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

ভগবান্ ব্যাসদেব মায়াকে গুণময়ী বলিয়াছেন। যাহা গুণবিশিষ্ট, তাহা অলীক বস্তু নহে, তাহা সাকার না হইয়া যায় না, তাই প্রকৃতি সাকারা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও মায়া অর্থে প্রকৃতি স্বীকৃত হইয়াছে, উহার অর্থ চিত্তের ভ্রমোৎপাদক কুহক নহে।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥

ইহা গীতার ভাবের প্রতিধ্বনি ও ঋষির কথার অনুমোদন।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

মায়াকে প্রকৃতি এবং তাহার অধীশ্বরকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। তাঁহারই অংশ দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত। গুণময়ী প্রকৃতিকে অতিক্রম করা অপরিহার্য্য, তবে ভগবানের ভক্তই এই মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারেন। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি,

অহঙ্কার ভগবানের অপরা প্রকৃতি এবং জীবজগতের মূল কারণস্বরূপা প্রকৃতিই তাঁহার পরা প্রকৃতি। এ সকল স্থলেই প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাকে উড়াইয়া দিয়া কুহক বলা সত্যের অপলাপ করা ; সুতরাং মায়া বা প্রকৃতি এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—উহা কুহক নহে, উহা ইন্দ্রজাল সাহায্যে প্রত্যক্ষীকৃত অবাস্তব বস্তু নহে, উহা স্বপ্নদৃষ্ট অলীক পদার্থও নহে। বিশ্বকে উড়াইয়া দিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও গণিত জ্যোতিষেরও মুণ্ডপাত করিতে হয়। সত্যশীল ঋষিগণ তাহা করিতে পারেন না, তাঁহাদের প্রতি এরূপ কলঙ্কারোপ করায় মহা পাপ আছে, ইহা কূটব্যবহারীর কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই।

এই কূটব্যবহারীর জ্বালায় আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ উপনিষৎ কলুষিত হইয়া আছে। ইহারা পরাক্রমশালী বৌদ্ধ নৃপতি নাগার্জ্জুনের সহযোগী ছিল। বেদান্তদর্শন, মীমাংসাদর্শন, ছান্দোগ্য, কেন বা তবলকার, ঐতরেয়, কৌষীতকী ইত্যাদি উপনিষদ্‌গুলি ইহাদেরই রচনা (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত মত "বেদান্তদর্শন কাহার রচনা" শীর্ষক সাহিত্য-পরিষদে পঠিত আমার প্রবন্ধ গৃহস্থ পত্রে দ্রষ্টব্য)। এগুলি প্রাচীন উপনিষদের চর্ব্বিতচর্ব্বণ ও আবর্জ্জনায় পূর্ণ। ধীরভাবে তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলেই যে কেহ আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এগুলিতে অনেক বেদবিরুদ্ধ কথার বর্ণনা আছে। এ স্থলে দৃঢ়তার সহিত বলিয়া রাখি যে, বেদে প্রকৃতি-পূজার সূত্রপাত হইয়া উপনিষদে তাহাই ব্রহ্মোপাসনারূপ চরমসীমায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। বেদের ঈশ্বর স্বর্গে বা আকাশে বিরাজমান, উপনিষদের ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত। যাগ-যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ক্ষয়শীল স্বর্গই লব্ধ হয়, ব্রহ্ম লব্ধ হন না। জন্ম-জন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে আত্মা পরিশুদ্ধ হইলে মনুষ্য আত্মার কৃপাতেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারে (কঠোপনিষৎ)। এই আত্মাকে হৃদয়পদ্মে ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত ধ্যান করিবার ব্যবস্থা উপনিষদে কথিত হইয়াছে। প্রাচীন উপনিষদ্ যথা,—কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ব্রহ্মবল্লী, ভৃগুবল্লী, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর। শ্বেতাশ্বতরের অনেক ভাব কঠ, মুণ্ডক, ভগবদ্গীতা হইতে গৃহীত ; প্রভেদের মধ্যে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, ইহাতে ভগবান্ শঙ্কর বা মহেশ্বরের প্রতি সেই অভিধা প্রযুক্ত হইয়াছে। গভীর ভাবুক ঋষিগণের নিকট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ব্রহ্মেরই গুণত্রয়, তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবিলেও কোন দোষ নাই, তিনটিকে একভাবে চিন্তা করিলেও কোন ক্ষতি নাই—এরূপ উভয় প্রকারের চিন্তাতে মনের প্রশস্ততার বৃদ্ধি হয়। এই উপনিষদের "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং", "দ্বাসুপর্ণা" শ্লোকদ্বয় দ্বারা প্রাচীন ঋষিমত উদ্ধৃত ও সমর্থিত হইয়াছে। ইহা মূল প্রকৃতি ও জীবাত্মাপরমাত্মাবোধক। ইহার দ্বারা বেশ বোধ হইতেছে যে, প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া লইয়া ব্রহ্মোপাসনাই প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণের অভীপ্সিত মত ছিল। বড় পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের পূর্ব্বতম ঋষিগণ যেরূপ সাত্ত্বিক চিন্তা করিতে পারিতেন, তাঁহাদের অধস্তন পুরুষগণ সে শক্তি ক্রমিক হারাইতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহাদের বুদ্ধিও ক্রমিক কুণ্ঠভাব ধারণ করিতে থাকে। পুরাণকারগণ ও আমরা স্বাধীন

চিন্তার নির্ম্মল স্রোত অবহেলায় শুষ্ক করিয়া গড্ডালিকাপ্রবাহের আবিল জলে হাবুডুবু খাইতেছি।*

ভগবান্ শঙ্কর দায়ে পড়িয়া প্রকৃতি-বিলোপন-মতের পক্ষপাতী হন। তাঁহার হৃদয়ের গভীর উদারতা যে কিরূপ ছিল, তাহা বলা যায় না। যদি বাস্তবিক তিনি প্রকৃতি-বিলোপক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার রচিত শিব, ভবানী, গঙ্গা, অন্নপূর্ণা, অপরাধক্ষমা স্তোত্রাদি কি দেখিতে পাইতাম? ইহার দ্বারা বেশ বোধ হইতেছে, তিনি গুণময়ী প্রকৃতির আন্তরিক উপাসক ছিলেন; তিনি বেদান্ত-ভাষ্যের এক স্থলে তাহা স্বীকারও করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবান্ বুদ্ধদেবকে অসম্বন্ধ-প্রলাপী বলিয়াছেন, আবার পাকে প্রকারে বৌদ্ধমত মায়াবাদও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ কপিলের মত খণ্ডন করিয়া, আবার মূল-প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের তুল্যতা প্রখ্যাপিত করিয়া কাপিল ও বেদান্তমতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া গিয়াছেন। পরমাণুবাদ-সম্বলিত বৈশেষিক মত খণ্ডন করিয়া, "ন বিয়ৎ শ্রুতেঃ" সূত্রের ব্যাখ্যায় আকাশভূত নয়—এই বৈশেষিক-মতের বহুমান করিয়াছেন। এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ কথাগুলি লিপিবদ্ধ দেখিয়া স্থূলদর্শিগণ তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ অভিধা দ্বারা তিরস্কৃত করিতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ও উদারচেতাগণ তাঁহার ওরূপ ভাব দেখিয়া ধীরভাবে বিচার করিয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়াই অবধারণ করিবেন। তিনি একটি শাস্ত্রের ভাষ্য লিখিতে বসিয়াছেন। যত দূর সাধ্য, সূত্রকারের মত স্থাপন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য, তাহাতে প্রতিযোগীকে নিন্দা করিতে হয়, অগত্যা তাহাও করিতে হইবে, কিন্তু অবসর পাইলেই তিনি দোষ পরিহার করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে হৃদয় খুলিয়া প্রশংসা করিয়া লইয়াছেন। ইহার দ্বারা তিনি স্বীয় উদার স্বভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে ভাষ্যে স্বাধীন মত বিবৃত হইত। গ্রন্থকারের দোষ-গুণ উভয়ই ভাষ্যকারের ভাষায় প্রকাশিত হইত। শবর স্বামী ও মেধাতিথির ভাষ্যে এই ভাব দৃষ্ট হয়। কুমারিল ভট্ট বার্ত্তিকের সেই গুণ দিয়া ভাষ্যের ব্যাপ্তি সংকুচিত করিয়া যান। ভগবান্ শঙ্কর কুমারিলের মত অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি ভাষ্যে অবান্তর আনুসঙ্গিক কথা বলিলেও গ্রন্থের বিরুদ্ধমত বলিতে সংযত রহিয়াছেন।

মেধাতিথি মনুভাষ্যে কুমারিলের কথার ভাব উল্লিখিত করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সময়ে কুমারিলের তন্ত্রবার্ত্তিক যে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত। বার্ত্তিককার কোথাও কোথাও শব্দের প্রচলিত মূলের বিভিন্নতা দিয়াছেন। তাঁহার মতে রুদ ধাতু রোদন করা। রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া রুদ্রের রুদ্রত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, ইহাই "কুমারিল পক্ষ" বলিয়া

---

* প্রাচীন সাংখ্যদর্শনের প্রমাণত্রয় ও ন্যায়দর্শনের প্রমাণচতুষ্টয় তুলনা করুন। তার পর পরবর্ত্তী কালের ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি ইত্যাদির বিষয়ও চিন্তা করুন। এ সকলগুলিই এক শব্দপ্রমাণের অন্তর্গত কি না, একবার ভাবিয়া দেখুন।

মনুভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। এইরূপে শব্দের একটা ধাতু স্বীকার করিয়া তাহার শিথিল ভিত্তির উপর কাল্পনিক প্রাসাদ নির্ম্মিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে নানারূপ অবিশ্বাস্ত আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছে। আমার বোধ হয়, রুদ্র শব্দ রুদ্ধ ধাতু রোধ করা বা রুদ ধাতু ভীষণ চীৎকার করা হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কারণ, তিনি প্রজাপতির অকর্ম্ম প্রতিরুদ্ধ করিয়া তাহাকে বাণ-বিদ্ধ করিয়াছিলেন। আখেটে ভীষণ চীৎকার দ্বারা পশুগণ প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে; এ কারণেও পশুপতির রুদ্র নাম হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ভাব প্রাচীন তৈত্তিরীয়-সংহিতায় লিখিত দৃষ্ট হয়। এই কারণে রুদ্র দেবসংঘ হইতে পশুপতি উপাধি দ্বারা বিভূষিত হন।

মেধাতিথি অদ্বৈতবাদিগণের বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন,—সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিলে উহা যেমন সমুদ্র হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন, উভয়রূপেই প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ এই বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত্ত।* এ স্থলে স্পষ্টতঃ বিশ্বের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং ইহাই যে প্রাচীন ঋষিসম্মত অদ্বৈতবাদ, তাহার ভুল নাই। অন্ততঃ মেধাতিথির সমসাময়িক অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ বিবর্ত্তই বিশ্বাস করিতেন। মেধাতিথি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্ব-উত্তর-মীমাংসা শারীরক মীমাংসা বলিয়া কথিত হইত। অথচ ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়ের একমত নাই—রাজা রাজকর্ম্মচারীর উত্তম কর্ম্মের জন্য উচ্চ পদ দিতে পারেন, কিন্তু রাজপদ দিতে পারেন না; তদ্রূপ সুকৃতী কর্ম্মানুসারে স্বর্গপদই প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন না। ইহা মীমাংসা-দর্শনের মত। বেদান্তদর্শনের মত সুকৃতী ব্রহ্মই হইয়া যান। এক ব্রহ্ম অখণ্ডভাবে সকল মনুষ্যে কি করিয়া বিরাজ করিতে পারেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের বহুত্ব-দোষ আসিয়া পড়ে, মেধাতিথি এরূপও তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। মনুভাষ্যে এই সকল কথার প্রসঙ্গ থাকায় আমরা দুইটি বিষয় অবগত হইতেছি;—১ম মেধাতিথির সময় বেদান্ত-দর্শনের মত তত আদরণীয় ছিল না, ২য় সুতরাং তখনও বেদান্তদর্শনের শাঙ্কর ভাষ্য লোক-সমাজে প্রচারিত হয় নাই।

মনুভাষ্যের এক স্থলে লিখিত হইয়াছে যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের নির্য্যাতন প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহা কোন্ উৎপীড়নের প্রতি ইঙ্গিত, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না; সম্ভবতঃ সুধন্বা কর্ত্তৃক বৌদ্ধ-নিধনব্যাপার হইতে পারে। এরূপ প্রবাদ এবং উহা শঙ্করবিজয়ে লিপিবদ্ধও আছে যে, কুমারিলের শাস্ত্রবিচারে যে বৌদ্ধগণ পরাজিত হইতেন, সুধন্বা তাঁহাদের প্রাণদণ্ড করিতেন। এরূপ শুনা যায় যে, তিনি হিমালয় হইতে কুমারিকার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে অধ্যুষিত বৌদ্ধ ও তাঁহাদের আশ্রয়দাতা, উভয়ের প্রতিই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন। ইহা কত দূর সত্য কথা, তাহা বলা যায় না। সুধন্বা চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন না; তিনি ক্ষুদ্র রাজাবিশেষ। তাঁহার নিজের রাজ্যমধ্যে তাঁহার এই খামখেয়ালী চলিতে পারে। অন্যত্র

---

* সমুদ্রাদ্‌বায়ুনাভিহতা উর্ম্ময়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তে চ ন ততোঽভিপদ্যন্তে নাপি লিপ্যন্তে সর্ব্বথা ভেদাভেদাভ্যাং অনির্বাচ্যা এবময়ং ব্রহ্মণো বিশ্ববিবর্ত্তঃ।

তাঁহার আজ্ঞা গৃহীত, সমর্থিত ও প্রতিপালিত হইবার সম্ভাবনা অল্পই ছিল। ভারতের উত্তরাংশও বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মভূমি। তথায় কোন রাজাই প্রকাশ্যভাবে বৌদ্ধ-নির্য্যাতন করেন নাই। শশাঙ্ক তাহার সূত্রপাত করিতে গিয়া এ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হন। তাঁহার অন্তিম জীবন সম্ভবতঃ কলিঙ্গদেশে অতিবাহিত হয়। তার পর ভারতের রাজগণ প্রজার উপর অত্যাচার করা শ্রেয়ঃকল্প মনে করিতেন না। যে তাহা করিতে গিয়াছে, সে নিজেই শাসিত হইয়াছে। সগর রাজা নিজ পুত্র অসমঞ্জসকে প্রজার অভিযোগে নির্ব্বাসিত করেন। নহুষ ব্রাহ্মণের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করায় স্বর্গভ্রষ্ট হন। বেণ রাজা অবিনয় ও কুকর্ম্মের জন্য নিহত হন। উদ্ধত নন্দ চাণক্যের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। নিরীহ ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করায় উজ্জয়িনীপতি পালক শর্ব্বিলকের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

আমার বোধ হয়, ভগবান্ শঙ্কর ও কুমারিল সুধন্বার একদেশবাসী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ-নির্য্যাতন দেখিয়া মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন। তাই ঘৃণা ও ক্ষোভে স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশবাসী হওয়া মনস্থ করেন এবং বৌদ্ধগণ ও বৌদ্ধধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। তিনি তাঁহার ভাষ্যে রাজ্যবর্ম্মন ও পূর্ণবর্ম্মনের নাম উল্লিখিত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা তাঁহাদের গুণ ও নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যবর্ম্মন ও পূর্ণবর্ম্মার শিষ্টতার কথা ছান্দোগ্য-ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। বেদান্তদর্শন-ভাষ্যে অসম্ভব বস্তুর অনস্তিত্বের উল্লেখকালে পূর্ণবর্ম্মা রাজার নাম করা হইয়াছে। এই পূর্ণবর্ম্মা মগধদেশের রাজা ছিলেন। শশাঙ্ক বোধিদ্রুম দগ্ধ করিলে ইনিই দুগ্ধসিঞ্চন দ্বারা তাহা পুনঃ সঞ্জীবিত করেন এবং ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে রক্ষার্থে বৃহৎ প্রস্তর-প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত করিয়া দেন। সম্ভবতঃ ইনিই শশাঙ্ককে বঙ্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ইনি থানেশ্বর ও কান্যকুব্জাধিপতি বিখ্যাত সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। হর্ষচরিত পাঠে জানা যায়, শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত হত্যা করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের ধার্ম্মিকতা বহুরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই রাজ্যবর্দ্ধনই শঙ্করের ভাষ্যে রাজ্যবর্ম্মনরূপে উক্ত হইয়াছেন। কারণ, পূর্ণবর্ম্মার সহিত ইহাঁরই সহযোগিতা হওয়া সম্ভব।

প্রাচীন ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের একটি বিশেষ প্রথা এই ছিল যে, তাঁহারা সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের উপমা বিশদ করিয়া দিতেন। সুতরাং শঙ্কর যে রাজ্যবর্দ্ধন ও পূর্ণবর্ম্মার সমসাময়িক ছিলেন, তাহা একরূপ নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার "ভামতী"তে তাঁহার সমসাময়িক নৃপতি নৃগের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন। ছান্দোগ্য-ভাষ্যে শঙ্কর ইহাঁদের উভয়ের একযোগে নাম করিয়াছেন। সুতরাং তাহার রচনাকালে রাজ্যবর্দ্ধন জীবিত ছিলেন, ইহা নিশ্চিত। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন। রাজ্যবর্দ্ধন তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে রাজা হন। তাহা হইলে বেশ বোধ হইতেছে যে, ছান্দোগ্য-ভাষ্য ৬০৪ ও ৬০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। রাজা পূর্ণবর্ম্মার পূর্ব্বে কোন

বন্ধ্যাপুত্র রাজা হন নাই, বেদান্তভাষ্যে পূর্ণবর্ম্মার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ত্তমান ক্রিয়াবোধক উক্তি আছে; সুতরাং বোধ হয়, উক্ত ভাষ্য তাঁহার রাজ্যকালে রচিত হয়। তখন হয় ত রাজ্যবর্দ্ধন মৃত হইয়াছেন। পূর্ণবর্ম্মা সম্ভবতঃ বৌদ্ধ নৃপতি ছিলেন, রাজ্যবর্দ্ধনও সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসবান্ ছিলেন। এত হিন্দু রাজা থাকিতে শঙ্কর ভাষ্যগ্রন্থে এই দুই নৃপতির প্রশংসার কেন উল্লেখ করেন? ইহা সমস্যা নহে, ইহাতে রহস্য আছে। পদ্মপুরাণকার সাত পাঁচ ভাবিয়া শঙ্করকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলিতে পারেন, কিন্তু আমাদের মনে এ সম্বন্ধে অন্যরূপ ধারণা আছে। সজ্জন ব্যক্তি নিরীহ ব্যক্তির নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার সাধ্য থাকিলে তিনি তাহার প্রতীকার করিবার চেষ্টা পান। শঙ্কর ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী ছিলেন; সুতরাং কাহারও বিরোধ, বিশেষতঃ পরাক্রমশালী রাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তিনি শ্রেয়ঃকল্প মনে করিলেন না। ব্রাহ্মণের প্রধান অস্ত্র, শস্ত্র নহে—শাস্ত্র। এই শাস্ত্র-ব্যাখ্যার দ্বারাই তিনি অতিবড় প্রবল শত্রুকেও করায়ত্ত করিতে পারেন। নিজ দেশ বৌদ্ধদ্বেষিগণ দ্বারা আকীর্ণ। তথায় তাঁহার উপদেশ শ্রুত হইবে না, রাজাও তাঁহার সহায় হইবেন না, এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া শঙ্কর ভারতের উত্তরাখণ্ডে আসিয়া বাস করেন এবং পূর্ণবর্ম্মা রাজার স্নিগ্ধ ছায়ায় অবস্থিতি করিয়া স্বীয় তপ্ত হৃদয় শীতল করিলেন আর জগজ্জনকে গৌণভাবে ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তিমান্ ও বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাবান্ হইতে শিক্ষা দিলেন।

উত্তরাখণ্ড কখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিত না। সুতরাং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অন্য মতের ন্যায় শঙ্করের মায়াবাদও এ অঞ্চলে নির্ব্বিবাদে ও নীরবে গৃহীত হইল। কিন্তু দক্ষিণদেশে ইহা লইয়া মহা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। কেহ শঙ্করের পক্ষ লইল, কেহ তাঁহার বিপক্ষ হইল; পুরাণগুলি তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। এক ব্রহ্মপুরাণ ব্যতিরেকে যাবতীয় পুরাণগুলিতে শঙ্করের মায়াবাদ আলোচিত এবং কোথাও সমর্থিত ও কোথাও তিরস্কৃত হইয়াছে। শঙ্করের উদার হৃদয়ের চেষ্টায় ভগবান্ বুদ্ধদেব বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন—মহাভারতের শেষ সংস্করণ সময়ে তিনি সেরূপ বিবেচিত হইতেন না।

মেধাতিথি অদ্বৈত ও বেদান্ত-দর্শনের যেরূপ ভাব দিয়াছেন, তাহা মায়াবাদ নহে। সুতরাং তাহা শঙ্করের কথিত মতের বিরোধী। অতএব তিনি যে শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি মনুভাষ্যে ও বাণভট্ট হর্ষচরিতে অন্তঃপুরবাসিনী মহিষীগণের কুচেষ্টার যেরূপ উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, উভয়েই সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত করিতেছেন। উভয়েই ভ্রাতা কর্ত্তৃক আবন্ত্য বা অবন্তী-অধিপতির নিধনের কথা লিখিয়াছেন। এই অবন্তীরাজের বন্ধু শশাঙ্ক হর্ষ-ভগিনী রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্ম্মাকে নিধন করেন, ইহা হর্ষচরিতে লিখিত আছে। গ্রহবর্ম্মার হত্যার প্রতিশোধ লইতে গিয়া রাজ্যবর্দ্ধন হত হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার আভাস মনুভাষ্যে আছে, অতএব উহা যে ৬০৪ ও ৬০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রচিত হয়, তাহা বেশ জানা যাইতেছে। হর্ষ অভিষেকের ৬ বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

ইহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি হর্ষচরিতে লিপিবদ্ধ নাই। সম্ভবতঃ হিন্দু বাণভট্ট ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া হর্ষের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন এবং শেষ জীবন উজ্জয়িনীরাজের আশ্রয়ে অতিবাহিত করেন।—সুতরাং হর্ষচরিতের রচনাকাল ৬০৬ ও ৬১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময় ধরা যাইতে পারে। বাণ বৈশ্যকুমার ব্রাহ্মণ রসায়নকে অষ্টাদশবর্ষদেশীয় অর্থাৎ আঠার বৎসরের নিকটবর্ত্তী বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিজ বয়ঃক্রম ও আভাসে তাহাই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করেরও ভাষ্যাদি রচনাকালে ঐরূপ অল্প বয়সের কথা লিখিত হইয়াছে। মেধাতিথি তাঁহার প্রতিযোগী উপাধ্যায়ের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রয়োগ করায়, বোধ হয়, ভাষ্য-রচনাকালে তাঁহারও বয়ঃক্রম অল্প ছিল—সম্ভবতঃ তখনও তিনি প্রথম যৌবন অতিক্রম করেন নাই। এই সময়েই অসহিষ্ণু মনুষ্যের শক্রর প্রতি বক্রোক্তি অধিক স্ফুরিত দৃষ্ট হয়। তিনি ভাষ্যের পূর্ব্বে স্মৃতিবিবেক নামে একখানি স্মৃতিনিবন্ধও রচনা করেন; তাহার প্রতিও ভাষ্যে ইঙ্গিত আছে। এইরূপে শঙ্কর, বাণ ও মেধাতিথির গ্রন্থাবলী তুলনা করিলে তাঁহাদের জন্মসময় ও সমসাময়িক ঘটনার বিষয় নিশ্চিতরূপে অবধারিত হইতে পারে। শঙ্কর বাণের জন্মসময় অনুমান ৫৮৫ খৃষ্টাব্দ এবং মেধাতিথির ৫৮০ ও ৫৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময় নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়।

মেধাতিথির ভাষ্যদ্বারা তাৎকালিক অনেক ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। যেমন নামকরণ-স্থলে ভবভূতি শব্দের উল্লেখ। ব্রাহ্মণের নামের অন্তে মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের বল বা রক্ষা-বাচক, বৈশ্যের ধনবাচক ও শূদ্রের দাসবাচক শব্দ প্রযুক্ত হওয়া উচিত। এরূপ নির্দ্দেশ অনুসারে ভবভূতি শব্দ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নাম বলিয়া নিশ্চিত হইতে পারে, অথচ ব্রাহ্মণের অন্ত উদাহরণের সহিত ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা বেশ বোধ হইতেছে যে, ভাষ্য-রচনাকালে ভবভূতি উদীয়মান নাটককার বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন। তিনি মহাকালের উৎসবযাত্রা উপলক্ষে উজ্জয়িনীতে আসিয়া তাঁহার বীরচরিত অভিনয় করেন। মেধাতিথি মালববাসী ছিলেন; তিনি সম্ভবতঃ তাহা দেখিয়া প্রীত হন, তাই ভবভূতির বহুমান করিয়া ব্রাহ্মণনামের উদাহরণের সহিত তাঁহারও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ভবভূতিও শঙ্কর, বাণ ও মেধাতিথির সমসাময়িক কবি—তিনি যশোবর্ম্মা রাজার সভাসদ বা সমকালীন নহেন; উহা রাজতরঙ্গিণীকারের ভ্রম—সেই ভ্রমে গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় আধুনিক ঐতিহাসিকগণ পতিত হইয়াছেন। তাহা হইলে ভবভূতির বীর-চরিত বোধ হয়, ৬০৪-৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, ভবভূতি কুমারিলের শিষ্য ছিলেন। মালতীমাধবের একখানি আধুনিক সংস্করণের অঙ্কশেষে এই ভাবের কথা আছে। কুমারিলের কথা মনুভাষ্যে আছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং তিনিও শঙ্কর প্রভৃতির সমকালীন ব্যক্তি, তবে তিনি শঙ্কর অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। এ সম্বন্ধে জীবনীগুলিতে অনুরূপ কথা আছে।

শঙ্কর পূর্ণবর্ম্মা রাজার উল্লেখ করায় এবং শ্রুঘ্ন পাটলীপুত্র জনপদের উপমা দেওয়ায় স্বর্গীয় কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং মহোদয় তাঁহাকে উত্তরাখণ্ডবাসী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি প্রায় অধিকাংশ স্থলে অকাট্য দেখা যায়, কিন্তু এ স্থলে তাঁহার সিদ্ধান্তে একটু দোষ স্পর্শ করিয়াছে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয়। যেহেতু ভগবান্ শঙ্কর সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে যত জীবনী ও আখ্যায়িকা আছে, দাক্ষিণাত্যের সহিত তাঁহার স্মৃতি যেরূপ বিজড়িত এবং তাঁহার ধর্ম্মমত যেরূপ তীব্রভাবে আলোচিত হইয়াছে, উত্তরাখণ্ডে তাহার কিছুই নাই—তিনি এ দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বুদ্ধদেবের ন্যায় পূজিত হইতেন এবং তাঁহার ধর্ম্মমতগুলি গুরুবাক্যের ন্যায় বিনা পরীক্ষায় সমর্থিত ও সম্মানিত হইত। কারণ, উত্তরাখণ্ড-বাসিগণ কোন কালে ধর্ম্মমতের প্রতি বিদ্রূপ করিতে শিক্ষা করেন নাই। এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের পার্শ্বে সনাতন ধর্ম্ম নির্ব্বিবাদে আবহমান কাল হইতে বসবাস করিতেছে। বৌদ্ধ নৃপতিগণ শ্রমণের সহিত ব্রাহ্মণপূজার দৃষ্টান্ত পদে পদে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অতএব এই গৌণ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ভগবান্ শঙ্কর দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন—তিনি মর্ম্মপীড়িত হইয়া নিজ দেশাধিপতির প্রতি আন্তরিক ঘৃণায় দেশত্যাগী হন এবং মগধে সজ্জন বৌদ্ধ নৃপতি পূর্ণবর্ম্মার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি শাস্ত্রে বৌদ্ধ ভাবের অংশ প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের গৌণভাবে উপকার করিয়া গিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি গ্রন্থপ্রচারকল্পে পূর্ণবর্ম্মার আনুকূল্য লাভ করেন। সুতরাং প্রমাণিত হইল, ভগবান্ শঙ্কর বৌদ্ধদলনকারী ছিলেন না। পরন্তু তিনি তাঁহাদের মায়াবাদ-মতের সমর্থক হইয়া তাঁহাদের উপকারক ও পক্ষাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার নামে অন্যরূপ কলঙ্কারোপ করা যে স্বার্থপরগণের কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গৌড়পাদের সময় নিরূপণ ও তাঁহার অদ্বৈতমতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। চরিতলেখকগণের মতে শঙ্করের সন্ন্যাস-দীক্ষাকালে তাঁহার গুরু গোবিন্দযতির ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তিনি ৯ কি ১২ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় দীক্ষিত হন। তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, গোবিন্দযতি অনুমান ৫২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়পাদের তাঁহা অপেক্ষা ৫০ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠতা ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে গৌড়পাদ যে অনুমান ৪৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

গৌড়পাদ সাংখ্যকারিকার ভাষ্য লেখেন। তাহাতে লিখিত আছে, পুরুষ বদ্ধ হন না—বন্ধন তাঁহাতে উপচারমাত্র। প্রকৃতিই পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য বদ্ধা হন, সুতরাং মনুষ্যের দেহপরিগ্রহ প্রকৃতির কার্য্য। সাধনার দ্বারা পুরুষ প্রকৃতিকে জ্ঞাত হইলে তাঁহার প্রকৃতি-স্পৃহার নিবৃত্তি হয়। তখন তিনি নিরপেক্ষভাবে প্রকৃতিকে অবলোকন করেন এবং প্রকৃতিও সতী স্ত্রীর ন্যায় পুরুষকর্তৃক দৃষ্টা হইয়াছি জানিয়া আর তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হন না—ইহারই নাম প্রকৃতিলয়—ইহাই হইল সাংখ্যমতে পুরুষের মোক্ষ। গৌড়পাদ কিন্তু মাণ্ডুক্যকারিকাতে বলিয়াছেন যে, পুরুষ মুমুক্ষুও হন না, মুক্তও হন না; তাঁহার দেহবদ্ধ ভাব বা জন্মও নাই, তিনি সাধকও নহেন।* এ স্থলে তিনি সাংখ্যকারিকার বিরোধ উক্তি করিয়াছেন,

* ন নিরোধো ন চোৎপত্তিঃ ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥

তিনি প্রাচীন উপনিষদেরও বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উহাতে ব্রহ্মলাভার্থে সাধনার উপদেশ আছে; সুতরাং শরীরাধিষ্ঠিত জীব সাধক হইলেন।* ভগবান্ গীতাতেও সাধনারূপ কর্ম্মের প্রসঙ্গ কর্ম্মযোগে বিবৃত করিয়াছেন।

গৌড়পাদ জীবাত্মা পরমাত্মাকে অখণ্ড বলেন। ইহাও তাঁহার ভ্রম। ইহাও প্রাচীন উপনিষদ্‌বিরুদ্ধ মত। তথায় পরমাত্মা ও জীবাত্মা অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে এবং সমুদ্র ও প্রবাহিতা নদীরূপে তুলিত হইয়াছেন।† গৌড়পাদের মতে মায়াপ্রভাবে এরূপ ভিন্নজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যদি উভয়ের ভিন্নতা স্বীকার করা হয়, তবে ব্রহ্মের জন্মও স্বীকার করিতে হয়‡। গৌড়পাদের এ যুক্তি আকিঞ্চিৎকর। কারণ, প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম-মৃত্যু, স্বভাব-চরিত্র, চিন্তা-কার্য্য ও গুণত্রয়ের সমাবেশের বিভিন্নতারূপ সাংখ্যমত তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইতেছে। মনুষ্যমাত্র কোন বিষয়ে পরস্পরে ঐকমত্য হয় না; সুতরাং সকলের জীবাত্মা বিভিন্ন। তবে সকল জীবাত্মাই যে পরমাত্মার অংশ, এই প্রাচীন উপনিষদ্‌মতও মানিতে হয়। কারণ, সকল জীবের মোক্ষপ্রাপ্তিস্থল ব্রহ্ম।

গৌড়পাদ জগৎকে মায়া বা কুহক বলিয়াছেন—ইহাও সাংখ্যমত ও উপনিষদ্‌মতের বিরুদ্ধ উক্তি। তাঁহার মতে ইহা রজ্জুতে সর্পজ্ঞানরূপ এবং স্বপ্নে গন্ধর্ব্বনগর দর্শনস্বরূপ।¶ জগৎ সম্বন্ধে এ ভাব খাটে না; কারণ, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও গণিতজ্যোতিষ মিথ্যা হইয়া যায়। যাহা হউক, ইহা গৌড়পাদের স্বাধীন চিন্তা; সুতরাং তাহাতে ভ্রম থাকিলেও আমরা উহা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি।

---

* কঠ উপ, ৩য় বল্লী—

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।—(২য় মুণ্ড, ২য় খণ্ড ৪)
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।—(কঠ, ৩য় বল্লী)
যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্‌বিস্ফুলিঙ্গা সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধা সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যান্তি।—(২য় মুণ্ড)
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানা সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।—(৩য় মুণ্ড, ২য় খণ্ড)
জীবাত্মনোরনন্যত্বমভেদেন প্রশস্যতে।
নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেব হি সমঞ্জসম্॥
মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতৎ ন তথাজং কথঞ্চন।
তত্ত্বতো ভিদ্যমানো হি মর্ত্ততামমৃতং ব্রজেৎ॥
নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে।
রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্মবিনিশ্চয়ঃ॥
স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥

মেধাতিথি তাঁহার মনুভাষ্যে বিন্ধ্যগিরিনিবাসী সাংখ্যগণের মতের ভাব দিয়াছেন—তাহা অনেকটা মহাভারত-কথিত সাংখ্য-মতের ন্যায়। তাঁহারা তাঁহাদের মত ব্রহ্মপুরাণে প্রথম বিবৃত করিয়া যান, তাহাই বিষ্ণু আদি পুরাণে অনুসৃত হয়। বোধ করি, গৌড়পাদও সাংখ্য-মতাবলম্বী ও বিন্ধ্যবাসী ছিলেন, নতুবা তিনি সাংখ্যকারিকার ভাষ্য লিখিতে যাইবেন কেন? কারণ, সমতন্ত্রী না হইলে পূর্ব্বতনগণের মধ্যে কাহারও পঠন-পাঠন ও ব্যাখ্যায় অধিকার ঘটিত না। গৌড়পাদ ও শঙ্কর সাংখ্যগণের ন্যায় নির্ম্মলচরিত্র ছিলেন—তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মের উপাসনা করা না করায় কোন অনিষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থীর মনে নিষ্কর্ম্ম-ভাব বদ্ধমূল করায় সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ইহার পরিণাম যে বিষময়, যোগবাশিষ্ঠের চূড়ালার উপাখ্যান তাহার দৃষ্টান্ত। মূর্খের নিকট এইরূপ শিক্ষা কুশিক্ষায় পরিণত হইয়াছে—তাহার ফলেই অবারিত ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত দৃষ্ট হয়। ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও আমাদের অধিকাংশ তন্ত্রে এই কুশিক্ষার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান।

অনেক জন্মের সাধনার ফলে মনুষ্য সৎস্বভাব অথবা গীতাপ্রোক্ত দৈবী প্রকৃতি লাভ করে এবং তাহাই তাহাকে অচিরে ব্রহ্মলাভে সমর্থ করে। কঠোপনিষদে ইহাকে আত্মার আনুকূল্য বলা হইয়াছে। গীতায় ভগবান্ ইহাকে বাসুদেবে পরা ভক্তি বলিয়াছেন। ভগবান্ বুদ্ধদেব ইহা লাভ করেন। তিনি সাধারণের শিক্ষক, তাই তিনি তাহা মুখে ব্যক্ত করেন নাই ; কারণ, অজ্ঞ ব্যক্তি সে কথা বুঝিতে পারিবে না। গৌড়পাদ ও শঙ্করও তাহাই বুঝিয়াছিলেন। গৌড়পাদ শুষ্ক জ্ঞানের বর্ণনদ্বারা সাধারণের মন হরণ করিতে পারিলেন না, শঙ্কর তাহাই সগুণ ছাঁচে ফেলিয়া দেবস্তোত্রাকারে প্রকাশ করিয়া লোকের চিত্তাকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যদেব ইহার মর্ম্ম বুঝিয়া যেরূপ মত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাৎকালিক বঙ্গসমাজ উদ্বেলিত হইয়াছিল। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত তাহাই নম্রতা ও দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ ভক্তিগর্ভ দ্বৈত-অদ্বৈতভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার—"চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি" দ্বৈতমত। জীবহিংসা ভাল নহে, তাহাতে ভক্তির লেশমাত্র প্রকাশ হয় না। "ছাগ মেষ মহিষ আদি কাজ কি রে তোর বলিদানে"।

তিনি ইহার দ্বারা সাংখ্যমত অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালের গানে দ্বৈত, অদ্বৈত, সাংখ্য—তিন মতই উক্ত হইয়াছে। "বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ", ইহা দ্বৈতগর্ভ অদ্বৈতবাদ, কি গৌড়পাদের জ্ঞানগর্ভ শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ, তাহা ঠিক বোঝা যায় না। সম্ভবতঃ উহা দ্বৈতগর্ভ অদ্বৈতবাদ ; কারণ, তিনি পরেই বলিতেছেন,—

"যা ছিলি তাই তাই হবি রে নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হলে সে মিশায় জলে॥"

এ স্থলে জলের বিম্বের অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় উহা দ্বৈতগর্ভ অদ্বৈতবাদ হইতেছে এবং ইহাই প্রাচীন উপনিষদের মত। গৌড়পাদ ঘটাকাশ স্বীকার করিয়াও ঘটের অস্তিত্বের প্রতি উপেক্ষা করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার মত দোষশূন্য নহে। এখানে প্রসাদের সূক্ষ্মদর্শিতা ও

ভক্তিগর্ভ অদ্বৈতবাদের নিকট গৌড়পাদের জ্ঞানগর্ভ শুষ্ক অদ্বৈতবাদ নিষ্প্রভ—উহার নিকট ইহাঁকে নিশ্চয় পরাজয় স্বীকার করিতে হইতেছে।

আমার শাস্ত্রগুরু পূজ্যপাদ স্বর্গীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার "শঙ্কর ও শাক্যমুনি" নামক গ্রন্থে শঙ্করের মায়াবাদকে বৌদ্ধমত বলিয়া অস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন এবং পদ্মপুরাণে শঙ্করের নাম ও মায়াবাদের নিন্দার উল্লেখে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি পণ্ডিত; তাঁহার হৃদয়, মন ও মুখে পরস্পরের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইলেও তিনি লোক-সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংযতমুখ হইয়াছেন।

পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "ষড়্‌দর্শন" গ্রন্থে শাস্ত্রসম্বন্ধে স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিতে গুরু জনের অভিসম্পাতের আশঙ্কা করিয়াছেন। বর্ত্তমান লেখক একজন ক্ষুদ্রবুদ্ধি, তাহার অন্তরাত্মা শাস্ত্রপাঠে যাহা সত্য বলিয়া অবধারিত করিয়াছে, তাহাতে মনও সায় দিয়াছে, তাই তাহা স্বতঃ মুখ হইতে স্ফুরিত হইয়াছে। আমি গুরুজনের পাদপদ্মে আত্মমত নিবেদনমাত্র করিয়াছি। তাঁহারা উহা গ্রহণ করিতে পারেন, নাও পারেন; সুতরাং আমার তাঁহাদের অভিসম্পাতের আশঙ্কা অতি অল্প। আমি যাঁহার ভক্ত, তিনি আমাকে অকারণ অভিশাপ হইতে সতত রক্ষা করিতেছেন। তিনিই তাঁহাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমার কথার ধীর বিচারে প্রবৃত্ত করিবেন এবং অবশেষে আমার মতের পক্ষপাতী করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদভাজন করাইবেন। ইহা আজ না হউক, এক দিন হইবেই হইবে।

অকিঞ্চনের স্বভাব, যে গ্রন্থ পাঠ করে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া, অগ্রপশ্চাৎ তুলনা করিয়া, ভাষা, ভাব, রীতির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া পাঠ করে। এই কারণে আমি ঈশ্বরকৃপায় অচিরে সত্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই, এই কারণে আমি মহাভারতে চারিটি সংস্করণ দেখিতে পাইয়াছি, ভগবদ্গীতার তিনজন লেখক অবধারণ করিতে পারিয়াছি; ভারতে তিন জন কালিদাসের অস্তিত্ব নিরূপিত করিয়াছি। প্রথম কালিদাস খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে অথবা প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার যৌবন-রচনা মেঘদূত ও কুমার-সম্ভব, প্রৌঢ়-রচনা রঘুবংশ; তাঁহার যৌবন-রচনা বিক্রমোর্ব্বশী, তাঁহার প্রৌঢ়-রচনা শকুন্তলা। দ্বিতীয় কালিদাস হর্ষবর্দ্ধনের পরে প্রাদুর্ভূত। মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার ও শ্রুতবোধ ইহাঁরই রচনা। উদ্ভট শ্লোকে কালিদাস ও ভবভূতির প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা যে প্রচলিত, তাহা সম্ভবতঃ ইহাঁকেই লক্ষ্য করিয়া—কারণ, ভবভূতি ঐ সময়েরই লোক। তৃতীয় কালিদাস জনৈক প্রবঞ্চক; "জ্যোতির্বিদা-ভরণ" ও "নলোদয়" তাঁহার রচনা বলিয়া বোধ হয়। এইগুলিতে হেমচন্দ্র সূরির অভিধান-চিন্তামণির শব্দরাশির আদ্যশ্রাদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং এই কালিদাস হেমচন্দ্রের বহু পরবর্ত্তী কালের লোক। ইনি দাক্ষিণাত্যের মাথুর ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

এইরূপে আমি অনেক শঙ্করের অনুসন্ধান পাইয়াছি। আমার মতে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্কর দাক্ষিণাত্যের লোক। স্বর্গীয় তেলাং মহোদয় তাঁহাকে গৌড়ীয় বলিয়াছেন। ভট্টোৎপল বৃহজ্জাতকের টীকায় জনৈক গণিতজ্ঞ ভট্ট শঙ্করের উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গদেশেও অনেক-

গুলি শঙ্করের নাম শ্রুত হওয়া যায়। একজন সত্যপীরের পাঁচালী-রচয়িতাও আছেন। "নিরালম্বো লম্বোদর-জননি কং যামি শরণং" এই ভণিতাযুক্ত স্তোত্র শঙ্করাচার্য্য-রচিত বলিয়া প্রচারিত। ইনি সম্ভবতঃ বঙ্গদেশবাসী এবং আধুনিক ব্যক্তি। ইঁহার প্রাদুর্ভাবকাল ১৫০—২০০ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। ইহার ভাষা, ভাব ও রীতির সহিত অন্নপূর্ণাস্তোত্র ও অপরাধক্ষমা স্তোত্রের ভাষা, ভাব ও রীতির বিস্তর প্রভেদ। এ দুইটিতে হিন্দুস্থানী ভাবের সম্পূর্ণ আঘ্রাণ পাওয়া যায়। একজন জ্ঞান, বৈরাগ্য ও মোক্ষের অভিলাষী, অন্য জন মোক্ষাভিলাষী নহেন। ভাষ্যকার শঙ্কর জ্ঞানমার্গের পথিক; সুতরাং অন্নপূর্ণা ও অপরাধক্ষমাস্তোত্র তাঁহার রচনা বলিয়া বোধ হইতেছে। এগুলিতেও ভাষ্যের প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদ-গুণ বর্ত্তমান।

যিনি বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে মোটেই কষ্ট হয় না—ভাষা তাঁহার নিকট ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় নৃত্য করে;—শূদ্রক, কালিদাস, ভবভূতি, বাণ, মেধাতিথি ও শঙ্করের রচনায় এই ভাব প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। ভাল লেখকের অনেকেই অনুকরণ করিতে যায়; কিন্তু দৈব অনুকূল না হইলে অনুকরণ ফলবান্ হয় না। এই কারণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনুকারিগণের রচনায় সজীবতা নাই। ঘটকর্পরের যমক সরস ও হৃদয়ানন্দকর; প্রত্যুত প্রতিদ্বন্দ্বী কালিদাসের নলোদয় নীরস ও বিরক্তিকর। কালীভক্ত রামপ্রসাদের প্রসাদ ভণিতাযুক্ত কবিতাগুলি কি মধুর ও হৃদয়স্পর্শক—ভাব ও ভাষা অনুগতা পরিচারিকার মত আজ্ঞাকারিণী হইয়াছে; কিন্তু দ্বিজ রামপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ ঠাকুরের রচনায় যেমন শব্দ-যোজনার অসঙ্গতি দেখা যায়, তেমনি ভাবের মস্তকেও লগুড়াঘাত পড়িয়াছে। এইগুলি হৃদয়ে রাখিয়া সুধীসমাজ আমার প্রবন্ধের বিচার করুন, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

লখ্‌নৌ সহরের নামের উৎপত্তি*

লখ্‌নৌ কত দিনের সহর এ সম্বন্ধে লখ্‌নৌ অঞ্চলে প্রবাদ আছে—অযোধ্যাধিপতি রঘুকুল-তিলক শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণ এই লখ্‌নৌ সহর প্রতিষ্ঠা করেন। (Vide Imperial Gazetteer, (1908), Vol. XVI. p. 182)। এরূপ প্রবাদও আছে—রামচন্দ্র ঘর্ঘরা পর্য্যন্ত এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড লক্ষ্মণকে জায়গীর দিয়াছিলেন। সেই ভূখণ্ডমধ্যে লক্ষ্মণ লছমনপুর গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান মচ্ছিভবন কেল্লার মধ্যে যে লছমনটিলা নামে উচ্চ ভূখণ্ড পড়িয়া আছে, এই স্থানেই সুপ্রাচীন লছমনপুর অবস্থিত ছিল। (Gazetteer of the Province of Oudh, 1877, Vol. II. p. 364)।

এই প্রবাদের মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের প্রসঙ্গ থাকিলেও রামচন্দ্রের এরূপ ভূমিদানের কথা নাই। বিশেষতঃ ভাষাতত্ত্ব-বিচারে লক্ষ্মণপুর বা লছ্‌মন্‌পুর নাম হইতে 'লখ্‌নউ' শব্দের নামোৎপত্তি হইতে পারে না। লক্ষ্মণপুর বা লছমন্‌পুর নামই এখনও পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিত। তবে মচ্ছিভবনের মধ্যবর্ত্তী 'লক্ষ্মণটিলা' নাম হইতে মনে হয় যে, এ অঞ্চলে কোন এক সময়ে লক্ষ্মণ নামে এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন, লক্ষ্মণটিলার নিকট তাঁহার রাজভবন থাকারই সম্ভাবনা। এই স্থান উপযুক্তরূপে খনন করিলে সম্ভবতঃ সেই প্রাচীন নিদর্শন বাহির হইতে পারে। লখ্‌নৌ নগরীর সহিত যে তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

আমার মনে হয়, উক্ত লক্ষ্মণ নৃপতির নামানুসারে এই নগরী এক সময়ে লক্ষ্মণাবতী নামে পরিচিত ছিল। লক্ষ্মণাবতীর অপভ্রংশে প্রথমে লখ্‌নৌতী এবং অবশেষে লখ্‌নৌ নামে খ্যাত হইয়াছে। সুতরাং লখ্‌নৌর আদি পরিচয় বাহির করিতে হইলে, এই স্থানের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মণ নৃপের সন্ধান ও সেই সঙ্গে লক্ষ্মণাবতীর প্রসঙ্গও বাহির করিতে হইবে।

লখ্‌নৌ যাদুঘরে পরমমাহেশ্বর শ্রীমহারাজ লক্ষ্মণের একখানি তাম্রশাসন রক্ষিত আছে। এই তাম্রপট্টে লিখিত আছে,—

"ওঁ স্বস্তি জয়পুরাৎ পরমমাহেশ্বরঃ শ্রীমহারাজলক্ষ্মণঃ কুশলী ফেলাপর্ব্বতিকাগ্রামে ব্রাহ্মণা-দীন্ প্রতিবাসিকুটুম্বিনঃ সমাজ্ঞাপয়তি বিদিতং বোস্তু যথৈষ গ্রামো ময়া মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে কৌৎসসগোত্রায় বাজসনেয়িসব্রহ্মচারিণে মাধ্যন্দিনায় ব্রাহ্মণরেবতিস্বামিনেগ্রা-হারোতিসৃষ্ট" ইত্যাদি।

এই শাসনাংশ হইতে মনে হয়, পরমমাহেশ্বর মহারাজ লক্ষ্মণ জয়পুরে অবস্থানকালে

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

রেবতিস্বামী নামক এক ব্রহ্মচারীকে ফেলাপর্ব্বতিকা নামক গ্রামে অগ্রহার উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই তাম্রপট্টের সর্ব্বশেষে "দূতকশ্চাত্র শ্রীমহারাজনরবাহনদত্তঃ সংবৎসরশতেষ্টপঞ্চাশদুত্তরে জ্যৈষ্ঠমাসে পৌর্ণমাস্যাং লিখিতং বলদেবেনেতি ১৫৮।" এই অংশ হইতে বুঝা যায়, ১৫৮ অনির্দ্দিষ্ট সংবতে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় উক্ত তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল। তাম্রপট্টের লিপিগুলি দেখিলে উহা খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীর অক্ষর বলিয়া মনে হইবে। এ অবস্থায় ১৫৮ সংবৎ অঙ্ককে গুপ্তসংবৎ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে ৪৭৭-৮ খৃষ্টাব্দে আমরা মহারাজ লক্ষ্মণকে পাইতেছি। মহারাজ লক্ষ্মণ একজন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই। কারণ, নরবাহন দত্ত নামক একজন মহারাজ তাঁহার শাসনপত্রের দূতক হইতেছেন।

মহারাজ লক্ষ্মণের উক্ত তাম্রপট্টখানি বর্ত্তমান আলাহাবাদ জিলার অন্তর্গত বর্ত্তমান কোসাম্ নামক স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী পালী নামক গ্রামে এক স্বর্ণকারের গৃহে ভূগর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছে ও পরে লখ্‌নৌ যাদুঘরে রাখা হইয়াছে। ডাক্তার ফুহরের (Dr Fuhrer) ঐ পালী গ্রামকেই তাম্রশাসনোক্ত "ফেলাপর্ব্বতিকা" বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়পুরের অবস্থান নির্ণয় করিতে পারেন নাই।*

তাম্রশাসন এই স্থানে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান পালী গ্রামকে ফেলাপর্ব্বতিকা বলিতে আমরা কিন্তু প্রস্তুত নহি। এক স্থানের তাম্রশাসন অনায়াসেই বহু দূরদেশে নীত হইতে পারে। যেমন কামরূপপতি বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন বেনারস জেলার অন্তর্গত কুমৌলী গ্রামে পাওয়া গিয়াছে, অথচ যেমন কুমৌলী গ্রামের সহিত বৈদ্যদেবের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া কখন কেহ স্বীকার করিবেন না। দূর আসাম হইতে কাশীবাস উপলক্ষে কোন ব্যক্তি বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন আনিয়া থাকিবেন, সেইরূপ কোন ব্যক্তি ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন নগরী কোশাম্ব নামক স্থানে আগমন উপলক্ষে মহারাজ লক্ষ্মণের প্রাচীন শাসন-পত্রখানিও সঙ্গে আনিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ ফেলাপর্ব্বতিকার বর্ত্তমান নাম পালী না হইয়া অপভ্রংশে "ফেলা পাহাড়ীয়া" বা "ভেলা পাহাড়ী" হওয়াই সঙ্গত।

তাম্রপট্টে প্রথমেই যেরূপ "জয়পুরাৎ" লিখিত হইয়াছে, অধিকাংশ তাম্রশাসনে ঐরূপ স্থানে "জয়স্কন্ধাবারাৎ" পাওয়া যায়। মহারাজ লক্ষ্মণের "জয়পুর জয়স্কন্ধাবার" সম্ভবতঃ জয়পুর নামে অভিহিত হইয়াছে। বর্ত্তমান উনাব জেলায় কানপুর হইতে প্রায় ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং উনাব সহর হইতে প্রায় ১৪ মাইল পশ্চিমোত্তরে পরিয়ার নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। প্রবাদ আছে, এই স্থান পূর্ব্বে "মহারণ্য" নামে প্রসিদ্ধ ছিল, বনবাসকালে সীতা দেবী এই মহারণ্যে অবস্থান করিতেন। এইখানেই লব-কুশ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং কুশ নিজ নামে এই স্থানে 'কুশাবী' নামে সুপ্রসিদ্ধ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। (Oudh Gazetteer, 1878, Vol. II, p. 562)।

---

* Epigraphia Indica, Vol II. p. 364.

এ দিকে স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, উপরোক্ত পরিয়ার হইতে ২০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত 'কুসুম্বী' নামক স্থান পর্য্যন্ত মহারণ্য ছিল, এই মহারণ্যের পূর্ব্বসীমায় রাজা কুশ নিজ নামে "কুশপুরী" বা "কুশাম্বী" নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান উনাব সহর হইতে ১২ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে আযুধ-রোহিলখণ্ড রেলপথের ধারে কুশুম্বী নামে একটি অতি প্রাচীন গ্রাম আছে। এই গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন অদ্যাপি বড় মেলা হইয়া থাকে। এই মেলা কুশপুরী বা কুশাড়ীর মেলা নামেই খ্যাত। মেলায় অর্দ্ধ লক্ষের অধিক লোক সমবেত হইয়া থাকে। এখানকার কৌশাম্বী দেবীর সম্মুখে এই মেলা হয়। এই সময়ে দেবীর সম্মুখে শত শত ছাগ বলি হইয়া থাকে। এই সময়ে বহু দূরদেশ হইতে যাত্রী আসে ও এখানে নানা দ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে। ৮।১০ দিন মেলা থাকে। এই মেলা হইতেই এই স্থানের প্রাচীনতা ও রাজর্ষি কুশের স্মৃতি রক্ষা হইতেছে।

রামায়ণে লিখিত আছে, কুশ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—কুশাম্ব, অমূর্ত্তরজা, বসু ও কুশনাভ। পিতার আদেশে এই চারি জনের মধ্যে কুশাম্ব কৌশাম্বী পুরী, অমূর্ত্তরজা ধর্ম্মারণ্য, বসু গিরিব্রজ এবং কুশনাভ মহোদয় নামে পুরী স্থাপন করেন। (রামায়ণ, ১।৩২।১—১০)।

সম্ভবতঃ রাজর্ষি কুশের রাজধানী কুশপুরীর পার্শ্বেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশাম্ব কৌশাম্বী-পুরী পত্তন করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন কুশপুরী ও কৌশাম্বী অধুনা কুশাড়ী ও কুশুম্বী নামে পরিচিত হইতেছে। এই কুশুম্বীর উত্তরে চারি মাইলের মধ্যে জয়ৎপুর নামে আর একটি প্রাচীন গ্রাম দৃষ্ট হয়। কুশুম্বী হইতে জয়ৎপুর পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে এখনও কিছু কিছু প্রাচীন স্মৃতিনিদর্শন পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, এ অঞ্চলে পূর্ব্বে বহু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন ছিল। এখানকার রেলপথ প্রস্তুতকালে সেই সমস্ত ধ্বংসাবশেষ স্থানান্তরিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীন কৌশাম্বীর নিকটবর্ত্তী উক্ত জয়ৎপুরই মহারাজ লক্ষ্মণের তাম্রশাসন-বর্ণিত জয়পুর বলিয়া মনে হয়। মহারাজ লক্ষ্মণ পরমমাহেশ্বর বা পরম শৈব বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বাস্তবিক বর্ত্তমান উনাব জেলার সর্ব্বত্রই শৈব প্রভাবের প্রাচীন নিদর্শন যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু এই সুপ্রাচীন কৌশাম্বীপুরী ও বৌদ্ধ-জৈনগ্রন্থ-বর্ণিত কৌশাম্বীপতি উদয়নের রাজধানী বৎসপত্তন অভিন্ন বলিয়া মনে হয় না। চীন-পরিব্রাজকগণ কৌশাম্বী রাজ্যে আসিয়া উদয়নের যে প্রাচীন রাজধানী দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্বতন্ত্র।

বর্ত্তমান লখ্‌নৌ জিলার পার্শ্ববর্ত্তী রায়বরেলী জিলার সলোন তহশিলের মধ্যে "জাইস" নামে এক অতি প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগর আছে, ইহার নামান্তর উদয়ননগর বা উদয়নগর। উর্দ্দু ভাষানুরাগী স্থানীয় অধিবাসীরা বলিতে চান, মাহ্মুদ গজনীর সময় তাঁহার এক সেনাপতি আসিয়া এখানে তাম্বু গাড়িয়াছিলেন। পারসী ভাষায় তাম্বুকে 'জৈস' বলে। তাহা হইতে এই স্থানের নাম 'জাইস' হইয়াছে। উর্দ্দু তাম্বু ও সংস্কৃত স্কন্ধাবার একই অর্থ। এরূপ

স্থলে জয়স্কন্ধাবার হইতে জাইস নাম হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পদুমাবৎ-প্রণেতা মালিক মুহম্মদ এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে এই স্থানের জাইস ও উদীনগর নাম দৃষ্ট হয়। এই জাইস সহরের পার্শ্বে এখনও বহু উচ্চ স্তূপ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। এই সুপ্রাচীন জাইস নগর হইতে প্রায় ১১ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ফেলাভেলা, ভেলাথরা, ভেলাটিকাই, ভেলা পাহাড়ীয়া নামে পাশাপাশি কএকখানি প্রাচীন গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে পুরাতন দেবকীর্ত্তি বা অগ্রহারের ধ্বংসাবশেষের অভাব নাই, ইহার মধ্যে কোনটি তাম্রশাসনোক্ত ফেলাপর্ব্বতিকা হইতে পারে। মহারাজ লক্ষ্মণের জয়স্কন্ধাবার বা জাইস কত দিনের, তাহাই এখন অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ, আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের সহিত তাহারও কিছু সংস্রব আছে, পরে প্রকাশ পাইবে।

রামায়ণোক্ত কোশলের বিশাল রাজধানী অযোধ্যা নগরী ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইলে পর নানা পুরাণ এবং প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে জানিতে পারি যে, এই প্রদেশে শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী প্রভৃতি নগরী খ্যাতি লাভ করে। শ্রাবস্তী সম্বন্ধে পুরাণে আছে,—

"শ্রাবস্তিশ্চ মহাতেজা বংশকস্তু ততোঽভবৎ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ॥"

(লিঙ্গপুরাণ, ৬৫।৩৪)

ইক্ষ্বাকুবংশীয় (যুবনাশ্বের পৌত্র) শ্রাবস্তিপুত্র মহাতেজা বংশক গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নামে পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশ রচনা করেন। এই গ্রন্থেও পাইতেছি,—

"অস্তি গৌড়বিষয়ে কৌশাম্বীনাম নগরী।"

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বলা যাইতে পারে যে, শ্রাবস্তী ও কৌশাম্বী খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী বা তৎপূর্ব্বে গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল। এই গৌড়দেশ প্রাচীন কোশল-রাজ্যেরই অংশ। অযোধ্যাপ্রদেশের বর্ত্তমান গোণ্ডা জেলাই উক্ত গৌড়দেশ। তবে এখন গোণ্ডা জেলার যে আয়তন, উক্ত গৌড়দেশের আকার তদপেক্ষা অনেক বড় ছিল, সন্দেহ নাই।

সুপ্রাচীন পালি বৌদ্ধশাস্ত্র সুত্তনিপাত পাঠে জানা যায় যে, ভগবান্ বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে ব্রাহ্মণ বাবরি বুদ্ধদেবের নিকট একদল লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে কৌশাম্বী, তৎপরে সাকেত (অযোধ্যা) ও অবশেষে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হন। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কৌশাম্বী ও শ্রাবস্তী প্রাচীন গৌড়দেশের অন্তর্গত হইলেও কৌশাম্বী হইতে শ্রাবস্তী যাইতে হইলে সাকেত বা অযোধ্যা হইয়া যাইতে হইত। এ অবস্থায় অযোধ্যার দক্ষিণ দিকে কৌশাম্বী এবং উত্তরে শ্রাবস্তী হইতেছে।

বর্ত্তমান আলাহাবাদ জিলায় প্রয়াগ হইতে ২৮ মাইল পশ্চিমে করারি পরগণা মধ্যে 'কোসাম' নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। এই 'কোসাম'কেই অনেকে প্রাচীন কৌশাম্বী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এখানকার কয়রাগড়ের একখানি খোদিত লিপিতে "কৌশাম্ব

মণ্ডল” লিখিত থাকায়, এই কোসামের পূর্ব্বনাম কৌশাম্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু রামায়ণ, বৌদ্ধগ্রন্থ এবং চীনপরিব্রাজক ফাহি-এন্ ও য়ুঅন্-চুঅঙের বিবরণী অনুসরণ করিলে বর্ত্তমান কোসাম্‌কে পুরাণ ও বৌদ্ধগ্রন্থ-বর্ণিত সুপ্রাচীন কৌশাম্বী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। য়ুঅন-চুঅঙের কোশাম্বী প্রয়াগ হইতে ৫০০ লি (প্রায় ৮০ মাইল) এবং ফা-হিএনের কোশাম্বী বারাণসী হইতে ১৩ যোজন (প্রায় ১০৪ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। য়ুঅন-চুঅঙ্ দূরত্ব সম্বন্ধে গোল না করিলেও দিক্ সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে গোল আছে। তাঁহার বিবরণী অনুসারে প্রয়াগ হইতে প্রায় ৫০০লি দক্ষিণপশ্চিমে কোশাম্বী, আবার কোশাম্বী হইতে প্রায় ৫০০লি পূর্ব্বে বিশাখ (অযোধ্যা), আবার বিশাখ হইতে প্রায় ৫০০ লি উত্তর-পূর্ব্বে শ্রাবস্তী। এ দিকে চীনপরিব্রাজক ফা-হিএনের মতে বারাণসী হইতে ১৩ যোজন উত্তর-পশ্চিমে কোশাম্বী এবং বিনয়পিটকের অন্তর্গত মহাবগ্‌গের মতে সাকেতের ৬ যোজন পূর্ব্বে শ্রাবস্তী অবস্থিত। এরূপ স্থলে য়ুঅন্-চুঅঙের লেখকের লিপিপ্রমাদে ‘উত্তর-পশ্চিম’ স্থলে দক্ষিণ-পশ্চিম লিখিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

কোশাম্বীর রাজা উদয়নের জন্য এই স্থান নানা প্রাচীন কথা-গ্রন্থে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উদয়নের প্রসিদ্ধির সঙ্গে তাঁহার এই রাজধানী ‘উদয়ন-নগর’ নামেও খ্যাত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এখনও স্থানীয় লোকে পূর্ব্ববর্ণিত জায়সী বা জয়পুর স্কন্ধাবারের তৎপূর্ব্বনাম উদয়ন-নগর বা উদয়িনগর বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, ঐ নামটিও কৌশাম্বীপতি উদয়নের স্মৃতিই বহন করিতেছে।

পালি বৌদ্ধগ্রন্থ ও চীনপরিব্রাজকদ্বয়-নির্দ্দিষ্ট দূরতা লক্ষ্য করিলেও উদয়ন-নগর বা বর্ত্তমান জায়সী নামক প্রাচীন স্থানকেই আমরা অন্যতম সুপ্রাচীন কোশাম্বী রাজধানী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে পারি। প্রয়াগের সীমা হইতে জায়সী উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৬০ মাইল এবং বারাণসী হইতেও উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ১০৬ মাইল, জায়সী হইতে অযোধ্যা পূর্ব্বোত্তরে প্রায় ৬০ মাইল এবং অযোধ্যা হইতে শ্রাবস্তী (বা বর্ত্তমান গোঁড়া জেলার অন্তর্গত রাপ্তীনদী-তীরস্থ সহেট-মহেটও) প্রায় ৬০ মাইল হইবে। য়ুঅন্-চুঅঙের বর্ণনায় জানা যায় যে, প্রয়াগ হইতে কোশাম্বী যাইবার পথ বন্য হস্তী ও হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যময় ছিল। এরূপ স্থলে নিবিড় বনমধ্য দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে কোশাম্বী যাইতে হয়, এ কারণ বর্ত্তমান ৬০ মাইলের স্থানে তিনি প্রায় ৮০ মাইল লিখিবেন, তাহা কিছু অন্যায় নহে। বিশেষতঃ বৌদ্ধ গ্রন্থ ও চীনপরিব্রাজকগণের বর্ণিত দূরতার প্রতি লক্ষ্য করিলে সহসাই অনুমিত হয় যে, প্রয়াগ হইতে কোশাম্বী রাজধানী উদয়ন-নগর যতটা, আবার কোশাম্বী হইতে সাকেত ততটা, পুনরায় সাকেত হইতে শ্রাবস্তীও প্রায় তত দূর। এই সকল আলোচনা করিলে উদয়ন-নগর বা জায়সীকে কোশাম্বীপতি উদয়নরাজের রাজধানী বৎসপত্তন বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকে না। চীন-পরিব্রাজকগণ এখানে বৌদ্ধ-কীর্ত্তি অপেক্ষা প্রাচীন হিন্দু দেবকীর্ত্তিই অধিক দেখিয়াছিলেন। বাস্তবিক এতদঞ্চলে

মহারাজ লক্ষ্মণের ন্যায় পরমমাহেশ্বর নৃপতিগণের প্রভাব বিস্তারের সহিত শৈব প্রভৃতি হিন্দুগণেরই প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে শৈবাদির দেবকীর্ত্তি যে বহুলপরিমাণে এখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা স্বভাবসিদ্ধ। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক কৌশাম্বীর প্রাচীন রাজধানী দর্শন করিয়া এখানে ৫০টি দেবমন্দির ও ১০টি বিধ্বস্ত বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি এই উদয়ন নৃপতির রাজধানী বলিয়াই এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা উদয়ন চন্দনকাষ্ঠের উপর যে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, চীন-পরিব্রাজক এখানকার প্রাচীন রাজভবনের বেষ্টনীর ভিতর ৬০ ফুট উচ্চ এক মন্দিরমধ্যে সেই অলোকসামান্য বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Watters, Vol. I. p. 358)।

বৌদ্ধগ্রন্থ-মতে যে দিন বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, সেই দিনই উদয়নের জন্ম। প্রথমে তিনি অতিশয় বুদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন, অবশেষে বুদ্ধভক্তা রাজমহিষীর গুণে তিনিও একজন প্রধান বুদ্ধভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন (দিব্যাবদান, ৩৬শ অব০)। উদয়নের প্রতিষ্ঠিত সেই অপূর্ব্ব বুদ্ধমূর্ত্তি চীনদেশে আনীত হইয়াছিল। চীন-পরিব্রাজকের জীবনীর লেখকের মতে এই মূর্ত্তি শূন্যমার্গে খোতনে গমন করিয়াছিলেন (Watters, I. p. 369)।

যাহা হউক, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ কথাগ্রন্থে কৌশাম্বীপতি উদয়নের খ্যাতি যথেষ্ট বর্ণিত আছে। উদয়নের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান জায়সী নগরের উপকণ্ঠে এখনও পড়িয়া আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা এই সমস্তই ভড়রাজাদিগের চূর্ণাবশেষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। নগরের উপকণ্ঠে পাহাড়ের উপর অতি সুন্দর ও বৃহৎ এক প্রাচীন জুম্মা মস্জিদ রহিয়াছে। স্থানীয় প্রবাদ, এইখানে ভড়রাজাদিগের এক অতি বৃহৎ ও সুন্দর মন্দির ছিল। ভড়দিগকে তাড়াইয়া ও সেই প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহারই মাল-মসলায় বর্ত্তমান মস্জিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মসজিদের স্থানে স্থানে এখনও প্রাচীন হিন্দু-শিল্পের স্পষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান। কোন কোন স্থানে মাটিচাপা হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি বা বুদ্ধমূর্ত্তির আভাস আছে। এই সকল স্মৃতি দেখিলেই মনে হইবে, প্রাচীন শৈব বা বৌদ্ধ দেবমন্দিরের সুপ্রাচীন উপকরণ লইয়াই মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আমার মনে হয়, চীন-পরিব্রাজক যে হিন্দু ও বৌদ্ধকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই উপকরণে উক্ত সুপ্রাচীন মস্জিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানীয় জনপ্রবাদে এখানকার যে অতি প্রাচীন সুবৃহৎ দেবালয়ের কথা শুনা যায়, সেই অতি প্রাচীন দেবালয়টি সম্ভবতঃ চীন-পরিব্রাজক-বর্ণিত চন্দন-খোদিত বুদ্ধমূর্ত্তি-যুক্ত উদয়নের প্রতিষ্ঠিত মন্দির বলিয়া মনে হয়। এখানকার বনিয়াদি হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে কিংবদন্তীও আছে যে, ঐ দেবালয়-প্রতিষ্ঠাতাই এক সময় এই সহর বসাইয়াছিলেন। এই প্রবাদ হইতেও যেন এখানেই চীন-পরিব্রাজক-বর্ণিত উদয়নের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছিল বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান জাইস সহরে বহু কাল হইতে মুসলমান-প্রাধান্য চলিয়া আসিতেছে, এখনও এখানে মুসলমান শেখদিগেরই একমাত্র প্রতিপত্তি দেখা যায়। তাহাদের যত্নে উক্ত প্রাচীন মস্জিদ্ ব্যতীত

অপর সুবৃহৎ মস্‌জিদ্‌ ও অতি সুন্দর শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত ইমামবাড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল মুসলমান কীর্ত্তি-নির্ম্মাণকালে স্থানীয় প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তিসমূহের বিধ্বস্ত উপকরণের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার হইয়া থাকিবে, তাই আজ কোশাম্বীর সুপ্রাচীন রাজধানী উদয়ন নগর বা প্রাচীন জাইস সহরে প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তিরাজির চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দের শেষভাগে গজনীর সুলতান মাহ্মূদ ভারতের অন্যতম প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী কোশাম্বী নগর লুণ্ঠন বা ধ্বংস করিবার জন্য এখানে যে সময়ে তাঁহার একজন প্রধান সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন, সেই সময়েই মুসলমান-অত্যাচার-ভয়ে এই স্থান পরিত্যক্ত হয়। সম্ভবতঃ সেই সময়েই এখানকার বণিক্‌ ও ধর্ম্মপরায়ণ অনেক হিন্দু অধিবাসী কয়রা দুর্গের নিকট যমুনাতীরে বর্ত্তমান কোসাম্‌ নামক স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহাদের অধিষ্ঠান হেতু এই স্থানও কোশাম্ব নামে পরিচিত হয়, তাই পরবর্ত্তী কালে উৎকীর্ণ কয়রা দুর্গের শিলালিপিতে 'কোশাম্বমণ্ডল' নাম পাইতেছি। সম্ভবতঃ তৎকালে প্রাচীন কোশাম্বীর যে সকল ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক এখানে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গেই মহারাজ লক্ষ্মণের তাম্রশাসন আনীত হইয়া থাকিবে। তৎকালে আরও কতিপয় লোক উত্তর-পশ্চিমে বর্ত্তমান লখ্‌নউ নামক সহরের নিকট আসিয়া বাস করেন। এখনও লখ্‌নউ সহরের বনিয়াদী কোন কোন হিন্দুপরিবার তাঁহাদের পূর্ব্ববাস 'জাইস' বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই পুরাণ ও বিষ্ণুশর্ম্মার উক্তি হইতে দেখাইয়াছি যে, প্রাচীন কোশাম্বী বা উদয়ন নগর এবং শ্রাবস্তী গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল। রাজশেখরের প্রবন্ধকোষ, বপ্পভট্টি সূরি-চরিত ও প্রভাচন্দ্র সূরি-রচিত প্রভাবক-চরিত প্রভৃতি জৈন গ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, গৌড়দেশে লক্ষণাবতী নামে একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। এখানে ধর্ম্ম নামে কোন নৃপতি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে আধিপত্য করিতেন। বপ্পভট্টিসূরি-চরিতে লিখিত আছে, কান্যকুব্জপতি আমরাজ গোপগিরি দুর্গে অবস্থান করিতেন। কিন্তু প্রভাবক-চরিতের মতে কান্যকুব্জেই তাঁহার রাজধানী ছিল। উক্ত তিনখানি জৈন গ্রন্থের মতেই কবিবর বাক্‌পতি মহারাজ যশোবর্ম্মা, তৎপুত্র আমরাজ ও ধর্ম্মের সভায় কিছু দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সুতরাং বাক্‌পতি আমরাজ ও ধর্ম্মের সম-সাময়িক হইতেছেন। বাক্‌পতি নিজ গৌড়বধকাব্যে কান্যকুব্জই তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মহারাজাধিরাজ যশোবর্ম্মা-কমলায়ুধের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ অবস্থায় প্রভাবক-চরিতের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরাজকেও আমরা কান্যকুব্জে অধিষ্ঠিত মনে করিতে পারি। বাক্‌পতি গৌড়াধিপকে 'মগধনাথ' বলিয়াও পরিচিত করিয়াছেন। কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী হইতে জানা যায় যে, কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য কান্যকুব্জপতি যশোবর্ম্মাকে পরাজয় করেন এবং গৌড় পর্য্যন্ত জয় করেন। আবার তাঁহার পৌত্র জয়াদিত্য পঞ্চগৌড়ের অধিপতিগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহার শ্বশুর গৌড়পতি জয়ন্তকে তাঁহাদের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। এই উক্তি হইতে মনে করা যাইতে পারে, পশ্চিমে কান্যকুব্জের সীমা ও উত্তর-

পশ্চিমে শ্রাবস্তী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বারাণসী-সীমা হইতে পূর্ব্বে বঙ্গ পর্য্যন্ত 'গৌড়রাজ্য' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে যে গৌড় অযোধ্যাপ্রদেশ বা উত্তর-কোশলের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল, বিষ্ণুশর্ম্মার বা মহারাজ লক্ষ্মণের সময়ে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে তাহার আয়তন আরও কিছু বাড়িয়াছিল, তৎপরে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ক্রমে মগধ, বরেন্দ্র ও বঙ্গ পর্য্যন্ত এক গৌড়-সাম্রাজ্য বলিয়া কিছু দিন পরিগণিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এ সময়ের মগধ-পতিই এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিপতি হইয়াছিলেন। মহারাজ যশোবর্ম্মা সেই গৌড়-মগধপতিকে পরাজিত ও বিনাশ করিয়া সম্ভবতঃ তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। সেই গৌড়পতির বধবৃত্তান্ত উপলক্ষ্য করিয়াই বাক্‌পতির 'গউড়বহ' বা 'গৌড়বধ' কাব্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, বাক্‌পতি সেই গৌড়-পতির নামটি পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, মহারাজ যশোবর্ম্ম-কমলায়ুধের আক্রমণে সম্ভবতঃ সেই বিস্তীর্ণ গৌড়রাজ্য পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। আবার খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশ্মীরপতি জয়াদিত্যের সাহায্যে মহারাজ জয়ন্ত সেই পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। প্রবন্ধকোষ ও প্রভাবক-চরিত হইতে জানিতে পারি, যে সময়ে পাটলিপুরে জিতশত্রু রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে জৈনাচার্য্য সিদ্ধসেন এখানে বাস করিতেন। মহারাজ যশোবর্ম্মা আমরাজের মাতা যশোদেবীকে ভালবাসিতেন না, তাঁহার নির্ব্বাসনকালে আমরাজের জন্ম হয়। আচার্য্য সিদ্ধসেন মাতা ও পুত্র উভয়কে আশ্রয় দিয়াছিলেন। যশোবর্ম্মা মৃত্যুকালে পাটলিপুর হইতে আমরাজকে আনাইয়া মন্ত্রিগণের পরামর্শে তাঁহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আদেশ দিয়া যান।

প্রায় ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বৎসরাজ গৌড়সাম্রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার মরুদেশে আশ্রয় গ্রহণের পর মাৎস্য-ন্যায়ের বশীভূত হইয়া সেই বিস্তীর্ণ গৌড়রাজ্য নানা ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন স্বাধীন নৃপতির শাসনাধীন হইয়াছিল। সেই মাৎস্য-ন্যায়ের যুগে প্রজাসাধারণের যত্নে গোপালদেব প্রথমে বঙ্গের বা প্রাচ্যগৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্র সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ভূপতি ধর্ম্মপাল। ভারতের নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাম্রশাসনে এই ধর্ম্মপাল বঙ্গপতি ও গৌড়পতি উভয় নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। প্রথমে বঙ্গেই তিনি রাজ্য করিতেন। তৎপরে সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। প্রভাবকচরিত প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত জৈনগ্রন্থ-সমূহে ইনি গৌড়পতি 'ধর্ম্ম' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন এবং উক্ত গ্রন্থত্রয়ের মতে 'লক্ষ্মণাবতীতে' তাঁহার কিছু দিন রাজধানী ছিল।

বপ্পভট্টিসূরি-চরিত ও প্রবন্ধকোষে লিখিত আছে,—(পূর্ব্বে বর্ণিত) আচার্য্য সিদ্ধসেনের প্রধান শিষ্য বপ্পভট্টিসূরি আমরাজের গুরু ছিলেন, তৎপ্রতি কোন কারণে বিরক্ত হইয়া তিনি গৌড়াধিপ ধর্ম্মের সভায় চলিয়া আসেন। এই আগমন প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,—"দিনৈঃ কতিপয়ৈঃ গৌড়দেশান্তর্ব্বিহরন্ লক্ষ্মণাবতীনাম্ন্যাঃ পুরো বহিরারামে সমাবাসাসীৎ তত্র পুরিধর্ম্মো

নাম রাজা" অর্থাৎ কিছু দিন (বপ্পভট্টি) গৌড়দেশের মধ্যে বেড়াইয়া লক্ষ্মণাবতী নাম্নী নগরীর বাহির উদ্যানে বাস করিয়াছিলেন। সেই নগরে ধর্ম্ম নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি বপ্পভট্টির সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে নিজ সভায় আহ্বান করেন। কিছু দিন পরেই আবার আমরাজ গুরুকে কৌশলক্রমে নিজ রাজসভায় আনাইয়াছিলেন, তাহাতে গৌড়পতি ধর্ম্ম আমরাজের উপর চটিয়া যান। এই সময় উভয় নৃপতির মধ্যে কিছু দিন মনোমালিন্য চলিয়াছিল। মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য আমরাজ গুরুদেবকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মের সভায় লক্ষ্মণাবতীতে আগমন করিলেন। স্থির হইল, উভয় পক্ষে শাস্ত্রীয় বিচার-সংগ্রাম চলিবে। যিনি পরাজিত হইবেন, তিনি নিজ রাজ্য-সম্পদ্‌ অপরকে প্রদান করিবেন। যাহা হউক, বপ্পভট্টির কৌশলে আমরাজের পক্ষই অন্যায় বিচারে জয়ী হইলেন ও গৌড়পতিও আপনার রাজ্য-সম্পদ্‌ আমরাজকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। আমরাজও নিজ অন্যায়োপার্জ্জিত সম্পত্তি পুনরায় ধর্ম্মকে প্রত্যর্পণ করিয়া উভয়ে মিত্রতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন।

উক্ত জৈন গ্রন্থানুসারে আমরাজগুরু বপ্পভট্টি ৮৯৫ সংবতে (৮৩৬ খৃষ্টাব্দে) ৯৫ বর্ষ বয়সে পঞ্চত্ব লাভ করেন। এ অবস্থায় ৮০০ সংবৎ বা ৭৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বপ্পভট্টির আবির্ভাব-কাল স্বীকার করিতে হয়। প্রবন্ধ-কোষের মতে ৮১১ সংবতে বা ৭৫৫ খৃষ্টাব্দে বালক আমরাজেরই প্রার্থনায় বপ্পভট্টি সূরিপদ লাভ করেন। আমরাজ বৃদ্ধ বয়সে স্তম্ভতীর্থ, গিরনর, প্রভাস প্রভৃতি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ৮৯০ সংবৎ বা ৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মগধতীর্থে আসিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ৭৫৫ হইতে ৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমরাজ বিদ্যমান ছিলেন। এ দিকে গৌড়ের পালরাজ-বংশের পূর্ব্বেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল ৭৯৫ হইতে ৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।* সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পালবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ ধর্ম্মপাল ও কান্যকুব্জপতি আমরাজ সমসাময়িক হইতেছেন। এরূপ স্থলে উক্ত জৈন গ্রন্থত্রয়-বর্ণিত গৌড়াধিপ ধর্ম্ম ও আমাদের গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন।

উক্ত জৈন গ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, আমরাজ ও তাঁহার গুরু বপ্পভট্টি প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন।

৭৫১ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জপতি যশোবর্ম্মার মৃত্যু হয়। তৎকালে আমরাজের বেশী বয়স হয় নাই। তিনি মন্ত্রিগণের চেষ্টাতেই রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই যশোবর্ম্মার অপর পুত্র বা আত্মীয় বজ্রায়ুধ কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করিয়া সমস্ত পঞ্চালের অধিপতি হইয়াছিলেন। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী নাম্নী নাটিকায় পঞ্চালপতি-বিজয়ী বজ্রায়ুধের কান্যকুব্জ প্রবেশের প্রসঙ্গ আছে। সম্ভবতঃ কিছু কাল পরে আমরাজ নিজ পিতৃরাজ্য উদ্ধারে সমর্থ হইলেও তাঁহার অবাধ্য ও দুর্দ্ধর্ষ পুত্র ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রায়ুধকে সিংহাসন ছাড়িয়া

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মচর্চ্চায় কাল কাটাইতে হইয়াছিল। জৈন হরিবংশ হইতে পাওয়া যায় যে, ইন্দ্রায়ুধ বা ইন্দ্ররাজ ৭০৫ শকে বা ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরাপথে রাজত্ব করিতেছিলেন। জৈন গ্রন্থসমূহে ইনি ইন্দুক নামেই পরিচিত।* গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃ-প্রপৌত্র নারায়ণ-পালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, মহারাজ ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি অরাতিবর্গকে জয় করিয়া কান্যকুব্জের রাজশ্রী লাভ করিয়াছিলেন এবং চরণে প্রণত বামনরূপী চক্রায়ুধ নামক (ইন্দ্ররাজের) পিতাকে সেই রাজশ্রী অর্পণ করিয়াছিলেন।† আবার ধর্ম্মপালের নিজের খালিমপুর-লিপিতে দেখা যায়, তিনি ইঙ্গিতমাত্রে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি জনপদের প্রণতিপরায়ণ অবনতশির নৃপতিগণকে তাঁহার সাধুবাদ দান করাইতে করাইতে হর্ষোৎফুল্ল পঞ্চালবৃদ্ধ কর্ত্তৃক মস্তকোপরি নিজ অভিষেকের স্বর্ণকলস তুলিয়া ধরাইয়া কান্যকুব্জকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।‡

উক্ত পালবংশের দুইখানি তাম্রশাসন হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জ-পতি ইন্দ্রায়ুধকে জয় করিয়া পঞ্চাল অধিকার করিয়াছিলেন এবং পঞ্চালবৃদ্ধ কর্ত্তৃক এখানে তাঁহার অভিষেকের আয়োজন হইলেও তিনি প্রকৃত অধিপতি চক্রায়ুধ আমরাজকেই কান্যকুব্জের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। খালিমপুরের লিপি হইতে জানা যায় যে, ঐ লিপি-প্রদানকালে পাটলিপুত্র তাঁহার রাজধানী ছিল। কিন্তু চক্রায়ুধ আমরাজকে পুনরায় তাঁহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কবিবার সময় এবং ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার প্রভৃতি সামন্তরাজগণের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিবার জন্য সম্ভবতঃ লক্ষ্মণাবতী বা বর্ত্তমান লখ্‌নউ নগরেই তিনি কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থানকালেই তাঁহার সহিত আমরাজের বন্ধুত্ব জন্মে এবং বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের বহু খ্যাতনামা আচার্য্য তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করেন।

প্রবন্ধকোষ ও প্রভাবক-চরিতে ধর্ম্মের অধিষ্ঠিত লক্ষ্মণাবতী নগরী গৌড়দেশের অন্তর্গত অথচ গৌতমী বা গোদাবরী-তীরবর্ত্তী বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডু ঐ স্থান দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত ছিল বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। তাহার কারণ এই, আম-রাজ লক্ষ্মণাবতীতে প্রবেশ করিবার সময় গোদাবরীতীরস্থ খণ্ডোবার মন্দির দর্শন করিয়া

* কোন কোন ঐতিহাসিক 'ইন্দুক' স্থানে 'দন্দুক' এইরূপ বিকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

† "জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানতিবামনায়॥"
—(নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপি)

‡ "ভোজৈঃ মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগন্ধারকীর-
ভূপৈর্ব্যালোলমৌলিপ্রণতিপরিণতৈঃ সাধু সঙ্গীর্য্যমানঃ।
হৃষ্যৎপঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকান্যকুব্জস্সললিতচলিতভ্রূলতালক্ষ্ম যেন॥"

নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে গৌড়দেশ নামে কোন জনপদ বা লক্ষ্মণাবতী নামে কোন নগরের অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানেই খণ্ডোবা দেশের মন্দির আছে। এই নামটীও বেশী প্রাচীন নহে। শঙ্করাচার্য্যের সময় এই দেবতা মল্লারি নামেই পরিচিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বহু লোক এই মল্লারি দেবের উপাসক ছিলেন। আনন্দগিরির শঙ্করবিজয় হইতে জানিতে পারি যে,শঙ্করাচার্য্য মল্লারি-মতাবলম্বিগণকে পরাজয় করেন। মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের প্রায় সমস্তই এই মল্লারি বা খণ্ডোবার ভক্ত ও খণ্ডোবার ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির দেখা যায়। এ অবস্থায় খণ্ডোবার মূর্ত্তি ধরিয়াও স্থান নিরূপণ হইতে পারে না। উক্ত জৈনগ্রন্থকারগণ দাক্ষিণাত্য বা গুর্জ্জরের অধিবাসী। তাঁহারা গোদাবরীর অন্য প্রাচীন নাম গোমতী সকলেই অবগত ছিলেন। সম্ভবতঃ বপ্পভট্টিস্থরির মূল চরিতাখ্যায়িকায় গোমতী পাঠই ছিল। তৎপরে লিপিকর প্রমাদে 'গোমতী' স্থানে 'গোতমী' হইয়া পরে নানা লেখকের হস্তে গোতমীর নামান্তর গোদাবরীতে পরিণত হওয়া ও তদনুসারে বিবরণ প্রক্ষিপ্ত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান লখ্‌নউ সহর গোমতী তীরেই অবস্থিত। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ধর্ম্মপাল যখন বঙ্গপতি বলিয়াও ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন, এবং বাঙ্গালা দেশেই বর্ত্তমান মালদহ জেলায় অদ্যাপি প্রাচীন লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়-রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান, তখন এই লক্ষ্মণাবতীকে জৈনগ্রন্থবর্ণিত রাজপুরী বলিয়া ধরিতে আপত্তি কি ?

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে মালদহ জেলায় লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে গৌড়পতি ধর্ম্মপালের অভ্যুদয়। মালদহ জেলার লক্ষ্মণাবতীতে যে কোন কালে তাঁহার রাজধানী ছিল, তাহার প্রমাণাভাব। যখন একাধিক জৈনগ্রন্থকার একবাক্যে ধর্ম্মের রাজপুরী লক্ষ্মণাবতীর উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সময়ে অর্থাৎ মালদহ জেলার লক্ষ্মণাবতীর প্রতিষ্ঠার বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে অন্য লক্ষ্মণাবতীর অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর পূর্ব্বে উক্ত লক্ষ্মণাবতী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতেও কৌশাম্বী বা পূর্ব্বোক্ত কুশুম্বী গৌড়দেশের একটী প্রধান নগরী বলিয়া গণ্য ছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক য়ুঅন্ চুআং আসিয়া বৎস রাজধানী উদয়ন নগরের ধ্বংসাবশেষ ও হিন্দু মন্দিরাদিরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময় এই স্থান প্রাচীন রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। কৌশাম্বীর তৎকালীন রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় ঠিক পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বোক্ত কুশুম্বী হইতে ২২ মাইল এবং জয়ৎপুর হইতে ১৭১ মাইল উত্তর পূর্ব্বে বর্ত্তমান লখ্‌নউ সহর, এদিকে জাইস্ হইতে প্রায় ৬০ মাইল উত্তর পশ্চিমে লখ্‌নউ হইতেছে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজকের আগমনকালে এই প্রদেশ কৌশাম্বী, বিশাখ বা অযোধ্যা এবং শ্রাবস্তী এই তিনটী রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক রাজ্যের আয়তন ৬০০ লি অর্থাৎ

১০০০ বর্গমাইলের উপর ছিল, এরূপ অবস্থায় জাইস হইতে লথ্নউ পর্য্যন্ত তৎকালীন কৌশাম্বী রাজ্যের অন্তর্গত ধরা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মহারাজ লক্ষ্মণের আধিপত্যকালে উনাব হইতে গোঁড়া পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ সম্ভবতঃ তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। এই সময়ে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ গৌড়দেশ নামে পরিচিত ছিল, তাহা বিষ্ণুশর্ম্মার উক্তি হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বলা বাহুল্য, এ সময়ে বর্ত্তমান লথ্নউ সেই গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল এবং মহারাজ লক্ষ্মণের নামানুসারে সেই সময় হইতে 'লক্ষ্মণাবতী' নামে পরিচিত হইয়াছিল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

গুপ্ত-বলভী-সংবৎ*

পূর্ব্বাভাষ

বিক্রম-সংবৎ প্রভৃতির ন্যায় গুপ্তসংবৎ নামে একটা সংবৎ আছে; কাব্য-সাহিত্যাদিতে এ সংবতের কোন নাম-গন্ধ পাওয়া যায় না; তবে গুপ্তরাজাদিগের মুদ্রা এবং কতিপয় প্রাচীন লিপিতে গুপ্ত-কাল বা গুপ্তাব্দের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত-সংবৎ নামে এক অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন। খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রারম্ভে গুপ্তাব্দের প্রচলন ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে নেপালে এবং খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে প্রাচীন সৌরাষ্ট্রে গুপ্তাব্দের ব্যবহার ছিল। গুপ্তদিগের পর বলভীরাজগণ এই সংবতের প্রচলন বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। কাঠিয়াবাড়ের নিকটে যে সমস্ত দেশ আছে, তাহাদের সকল স্থানেই এই সংবৎ "বলভী-সংবৎ" নামে প্রচলিত। নেপাল হইতে কাঠিয়াবাড় পর্য্যন্ত এক সময়ে এই সংবতের প্রচলন ছিল। গুপ্ত-সংবতের প্রারম্ভ চৈত্র শুক্লা প্রতিপদে; ইহার মাস পূর্ণিমান্ত।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রারম্ভ-কাল লইয়া অনেক দিন হইতে তর্ক-বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। ১৮৩৬-৩৮ খৃষ্টাব্দে Princep, Troyer, Mill প্রভৃতি পণ্ডিতগণ খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতককে গুপ্ত-কাল' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যান। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিৎ Edward Thomas সর্ব্বপ্রথম স্থির করেন যে, ৩১৯ খৃষ্টাব্দ গুপ্তদিগের অভ্যুদয়-কাল। আরব-জ্যোতির্ব্বিৎ আবুরিহান অল্‌বিরুণীর ১০৩০ খৃষ্টাব্দে লিখিত কতকগুলি উক্তির ফরাসী অনুবাদ পাঠ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ১৮৫৪ খৃঃ মেজর জেনেরল্ ক্যানিঙ্‌হম্ ভিলসার বৌদ্ধস্তূপ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনি লেখেন যে, খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তগণ নিশ্চয়ই রাজত্ব করিতেছিলেন (Bhilsa Topes, p, 138)। ১৮৫৫ খৃঃ টমাস সাহেব লাসেনের মত[১] অবলম্বন করিয়া ১৫০ হইতে ১৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গুপ্তরাজগণের অভ্যুত্থান-কাল স্বীকার করেন (J. A. S. B. Vol. XXIV.)। কিছু কাল পরে ক্যানিঙ্‌হম ও টমাস উভয়েই মত পরিবর্ত্তন করেন। গুপ্তরাজগণের শিলা-লিপিতে উৎকীর্ণ সংবৎ ও শক-কাল এক,—টমাস এই মত প্রচার করেন (Fleet, Vol. III. p. 32)। ক্যানিঙ্‌হম্ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বহু গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ১৬৬-৬৭ খৃঃ গুপ্ত-সংবৎ আরব্ধ হয় (Indian Eras, pp. 53—59)। ক্যানিঙ্‌হম্, ফর্গুসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রথমেই টমাসের প্রথম সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ বার্ষিক, ১০ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

(১) Indische Alterthumskunde, Vol. II.

যে, গুপ্তগণ বলভীদের সমসাময়িক; আর তাঁহারা দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে কোন না কোন সময়ে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু পরে মুদ্রা ও লিপি-প্রমাণ হইতে এগুলি ভুল বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অতঃপর টমাস-আবিষ্কৃত ৩১৯ খৃষ্টাব্দই যে গুপ্তাব্দের আরম্ভকাল, তাহা প্রতিপন্ন হয়।

এই সময় পণ্ডিতমণ্ডলী বিচার করিয়া দেখিলেন যে, গুপ্তগণ একপ্রকার 'অব্দ' ব্যবহার করিতেন; গুপ্তদিগের মুদ্রা ও শিলালিপিতে এই অব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সেপ্ সাহেব সাঁচী-স্তূপের উপর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের লিপি দেখিয়াছিলেন। এই লিপির কাল ইহাতে খোদিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই[১]। পরে লিপি-কালের পাঠোদ্ধার হইলে, লিপিকাল '৯৩' বলিয়া স্থির হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অনেকগুলি সৌরাষ্ট্রীয় রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কার করেন। এই বৎসর ভূপালের ইরণ-স্তম্ভলিপিতে তিনি দেখিতে পান যে, উহা বুধগুপ্তের রাজত্বকালে ১৬৫ বর্ষে নির্ম্মিত বলিয়া খোদিত আছে। এই লিপির কাল অক্ষর-সংযোগে লিখিত ছিল, কাজেই সহজেই পাঠ করিবার সুবিধা হইয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে Wilson সাহেব, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে টমাস এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে Princep সাহেব আরও কতকগুলি নূতন তথ্যের অবতারণা করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে Fitz Edward Hall পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করিয়া স্থির করেন যে, বুদ্ধগুপ্ত ১০৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। গোরখপুরের কুহৌনস্তম্ভে Princep সাহেব (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে) অপর একটি সময়ের উল্লেখ দেখিতে পান[২] এবং তাহার পাঠোদ্ধার করেন। তাঁহার উদ্ধৃত পাঠানুসারে স্তম্ভলিপিটি সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুকাল হইতে ১৩১ বৎসর পূর্ব্বে উৎকীর্ণ। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে Fitz Edward Hall উহা কথঞ্চিৎ সংশোধন করিয়া যে পাঠ উদ্ধার করেন, তদনুসারে লিপিটি স্কন্দগুপ্তের সাম্রাজ্য-ধ্বংসের ১৪১ বর্ষ পরে উৎকীর্ণ হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে) প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। তাঁহার পাঠানুসারে লিপিটি গুপ্ত-সংবতের ১৪১ বর্ষে খোদিত। এই সময় তিনি স্কন্দগুপ্তের একখানি নবাবিষ্কৃত অনুশাসনও প্রকাশ করেন। ইহাতে ১৪৬ গুপ্তাব্দ অঙ্কিত ছিল। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে) Hall সাহেব ১৫৬ ও ১৬৩ গুপ্তাব্দের দুইখানি ভূমিদান-পত্র প্রকাশ করেন। এইরূপে ক্রমশঃ গুপ্তসংবতের অনেক তারিখ সংগৃহীত হয়। এই সমস্ত গুপ্তাব্দ হইতে গুপ্তাব্দের প্রারম্ভকাল নির্ণয় করা সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হয়। প্রথম প্রথম পণ্ডিতগণ এই গুপ্তাব্দকে শকাব্দ বলিয়া মনে করিতেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, Hon'ble E. C. Bayley ও অন্যান্য পণ্ডিতগণের মত এইরূপ ছিল। Major General Cunninghamও পূর্ব্বে শকাব্দ ও গুপ্তাব্দ অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন,

---

(১) J. A. S. B. Vol. VI, pp. 452—457.

(২) J. A. S. B. Vol. VII. pp. 36.

কিন্তু তিনি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সমুদয় শিলালিপির সময় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, এ মত অত্যন্ত ভ্রান্ত। তিনি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারোহণ-কালকে অর্থাৎ ১৬৬ খৃষ্টাব্দকে গুপ্ত-সংবতের প্রথম বর্ষ বলিয়া মনে করেন। অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বিদ্বন্মণ্ডলী এই মত পোষণ করিয়া আসিয়াছেন।

গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের কালের আলোচনা করিলে, এই বংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত আর এক বংশীয় রাজগণের রাজ্য-কাল নির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। ইহাঁরা বলভীরাজ। গুর্জ্জরের অন্তর্ব্বর্ত্তী বলভীপুর ইহাঁদের রাজধানী ছিল। বলভী কাঠিয়াবাড়ের গোছিলবাড় বিভাগস্থিত বর্ত্তমান বলেম বা 'বলা'১। পণ্ডিতগণ বলভীদিগের সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন।

য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে কর্ণেল টড্ (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে) সর্ব্বপ্রথম বলভীরাজবংশের অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। কতকগুলি জৈন-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া টড্ তাঁহার রাজস্থানের পুরাবৃত্তে বলিয়াছেন যে, গহলোত রাজপুতগণ হয় বলভীপুর আবিষ্কার করিয়াছিলেন, না হয় তাঁহারা তাহা অধিকার করেন। এই ঘটনা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পর কোন সময়ে সঙ্ঘটিত হয়২।

তিনি বিশেষ করিয়া কয়েক জন রাজকুমারের নাম করিয়াছেন। কনকসেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। বিজয়প্রমুখ কয়েকজন কতকগুলি নগর নির্ম্মাণ করেন। এই বংশের শেষ নরপতি শীলাদিত্যের রাজত্বকালে বলভীপুর বৈদেশিক জাতি-দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া গৃহীত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে W. H. Wathen দুইখানি তাম্রফলক সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে সমানয়ন করেন। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে এই তাম্রফলকগুলি তিনি মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রাপ্ত হন। এই তাম্রফলক হইতে বলভীবংশের প্রায় তাবৎ রাজাদিগের সংবাদ পাওয়া যায়। ইহার তিন বর্ষ পরে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে Prinsep সাহেব এই বংশের আর একটি নূতন রাজার নাম সংযোগ করিয়াছেন। এই রাজার নামটি তিনি Burns-আবিষ্কৃত Kaira-তাম্রফলক হইতে প্রাপ্ত হন। ইহার দুই বৎসর পরে Dr. Bühler আরও দুইটি রাজার নাম বাহির করেন।

কর্ণেল টড বলেন, বলভী রাজাদিগের একটি অব্দ ছিল, তাহার নাম বলভী-সংবৎ; ইহার প্রথম বর্ষ =৩১৯ খৃষ্টাব্দ। Wathen সাহেব কর্ণেল টডের কথার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া বলভীদিগের ভূমিদান-পত্রের সময় বলভী-সংবৎ দ্বারাই স্থির করিয়াছেন। ভূমিদান-পত্রে ৪১১ অব্দ অঙ্কিত আছে—সুতরাং বলভীগণ যে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে ৮ম শতাব্দী

---

(১) Indian Ant, 1902, p. 333, Gaz. Bom. Press. Vol. I. part I. p, 125; Indian Ant. 1903, p. 49.

(২) Indian Ant. 1902, p. 333; Gaz. Bom. Press. Vol. I. part I. p. 125; Ind. Ant. 1903, p. 49.

পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৩১৯ খৃঃ হইতে ৭৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করিতেন, তাহা Wathen সাহেব স্থির করেন (১)। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে Princep সাহেব এই বিষয়টির পুনরালোচনা করেন। তিনি বলেন, বলভী-দানপত্রগুলির 'অব্দ' বিক্রমাব্দ ; কেন না, যখন বলভী-সংবৎ বলিয়া উল্লেখ নাই, কেবল সংবতের উল্লেখ আছে, তখন এইগুলি ৫৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ বিক্রম-সংবৎ-দ্যোতক (২)। দশ বৎসর পরে (১৮৪৮ খৃঃ) টমাস্ বলেন যে, দানপত্রের 'সংবৎ' শব্দে শক-সংবৎই বুঝায় (৩)। Dr. Bhaudaji ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে (৪) এবং Prof. Bhaudarkar ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে (৫) টমাসের মতেরই পোষকতা করেন। Bhandarkar কিন্তু দুই বৎসর পরে এ মত পরিত্যাগ করেন (Ind. Ant. Vol. III. p. 304)। অতঃপর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে Dr G. Bühler একখানি নবাবিষ্কৃত ভূমিদান-পত্র হইতে সপ্রমাণ করেন যে, বলভীদিগের দানপত্র-গুলির অব্দ 'শকাব্দ'দ্যোতক নয়—১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আর একখানি নূতন দানপত্র হইতে তিনি দৃঢ়তার সহিত সপ্রমাণ করেন যে, ষষ্ঠ শীলাদিত্যের অপর একটি নাম ধ্রুবভট। য়ুয়ন-চয়ঙ্ও যে তাঁহাকে এই নামে বুঝিতেন, M. Engene Jaquet চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৩৬ খৃঃ) তাহা দেখাইয়াছিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে Ferguson শক-সংবৎ ও গুপ্তাব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে V. A. Smith গুপ্তবংশের স্বর্ণমুদ্রার একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে Fleet সাহেবের Gupta Inscriptions প্রকাশিত হয়। এক বর্ষ পরে প্রাচীন গুপ্ত-বংশের মুদ্রাতত্ত্বে অনেক নূতন কথার আলোচনা হইয়াছিল। Bhitari মুদ্রা ১৮৮৫ খৃঃ আবিষ্কৃত হয়। ১৮৮৯ খৃঃ V. A. Smith ও Hoernle দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের Bhitari মুদ্রা Bengal Asiatic Societyর পত্রে (LV. pt. I.) প্রকাশ করেন। ১৮৯০ খৃঃ E. Douin Bhitari মুদ্রার আলোচনার সঙ্গে গুপ্তাব্দের আলোচনা করেন। ১৮৯১ খৃঃ G. Buhlerএর গুপ্তাব্দ সম্বন্ধে ও Rapsonএর গুপ্তমুদ্রা সম্বন্ধে মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (Die Indischen Inscriften এবং Wiener Zeitscher. f. die k. des morgenl; Notes on Gupta coins)। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে প্রাচ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মহাসভায় V. A. Smith গুপ্তাব্দ সম্বন্ধে পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অনেক-গুলি গুপ্তলিপির আবিষ্কার হয়। ব্রহ্মদেশে দুইটি লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এই গুপ্ত-বাকালক-দানপত্রেরও আবিষ্কার হয়। এইগুলির বিবরণ Arch. Sur. Prog. Rep. Burmes 1894, pp. 15-20এ প্রকাশিত হয়। K. B. Pathak (Ind. Ant. ১৯১২, পৃঃ ২১৪) গুপ্ত-বাকালক-দানপত্রের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন।

---

(১) J. A. S. B. Vol. IV. pp, 478, 497. Ind. Ant. Vol. VII. p, 80.
(২) J. A. S. B. Vol. XII. pp. 354, 367, 368.
(৩) J. R. A. S. Vol. XII.
(৪) Bom. R. P. S. Vol. VII. pp. 232, 233.
(৫) Ind, Ant. Vol I. pp. 45, 61.

১৯০৩-৪ খৃঃ Arch. S. Annual Rep. (1903-4 pp. 101-22 pts. XL-XLII)এ ঘটোৎকচগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-মহিষীর Basarh-মুদ্রার বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১৯০৭-৮ খৃঃ Arch. Sur. Progr. Rep. of N. Circle (1907-8 p. 39)এ প্রথম কুমারগুপ্তের ১১৭ গুপ্তাব্দাঙ্কিত Baradi Dih লিপির বিবরণ বাহির হয়। ১৯০৯ খৃঃ ঐ লিপি J. A. S. Bতে (Vol V. N. S. p. 457) উহার প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়। এই বৎসর প্রথম কুমার-গুপ্তের ১১৩ গুপ্তাব্দাঙ্কিত ধানাইদহ তাম্রলিপির বিবরণ J. A. S. Bতে (p. 459) বাহির হয়। ইহার পর ১৯১২ খ্রীঃ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় I. A. ৩১৯ খৃষ্টাব্দকে গুপ্তাব্দের প্রারম্ভ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসর তিনি তাঁহার বাঙ্গালার ইতি-হাসেও তাহাই লিখিয়াছেন।

গুপ্ত-সংবৎ

ফ্লীট সাহেব (Corpus Inscriptionum Indicarum Vol III) ভারতীয় শিলালিপি নামক গ্রন্থে সপ্রমাণ করেন, গুপ্ত-বলভী-সংবতের প্রারম্ভ-সম্বন্ধে মুসলমান-জ্যোতিষী অল্‌-বেরুণী যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অমূলক। যত দিন ফ্লীটের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই, তত দিন অনেকেই বেরুণীর মতের পোষকতা করিতেন। বেরুণী বলেন, বলভী-সংবৎ শক-সংবৎতের ২৪১ বর্ষ পরে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। শক-সংবৎ হইতে ৬-এর 'ঘন' এবং ৫-এর 'বর্গ' (২১৬+২৫=২৪১) বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে, তাহাই বলভী-সংবৎ। গুপ্ত-সংবৎ সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, গুপ্তগণ অত্যন্ত দুষ্ট ও পরাক্রমশালী ছিল; আর গুপ্তবংশ ধ্বংস হইবার পরও লোকে গুপ্ত-সংবৎ ব্যবহার করিতে থাকে। গুপ্ত-সংবৎ শক-সংবতের ২৪১ বর্ষ পরে আরব্ধ হইয়াছিল। "শ্রীহর্ষ-সংবৎ ২৪৮৮=বিক্রমসংবৎ ১০৮৮ =শকসংবৎ ৯৫৩=গুপ্ত বা বলভী-সংবৎ ৭১২।" [Al Beruni's India, Original Arabic Text, Ch. 49, p. 204-6].

উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বেরুণী দেখাইতেছেন—বিক্রম ও গুপ্ত-সংবতের মধ্যে ৩৭৬ বৎসরের ব্যবধান; সুতরাং গুপ্ত-সংবতের প্রথম বর্ষ ৩৭৭ বিক্রম-সংবতের সমান। গুপ্ত-সংবৎ ১=২৪২ শকসংবৎ; অতএব শকাব্দ ও গুপ্ত-বলভী অব্দের মধ্যে ২৪১ বৎসরের ব্যবধান। এই মত যে সত্য, তাহা দেখাইতে গিয়া অনেকে তাঁহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে নব নব পরিকল্পিত মতের আবিষ্কার করিয়া থাকেন। অধ্যাপক ওল্‌ডেনবর্গ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে "ইরণ"-স্তম্ভের উপরে যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে স্থির করেন যে, গুপ্তসংবৎ ১৬৫=৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ভাণ্ডারকারও অধ্যাপক ছত্রের [Kero L. Chattre] সাহায্যে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ফ্লীটের মতের যাথার্থ্য স্বীকার করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ পিটারসন বৎসভট্টির মান্দাসর প্রশস্তির কালনিরূপণ করেন; এই প্রশস্তিতে লিখিত আছে যে, ৪৯৩ মালববর্ষ কুমারগুপ্তের রাজত্বকালেই পড়িয়াছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে, ৪৯৩ বর্ষ ৯৬-১৩০ গুপ্ত-

সংবতের মধ্যে পড়িতেছে। পিটারসন দেখাইয়াছেন, মালবাব্দই বিক্রমাব্দ। অধ্যাপক কীলহর্ণও কিছু দিন পূর্ব্বে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। বেণ্ডাল সাহেব নেপালে একটি গুপ্তাব্দ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের পর হইতেই ডাক্তার বুহ্লার বেরুণীর মতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া এই গুপ্তাব্দ সম্বন্ধে অনুশীলন করিতে থাকেন; ফলে তিনি দেখেন যে, ৩৩০ [গুপ্ত-] সংবতের ধরসেনের 'খেড়া' অনুশাসনে মলমাসের অস্তিত্ব রহিয়াছে। বুহ্লারের মতে ৩৩০ সংবৎ ৬৪৮ খৃষ্টাব্দের অনুরূপ। এগুলি গুপ্তাব্দ-সম্বন্ধে ছোট-খাট রকমের আলোচনা। বস্তুতঃ ফ্লীট সাহেবই এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, তাঁহার 'গুপ্ত-লিপি' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় যাবতীয় মত-বাদের উল্লেখ করিয়া স্বয়ং যুক্তি-জাল বিস্তার-পূর্ব্বক গুপ্তাব্দের এক নিষ্পত্তি প্রকাশ করেন। ফ্লীটের এই গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর হইতে ভারতেতিহাস-অনুশীলনকারী প্রত্যেক ঐতিহাসিকই গুপ্তাব্দের প্রারম্ভ-কালকে ১০০ বা ১৫০ বৎসর পিছনে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন; অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দই গুপ্তাব্দের প্রারম্ভ-কাল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। গুপ্তাব্দের প্রারম্ভ-বর্ষ প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মধ্যে একটু-আধটু মতভেদও লক্ষিত হয়। ডাক্তার ভাণ্ডারকার বলেন, ৩১৮।১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্তাব্দের সূচনা, ফ্লীট বলেন, ৩১৯।২০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তাব্দ আরব্ধ হয়। অবশ্য এক আধ বৎসরের পার্থক্যে বড় কিছু আসিয়া যায় না। যে ক্ষেত্রে জ্যোতিষের নিখুঁত তুলাদণ্ডে সময় পরিমাণ করিবার সম্যক্ সুবিধা না থাকে, সেইখানেই সাধারণতঃ এইরূপ একটু পার্থক্য থাকিয়া যায়। ফ্লীট, ভাণ্ডারকার, কীলহর্ণ—ইহাঁরা ত বহুসংখ্যক পাণ্ডুলিপি, দানলিপি প্রভৃতি পড়িয়াছেন। আমাদের কিন্তু এমনই একটা স্বাতন্ত্র্য, এমনই একটা বিশিষ্ট রকমের বিশেষত্ব যে, পাণ্ডুলিপি, দানলিপিতে তারিখ দিবার সময় যদি বর্ষ দিতে হয়, তবে তাহা এমনই ভাবে দেওয়া হইবে যে, তাহা অতীতাব্দ কি না, বুঝিবার যোটি থাকিবে না। এ ছাড়া সময়াদি সম্বন্ধে সময়ে সময়ে মারাত্মক রকমের ভ্রম-প্রমাদেরও অসদ্ভাব থাকে না।

ফ্লীট সাহেব তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় গুপ্তাব্দের ব্যুৎপত্তি-সময়ের আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তিগুলি এইরূপ;—

১। প্রাচীন লিপি প্রভৃতিতে এমন কোনও ভিত্তি পাওয়া যায় না, যাহার উপর নির্ভর করিয়া গুপ্তদিগকে এই অব্দের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। গুপ্ত-কাল বা গুপ্তাব্দের সামান্য অপভ্রংশপদ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বেরুণীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। (পৃঃ ১৯)

২। জ্যোতিষিক বা ঐতিহাসিক কাল-গণনার ফলে এই অব্দ প্রবর্ত্তিত হয় নাই; ৩২০ খৃষ্টাব্দে এমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়, যাহা হইতে এই অব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল।

৩। কোন বলভী-রাজকুমারের সিংহাসনাধিরোহণ উপলক্ষ্য করিয়া এই সংবৎ প্রবর্ত্তিত হয় নাই; কারণ, ৩২০ গুপ্ত-সংবৎ পর্য্যন্ত বলভীগণ সেনাপতি মাত্র (Feudatory Maharajas) ছিলেন।

৪। শ্রীগুপ্তকে এ পর্য্যন্ত প্রথম গুপ্তরাজ বলিয়া জানা গিয়াছে। ইঁহারও রাজ্যাধিরোহণকালে এই অব্দের প্রবর্ত্তন হইতে পারে না; কেন না, সপুত্র তিনি Indo-Soythio রাজাদিগের অধীনে মহারাজ বা Feudatory মাত্র ছিলেন।

৫। তবে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা এই অব্দ প্রতিষ্ঠিত হইলেও হইতে পারিত; কেন না, এক সময়ে তিনি স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। যদি এইটুকু অনুমান করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে এইটুকুও ধরিয়া লইতে হইবে যে, গুপ্ত মহারাজাধিরাজদিগের রাজত্বকাল নিতান্ত অল্পকালস্থায়ী ছিল। কথাটা এই, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনাধিরোহণকাল ৯৪ বা ৯৫ গুপ্ত-সংবৎ, তৎপুত্র কুমারগুপ্ত ১৩০ গুপ্তাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র; সুতরাং প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র পর্য্যন্ত চারি পুরুষ হইতেছে। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক-কাল হইতে যদি গুপ্তাব্দ প্রচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র পর্য্যন্ত, এই চারি পুরুষে অন্ততঃ ১৩০ বৎসর—অর্থাৎ প্রত্যেকে গড়ে ৩২ বৎসর করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে। হিন্দু রাজাদিগের পক্ষে উপর্য্যুপরি চারি পুরুষে গড়পড়তা ৩২ বৎসর করিয়া রাজত্ব করা একরূপ অসম্ভব; সুতরাং প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক-কালে এই সংবতের প্রচলন আরম্ভ হয় বলিয়া বোধ হয় না।

৬। ৩২০ খৃষ্টাব্দে যে গুপ্ত-সংবতের প্রারম্ভ, তাহার একরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ৩২০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এমন কোন বিশিষ্ট ঘটনা ঘটে নাই, যাহাতে একটা অব্দের প্রচলন আরম্ভ হইতে পারে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, গুপ্তাব্দের প্রচলন ভারতবর্ষে হয় নাই। ফ্লীটের মতে যাহা গুপ্তাব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা সর্ব্বপ্রথম নেপাল প্রদেশে প্রচলিত হয়। নেপালের লিচ্ছবিরা এক প্রাচীন ও প্রতাপান্বিত জাতি। ইঁহারা প্রায় ৩৩০ খৃষ্টাব্দে প্রথম জয়দেবের অধীনে নেপাল জয় করেন (Dr. Bhagawanlal's Not. Ins. No XV)। সম্ভবতঃ নেপাল-জয়ের সময় হইতে এই বর্ষ-গণনা চলিয়া আসিতেছে; অথবা নেপালে যে শাসন-প্রণালী ছিল, তাহার উচ্ছেদে রাজতন্ত্র-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার কাল-স্মরণার্থ এই সংবৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন গুপ্ত-বংশের সহিত লিচ্ছবিদিগের সম্বন্ধ ছিল, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এক লিচ্ছবিরাজ-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই কন্যার পিতা প্রতাপশালী ছিলেন বলিয়াও বোধ হয়; কারণ, সমুদ্রগুপ্তের লিচ্ছবিরাজের দৌহিত্র বলিয়া খ্যাতি ও গৌরব ছিল। অধিকন্তু হরসেনের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে লিখিত আছে যে, নেপালরাজ সমুদ্রগুপ্তকে কর প্রদান করিতেন। গুপ্তবংশীয়গণ যে নেপাল ও নেপালপ্রচলিত অব্দ পরিজ্ঞাত ছিলেন, ইহা হইতে তাহার স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়।

ফ্লীট সাহেবের পুস্তকের পরিশিষ্টে নিম্নলিখিত তালিকাটি পাওয়া যায়;—

Bendal	No 1.	Sambat 316 = AD. 635
Bhagawanlal	No 1.	386 = AD. 705

Bhagawanlal No 2. „ 413 = AD. 732/33
„ No 3. „ 435 = AD. 754
„ No 4. „ 535 = AD. 854

উপরিকথিত সংবৎগুলি লিচ্ছবি-সংবৎ হইলে ফ্লীট সাহেবের মতই যে সমীচীন, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু নেপালে যে ঐ সংবৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, উক্ত তালিকা-পাঠে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। হরসেনের প্রশস্তি অনুসারে নেপালকে সমুদ্রগুপ্তের করদ রাজ্য বলিয়া ধরিলে, নেপালরাজ যে গুপ্ত-সংবৎই নেপালে প্রচলিত করেন নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? বাণের মতানুসারে ৬০৬ খৃষ্টাব্দে নেপালের ঠাকুরী-বংশের রাজারা হর্ষ-কাল ব্যবহার করিতেন; সেইরূপ ইহাঁরাও গুপ্ত-সংবৎ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। অধিকন্তু, ৩১৮ বা ৩১৯ সংবতের নেপালের খোদিত লিপিতে গুপ্ত নামের আভাষ পাওয়া যায়।

নেপাল বরাবরই একটি সামান্য রাজ্য। কি বিস্তারে, কি জন-সংখ্যায়, এটি তেমন একটি বড় রাজ্য নয়। লিচ্ছবি রাজারাও নেপাল জয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী কোনও প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। এমন কি, নেপাল-জয়ের পরও ভারতে তাঁহাদের রাজত্ব ছিল। গঙ্গার উত্তরে ভারতের প্রাচীন রাজধানী পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্রে তাঁহাদের শাসনাধিকার ছিল (Dr. Bhagawanlal's Nepal Ins. No. XV)। খুব সম্ভব, পাটলিপুত্রের লিচ্ছবি-রাজগণ পরাক্রমশালী ছিলেন এবং ইহাঁদেরই মধ্যে কাহারও কন্যার সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হয়। সম্ভবতঃ এই বিবাহ-সূত্রেই চন্দ্রগুপ্ত "মহারাজাধিরাজ" হইবার সুযোগ পান। চন্দ্রগুপ্ত যখন "মহারাজাধিরাজ" হয়েন, তখনই ঐ সমারোহ উপলক্ষ্য করিয়া গুপ্ত-সংবৎ প্রবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব; তবে ফ্লীট সাহেবের আপত্তি এই যে, হিন্দু রাজপরিবারের পক্ষে চারি পুরুষে প্রত্যেকে গড়-পড়তা ৩২ বৎসর করিয়া রাজত্ব করা অসম্ভব। কিন্তু ফ্লীট সাহেবের এ সন্দেহ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তিনি স্বয়ংই তাঁহার গ্রন্থের উপক্রমণিকায় ১৩১ পৃষ্ঠে পরবর্ত্তী চালুক্য-রাজবংশের চারি পুরুষের মোট রাজত্বকাল ১৩০ বৎসর দেখাইয়াছেন। জৈন মেরুতুঙ্গের সময়ানুক্রমিক তালিকা হইতে গুর্জ্জরের চালুক্য-রাজবংশের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম রাজার রাজত্ব-কাল নিম্নে বিবৃত হইল;—

৫ সংখ্যা ১ম ভীম, বিক্রম-সংবৎ ১০৭৮-১১২০ = ৪২ বৎসর

৬ „ ১ম কর্ণ, ১ম ভীমের পুত্র বিঃ সং ১১২০-১১৫০ = ৩০ বৎসর

৭ „ জয়সিংহ, ১ম কর্ণের পুত্র বিঃ সং ১১৫০-১১৯৯ = ৪৯ বৎসর

এই তিন রাজার রাজত্বকাল মোট ১২১ বৎসর হইল, অর্থাৎ দেখা গেল, প্রত্যেকে গড়-পড়তা ৪০ বৎসর করিয়া রাজত্ব করিয়াছেন।

উল্লিখিত তালিকাটি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই; তথাপি একটু পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। প্রথম ভীমের সর্ব্বপ্রথম যে খোদিত লিপি পাওয়া যায়, তাহার তারিখ

১০৮৬ বিক্রম-সংবৎ। সর্ব্বপ্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিকের মতে ভীম মামুদের সোমনাথ-অভিযানের সময়েও ৪১৪।১৫ হিজরায় বা ১০২৩।২৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১০২৩।২৪ খৃষ্টাব্দ দক্ষিণাঞ্চল-প্রচলিত ১০৮০ বিক্রম-সংবৎ বা উত্তরাঞ্চল-প্রচলিত ১০৮১ বিক্রম-সংবৎ।

মহাবীর-চরিতে হেমচন্দ্র জয়সিংহের মৃত্যুকাল সমর্থন করিয়াছেন। মহাবীর-চরিতে তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও ছাত্র, জয়সিংহের উত্তরাধিকারী, কুমারপাল মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৬৬৯ বৎসর পরে ১৬৬৯—৪৭০=১১৯৯ বিঃ সংবতে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, মেরুতুঙ্গের বর্ণিত সময়গুলি বিশ্বাস-যোগ্য। তিন পুরুষে গড়পড়তা প্রত্যেকে ৪০ বৎসর করিয়া রাজত্ব করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গেল। জয়সিংহের উত্তরাধিকারী কুমারপাল, প্রথম কর্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পৌত্র; সুতরাং তিনি পুরুষানুক্রমে জয়সিংহের পরবর্ত্তী হইলেন। তিনি পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে রাজা হইয়া ১২২৯ বিক্রম-সংবৎ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদি আমরা উপরের মোট গণনায় তাঁহার রাজত্বকাল অর্থাৎ ৩০ বৎসর যোগ করি, তাহা হইলে চারি পুরুষে সর্ব্বসমেত ১৫১ বৎসর পাই; অর্থাৎ চারি পুরুষে প্রত্যেকে গড়পড়তা ৩৭¾ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন, এইরূপ উদাহরণও পাই।

ফ্লীট সাহেবের তালিকায় পূর্ব্বাঞ্চলবাসী চালুক্য-রাজগণের রাজত্ব কাল এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে;—

সংখ্যা ৮—বিষ্ণুবর্দ্ধন	৩,		৩৭ বৎসর
„ ৯—বিজয়াদিত্য	১, ৮ সংখ্যকের পুত্র,		১৮ বৎসর
„ ১০—বিষ্ণুবর্দ্ধন	৪, ৯	„ „	৩৬ বৎসর
„ ১১—বিজয়াদিত্য	২, ১০	„ „	৪৪ বা ৪৮ বৎসর

চারি পুরুষের মোট রাজত্ব-কাল ১৩৫ বা ১৩৯ বৎসর, গড়ে প্রত্যেকের রাজত্ব-কাল ৩৩¾ বা ৩৪¾ বর্ষ। যখন এইরূপ অখণ্ডনীয় উক্তি পাওয়া যাইতেছে, তখন কেমন করিয়া বলা যায় যে, এইরূপ ঘটনা অসম্ভব?

এখন দেখা গেল, ৩১৮ বা ৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-সংবতের প্রারম্ভ। শুধু খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে নয়, দশম শতাব্দীর প্রারম্ভেও, এমন কি, পঞ্চম শতাব্দীতেও এই সংবতের সহিত গুপ্ত নামের সম্বন্ধ দেখা গিয়াছে; সুতরাং এ অব্দটি যে কোন গুপ্তরাজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রথম দুই গুপ্ত 'মহারাজ' মাত্র ছিলেন, কাজেই ইঁহাদের কাহারও দ্বারা এ সংবতের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইতে পারে না! গুপ্তবংশীয় তৃতীয় রাজা ঐ বংশীয় প্রথম মহারাজাধিরাজ হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই এই অব্দকর্ত্তা ছিলেন, এরূপ বুঝিতে হইবে।

চন্দ্রগুপ্তের সহিত লিচ্ছবি-রাজকন্যার বিবাহ-ঘটনা গুপ্তবংশীয়গণ গৌরবজনক বলিয়া মনে করিতেন, ফ্লীট সাহেব তাহা দেখাইয়াছেন। সমুদ্র গুপ্ত লিচ্ছবিরাজের দৌহিত্র বলিয়া সগর্ব্ব-

নিতও হইতেন। ইহাতেই বুঝাইতেছে যে, এক সময়ে লিচ্ছবিরাজবংশের যথেষ্টই প্রতাপ ছিল। এমনও বোধ হয়, চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিরাজকন্যাকে বিবাহ করায় লিচ্ছবিরাজের সাহায্যে তিনি সমুন্নত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে 'মহারাজাধিরাজ' পর্য্যন্তও হইয়াছিলেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় কুমারদেবীর নাম ও 'লিচ্ছবয়ঃ' কথাটি পাওয়া যায়। সুতরাং এরূপ অনুমান করা বোধ হয়, অসঙ্গত নয় যে, হয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের লিচ্ছবিরাজকন্যার সহিত বিবাহ উপলক্ষ্যে, না হয় তাঁহার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে এই সংবতের প্রচলন আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহার গণনা তাঁহার রাজ্যাব্দ হইতেই সূচিত হয়। রাজ্যাব্দ হিসাবে কালগণনার পদ্ধতি বরাবরই চলিয়া আসিয়াছে। অন্যান্য অব্দের সূচনার ন্যায় গুপ্তাব্দেরও উদ্ভব রাজ্যাব্দ হিসাবে হইয়াছে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন,—প্রথম চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক উপলক্ষ্য করিয়া গুপ্তাব্দের গণনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; তাঁহার এ উক্তিতে আমাদের আস্থা নাই। অব্দপ্রবর্ত্তকের মৃত্যুর পরও অব্দগণনার মূলসূত্র বজায় ছিল এবং উত্তরাধিকারীর রাজত্বে অব্দগণনা পূর্ব্বপ্রথানুসারে অবিকল চলিয়াছিল। এই উক্তির প্রমাণস্বরূপ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের গঢ়োয়া শিলালেখের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিলালিপির পাঠে আছে,—"শ্রীচন্দ্রগুপ্তরাজ্যসংবৎসরে ৮০৮ [৮৮]"; ফ্লীটের অন্যান্য বহু লেখেও এইরূপ প্রয়োগ আছে। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার পিতৃসিংহাসন প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেন নাই। তিনি নিশ্চয়ই কয়েক বর্ষ ধরিয়া পৈতৃক রাজ্য সংবর্দ্ধন ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন, পরে শক্তিশালী হইয়া 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির প্রথম বর্ষ হইতেই এই অব্দ চলিয়াছিল—'মহারাজাধিরাজ' উপাধিমণ্ডলসূচক অভিষেক উপলক্ষ্যে ইহার গণনা আরব্ধ হয় নাই। এ ঘটনা অসাধারণ নয়। হর্ষবর্দ্ধন ৬১২ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন; কিন্তু তাঁহার অব্দ ছয় বর্ষ পূর্ব্ব হইতে চলিয়াছিল। হর্ষসংবতের গণনা ৬০৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে সূচিত হয়।

অতএব আমাদের স্বীকার্য্য যে, সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল হইতেই গুপ্তাব্দগণনারম্ভ। Vincent Smith তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, প্রথম গুপ্তাব্দ ২৬শে ফেব্রুয়ারি ৩২০ হইতে ১৩ই মার্চ ৩২১ পর্য্যন্ত; ইহাই প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের প্রথম বৎসর বলিয়া গণিত হইয়া থাকে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ-ধৃত ১৩ই মার্চ্চ ৩২১ আমাদের গণনায় ১৫ই মার্চ্চ হইতেছে; আর ১৫ই মার্চ্চই ঠিক। ফ্লীট সাহেবও তাঁহার Gupta Inscription এর ভূমিকায় এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের Indian Antiquaryর ৩১৬-৪৯ পৃষ্ঠে ১৫ই মার্চ্চই গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। গত বৎসর Allan সাহেবও তাঁহার Indian Coinsএ তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই, গুপ্তসংবৎই বলভী-সংবৎ। বলভীরাজগণ ইহা ব্যবহার করিতেন বলিয়া ইহার নাম বলভী-সংবৎ হয় নাই। গুর্জ্জরে একটি প্রবাদ আছে যে, ৩৭৬ বিক্রম-সংবতে বলভীগণের সম্যক্ উচ্ছেদ সাধিত হয়। বলভী-ভঙ্গের বিশদ বিবরণ মেরুতুঙ্গের (১৩০৬ খৃষ্টাব্দ) প্রবন্ধচিন্তামণিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পরে বহু জৈন লেখক বলভী-

ভঙ্গের কথাও লিখিয়া গিয়াছেন। মেরুতুঙ্গের এই শ্লোকটি Buhler সাহেব সর্ব্বপ্রথম সাধারণ্যে প্রচার করেন। শ্লোকটি এই;—

পণসয়রী বাসাইং তিন্নি সযাইং অইক্কমেউণ।

বিক্কমকালাও তও বলহীভঙ্গো সমুপ্পন্নো ॥—Bombay Eqn p 275.

অর্থাৎ বিক্রমকালের ৩৭৫ বৎসর অতীত হইলে পর বলভীভঙ্গ সঙ্ঘটিত হয়। অলবেরুণী এই বলভীভঙ্গের বিবরণ দিয়াছেন। ইহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বেরুণীর মতে 'বলব' নামক এক রাজা এই অব্দের প্রতিষ্ঠাতা। এই অব্দই গুপ্তাব্দ।

বলভী-সংবৎ অর্থে বলভীভঙ্গ-সংবৎ। গুপ্তাব্দ পরে বলভীসংবৎ নামে কাঠিয়াবাড়ে প্রচলিত হইয়াছিল।

গুপ্ত-বলভী-সংবতের শিলালিপি

১।	৮২	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত	G. I. p 25
২।	৮৮	„	„ 37
৩।	৯৩	„	„ 31
৪।	৯৬	প্রথম কুমারগুপ্ত	„ 43
৫।	৯৮	„	„ 41
৬।	১০৬	উদয়গিরিগুহা জৈন	„ 258
৭।	১১৩	প্রথম কুমারগুপ্ত	„ Vol 2. p. 314
৮।	১১৩	„	J. A. S. B. N. S. Vol V. p. 459.
৯।	১১৭	„	J. A. S. B. N. S. Vol V p 457.
১০।	১২৯	„	G, I. p. 46.
১১।	১৩১	সাঞ্চী-লিপি	„ 131
১২।	১৩১	মথুরা বৌদ্ধমূর্ত্তির লিপি	„ 263
১৩।	১৩৬	স্কন্দগুপ্ত	G. I. p. 58,
১৪।	১৩৭		Bh. I. p. 24.
১৫।	১৩৮		
১৬।	১৩৯	ভীমবর্ম্মা	G. I. p 267.
১৭।	১৪১	স্কন্দগুপ্ত	G. I. p. 66.
১৮।	১৪৬	স্কন্দগুপ্ত, শর্বনাগ	„ 70.
১৯।	১৪৮	বৈষ্ণবশিলালিপি	„ 268.
২০।	১৫৬	হস্তী	„ 95.
২১।	১৫৮ (?)	লক্ষ্মণ	E. I. Vol II. p 364.

২২।	১৬৩	হস্তী	G. I. p. 102
২৩।	১৬৮	বুধগুপ্ত, সুরমিচন্দ্র মাতৃবিষ্ণু	„ 89
২৪।	১৯১	ভানুগুপ্ত	G. I. p. 92.
২৫।	১৯১	হস্তী	G. I. p. 107
২৬।	২০৭	প্রথম ধ্রুবসেন	E. I. Vol III. p 320
২৭।	২০৭	„	I. A, Vol V. p 114.
২৮।	২০৯	সংক্ষোভ	G. I. p 114.
২৯।	২১৬	„	J. A. Vol IV. p. 105
৩০।	২১৭	প্রথম ধ্রুবসেন	J. R. A. S. 1895. p 382.
৩১।	২২১	„	V. O. I. Vol 7. p 297.
৩২।	২৩০	বৌদ্ধমূর্ত্তির শিলালিপি	G. I. 276.
৩৩।	২৪০ (২৩৭?)	গুহসেন	I. A. Vol 7, p. p. 67.
৩৪।	২৪৬	„	I. A. Vol 4, p 175,
৩৫।	[২]৪৭	„	I. A. Vol 14 p 75.
৩৬।	২৪৮	„	I. A. Vol 5 p 207.
৩৭।	২৫২	দ্বিতীয় ধরসেন	Bh. I. p 31.
৩৮।	২৫২	„	G. I. p 165.
৩৯।	২৫২	„	I. A, Vol 7. p 68.
৪০।	২৫২	„	I. A. Vol. VIII. p 301.
৪১।	২৫২	„	Bh. I. p 35.
৪২।	২৬৯	দ্বিতীয় ধরসেন	I. A. Vol VI. p 11.
৪৩।	২৬৯(?)	মহানাম	G. I. p 276.
৪৪।	২৭০	দ্বিতীয় ধরসেন	I. A. Vol VII. p 71.
৪৫।	২৮৬	শীলাদিত্য, প্রথম ধর্ম্মাদিত্য	I. A. Vol I. p 46.
৪৬।	২৮৬	„	I. A. Vol 14. p 329
৪৭।	২৯০	„	I. A. Vol IX. p 238.
৪৮।	৩১০	ধ্রুবসেন দ্বিতীয়, বালাদিত্য, ধর্ম্মাদিত্য	I. A. Vol VI. p 13 Bh. I. p 40.
৪৯।	৩১৬ (বা ৩১৮)	প্রথম শিবদেব, অংশুবর্ম্মা	I. A. Vol 14. p 98. Prof Bendal's Journey
৫০।	৩২৬	চতুর্থ ধরসেন	J. B. R. A. S. Vol X p 77. I. A. Vol I. p 14.

৫১।	৩২৬	চতুর্থ ধ্রুবসেন	I. A, Vol I. p 45.
৫২।	৩৩০	চতুর্থ ধরসেন	I. A. Vol Vol VII. p 73.
৫৩।	৩৩০	"	I A. Vol 15. p 339.
৫৪।	৩৩৪	তৃতীয় ধ্রুবসেন	E I. Vol. I. p 86.
৫৫।	৩৩৭	দ্বিতীয় খরগ্রহ	I A. Vol VII. p 76.
৫৬।	৩৫০	তৃতীয় শীলাদিত্য	E I. Vol 1V. p 76.
৫৭।	৩৫২	"	I A. Vol XI. p 306. Bh. p 45
৫৮।	৩৬৫ (?)	"	J. B. R. A, S. Vol VII. p 968.
৫৯।	৩৭২	চতুর্থ শীলাদিত্য	IA. Vol 5. p 209.
৬০।	৩৭৫	"	VOJ Vol I. p 253. Bh. 30 p 55
৬১।	৩৭৬	শীলাদিত্য (চতুর্থ)	ডাক্তার বরগেসের প্রতিলিপি হইতে
৬২।	৩৮২	"	ডাক্তার ফ্লীটের প্রতিলিপি হইতে
৬৩।	৩৮৬	মানদেব	I A. Vol IX. p 168.
৬৪।	৪০৩	পঞ্চম শীলাদিত্য, মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর	J. B. R A S. Vol 11, p 335
৬৫।	৪০৩	পঞ্চম শীলাদিত্য	J. B. R. A. S. Vol XI. p 335.
৬৬।	৪১৩	মানদেব	I A. Vol IX. p 167.
৬৭।	৪৩৫	বসন্তসেন	IA. Vol IX. p 167.
৬৮।	৪৪১	ষষ্ঠ শীলাদিত্য	IA. Vol VI. p 17.
৬৯।	৪৪৭	শীলাদিত্য সপ্তম ধ্রুবট	G. I, p 173.
৭০।	৫৩৫	"	IA. Vol IX. p 168.
৭১।	৫৮৫	জৈনক	IA. Vol II. 257.
৭২।	৮৫০	ভাববৃহস্পতি	VOJ. VOl III. p 7.
৭৩।	৮৫০ (?)	চালুক্য কুমারপাল	Bh I. p 184.
৭৪।	৯১১	বেলানা শিলালিপি	Bh I. p 161.
৭৫।	৯২৭	বেরবলমূর্ত্তি-শিলালিপি	E I. Vol III. p 303.
৭৬।	৯৪৫	অর্জ্জুনদেব	বেরাবল শিলালিপি

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

সম্বোধন*

এবারকার সম্বোধনে আমি পুরাণ বাঙ্গালার কথা কহিব। মুসলমানদিগের বাঙ্গালায় আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা যে সকল গান, ছড়া, দোঁহা লিখিয়াছিলেন, তাহারই কথা বলিব। গত বৎসর এই সকলের কতক আভাস দিয়াছি, চারি জন পদকর্ত্তার নাম, জীবন-চরিত ও পদের বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়াছি, এবার তাহাই একটু বিস্তার করিয়া বলিব। গত বৎসর যে দুই একটা ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছে, এবার তাহা শুদ্ধ করিয়া দিব। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি এখন যাহা বলিব, তাহা সবই একেবারে ঠিক; কারণ, আমাদের সামগ্রী অল্প, পুথিপাঁজী অল্প পাওয়া গিয়াছে, পুথিপাঁজীর খোঁজও অল্প হইয়াছে। অধিক পুথিপাঁজী হাতে আসিলে, অধিক খোঁজ হইলে এখন যাহা ঠিক বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার অনেক বদলাইয়া যাইতে পারে।

যে সকল পুথিপাঁজী পাওয়া গিয়াছে অথবা যে সকল পুথিপাঁজীর খোঁজ হইয়াছে, তাহাকে তিন ভাগ করা যাইতে পারে; এক ভাগ সঙ্কীর্ত্তনের পদ, এক ভাগ দোঁহা ও এক ভাগ গাথা। গত বৎসর সঙ্কীর্ত্তনের চারি জন পদকর্ত্তার নাম দিয়াছিলাম, তাঁহাদের জীবন-চরিতের কিছু কিছু ঘটনা দিয়াছিলাম ও তাঁহাদের গানের নমুনা দিয়াছিলাম। এবার তেত্রিশ জনের নাম দিব এবং তাঁহাদের জীবন-চরিত সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায় দিব, এবং সম্ভব হইলে তাঁহাদের গানেরও নমুনা দিব।

গত বৎসর অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, আমার তোলা গানগুলি সব বাঙ্গালা নাও হইতে পারে। আমার যে সেরূপ সন্দেহ ছিল না, তাহাও নহে। সেই জন্য এ বৎসর আমি দুইটি কার্য্য করিয়াছি। একজন ফরাসীস্ পণ্ডিত তেঙ্গুরের ১০৮ হইতে ১৭৯ বাণ্ডিলে যত তন্ত্রের পুথি আছে, তাহার এক তালিকা দিয়া গিয়াছেন। ঐ তালিকায় গ্রন্থকারের নাম, তর্জ্জমা-কারের নাম, অনেক স্থলে যে স্থানে বসিয়া তর্জ্জমা হয়, সেই স্থানের নাম এবং কয়েক স্থলে যাঁহারা এই তর্জ্জমা শোধন করিয়াছেন, তাঁহাদেরও নাম দিয়া গিয়াছেন। যে ফরাসীস্ পণ্ডিত এই তালিকাটি ছাপাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম P. Cordier—তিনি ফরাসডাঙ্গার ডাক্তার সাহেব ছিলেন, তাঁহার সহিত আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি অনেক সময় আমার বাড়ী আসিতেন, আমিও অনেক সময় তাঁহার বাড়ী যাইতাম। তিনি এখান হইতে পণ্ডিচেরীর ডাক্তার সাহেব হইয়া যান, সেখান হইতে প্যারি নগরে কিছু কাল বাস করিয়া আবার পূর্ব্ব উপদ্বীপে ফরাসীদের যে রাজ্য আছে, তাহার ডাক্তার সাহেব হইয়া আসেন। অল্প দিন হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় ও তিব্বতীয় পুথিপাঁজীর অনেক খোঁজ রাখিতেন।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ সাংবৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় পাঠ করেন।

বৈষ্ণ-শাস্ত্রের পুথির উপর তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি প্রায় চারি পাঁচ শত বৈষ্ণ-শাস্ত্রের পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তালিকাতে যত গ্রন্থকার, তর্জ্জমাকার, শোধক ও স্থানের নাম পাওয়া গিয়াছে, আমি তাহার একটি অকারাদিক্রমে সূচি প্রস্তুত করিয়াছি। সে সূচিতে যাঁহাকে বাঙ্গালী অথবা বাঙ্গালা দেশের লোক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার যদি বাঙ্গালা সঙ্কীর্ত্তনের পদ থাকে, সে পদ যে খাঁটি বাঙ্গালা, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া লইয়াছি। পরে তাঁহার সেই পদগুলিতে যত শব্দ পাওয়া গিয়াছে, অকারাদিক্রমে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া সে কালের বাঙ্গালা ও এ কালের বাঙ্গালায় কি তফাৎ, তাহা দেখিয়া লইয়াছি। তাহাতে সে কালের বাঙ্গালার ব্যাকরণ ও অভিধান সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হইয়াছে। সেই ধারণা লইয়া অন্য যে সকল পদ পাইয়াছি, তাহারও অকারাদি ক্রমে সূচি করিয়া লইয়া মিলাইয়াছি। তাহাতে যে সকল পদ বাঙ্গালা বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাকে বাঙ্গালা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই। এক জন পদকর্ত্তার বাড়ী উড়িষ্যা দেশে, তাঁহার গানটিও উড়িয়া ভাষায় লিখিত। তাহাতে বাঙ্গালায় যেখানে ক্রিয়ার শেষে 'ল' থাকে, তাহাতে সেখানে 'ড়' আছে; যেমন 'গাহিল'—'গাহিড়'। সে পদটিকে আমি উড়িয়া ভাষার পদ বলিয়া স্থির করিয়াছি। এইরূপে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে ফল হইয়াছে, তাহাই আজ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। অকারাদিক্রমে প্রতি পদকর্ত্তার গানের প্রত্যেক কথার সূচি প্রস্তুত করিতে আমি দুই জন লোকের নিকট বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। একজন শ্রীযুক্ত বাবু ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার ভ্রমণকারী পণ্ডিত, আর একজন সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানার মালিক, শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। বসন্ত বাবুর বয়স কত জানি না, কিন্তু তাঁহার দাড়ী সব পাকিয়া গিয়াছে; কিন্তু এ বয়সেও যেরূপ উৎসাহের সহিত সূচী প্রস্তুত বিষয়ে আমার সহায়তা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি পরিষৎ হইতে ছুটি লইয়া রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত আমার ওখানে কাজ করিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষায়, উড়িয়া, হিন্দী, আসামী প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার যে ব্যুৎপত্তি আছে, তাহাতেও আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে।

(১) একটু পুনরুক্তি-দোষ হইলেও গত বৎসর যে চারি জন পদকর্ত্তার কথা কহিয়াছি, এবারেও তাঁহাদের কথা কিছু কিছু বলিতে হইবে। সে দোষ আপনারা লইবেন না। যে তেত্রিশ জন পদকর্ত্তার নাম করিব, তাঁহাদের প্রথমেই লুইপাদের নাম করিতে হয়; কারণ, তেঙ্গুরে বাঙ্গালী বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ আছে। তাঁহার সম্বন্ধে আর যে যে খোঁজ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং এখানে বলিবার দরকার নাই। আমি স্থির করিয়াছি যে, তিনি রাঢ়দেশের লোক ছিলেন। তিনি এক নূতন সম্প্রদায় চালাইয়া যান। তাঁহাকে আদি-সিদ্ধাচার্য্য বলে। তাঁহার সম্প্রদায়ের লোক সকলেই সিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যে বাঙ্গালী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃতে তাঁহার চারিখানি পুস্তক আছে। একখানির নাম 'বজ্রসত্ত্বসাধন',—এখানি পুরুতের পুথি। একখানি 'বুদ্ধোদয়',—এখানি অতি

ছোট। তাঁহার নিজের মতে কি প্রকারে বুদ্ধের জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহারই কথা। বাকি দুখানি অভিসময়ের পুথি;—একখানি 'শ্রীভগবদভিসময়', আর একখানির নাম 'অভিসময়-বিভঙ্গ'। দুখানিই বড় পুথি। অভিসময় বলিতে গেলে অভিধর্ম্ম অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রের পুথি বুঝায়। হীনযানে যাহাকে অভিধর্ম্ম বলে, মহাযানে তাহাকেই অভিসময় বলে। লুইপাদের অভিসময়ের পুস্তক দুখানি তাঁহার নিজের দর্শনশাস্ত্রের মত। এই দুইখানি ছাড়া তিনি একখানি বাঙ্গালা পুথি লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'তত্ত্বস্বভাব-দোহাকোষগীতিকা দৃষ্টি'। এ পুস্তকখানি আমরা পাই নাই, কিন্তু এখানি যখন দোঁহাকোষ, তখন এখানি নিশ্চয় বাঙ্গালা। এতদ্ভিন্ন 'লুহিপাদগীতিকা' নামে তাঁহার একখানি বাঙ্গালা সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলী আছে। উহার দুইটি পদ আমরা পাইয়াছি। উহাতে তিরানব্বইটি কথা আছে। উহার মধ্যে ষোলটি সংস্কৃত শব্দ—সবগুলি আজও বাঙ্গালায় চলিতি আছে,—যথা 'আগম', 'উদক', 'উহ', 'করণক', 'কাল', 'চঞ্চল', 'চিহ্ন', 'তরু', 'ন', 'পঞ্চ', 'পরিমাণ', 'বর', 'বেণি', 'ভাব', 'রে', 'সুখ'। চুয়াল্লিশটি বাঙ্গালা শব্দের প্রাচীন অবস্থা দেখাইতেছি; যথা—'অচ্ছম', 'আহ্মে', 'আস', 'এড়িএউ', 'করিঅ', 'করিঅই', 'কাআ', 'কাহি', 'কাহেরে', 'কিষ', 'কীষ', 'কো', 'চান্দ', 'ছান্দক', 'জা', 'জাই', 'জাহের', 'জিম', 'তাহের', 'দিট', 'দিবি', 'দিস্', 'দুখেতেঁ', 'পতিআই', 'পাথ', 'পুচ্ছিঅ', 'বইঠা', 'বখানী', 'বট', 'বান', 'বান্ধ', 'বিলসই', 'ভণই', 'ভণি', 'ভাইব', 'ভিতি', 'মরিআই', 'মিচ্ছা', 'লই', 'লাহু', 'সাচ', 'সাণে', 'সো', 'হোই',। আটটি চলিত বাঙ্গালা—'জান', 'জানি', 'ডাল', 'ভুলকৃথ', 'পাটের', 'পাস', 'লাগে' 'সুনু', এই আটটি। প্রাকৃত শব্দ কুড়িটি—'অইস', 'কইসে', 'চীএ', 'ণ', 'ণা', 'তীঅধাএ', 'দিঠা', 'নিচিত', 'পইঠো', 'পাণ্ডি', 'পিরিচ্ছা', 'বি', 'বিণাণা', 'বেএঁ', 'মই', 'মহাসুহ', 'রায়', 'সংবোহেঁ', 'সঅল', 'সমাহিঅ', 'সুহ',। লুই ও লূই দুইটিই পদকর্ত্তার নাম। 'ধমন' আর 'চমন' কি কথা, জানি না; পারিভাষিক শব্দ বোধ হয়।

লুইএর গানে সম্বন্ধ-পদ 'র' দিয়াও হয়, আবার 'ক' দিয়াও হয়, যথা—'করণক', 'পাটের'। অধিকরণ 'একার' দিয়াও হয়, 'তেঁ' দিয়াও হয়, যথা—চীএ, সাণে ও 'দুখেতেঁ'; 'এঁ' দিয়াও হয়, যথা—'সম্বোহেঁ'। কর্ত্তা ও কর্ম্মে কোন বিভক্তি নাই। 'পইঠো কাল' কোন বিভক্তি নাই। 'সুনু পাখ ভিতি লাহুরে পাস'। 'গুরু পুচ্ছিঅ' ইত্যাদি।

(২) লুইএর একজন বংশধর কিলপাদ। তিনি আচার্য্য এবং সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার এক পুস্তক আছে 'দোঁহাচর্য্যাগীতিকাদৃষ্টি', এ পুস্তক আমরা পাই নাই, কিন্তু ইহা যে বাঙ্গালীর লেখা ও বাঙ্গালায় লেখা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(৩) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বাড়ী বাঙ্গালা দেশে। তিনি যে 'একবীরসাধন' ও 'বলবিধি' নামে দুইখানি বই লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বাঙ্গালী বলিয়া তাঁহার নাম আছে। এক জায়গায় তিনি আচার্য্য, পিণ্ডপাতিক, বাঙ্গালী, আর এক জায়গায় তিনি মহাচার্য্য, ভিক্ষু ও বাঙ্গালী। দুই জায়গায়ই তাঁহার জুটিয়া নাম 'অতিশ' দেওয়া আছে। কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহাকে

ভারতবাসী বলিয়াও উল্লেখ করা আছে। যে সকল জায়গায় ভারতবাসী বলিয়া তাঁহার নাম আছে, তাহার অনেক স্থানেও তাঁহার ভুটিয়া নামও দেওয়া আছে। অনেক স্থানে তাঁহাকে হয় কেবল আচার্য্য, কেবল উপাধ্যায় বা কেবল পণ্ডিত বলিয়া বলা আছে; সেখানে ভারতবাসীও নাই, বাঙ্গালীও নাই। ইহাতে মনে হয় যে, দুই জন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন। একজন সামান্য পণ্ডিত বা উপাধ্যায় ছিলেন, আর একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহাঁকেই তিব্বতরাজ ১০৩৮ সালে বিক্রমশীল হইতে তিব্বতে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় ইনিই বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার এবং বনপা ধর্ম্মের পুরোহিত-দের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া দেন। ইনি একজন প্রকাণ্ড পুরুষ ছিলেন, অসাধারণ পণ্ডিত এবং অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। তিব্বতে গিয়া ইহাঁরই নাম 'অতিশা' হইয়াছিল। ইহাঁকেই কোন কোন তর্জ্জমায় বঙ্গবাসী বলিয়াছে, কোন কোন তর্জ্জমায় বা ভারতবাসী বলিয়াছে। কারণ, দুই ব্যক্তির ভারতবর্ষীয় নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও তিব্বতীয় নাম অতিশা হওয়া অনেকটা অসম্ভব। তাই আমরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বাঙ্গালী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। তাঁহার অনেকগুলি সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলী ছিল। একখানির নাম 'বজ্রাসনবজ্রগীতি', একখানির নাম 'চর্য্যাগীতি' এবং একখানির নাম 'দীপঙ্করশ্রীজ্ঞানধর্ম্মগীতিকা'। আমার এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের সৌভাগ্য বড় কম ছিল না। এত বড় প্রকাণ্ড পণ্ডিতও মাতৃ-ভাষায় পদ রচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আর আমাদের বাঙ্গালা গ্রন্থকারদের মধ্যে যদি সত্য সত্যই আমরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মত জগদ্বিখ্যাত লোক পাই, সেটা কি আমাদের আনন্দের ও গৌরবের বিষয় নহে?

(৪) 'শান্তিদেব' বা 'ভুসুকু' বা 'রাউতু' যে একজন লোক, তাহা আমি গত বৎসর প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে শান্তিদেব 'বোধিচর্য্যাবতার', 'সূত্রসমুচ্চয়' ও 'শিক্ষা-সমুচ্চয়' লিখিয়াছেন, তিনিই ভুসুকু, তিনিই ভুসুকু নামে একখানি বৌদ্ধস্মৃতি লিখিয়া-ছিলেন এবং তিনিই কতকগুলি চর্য্যাপদ লিখিয়াছিলেন। তিনি একটি চর্য্যাপদে লিখিয়াছেন,—

"আজি ভুসু বাঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥"

একটি চর্য্যাপদে তাঁহার এই পদটি দেখিয়া আমি তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়াছিলাম। আমাদের তেঙ্গুরের সূচিতে ভুসুকুর নাম নাই। শান্তিদেবের নাম তিন জায়গায় আছে। 'শ্রীগুহ্যসমাজমহাযোগতন্ত্রবলিবিধি' নামক পুস্তকে তাঁহাকে 'সাহোর' নামক স্থানের লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। 'চিত্তচৈতন্যশমনোপায়' নামক একখানি পুস্তক তাঁহারই বংশধর মেকলের মত অনুসারে লেখা হয়। 'সহজগীতি' নামে তাঁহার একখানি কীর্ত্তনের পদাবলী আছে। ইহাতে তাঁহাকে যোগীশ্বর বলিয়াছে। আমার বোধ হয়, আমরা ভুসুকুর নামে যে আটটি চর্য্যাপদ পাইয়াছি, তাহা এই যোগীশ্বর শান্তিদেবের 'সহজ-গীতি' হইতেই লওয়া হইয়াছে। এ শান্তিদেবের বাড়ী সাহোর বা জাহোর কোথায়,

জানি না। তিনি "আজি ভুসু বাঙ্গালী ভৈলী" বলাতেই আমরা তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করিয়াছি। লাহোর বা সাহোর বাঙ্গালারই কোন অজ্ঞাত নগর হইবে। তাঁহার আটটি গানে তাঁহার নাম ভুসুকু বাদে ৩২৩টি কথা আছে। ইহার মধ্যে ৩৭টি সংস্কৃত; ৬৮টি বিকৃত সংস্কৃত, ১৮৬টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৩২টি চলিত বাঙ্গালা।

সাঁইত্রিশটি সংস্কৃত শব্দের মধ্যে সমরস, সহজানন্দ ও বিরমানন্দ বৌদ্ধধর্ম্মের শব্দ, বাকি-গুলি ঠিক এই ভাবে আজিও চলিতেছে। কেবল উহ চলে না, কিন্তু উহু চলে; খ চলে না, কিং চলে না, মা চলে না। বাকিগুলি বেশ চলে। বাঙ্গালা বত্রিশটি ত চলেই, বাঙ্গালার পূর্ব্বাভাষ যে ১৮৬টি কথা আছে, তাহা সে কালের বাঙ্গালায় চলিত। বাকি যে ৬৮টি কথা, ভুসুকু তাহার সংস্কৃত উচ্চারণ বদলাইয়াছেন, তাহারও অধিকাংশ প্রাচীন বাঙ্গালায় চলিত। ইহার মধ্যে অনেকগুলি কেবল বানান বদলান মাত্র—যেমন ষষহর, ষহজ, সসর, সেস। এগুলি লেখকের ভুল হইতে পারে, অথবা সে কালের লোক বানানটা বড় গ্রাহ্য করিত না। সম্বন্ধের বিভক্তি 'র', অধিকরণের বিভক্তি 'এ' বা 'এঁ' সম্পূর্ণ বাঙ্গালা। হিয়হিঁ, রহিঁ মাগধীর অধিকরণ কারক। "অচ্ছসি"র মধ্যম পুরুষের এক-বচনে সি, প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহার হইত। অনুজ্ঞায় 'অচ্ছহু'র 'হু'ও প্রাচীন বাঙ্গালায় দেখা যায়। জানমির উত্তম পুরুষের 'মি'ও প্রাচীন বাঙ্গালায় অনেক স্থলে দেখা যায়। সুতরাং ভুসুকুর ভাষা আমরা অনায়াসেই প্রাচীন বাঙ্গালা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

(৫) কৃষ্ণপাদ, কৃষ্ণাচার্য্য, কৃষ্ণবজ্র বা কাহ্নুপাদ সর্ব্বশুদ্ধ ৫৭ খানি বই লিখিয়া গিয়া-ছেন। তাহার মধ্যে দুইখানি বাঙ্গালা, একখানি দোঁহাকোষ, আর একখানি কাহ্নুপাদ-গীতিকা। আমরা কৃষ্ণাচার্য্যের ১২টি সঙ্কীর্ত্তনের পদ পাইয়াছি। কিন্তু তিনি কোন্ দেশের লোক, তাহা লইয়া বিশেষ গোল আছে। তেঙ্গুরে পনর জায়গায় তাঁহাকে ভারতবাসী বলিয়া গিয়াছে। কেবল এক জায়গায় লেখা—তিনি ব্রাহ্মণ, উড়িষ্যা হইতে আগত, সেও আবার তর্জ্জমাকার মহাপণ্ডিত কৃষ্ণ, তিনি গ্রন্থকার নহেন। সুতরাং তেঙ্গুরের লেখা হইতে পদকর্ত্তা কৃষ্ণের বাসস্থান নির্ণয় হইবে না। তাহার পর আবার কৃষ্ণ, কানু অনেক লোকের নাম হইতে পারে। এই যে ৫৭ খানি গ্রন্থের গ্রন্থকার একই কৃষ্ণ, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কোন জায়গায় কৃষ্ণকে মহাচার্য্য বলা হইয়াছে, কোন জায়গায় মহাসিদ্ধাচার্য্য, কোন জায়গায় উপাধ্যায়, কোন জায়গায় মণ্ডলাচার্য্য বলা হইয়াছে। এক জায়গায় আবার তাঁহাকে ছোট কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। পাঁচ জায়গায় তাঁহাকে কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নুপাদ বলা হইয়াছে। সুতরাং তেঙ্গুর হইতে যখন তাঁহার বাড়ী ঠিক হইল না, তখন তাঁহার ভাষা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে। তাঁহার গানগুলিতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৩৮টি শব্দ আছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত শব্দ ৬৮টি। তাহার মধ্যে ৪টি বৌদ্ধ শব্দ, যথা—এবংকার, তথতা, তথাগত আর দশবল। আর তিনটি কথা বাঙ্গালায় চলিত নাই, যথা—উ, মা ও ভবপরিচ্ছিন্না, বাকি ৬০টি শব্দ এখনও বাঙ্গালায় চলিতেছে। ৫৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা বাঙ্গালাতেই চলে,

অন্য কোন নিকটবর্ত্তী ভাষায় চলে না। ১৮৬টি শব্দ আমরা বাঙ্গালা পুরাণ পুথিতে দেখিতে পাই—এখনকার বাঙ্গালায় এই সকল শব্দ হইতে উৎপন্ন শব্দ চলিতেছে, যেমন—বোব্=বোবা, বোল—বুলি, ভলি—ভাল, দেহু—দে, মালী—মালা ইত্যাদি। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, অথচ বঙ্গালায় প্রচলিত নাই, এমন ১২৯টি শব্দ আছে। উহার মধ্যে কতগুলি শব্দ যথা—আইস, কৈসন, কইসেঁ ইত্যাদি পুরাণ বাঙ্গালায় চলিত ছিল, কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন কোন শব্দ এখন বাঙ্গালায় চলিত নাই, বরং নিকটবর্ত্তী ভাষায় চলিত আছে।

এই সকল দেখিয়া পদকর্ত্তা কৃষ্ণপাদ বা কাহ্নুপাদের ভাষা বাঙ্গালা বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ দেখি না। চলিত বাঙ্গালার মধ্যে ছিনালী, জৌতুক, টাল প্রভৃতি শব্দ একেবারেই বাঙ্গালা ভিন্ন ব্যবহার হয় না।

অলি এঁ কালি এঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা॥
কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মন গোঅর সো উআস॥

*　*　*　*
*　*　*　*

জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণা গবণে কাহ্নু বিমন ভইলা॥

কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নুপাদের বংশধরেরা অনেকেই বাঙ্গালায় গান ও দোঁহা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে সরহ, ধর্ম্মপাদ, ধেতন, মহিপাদের বাঙ্গালা গান আমরা পাইয়াছি।

৬। ধামপাদ বা ধর্ম্মপাদ

ধামপাদের আর এক নাম গুণ্ডরীপাদ। মূল গানে ধামপাদ থাকিলেও পুথিতে তাঁহার গানের মাথায় তাঁহাকে গুণ্ডরীপাদ বলা হইয়াছে। তাঁহার গানের মধ্যে আমরা দুইটি পদ পাইয়াছি। এই দুইটিতেই ৯২টি শব্দ আছে। তার মধ্যে ২১টি সংস্কৃত, ইহার মধ্যে একমাত্র মণিকুল শব্দটি বৌদ্ধ, আর সবগুলিই বাঙ্গালায় চলিত আছে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৪টি শব্দ আছে। সে সকল শব্দ বাঙ্গালীর বুঝিবার কোন ক্লেশ হয় না, যথা,—ধুম, ধূম=ণবগুণ =নবগুণ, মুহ=মুখ, বাহ্ম=ব্রাহ্ম, সুজ=সূর্য্য ইত্যাদি; কেবল একটু বানানের পরিবর্ত্তন। ৪৪টি পুরাণ বাঙ্গালা কথা আছে, তার মধ্যে "কুন্দুরে" একটি বৌদ্ধ শব্দ, বাকিগুলি পুরাণ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। তেরটি চলিত বাঙ্গালা, সবগুলি কথাবার্ত্তায় চলে। ধর্ম্মপাদের বাঙ্গালা বইএর নাম "সুগতদৃষ্টিগীতিকা"।

জোইণি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥

এইগুলিতে যেন বৈষ্ণব কবির ঝঙ্কার পাওয়া যায়।

৭। ধেতন বা ঢেণ্‌ঢেণ

ভোটবাসীরা ঢেণঢণ উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া ধেতন বলিয়াছে। ইহাঁর একটি গান পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে ৪৩টি শব্দ আছে। তাহার মধ্যে ৩টি সংস্কৃত, উহা আজও চলিত আছে, ৩টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, বেশ বুঝা যায়। ২৪টি পুরাণ বাঙ্গালা এবং ১৩টি চলিত বাঙ্গালা; কথাবার্ত্তায় চলে।

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী।
হাড়ীত ভাত নাহিঁ নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড়্‌হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে যামায়॥
বলদ বিআএল গবিয়া বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে॥
জো সো বুধী সো ধনি বুধী।
জো যো চৌর সোই সাধী॥
নিতে নিতে ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।
ঢেণ্ঢণ পাএর গীত বিরলে বুঝঅ॥

৮। মহীধর বা মহীপাদ

ইহাঁর একটি গান পাওয়া গিয়াছে, উহাতে ৬৩টি কথা আছে। তার মধ্যে ১৪টি সংস্কৃত, সবগুলি বাঙ্গালায় চলে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৩টি শব্দ। পুরাণ বাঙ্গালা ৩৪টি এবং এখনকার চলিত বাঙ্গালা ৩টি শব্দ আছে। ইহাঁর গ্রন্থের নাম বায়ুতত্ত্বগীতিকা।

তিনি এঁ বাটে লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই॥

৯। সরহ বা সরোরুহবজ্র

ইনি সরোজবজ্র, পদ্ম, পদ্মবজ্র ও রাহুলভদ্র নামে পরিচিত। ইহাঁর অনেকগুলি দোঁহা-কোষ ও গীতিকা আছে। একখানির নাম দোঁহাকোষগীতি, একখানির নাম দোহাকোষ চর্য্যাগীতি, একখানির নাম দোঁহাকোষ উপদেশগীতি। দোঁহাকোষমহামুদ্রোপদেশ, "ভাবনাদৃষ্টিচর্য্যাফলদোঁহাকোষগীতিকা", "মহামুদ্রোপদেশবজ্রগুহ্যগীতি","ডাকিনীবজ্রগুহ্যগীতি", "তত্ত্বোপদেশ শিখরদোঁহাগীতি" পুথিগুলিও তাঁর।

আমরা ইহাঁর ৪টি চর্য্যাগীতি পাইয়াছি। ২৪টি সংস্কৃত শব্দ আছে, সবগুলিই বাঙ্গালায় চলিতেছে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ৩৫টি শব্দ আছে, তাহার অল্প বিস্তর বানান বদলাইলেই সংস্কৃত হইয়া যায়। ৯৫টি পুরাণ বাঙ্গালা কথা আছে ও ২৮টি চলিত বাঙ্গালা শব্দ আছে।

অপণে রচি রচি ভবনির্ব্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা॥
অম্ভে ন জাণহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই।
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো॥
জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কংথা॥

সরোরুহবজ্রের দোঁহাকোষের কথা আমরা গত বৎসর বলিয়াছি, তাই এ বৎসর বলিব না। কিন্তু তিনি যে একখানি দোঁহাকোষ লিখিয়াছিলেন, এমন নহে; তিনি অনেকগুলি দোঁহা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একখানি দোঁহার নাম "কথস্থ দোহা", ইহার টীকাও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি গাথাও আছে। ইনি সে কালে অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃতে ইহাঁর তান্ত্রিক পুস্তক অনেকগুলি আছে।

১০। কম্বলাম্বরপাদ

ইহাঁকে কখনও কখনও শুদ্ধ কম্বল এবং বাঙ্গালায় কামলি বলিয়া থাকে। ইনি "প্রজ্ঞাপারমিতা উপদেশ" নামে একখানি মহাযানের পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহাঁর অধিকাংশ পুস্তকই বজ্রযান-সম্প্রদায়ের জন্য লেখা। ইনি নিজে যুগনদ্ধ হেরুকের উপাসনা করিতেন এবং ঐ উপাসনাক্রম লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর বাঙ্গালা পুস্তকের নাম "কম্বলগীতিকা।" আমি ইহাঁর একটি গান পাইয়াছি; তাতে ৪টি সংস্কৃত শব্দ আছে; করুণ, বহু, বাস, সদ্‌গুরু; সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন শব্দ চারিটি আছে—উই, কইসে, গঅণ, মহাসুহ। চলিত বাঙ্গালা ৯টি,—উপাড়ি, কি, কে, গেলি, চাপি, নাহি, মেলিল, মেলিমেলি, মিলিল। আর পুরাণ বাঙ্গালা ২২টি।

খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছি॥

কম্বলাম্বরের এক শিষ্যের নাম প্রজ্ঞারক্ষিত, ইনিও কম্বলের মতানুসারে বজ্রযানের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

১১। কঙ্কণ

ইনি কম্বলাম্বরের বংশধর; চর্য্যাদোঁহাকোষগীতিকা নামে ইহাঁর একখানি পুঁথি

আছে। ইহাঁর একটি গান পাইয়াছি, তাতে চারিটি সংস্কৃত শব্দ, ৮টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ১৯টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৮টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে, উহার মধ্যে বিহাণ=প্রাতঃকাল, থাকি, সুন=শূন্য।

১২। বিরূপ

ইনি সিদ্ধাচার্য্য ও যোগীশ্বর ছিলেন। ইনি বজ্রযান ও কালচক্রযানের পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহাঁর একখানি পুস্তকের নাম ছিন্নমস্তাসাধন, আর একখানির নাম রক্তযমারিসাধন। ইহাঁর চারখানি গানের বই আছে;—বিরূপগীতিকা, বিরূপপদচতুরশীতি, কর্ম্মচণ্ডালিকা-দোঁহাকোষগীতি, বিরূপবজ্রগীতিকা। ইহাঁর একটি মাত্র গান পাইয়াছি; তাতে ৬টি সংস্কৃত শব্দ, ২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ১৯টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ১২টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। গানের নমুনা,—

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥
সহজে থির করি বারুণী সান্ধে।
জেঁ অজরামর হোই দিট কান্ধে॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ॥

১৩। শান্তি

সিদ্ধাচার্য্য শান্তির আমরা দুইটি গান পাইয়াছি। তেঙ্গুরে অনেকগুলি শান্তির নাম আছে, তিনি যে কোন্ শান্তি, তা বলিতে পারি না। একখানি সহজগীতি আছে, সেখানি শান্তিদেবের। এই শান্তিদেবই যে ভুসুকু বা রাউতু, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ, একখানি অতি পুরাতন তালপাতার পুথিতে তাঁহাকে ভুসুকু ও রাউতু এই দুইটি নাম দিয়াছে। সুরতাং সিদ্ধাচার্য্য শান্তি কে, আমরা স্থির করিতে পারি না। দশম শতকে রত্নাকরশান্তি নামে একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি বিক্রমশিলার দ্বার রক্ষা করিতেন। তাঁহার অনেক পুস্তক আছে। ন্যায়শাস্ত্রের অতি গূঢ় কথা যে অন্তর্ব্যাপ্তি, তিনি তারও উপর বই লিখিয়া গিয়াছেন। বজ্রযান ও কালচক্রযানের উপর তাঁহার অনেক পুস্তক ছিল। সহজযানের উপরও তিনি "সহজরতিসংযোগ" ও "সহজযোগক্রম" নামে দুইখানা বই লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যদি আমাদের পদকর্ত্তা শান্তি হন, তবে পদকর্ত্তাদের মধ্যে আমরা আর একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত পাইলাম। ইনি যে রত্নাকরশান্তি, তাহা মনে করিবার কারণ এই যে, সুখদুঃখদ্বয়পরিত্যাগদৃষ্টি নামে তেঙ্গুরে যে সহজযানের গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাতে সিদ্ধাচার্য্য শান্তিকেই রত্নাকর শান্তি বলা হইয়াছে। শান্তির দুইটি গানে অতি সহজ সংস্কৃত শব্দ ১৩টি, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৯টি, প্রাচীন বাঙ্গালা ৫৫টি, আর চলিত বাঙ্গালা ১৩টি শব্দ আছে।

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু॥
তউষে হেরুঅ ণ পাবি অই।
শান্তি ভণই কিণ সভাবি অই॥
তুলা ধুণি ধুণি সুনে অহারিউ
পুণ লইআঁ অপনা চটারিউ।
বহল বট দুই মার ন দিশঅ
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ॥
কাজ ন কারণ জএহু জঅতি
সঁএঁ সঁবেঅণ বোলথি সান্তি॥

এই গানে একটি বোলথি শব্দ আছে। আমরা যতগুলি গান পাইয়াছি, তার মধ্যে এক জায়গায় মাত্র এই কথাটি পাই। "থি" দিয়া আর একজন মাত্র ক্রিয়াপদ করিয়াছেন।

১৪। সবরপাদ বা শবরীশ্বর

ইঁহার অনেকগুলি সংস্কৃত পুথি আছে। ইঁহার একখানি পুথির নাম "বজ্রযোগিনীসাধন", উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি বজ্রযোগিনীর উপাসনা প্রচার করেন। তাঁহার কন্যা লক্ষীঙ্করা এই বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতে অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। শবরীশ্বর বা সবর সেই দলেরই লোক ছিলেন। তিনি বজ্রযোগিনী সম্বন্ধে পাঁচখানি বই লিখিয়াছিলেন; গীতি-সম্বন্ধে তাঁর দুইখানি পুস্তক আছে; একখানির নাম মহামুদ্রাবজ্রগীতি, আর একখানির নাম চিত্তগুহ্যগম্ভীরার্থগীতি। শূন্যতাদৃষ্টি নামে তাঁর আর একখানি বই আছে। আমরা তাঁহার দুইটি বড় বড় গান পাইয়াছি। এই দুইটি গানে ২৩টি সংস্কৃত শব্দ আছে, ১৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ৮৫টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ২৫টি নূতন বাঙ্গালা কথা আছে।

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই শবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরীমালী॥
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলা গুহাড়া তোহৌরি।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী॥
ণাণা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এবণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী॥

১৫। চাটিল

চাটিলের নাম তেঙ্গুরে নাই, অথচ তাঁর একটি সুন্দর গান পাইয়াছি। উহাতে ১১টি সংস্কৃত, ৮টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৫টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ২টি চলিত বাঙ্গালা শব্দ আছে।

তবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই॥

১৬। আর্য্যদেব

আর্য্যদেব নামে মহাযান-মতের একজন বড় লেখক ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় তিন শতকে অনেকগুলি সংস্কৃত বই লিখিয়া মহাযান-মতকে উচ্চ হইতে অতি উচ্চে তুলিয়া গিয়াছেন। আমাদের আর্য্যদেব তিনি নন। আমরা আর্য্যদেবের একটি গান পাইয়াছি। উহাতে ২টি সংস্কৃত, ৯টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৫টি পুরাণ বাঙ্গালা ও দুইটি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। আমাদের আর্য্যদেব (বা আজদেব) কাণেরিন্ বা বৈরাগীনাথ নামে অনেক স্থলে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কাণেরীগীতিকা নামে একখানি বই আছে।

নমুনা—

চান্দরে চান্দ কান্তি জিম পতিভাসঅ।
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই।
ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার।
চাহন্তে চাহন্তে সুণ বিআর॥

১৭। দারিক

দারিক কালচক্র, চক্রশম্বর, বজ্রযোগিনী, কঙ্কালিনী প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে অনেকগুলি বই লিখিয়াছেন। তথতাদৃষ্টি শ্রীপ্রজ্ঞাপারমিতার উপরও তাঁর পুস্তক আছে। তিনি একটি গানে লুইকে প্রণাম করিতেছেন, তাতে মনে হয়, তিনি লুইএর শিষ্য ছিলেন। ঐ গানটিতে ১০টি সংস্কৃত, ১২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৮টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ২টি চলিত বাঙ্গালা শব্দ পাইয়াছি।

সুন করুণরি অভিন বারেঁ কাঅবাক্ চিঅ
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ।

*   *   *

রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
লুইপাঅ পএ দারিক দাদশ ভুঅণেঁ লধা॥

১৮। জয়নন্দী

জয়নন্দীর নাম তেঙ্গুরে নাই। উহাঁর একটি গান পাইয়াছি; উহাতে ৭টি সংস্কৃত, ১২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ও ২৩টি পুরাণ বাঙ্গালা শব্দ আছে।

চিঅ তথাতা স্বভাবে ষোহিঅ
ভণই জঅনন্দি ফুড় অণ ণ হোই ॥

১৯। তাড়কপাদ

ইহাঁর আমরা একটি গান পাইয়াছি ; তাতে ৮টি সংস্কৃত, ২১টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২১টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। গানের নমুনা,—

অপণে নাহিঁ সো কাহেরি শঙ্কা।
তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা ॥
অনুভব সহজ মা ভোলরে জোই।
চৌকোটি বিমুকা জইসো তইসো হোই ॥

২০। ডোম্বী

ডোম্বী হেরুক নামে মগধের এক জন রাজা ছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া যান। তাঁহাকে কখনও আচার্য্য, কখনও মহাচার্য্য ও কখনও সিদ্ধ বলা হইয়াছে। তিনি বজ্রযান ও সহজযান সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। ডোম্বীগীতিকা নামে তাঁহার এক সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলী আছে। আমরা তাঁহার একটি মাত্র গান পাইয়াছি। তাতে ৬টি সংস্কৃত ৬টি সংস্কৃত,হইতে উৎপন্ন, ৪০টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৯টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে।

তিনি ভুথণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লাড়েঁ ॥
কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।
অন্তে কুলিণ জণ মাঝেঁ কাবালী ॥

২১। ভাদে পাদ

আমরা ইহাঁর একটি গান পাইয়াছি ; তাতে ৪টি সংস্কৃত, ৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৪টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে।

এত কাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ ॥
এবেঁ চিঅরাঅ মকু ণ ঠা।
গণ সমুদে টলিআ পইঠা ॥

২২। বীণাপাদ

ইনি বিরূপের বংশধর। ইনি বজ্রডাকিনী দেবীর গুহ্য পূজার পুস্তক লিখিয়াছেন। আমরা ইহাঁর একটি গান পাইয়াছি। উহাতে ১০টি সংস্কৃত, ৫টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৩টি পুরাণ

বাঙ্গালা ও ৫টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। ইনি "সন্ধ্যাভাষায়" বীণা অবলম্বনে এই গানটি লিখিয়াছেন।

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধুতী॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা॥

২৩। কুক্কুরিপাদ

ইনি মহামায়ার উপাসক ছিলেন এবং অনেকগুলি বজ্রযানের পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার দুইটি গান পাইয়াছি; তাতে ৯টি সংস্কৃত, ৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ৫৯টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ১৪টি চলিত বাঙ্গালা কথা আছে। আমরা যে সকল ক্রিয়াপদের শেষে 'ল' বলি, ইনি প্রায় সে সমস্ত স্থলে 'ড়' ব্যবহার করিয়াছেন এবং 'ভণতি'র স্থলে 'ভণথি' করিয়াছেন।

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥
আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চৌরি নিল অধরাতী॥
অইসন চর্য্যা কুক্করি পাএ গাইড়।
কোড়িঅ মাঝে জত একু সনাইড়॥

২৪। অদ্বয়বজ্র

ইনি অনেকগুলি বাঙ্গালা বই লিখিয়া গিয়াছেন; ইহাঁর বাড়ী বাঙ্গালায় ছিল। ইহাঁর প্রধান বাঙ্গালা গ্রন্থ "দোঁহানিধিকোষপরিপূর্ণগীতিনামনিজতত্ত্বপ্রকাশটীকা", "দোঁহাকোষহৃদয়-অর্থগীতাটীকানাম", "চতুরবজ্রগীতিকা"। সুতরাং অদ্বয়বজ্র বৌদ্ধ-সঙ্কীর্ত্তনের একজন পদকর্ত্তা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁহার একটি বাঙ্গলা গানও পাই নাই।

২৫। লীলাপাদ

ইনি "বিকল্পপরিহারগীতি" নামে বৌদ্ধকীর্ত্তনের একখানি পদাবলী তৈয়ারি করিয়াছেন। গ্রন্থখানার অনুবাদ তেঙ্গুরে আছে।

২৬। সুগণ

ইনি কানেরিন্ বা আর্য্যদেবের বংশধর। ইনি রত্নাকরশান্তি-লিখিত একখানি সহজযানের গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। এঁর বাঙ্গালা বইএর নাম "দোঁহাকোষতত্ত্বগীতিকা"।

২৭। মৈত্রীপাদ

"গুরুমৈত্রীগীতিকা" নামে ইহাঁর একখানি বাঙ্গালা পদাবলী আছে।

২৮। গুরুভট্টারক ধৃষ্টিজ্ঞান

ইহাঁর দুইখানি বাঙ্গালা পদাবলী আছে। একখানির নাম "বজ্রগীতিকা", আর একখানির নাম "গীতিকা"।

২৯। মাতৃচেট

ইনি মহাযান-সম্প্রদায়ের একজন বড় গুরু। তাঁহার 'কণিকলেখ' ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। আমরা যে মাতৃচেটের কথা বলিতেছি, ইনি তাঁহার অন্ততঃ সাত শত বৎসরের পরের লোক। ইহাঁর বৌদ্ধ সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলীর নাম "মাতৃচেটগীতিকা।"

৩০। বৈরোচন

বৌদ্ধদিগের মধ্যে বৈরোচন নাম প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদিগের মধ্যে এক জনের "আচার্য্য বৈরোচনগীতিকা" নামে পদাবলী আছে।

৩১। নাড় পণ্ডিত

নাড় পণ্ডিতকে ভুটিয়ারা নারো বলে। ভুটিয়ারা ইহাঁকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ওয়াডেল সাহেব তাঁহার ভুটিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে নাড় পণ্ডিতের চেহারা দিয়াছেন। গোঁফ-দাড়ী কামানো, মাথায় লম্বা চুল, ঠিক যেন আমাদের এখনকার বাউল-সম্প্রদায়ের লোক। ইনি হেরুক ও হেবজ্র প্রভৃতি যুগনদ্ধমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন। ইহাঁর প্রভাব এক কালে ভারতবর্ষ ও তিব্বতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহাঁর তিনখানি পদাবলী আছে, দুই-খানির নাম "বজ্রগীতিকা", আর একখানির নাম "নাড়পণ্ডিতগীতিকা।"

৩২। মহাসুখতাবজ্র

ইনি "শ্রীতত্ত্বপ্রদীপতন্ত্রপঞ্জিকারত্নমালা" নামে তত্ত্বপ্রদীপের একখানা টীকা লেখেন। ইহাঁর পদাবলীর নাম "মহাসুখতাগীতিকা"।

৩৩। নাগার্জ্জুন

মহাযান-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক এবং শূন্যবাদের প্রধান আচার্য্য ইতিহাসখ্যাত নাগার্জ্জুন খৃষ্টের তিন শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। আমাদের নাগার্জ্জুন তাঁহার অনেক পরের লোক। এ্যাল্-বেরুনি বলেন যে, তাঁহার এক শত বৎসর পূর্ব্বেও একজন নাগার্জ্জুন ছিলেন। নেপালে একটি গুহা আছে, উহার নাম নাগার্জ্জুনগুহা। উহা চন্দ্রগড়ি পাহাড়ের একটি দুর্গম অংশে অবস্থিত। আমাদের নাগার্জ্জুন বোধ হয়, বেরুনী-কথিত শেষ নাগার্জ্জুন। ইহাঁর সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলীর নাম "নাগার্জ্জুনগীতিকা।"

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি পদাবলীর নাম আমরা পাইয়াছি। যথা,—"যোগি-প্রসর-গীতিকা," "বজ্রডাকিনীগীতি," "চিত্তগুহাগম্ভীরার্থগীতি।"

চৈতন্যদেবের অন্ততঃ ৬ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও পূর্ব্বভারতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণ সঙ্কীর্ত্তনের গান বাঁধিয়া ও নানা রাগ-রাগিণীতে ঐ সমস্ত গান গাহিয়া ভারতবাসীর মন বৌদ্ধ ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিতেন। তাঁহারা সচরাচর যে সমস্ত রাগিণীতে গান গাহিতেন, তাদের নাম ;—পটমঞ্জরী, গবড়া, অরু, গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধানশী, রামক্রী, বরাড়ি, শীবরী, বলাড্ডি, মল্লারি, মালশী, কহ্নুগুঞ্জরী, বাঙ্গাল ইত্যাদি।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরা গীতিকা ভিন্ন দোঁহা রচনা করিয়াছেন। এক এক সময় মনে হয় যে, এই দোঁহা হইতেই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। সরহপাদের "কথস্য দোহা" তন্ত্রের মন্ত্র নির্ম্মাণের উপযোগী। সরহপাদের এক দোঁহাকোষ আমরা পাইয়াছি। সহজযানের মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করাই এই দোঁহাকোষের উদ্দেশ্য এবং তাই করিতে গিয়া তিনি ব্রাহ্মণদিগের, ঈশ্বরবাদী-দিগের, সাংখ্যের, সৌগতদিগের, এমন কি, মহাযানেরও মতসকলের দোষ দিয়াছেন, সে কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহা ছাড়া তাঁর আরও দোঁহাকোষ ছিল, একখানির নাম "দোঁহাকোষ-নামচর্য্যাগীতি," একখানির নাম "দোঁহাকোষ উপদেশগীতি।" কৃষ্ণাচার্য্যের "দোঁহাকোষ," আমরা পাইয়াছি। উহাও সহজযানের পুস্তক। উড়িষ্যানিবাসী তেলিপের একখানি দোঁহাকোষ ছিল। বিরূপেরও একখানি দোঁহাকোষ আছে। তাহার পুষ্পিকায় লেখা আছে, উহা একখানি সংগ্রহ মাত্র। বিরূপ, কৃষ্ণ, শান্তিকপাদ, পুরপাদ এবং শ্রীবৈরোচন-এই কয়জনের দোঁহা লইয়া উহাতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অনেক সময় গাথা রচনা করিতেন। গাথা রচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। রাজেন্দ্রলাল উহাকে "গাথাভাষা"ই বলিয়া গিয়াছেন। সেনার উহাকে মিশ্র সংস্কৃত বলিয়া গিয়াছেন। ঐ ভাষায় যে বহু দিন পর্য্যন্ত গাথা রচনা হইতেছিল, এ কথা কিন্তু কেহই জানিতেন না। "শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা রত্ন-সঞ্চয়-গাথা" খৃষ্টের অন্ততঃ ৬ষ্ঠ শতকে লেখা হয়। কারণ, পাঁচ শতকের পূর্ব্বে "শতসাহস্রিকা"ই ছিল কি না, সন্দেহ। এই ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার সঙ্গে মিশিয়া অনেক নরম হইয়া আসিয়াছে, অনেকটা চলিত ভাষার মতনই দাঁড়াইয়াছে।

সরহপাদের "দ্বাদশোপদেশগাথা" নামে একখানি গাথা আছে। সরহপাদের গীতি বাঙ্গালা, দোঁহাও বাঙ্গালা ; গাথাও যে বাঙ্গালা হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর একখানি গ্রন্থ আছে, তার নাম "সার্দ্ধপঞ্চ-গাথা" ; সংগ্রহকারের নাম নাগার্জ্জুন গর্ভ। উহাতে শ্রীগিরি, সবর, কর্ম্মপাদ ও নাড়পাদের গাথা আছে। এরূপ গাথা আরও অনেকে লিখিয়া গিয়াছেন।

আমার নিজের সংগ্রহে ও তেঙ্গুরে যে সকল গীতি, গাথা ও দোঁহার নাম পাইয়াছি, তাহাদের মোটামুটি একটা বিবরণ দিলাম। কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও অনেক গীতি, গাথা

ও দোঁহা আছে; কারণ, আমি গাথা ও গীতির যে কয়খানি টীকা পাইয়াছি, তাহাতে কয়েক জন দোঁহা ও গীতিকারের নাম পাইয়াছি, যাঁহা এই দুইএর কোন সংগ্রহেই নাই। আর আমি নেপাল হইতে যে সমস্ত বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান ও মহাযানের পুস্তক আনিয়াছি, তাহাতেও মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা গীতি ও দোঁহা পাইয়াছি।

ডাকার্ণব নামে একখানি পুস্তকে অনেক চলিত ভাষার গান আছে। সে গানগুলি কি ভাষায়, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, আমি সেই অংশগুলি ছাপাইয়া ইয়োরুপে পাঠাইব স্থির করিয়াছি এবং ছাপাইয়াছি। কিন্তু যুদ্ধের জন্য পাঠাইতে পারিতেছি না। তাহারও শেষ দোঁহাগুলি আমার বাঙ্গালা বলিয়া মনে হয়।

রম রম পরম মহাসুখ রজ্জু।
প্রজ্ঞোপাঅই সিজ্জউ কজ্জু॥
লোঅণ করুনাভাব হু তুম্ম।
সঅল সুরাসুর বুদ্ধ হু জিম্ম॥
জরণ মরণ পড়িহাস ন দিসই।
ইবোহ করহু চিত্ত জিণ ন হই॥

ইহার উপর আরও একটা কথা বলিয়া রাখি। মীননাথের একটি বাঙ্গালা পদ গত বৎসর দেখাইয়াছি। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, মীন ও মৎস্যেন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের লোক। চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়ের টীকায় বহিঃশাস্ত্রের বলিয়া আরও দুই একটি বাঙ্গালা পদ তুলিয়াছে। তাহাতে বোধ হয় যে, নাথপন্থের নাথদিগেরও অনেক গ্রন্থ বাঙ্গালায় লেখা হইয়াছিল।

সুতরাং মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে একটা প্রবল বাঙ্গালা সাহিত্যের উদয় হইয়াছিল। তাহার একটি ভগ্নাংশ মাত্র আমি অদ্য আপনাদের কাছে উপস্থিত করিতেছি। ভরসা করি, আপনারা যেরূপ উদ্যম সহকারে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, ঐরূপ উৎসাহে বৌদ্ধ ও নাথ-সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিবেন। ইহার জন্য আপনাদিগকে তিব্বতী ভাষা শিখিতে হইবে, তিব্বত ও নেপালে বেড়াইতে হইবে, কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ, মণিপুর, সীলেট প্রভৃতি প্রান্তবর্ত্তী দেশে ও প্রান্তভাগে ঘুরিয়া গীতি, গাথা ও দোঁহা সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে, অনেক বার হতাশ হইয়া ফিরিতে হইবে। কিন্তু যদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত কেবল আপনাদের কলঙ্কের কথাই কহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা একেবারেই সত্যকথা কহেন নাই।

পুরাণ বাঙ্গালা সম্বন্ধে আমার যাহা বলার ছিল, বলিয়াছি। এক্ষণে আমার নিজের সম্বন্ধে দু চারিটা কথা বলিতে হইবে। নিজের সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভাল। কিন্তু আমার এ কয়টি কথা না বলিলে অন্যের উপর অবিচার হয়, নতুবা বলিতাম না। আমার নিজের বা আমার পুস্তকের নাম জাহির করিবার জন্য বলিতেছি না। এই পুরাণ বাঙ্গালা সাহিত্যের

একখানি ইতিহাস ও এই বাঙ্গালায় যে কয়েকখানি পুস্তক পাইয়াছি, তাহা আমি ছাপাইতেছি ও অবিলম্বে প্রকাশ করিব। যে সকল পুস্তক ছাপাইতেছি, তাহার মধ্যে দুইখানি নেপাল দরবারের। সে সকল পুথি ছাপা হইবার পর তাঁহারা লইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া পুথির অনেকগুলি পাতা ফটোগ্রাফ করিয়া রাখিয়াছি এবং আমার পুস্তকের সঙ্গে প্রকাশ করিব। অপর দুইখানি পুথি আমার নিজের অথবা নিজের হইতেও অধিক প্রিয়, কারণ, নেপালের পুথিখানার সুব্বা সাহেব বিষ্ণুপ্রসাদ রাজভাণ্ডারী আমাকে প্রীতি-উপহারস্বরূপ ঐ দুইখানি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা চব্বিশ পুরুষ ধরিয়া নেপালের মল্লরাজাদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ শেষ নেওয়ার রাজার সহিত কাশীবাস করিয়াছিলেন এবং পরে গোর্খা পর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পিতা জঙ্গ বাহাদুরের সহিত এক পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু জঙ্গবাহাদুর যখন ১৮৪৬ সালে কোতের হত্যাকাণ্ডের পর গোর্খারাজের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন,—"রাজ তুম্‌হারি, হুকুম হমারী," তখন তিনি গোর্খা রাজ্যে তাঁহার যে উচ্চ পদ ছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া ঘরে গিয়া বসিলেন। জঙ্গ বাহাদুর তাঁহাকে পুনর্ব্বার পদ গ্রহণ করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই লইলেন না; বলিলেন,—"আমি নেওয়ারদের নুন খাইয়া গোর্খাদের সঙ্গে মিলিয়াছিলাম, যথেষ্ট পাপ হইয়াছে। এখন আবার গোর্খাদের নুন খাইয়া তোমার সহিত মিশিব না।" জঙ্গ্ বাহাদুর তাঁহার পুত্রকে উচ্চ রাজপদ দিতে চাহিলে বিষ্ণুপ্রসাদ বলিলেন,—"যাহাতে অস্ত্র ধারণ করিতে হয়, এমন পদ আমি লইব না।" তাই তাঁহাকে পুথিখানার অধ্যক্ষ করা হয়। তিনি পুথিখানায় বসিয়া ক্রমাগত তন্ত্রের বহি পড়িতেন এবং তন্ত্রের অনেক খবর রাখিতেন। নেপালে যেখানে যে পুথি আছে, তাহা তাঁহার নখদর্পণে ছিল। তিনি এক দিন কয়েকখানি প্রাচীন তালপাতার পুথি লইয়া আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন,—"তুমি ব্রাহ্মণ, আমার দেশে আসিয়াছ ও পুথি খুঁজিতেছ। তোমায় কি উপহার দিব, অনেক দিন ভাবিয়া ভাবিয়া এই পুস্তক কয়খানি আনিয়াছি। আমি জানি, তুমি ইহার সদ্ব্যবহার করিবে।" আমি দেখিলাম, তাহার মধ্যে সরোরুহবজ্রের দোঁহাকোষ ও তাহার অদ্বয়বজ্রের টীকা আছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, আপনার নিকট হইতে আমি আমার দেশের ইতিহাসের একটা প্রধান সরঞ্জাম পাইলাম,—আমি নিশ্চয় এটি ছাপাইব। ছাপাইয়া আমি যদি তাঁহাকে ইহার এক কপি দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু ঠিক দুই বৎসর হইল, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কৃষ্ণাচার্য্যের দোঁহাকোষ ও তাহার টীকা, তাঁহারই উপদেশমত পুথিখানার লেখকেরা লিখিয়া আমায় উপহার দিয়াছিলেন, তাহাও আমি ছাপাইয়াছি। ইহার মূল পুথি এখন কোথায় আছে, জানা যায় না।

১৯০৭ সালে আমি নেপাল গিয়াছিলাম। তখন যে সকল পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহার

একটা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং তখনই আমি বলিয়াছিলাম, বাঙ্গালা পুস্তকগুলি আমি ছাপাইব। ছাপাইতে বিলম্ব অনেক হইয়াছে। ইহাতে অনেক 'সাহিত্যামোদী' অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন; অনেকে বলিয়াছিলেন,—"আমায় কেন দাও না, আমি ছাপাইয়া দিতেছি।" অনেকে বলিয়াছিলেন, "শাস্ত্রী মহাশয় যক্ষের ধনের মত এই সকল অমূল্য রত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছেন, কাহাকেও দেখিতে দিবেন না।" কিন্তু এই সকল ছাপাইতে যে কি পরিমাণ কাঠ-খড় দরকার, আমার মনে হয়, তাঁহারা তত জানিতেন না, তাই অত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অনেকে আছেন,—একটা নূতন কথা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ছাপাইয়া দিয়া নাম করেন। আমার সে প্রবৃত্তি নাই। তাই আমি মনে করিয়াছিলাম, বরং ছাপাইব না, তথাপি তাড়াতাড়ি করিয়া জিনিষটা নষ্ট করিব না। ভ্যাসিলিয়েফ বলিয়াছিলেন যে, অপভ্রংশ ভাষায় অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে। প্রোফেসার বেণ্ডল সুভাষিতসংগ্রহ নামে একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন, তাহাতে অপভ্রংশ ভাষার কতকগুলি দোঁহা ছিল। আমি দেখিয়াছিলাম, সে দোঁহাগুলি পুরাণ বাঙ্গালা। তাঁহারা দুজনেই বলিয়াছিলেন যে, তেঙ্গুরে এই সকল অপভ্রংশ পুস্তকের তর্জ্জমা আছে। কিন্তু ভুটিয়া শিখিয়া তেঙ্গুর পড়িয়া পুস্তক ছাপান আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। সুখের কথা, কয়েক বৎসর হইল, কডিয়ার সাহেব ঠিক যে অংশে ঐ সকল পুস্তকের কথা আছে, তাহার তালিকা ছাপাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে আমার বিস্তর উপকার হইয়াছে, এ তালিকা না পাইলে বোধ হয় আমার পুস্তক ছাপাইতে সাহস হইত না।

পুস্তক ছাপাইতে অনেক বিলম্ব হওয়ায় আমার কোন কোন আত্মীয় মনে করিয়াছিলেন, টাকার জন্যই আমি পুস্তক ছাপাইতে পারিতেছি না। তাই তাঁহারা লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় সাহেবের নিকট এই পুস্তক ছাপাইবার খরচের জন্য বলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি রাজা সাহেবের অনুরাগ অসীম। তিনি শুনিবামাত্র সাহিত্য-পরিষদে যে টাকা দিয়া থাকেন, তাহা হইতে উহার খরচ দিতে রাজী হন এবং উহা সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাবলীর মধ্যে লইবেন বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে আবার এক গোল উঠিল। আমি সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হইলাম। সভাপতি হইয়া সাহিত্য-পরিষদের খরচায় বই ছাপাইব, ইহা আমার ভাল লাগিল না। আমি রাজা সাহেবকে সে কথা জানাইলাম। তখন রাজা সাহেব স্বতন্ত্র ভাবে ঐ পুস্তক ছাপাইতে দিবেন এবং তাহার খরচ দিবেন, স্বীকার করিলেন। তিনি টাকা না দিলে এ পুস্তক এখন যে ভাবে ছাপা হইতেছে, এত ভাল কাগজে, এত ভাল ছাপায়, এত বেশী ফটোগ্রাফ দিয়া, এত অনুক্রমণিকা দিয়া ছাপা হইত না। পুরাণ বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ সরঞ্জামে সদরে বাহির হওয়া উচিত, সেরূপ সরঞ্জাম আমার দ্বারা হইয়া উঠিত না। সুতরাং এই খরচ দিবার জন্য আমিও তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণী থাকিব। বাঙ্গালা সাহিত্যও বোধ হয়, এ ঋণ শুধিতে পারিবে না। এ পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাবলীর ভিতর গণ্য হইবে।

সূচী

আর্য্যদেব

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
করুণা	ইন্দিয়	অকট	টলি
ভয়	চিঅ	অপা	দুর
	ণ	কোঁহি	
	পবণ	গই	
	বিআর	ঘিণ	
	বিকরণে	চান্দকান্তি	
	মণ	চান্দরে	
	লোআচার	চাহন্তে	
	সঅল	ছাড়িঅ	
		জহি	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
জাণমি	জিম	ডমরুলি	পঠা
নিবারিউ	নিরাসে	তহি	পইঠা
পইসই	পতিভাসঅ	বাজঅ	বিহরিউ
রাজই	সুন	হো	

কম্বলাম্বর

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণা বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
করুণা	উই	উবেসেঁ	উপাড়ী
বহু	কইসেঁ	কাচ্ছি	কি
বাম	গঅণ	কেঁ	কে
সদ্গুরু	মহাসুহ	কেড়ুআল	গেল
		খুন্টি	চাপী
		চউদিশ	নাহি
		চন্থিলে	মিলি মিলি
		চাহঅ	মিলিল
		জাম	মেলিলি

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
ঠাবী	থোই	দাহিণ	নাবী
পারঅ	পুচ্ছি	বাটত	বাহতু
বাহবকে	ভরিতী	মহিকে	মালা
মাংগত	রূপা	সঙ্গ	সোনে

কাহ্নু বা কৃষ্ণ

সংস্কৃত—	বিকৃত সংস্কৃত—	পুরাণ বাঙ্গালা—	চলিত বাঙ্গালা—
অনুদিন	অকিলেসেঁ	অচ্ছন্তে	আলো
অন্তে	অণহা	অচারে	কপালী
অবশ	অবর	অঠক	করি
আগম	অলিএঁ	অন্তরে	করিব
আভরণে	অহিনিশি	অবণাগবণে	কাম
আসব	আইস	অহারিউ, অহারী	কি
আলি	আনতু	আইলা	কোঠা
এক, এবংকার	আবই	আলাজালা	গল
কণ্ঠ	আলে	আন্ধে	গুণিয়া
কপালী	আসা	উছলিআঁ	গেলা
করণ্ড	ইন্দি	এট্টা	ঘরে
করুণা	ইষ্টামালা	করিআ	চউষঠ্ঠি
কারণ	উ	করিণা	চড়ি
কালি	উআস	করিনিরে	চলিল
কুঠার	উএস	করিবে	চৌষঠ্ঠি
কুণ্ডল	উইজঅ	কাজন	ছার
গন্ধ	উএসই	কান্ধ	ছিণালী
গুরু	উন্মত্তো	কাল	জ
ঘণ্টা	একারেঁ	কালিএঁ	জউতুক
চণ্ডালী	এসু	কালেঁ	জণ
চরণে	কইসনি	কাহিব	জায়
ডমরু	কইসেঁ	কাহরি	জাই
ডোম্বী	কল্পহার	কিঅ	জে
তথতা	কবালী	কুঠারে	টাল

সংস্কৃত—	বিকৃত সংস্কৃত—	পুরাণ বাঙ্গালা—	চলিত বাঙ্গালা
তথাগত	কশালা (?)	কুড়িআ	ঠাকুর
তরঙ্গ	কহিঁ	কুলিন	ডাল
তরু	কাঅ	কেড়ুআল	তা
দশবল	কাঅর	কেহো	তু
দৃঢ়	কাপালী	কোই	দেখি
দেহ	কিউ	খট্টে	দেখিল
ন	কিস্	খণহ	দুধ
নগর	গঅণ	খাঅ	না, নাড়ি
নলিনীবন	গঅবরেঁ	খেলহুঁ	নাহি
নিবাস	গোএর	গই	নিআ
নির্ব্বাণে	চঙ্গতা (?)	গাইতু	পরাণ
পঙ্ক	চিঅ	ঘলিলি	পাণী
পরম	চেঅণ	ঘুমই	পাত
বরগুরু	ছেব	ঘোরিঅ	পোথী
বল	ছেবই	ঘোলিউ	পোহায়
বহল	ছেবহ	চলিআ	বাট
বা	জইসা	চেবই	বাহ
বাক্	জইসোঁ	ছইছোই	বিমনা
বাক্পথাতীত	জসু	ছড়গই	ভণ
বিন্তা	জাম	ছাড়অ	ভর
বিবাহে	জিণউর	ছাড়ি	মাতা
বীরনাদে	জোই	ছিজঅ	যাই
বেণী (ণি)	জোইণিজালে	ছুধ	লো
ভব	ণ	জঅ জঅ	শালী
ভবজলধি	ণাবী	জাঅ	সঙ্গে
ভাবাভাব	তইসোঁ	জাণই	সুন
ভাবে	তরিত্তা	জাসি	সে
মা	তসু	জিতা	হাড়েরি
মূঢ়	তহিঁ	জিতেল	হালো
মূল	তান্তি	জিম	হেরি
মোক্ষ	তিশরণ	জো	হেন্নী

সংস্কৃত—	বিকৃত সংস্কৃত—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
মোহ	তিহুবণ	টলিউ, টালিউ	
যোগী	তৈলোএ	ণচ্ছন্তে	
রবি	দাহ	তআরি	
রাগ	দিঠ	তআগলি	
রে	দুন্দুহি	তুঁই	
শক্তি	নড়	তবি	
শশী	দেশ	তরঙ্গ	
সদ্‌গুরু	ধাম	তিনি	
সদ্ভাবে	নঅ	তিম	
সম	নঅরী	তে	
সহজ	নিঅ	তো	
সুফল	নিংদ	তোএ	
	নিঅড়	তোড়িআ	
	নিঅড়ি	তোড়িউ	
	নিঘিণ	তেড়েঁ	
	নিদালু	তোলিয়া	
	নিবিতা	তোহোর	
	পইঠ	তোহোরি	
	পড়হ	দশদিশেঁ	
	পদমা	দমকুঁ	
	পবণ	দিট	
	পরিচ্ছিন্না	দুআ	
	পরিনিবিত্তা	দেখই	
	পসঙ্গে	দেহু	
	পাএ	ধরিঅ	
	পাঞ্চ	নণন্দা	
	পাঞ্চজনা	নাচঅ	
	পাণ্ডিআচাএ	নাঠ	
	পুণ	নাড়িআ	
	পেখই	নাবেঁ	
	বঅণে	নেউর	

বিকৃত সংস্কৃত—	পুরাণ বাঙ্গালা—
বট্টই	পইসই
বলাগ	পইসি
বান্ধ	পড়িআঁ
বি	পমাই
বিআপক	পয়সর
বিচ্‌জন	পরিমাণই
বিবিহ	পহারী
বিরুআ	পহিলেঁ
বিসন্না	পাখি
বেঅন	পাখুড়ী
বোহেঁ	পিহাড়ী
ভিন্না	পুছমি
ভুঅণ	পোহাঅ
ভেব	ফরই
মই	ফলাহা
মণ	ফীটউ
মণগোএর	বড়িআ
মমু	বরিসঅ
মহাসুহ	বাখোড়
মাঅ	বাজএ
মাআজাল	বাটই
মাদেসি	বান্ধণ
মুত্তিহার	বাপুড়ী
মূঢ়া, মৌলাণ	বারিহিরে
রঅণ	বাহ
রএণি	বাহঅ
রত্তো	বাহিঅ
লোঅ	বিকণয়
সংপুন্না	বিকসই
সংবোহিঅ	বিবাহিআ
সঅল	বিয়োএ

বিকৃত সংস্কৃত,—	পুরাণ বাঙ্গালা,—
সপরবিভালা	বিলসঅ(ই)
সরবর	বিহরএ
সসহর	বিহল
সহাবে	বিহুনে
সা	বোধসে
সাঅর	বোব
সীস	বোল
সুইনা	বোলই
সুভাসুভ	বোলী
সুরঅ	ভইঅ
সুহে	ভইলা
সুধা	ভইঙ্গলা

পুরাণ বাঙ্গালা,—	পুরাণ বাঙ্গালা,—	পুরাণ বাঙ্গালা,—	পুরাণ বাঙ্গালা,—
ভাগ্রীম্ন	ভণই	ভণ্ডার	ভাভরিআলী
ভলি	ভাগ	ম	মঅ
মঝ	মতিএঁ	মমু	মরাড়িইউ
মাঙ্গে	মাঝেঁ	মাণই	মাদলা
মারমি	মারিঅ	মারী	মালী
মেলঙ্গ	মোএ	মোড্ডিউ	মোরি
মোহিঅই	রাহঅ	রিসঅ	রুন্ধেলা
লবএ	লাইএ	লাগ	লাঙ্গা
লাড়েঁ	লেমি	লেহুঁ	শাখি
শাসু	শুনমে	সড়ি	সমায়
সাঙ্গ	সাঙ্গে	সাদ	সাহা
সুণ	সুণত	সুতেলি	সো
সোধই	স্বপণ	হরিঅ	হাঁউ
হাঁউ	হেলেঁ	হো	হোহি

কুক্কুরী

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গলা—	প্রচলিত বাঙ্গলা—
অন্ত	অইসন	অধরাতী	কুম্ভীরে
খ	এথু	অহিঁ	গেল
চর্য্যা	নিদ	আঙ্গন	গো
ন	নিরাসী	উড়ি	ঘর

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
ভব	বাসন	একুড়ি	চাহি
ভো	সেব	কহন	চোরে
মন	সো	কা	ডরে
মূল		কাড়ই	নাড়ি
		কাণেট	নাহি
		কামরু	নিল
		কোড়ি	পুরা
		খাঅ	বাপ
		গই	বিআণ
		গাইড়	মোর
			রাতি

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
চৌরি	জা	জাঅ	জাই
জাগঅ	জান	জো	জোবন
তেন্তলি	থিরা	দিবসই	দুলি
দুহি	ধরণ	নখলি	পণ
পহিল	পিটা	পুড়	ফেটলিউ
ফিটলেসু	বাপুড়া	বাহাম	বহুড়ী
বিঅন্তী	বিআরন্তে	বিগোআ	বীরা
বুঝএঁ	ভইলে	ভইলেসি	ভতারে
ভণথি	ভাঅ	মাএ	মাগঅ
মাঝেঁ	মোহোর	রুখের	সংঘারা
সনাইড়	সি	সুন	সুসুরা
হাঁউ			

কৌঙ্কণপাদ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
তথা	অনুঅর	অচ্ছু	আণ
তথতা	পাদ	অণ	এ
মাসং	ধাম	আইলেসিঁ	চৌথন
সর্ব্ব	নিরোহ	উইআ	জান
	বি	কলএল	থাকি
	বোহী	চাহন্তে	বিহাণ
	সঅল	জথাঁ	মাঝ
	সংবোহী		হুঁ

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
জবেঁ	পঠা	পহি	তবেঁ
পৈঠা	বিচ্ছুরিল	বিহু	ভণই
মিলিআ	সাদেঁ	সুন	সুনে

গুণ্ডরী বা ধামপাদ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
অঙ্ক	গঅণ	অঙ্কে	উঠে
কমল	চান্দ	আগি	খর
কমলরস	চীরা	উভিল	গেল
কুলিশ	জালা	ওড়িআণে	ঘরে
চণ্ডালী	জীবমি	করহুঁ	চাপি
ডোম্বী	জোইনি	কুম্ভুরে	চুম্বী
ন	জোএঁ	কোঞ্চা	জায়
ন	ণবগুণ	খণহিঁ	দে
নারী	ধুম	খেপহুঁ	পড়া
পঞ্চ	নউ	গাঅ	পাণী
বেণি	পীবমি	ঘাণ্ট	ভরা
মাণকুলে	বান্ধ	ঘালি	লই
মেরু	মুহ	জলিঅ	হই
রে	সুজ	জানী	
লেপন	হিঁ	ডাহ	
শাসন		তাল	
শিখর		তুঁই	
স		তিয়ড্ডা	
সমতা		তো	
হর		দিসই	
হরি			

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
নরঅ	নালেঁ	পইসই	পখা
ফাটই	ফাল	ফীটা	ফুড়
বহিআ	বালী	বিআলী	বিণু
বীরা	ভইষ	ভণই	মঝেঁ

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
মাঝে	মিলিলী	লাগেলি	লেঙ্গ
সগায়	সিঞ্চহুঁ	সহষলি	সাস্থু

চাটিল

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
অনুত্তর	আদঅ	আস্তে	চড়িলে
গম্ভীর	জই	কোহিঅ	টাঙ্গী
গহণ	ধামার্থে	গটই	
দূর	নিবানে	চিখিল	
ন	নিভর	জাহী	
পারগামী	বোহি	জোড়িঅ	
বাম	ম	ণই	
ভব	লোঅ	তরই	
মা		তুন্ধে	
মোহতরু		থাহী	
হে		দাহিণ	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
দিটি	দুআন্তে	নিয়ড্ডী	পটি
পুচ্ছতু	ফাড্ডিঅ	বাহী	বেগেঁ
মাঝেঁ	সাঙ্কম	সাঙ্কমত	সামী
হোইব	হোহী		

জয়নন্দী

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—
অন্তরালে	অদশ	অণ
তথাতা	কাঅ	অবণা গবণা
ন	চিঅ	ছিজই
বেণি	ছাঅ	তুটই
মোহ	জই	তবেঁ
মোহে	জইসা	তিমই
স্বভাবে	ণ	দাটই
	তইসা	পাখেঁ

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—
ন	পেথ, পেথই
নো	পেখু
মাআ	ফুড়
সুঅনে	বলি বলি

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
বাঝই	বিণা	বিমুঁক্কা	ভণই
মাণা	মোঅ	ষোহিঅ	সমাণা
সোই	হোই		

ডোম্বী

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
গঙ্গা	গঅণ	উছারা	চড়িলা
ন	চন্দ	করেই	জাইব
বাম	জউনা	কবড়ী	দুই
রে	জো	কাচ্ছী	পানী
সংহার	জিন উরা	কুলেঁ কুল	পার
সদ্গুরু	সূজ্জ	কেড়ুআল	বাহ
		চকা	রথে
		ছন্দা	লেই
		জাই	লো

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
তুঁহি, তু	দাহিন	দুখোলেঁ	নাই
পইসই	পড়ন্তে	পাঅপএ	পাঞ্চ
পিটত	পুণু	পুলিন্দা	পোইআ
বহই	বাহবাণ	বাটত	বান্ধী
বাহতু	বুড়ই	বুড়িলী	বোড়ী
ভইল	মাতঙ্গি	মাগ	মাংগে
মাঝে	লাগে	বেরই	সান্ধি
সিঞ্চহ	সিঠি	[illegible]	

ঢেণ্টণ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন-	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
গীত	গবিআ	আবেশী	এ
চৌর	বুধি	জাঅ	কি
সংসার	ষম	ছুঝঅ	ঘর
		জো	ছুধু
		টালত	ছুহিল
		তিনা	ধনি
		ছুহিয়ে	নাহি
		নিতে	নিতি
		পড়বেষী	বলদ
		পিটা	বিরলে
		বড্‌হিল	ভাত
		বাঁঝে	মোর
		বিআএল	সাঁঝে
		বুঝঅ	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
বেঙ্গ	বেঁণ্টে	ষামায়	ষিআলা
ষিহে	ষো	সাধী	সেহ
সোই	হাড়ীত		

তাড়কপাদ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা —	প্রচলিত বাঙ্গালা—
অনুভব	অপণে	অছিলে	গেলি
অবকাশ	কংখা	অচ্ছ	টুটি
বাক্‌পথাতীত	জইসনে	এথু	তা
মা	জইসো	কাহেরি	বাস
য়ে	জো	কাহিঁ	ভোল
শঙ্কা	জোই	গলপাস	
স	জোঁ	গলেঁ	
সহজ	তই	চৌকোট্টি	
	বিমুকা	জাণী	
	ভান্তি	তইছন	
	লো	তা	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
নাহিঁ	পিথক	বথানী	বাণ্ডকুরু
বুঝই	ভণই	মহামুদেরি	সন্তারে
হোই	হো		

দারিক

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
অনুত্তর	অপইঠান	ইন্দীজানী	তো
কিং	অবর	একু	বাধা
দ্বাদশ	অভিন	করিআ	
ন	অলকৃখ	করুণরি	
পরম	কাঅ	কুলেঁ	
পরাপর	চিঅ	গঅণত	
বাক্	চিত্তা	চেবই	
মহাসুখ	ঝাল	তন্তে	
রে	নিবাণেঁ	দুঃখেঁ	
স্ব	মহাসুহ	দুলখ	
	মহাসুহে	পএ	
	সঅল	পাঅ	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
পারিম	বথানে	বারেঁ	বিলসই
ভুঅণেঁ	ভুঞ্জই	মন্তে	মানী
মোহেরা	রাঅ	রাআ	লঅ
লধা	লানেঁ	সুখেঁ	সুন

ভাদেপাদ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
কাল	কথু	অচ্ছিলে	এত
ন	গণ	অভাগে	দিল
পাপ	চিঅ	অহার	বুঝিল
মোহ	চিঅরাঅ	অহারিল	শূন
সদ্গুরু	দহ	এবেঁ	সর্ব্বই
	দিহ	কএলা	
	পুন্ন	গঅণত	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
টলিআ	ণঠা	পইঠা	পনিআঁ
পেথনি	বাজুলে	বিহুয়ে	বোহেঁ
ভণই	ভণিআ	মই	মকুঁ
লইআ	সমুদে	স্বমোহেঁ	হাঁউ

ভুসুকুপাদ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
অঙ্গ	অঅণা	অকট	আজি
আকাশ	অইস	অচ্ছসি	আনন্দে
কমল	অণুঅনাএ	অচ্ছহু	আরে
করুণ	অদঅ	অদভুআ	উঠি
কলা	অধ্যাতা	অন্ধারি	এ
কিং	অণুঅনা	অপণা	এত
কেলি	অধরাতি	অম্নেঁ	কর
ক্লেশ	অন্ধকারা	অবণা গবণা	করিহ
খ	অবধুই	অমিঅ	খুর
চঞ্চল	অমণধাণ	অহেই	জলে
চণ্ডালী	আই	আবই	দলিয়া
তম্	আইএ	উঞ্চল পাঞ্চল	দেখি
ন	আইস	উজলি	নাহি
নাশক	আহারা	উলাস	পরিবারে
নিরন্তর	ইদিবি	একুমণা	পাড়ী
পৃচ্ছতু	ইন্দিআল	এঁসো	পাণী
বিরমানন্দ	উইত্তা	এহ	পাথর
বিলক্ষণ	উহ	কট	বান্ধন
বিশেষ	উহ্লসিউ	করঅ	বিহাণ
বুধ	এথু	করই	বুঝি
ভব	কমলিনি	কলিআ	বৈরী
ভাবাভাব	কিম্পি	কাঁহি	ভর
মন	কীস	কাহেই	মার
মরণ	গঅণ	কা	মাঁসে
মরু	গঅণহু	কাহি	মেলি

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা
মহাতরু	গঅণে	কাহেরি	মোর
মা	গন্ধনইরী	কোএ	রাতি
মাংসে	চীঅ	কোড়ি	সাপ
রে	জই	খণঅ	সিংগে
সংজ্ঞা	জইসা	খণহ	সে
সদ্‌গুরু	জাম	খাই	হাক
সম	জোই	খালেঁ	হেরি
সমরসে	জোইআ	খেড়া	
সহজ	জোইণী	খেলই	
সহজানন্দ	ণ	গই	
হ	তরঙ্গন্তে	গউ	
হরিণী	তেলএ	গাতী	
	তৈলএ	ঘরিণী	
	থাতী	ঘিণি	
	দাপতি	চৌ	
	দিঠ	চমকিই	
	নিহুরে	চরঅ	
	পঁউআ	চা	
	পঞ্চজণা	চান্দে	
	পঞ্চধাউন	চারা	
	পবণা	চালিউঅ	
	পদ্মবণ	চৌদিশ	
	বণ	ছাড়অ	
	বহুবিহ	ছাড়ী	
	বাষণা	ছুপই	
	বি	জগ	
	বুঝিঝঅ	জগরে	
	মরিচী	জবেঁ	
	মহাসুহ	জাঅ	
	মহাসুহে	জাই	
	মাআজাল	জাইবেঁ	
	মাআহরিণী	জাণমে	
	মূঢ়া	জাণী	
	মেহ	জাসু	
	রঅণহ	জিম	
	রাজ	জীবন্তে	
	ষষহর	জেঁণ	
	ষহজে	টলিআ	

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—
সএলা	ভহি
স্বভাবে	ণঅণি
সহাব	ণঠা
সুসার	ণার
সেস	ণাহি

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
ণিঅ	তংহি	তবসে	তবেঁ
তরুঅ	তসু	তিণ	তিম
টুট	টুটঅ	টুট্টই	তুহ্মে
তেলেঁ	তো	তোরা	থাকিউ
দিণিঁ	দীসঅ	দে	দন্দল
ধাণ	নলনীবন	নিঅ	নিচ্চল
নিবাণে	নীলঅ	নিশিঅ	পইঠা
পইসঙ্গ	পইসন্তে	পইঅহিনি	পড়অ
পড়িহাই	পঁণালে	পসারিউ	পাণিআ
পাব	পিবই	পেথ	ফরিঅ
ফিটঅ	ফুলিলা	বঙ্গালী	বঙ্গালে
বতিস	বহই	বাজ	বাণ
বাণত	বাতাবন্তেঁ	বাঁধেলি	বাঁদ্ধি
বালুআ	বাহিউ	বিকসিউ	বিন্থু
বিন্দারঅ	বিন্থু	বিশুদ্ধিঁ	বিসারা
বিসঅ	বুঝষি	বুঝিঅ	বুঝঙ্গ
বেটিল্ল	বোড়ো	বোলঅ	বোহে
বোহেঁ	ভইআ	ভইলি	ভথঅ
ভণঅ	ভণই	ভণ্ডার	ভাণ্ডি
ভাণ্ডী	ভাণ্ডো	ভেড়	ভেলা
মই	মইলে	মএল	মাগে
মারেঁ	মারিহসি	মুষা	মুষাএর
মুসা	মেলেঁ	রাউতু	লইআ
লুড়িউ	লেলী	লোলেঁ	লোহ্না
সসর	স্বভাবেঁ	সমঅ	সরুআ
সারে	সুধ	সুআ	সুক
সুন	সুনন্তে	সোন	সপরেলা
ষারে	হণ	হআ	হরিআ
হরিণির	হরিণা	হরিণার	হিঅহি
হেন্তই	হেহিসি	হোহ	

মহীধর

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
কিরণ	কিম্পি	অণহ	তা
খর	কো	উএথী	পানে
ন	গঅন্দা	এঁ	লাগি
নিরন্তর	গঅণন্ত	এথু	
পঙ্ক	গঅণাঙ্গণ	কসণ	
পাপ	ঘণ	খন্তা	
পুণ্য	চিত্তা	গঅণ টাকলি	
বেণি	চীঅ	গই	
ভয়ঙ্কর	ণিবানা	গাজই	
মণ্ডল	তিহুঅন	ঘোলই	
মহারস	বী	ঠানা	
মার	সঅ	তিড়িঅ	
রবি	সএল	তিলি এঁ	
রে		তুসেঁ	
		দিঠা	
		দেখী	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
ধাবই	নায়করে	পইঠ	পইঠা
পাটে	বিপথ	বিষয়ারে	বুড়ন্তে
ভণন্তি	ভাজই	মই	মাতেল
মোড়িঅ	লাগিলি	সন্তাপেরে	সিঅল
সুনি			

লুই

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
আগম	অইস	অচ্ছম	আস
উদক	কইসে	আমৃহে	জান
উহ	চমণ	এড়িএউ	জানি
করণক	চীএ	করিঅ	ভাল
কাল	তিঅধাএ	করিঅই	পাটের
চঞ্চল	দিঠা	কাআ	পাস
চিহ্ন	দুলকৃখ	কাহি	লাগে
তর্ক	ধমন	কাহেরে	সুছু
ন	নিচিত্ত	কিষ	
পঙক্ত	পইঠো	কীষ	

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
পরিমাণ	পাস্তি	কো	
বর	পিরিচ্ছা	চান্দ	
বেণি	বি	ছান্দক	
ভাব	বিণানা	জা	
রে	বেঁএ	জাই	
সুখ	মই	জাহের	
	মহাসুহ	জিম	
	রুব	ণা	
	সঅল	তাহের	
	সংবোহেঁ		
	সমাহিঅ		
	সুহ		

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
দিট	দিবি	দিস্	দুঃখেতেঁ
পতিআই	পাখ	পুচ্ছিঅ	বইঠা
বখানী	বট	বান	বান্ধ
বিলসই	ভণই	ভণি	ভাইব
ভিতি	মরিআই	মিচ্ছা	লই
লাহ	সাচ	সাণে	সো
হই			

বিরুবা

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
অজরামর	দশমি দুআরত	করী	আইল
এক	দিট	কান্ধ	করি
চিহ্ন		গরাহক	ঘরে
বারুণী		ঘড়িএ	চাল
স		চউশঠী	ভুলি
সহজে		চীঅন	থির
		জে	দুই ঘরে
		দেখইলা	মাল
		দেট	নাহি
		নিসারা	পসারা
		পইঠেল	সরুই
		বহিআ	সে

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
বাকলঅ	বান্ধঅ	ভণন্তি	শুণ্ডিনি
সান্ধল	সান্ধে	হোই	

বীণাপাদ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
অবধূতী	অনহা	করহকলে	আলো
আলি	গঅবর	করহা	জবে
কালি	রুণা	কিঅত	লাউ
দেবী	বিআপিউ	গাস্তি	লাগেলি
নাটক	সহি	গুণিআ	সারি
বীণা		চাপিউ	
বুদ্ধ		তান্তি	
বেণি		দাণ্ডী	
সমরস		ধনি	
হেরুক		নাচন্তি	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
বত্তিস	বাকি	বাজই	বাজিল
বিলসই	বিসমা	সএল	সসি
সান্ধি	সুজ	সুন	সুনেআ
হোই			

শান্তি

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
অন্ত	অট	অনাবাটা	আখি
উহ	অলক্খ	অপণা	আগে
এবা	গুমা	অহারিউ	গেলা
ন	ঘাটন	আঁসু	জাই
নো	ণ	উজু	জে
পুন	নিরবর	একু	তুলা
বহুল	তউষে	এহু	তুই
বাম	বাকু	কাজন কারণ	দো
বাল	বালাগ	কণ্ডারা	ধুনি
মহাসিদ্ধি	ভণ্ডি	কিণ	বট
মা	ভাণ্ডি	কুলেঁ কুল	ভিণ
রাজপথ	মাআ	খড়তড়ি	ভেলা
রে	লক্খণ	চটারিউ	
	সঅ	চ্ছাড়ী	
	সভাবি	জ	
	সমুদারে	জঅতি	
	সম্বেঅন	জাঅন্তে	

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—
সরুঅ	জাইউ
সঁএঁ	জাস্তে

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
থাহা	দাহিন	দিসঅ	দিসই
দীসঅ	নাব	নাহা	পইসথ
পাবিঅই	পান্তর	পুচ্ছসি	বাটা
বাটে	বাসসি	বিআরন্তে	বুজ্ঝিঅ
বুজ্ঝসি	বুলথেউ	বোলথি	ভৈলি
ভইলা	ভণই	ভূলহ	মার
মুঢ়া	মোহা	লইআঁ	সংকেলিউ
সংসারা	সঁবেঅন	সিমএ	শূণা
শূণে	সেস্থ	সোই	হোই

সরহ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
অজরামর	অচিন্ত	অকট	অমিয়
অয়ে	অদভূঅ	অণা	ই
গুরু	কইসন	অণ	উপাএ
জায়া	কইসে	অপণে	এ
তে	কাঅ	অপণা, অপনা	করি
ন	কিম্পি	অপা	কাম
নাদ	চিঅ	অপ্যণা	কি
নৌকা	চিঅরাঅ	অবসরি	কুল
নৌবাহী	চীঅ	অবিদার	খর
পর	ছাত্র	অন্তে	খাইব
পার	জইসো	আচ্ছন্তে	গুণে
বাম	জলবিম্বকারে	আণেঁ	ছাড়ি
বিন্দু	জোই	উঁজায়	জাই
ভব	ণ	উজু	জীবন্তে
মরণ	তইসো	উলোলেঁ	জে
মা	তিঅশ	একেলে	তু
রবি	থির	কথা	থাকিব
রস	দাপণ	করউ	থর
রে	দুজ্জন	কা	পরে
সচরাচর	দোসে	কিম্মো	বজে
সদ্গুরু	ধাম	কুণ্ডবাঁ	বুঝ
হ	নিঅমন	কেড়ুআল	মেন

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা—
নির্ব্বাণা	খালবিখলা	মেলি
বর	খাণ্ট	রচি
বি	খাণ্টি	লই
বিনানা	গজ্জিই	হাথে
বিসেসো	গঅণে	
বিস	গিলেসি	
বোহি	গোহালিব	
ভঅ	ঘারে	
মন	ঘুণ্ড	
রসানেরে	জগ	
লাহ্ন	জা, জাউ	
লোঅ	জানহু	
শশীমণ্ডল	জাম	
সন্ধা	জাহু	
সহাবে	জো	

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
টাগুঅ	নাবড়ি	ণাহি	তই
তোহোর্	তোহোরেঁ	দাহিন	দিসই
ছুট	ছুঠ্য	ধহু	নাশিঅ
নাহী	নিঅহি	নিলেসি	পতবাল
পমাএঁ	পসর	পারউআরে	পারে
বঅণ	বহু	বন্ধাবএ	বপা
বলআ	বলন্দেঁ	বস	বাট, বাটঅ
বিরহুঁঈ	বিহারে	বুঝি ঝলে	বোলিআ
ভণই	ভণতি	ভণন্তি	ভমন্তি
ভাইলা	ভাগেল	মঅণে	মই
মরে	মিছেঁ	মোকল	মোহারো
লেহু	লোউ	ষঅ	সহজে
সাঙ্গে	সুইলা	সুণ	সো, সোই
সোন্তে	হোই	হোন্তি	

সবরপাদ

সংস্কৃত—	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা
কর্ণ	অণুদিন	অকাশ ফুলিআ	উচা
কুণ্ডল	এসেরে	অন্ধারি	উপাড়ী
খসমে	কইসে	উমত	এ
গিরিবর	কিম্পি	একেল	একে
গুরুবাক	ণাণা	কপাহু	কন্তুরি

সংস্কৃত —	সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন—	পুরাণ বাঙ্গালা—	প্রচলিত বাঙ্গালা —
তরুবর	ণামে	কান্দশ	কণ্ঠে
ন	ণিঅ	কাপুর	কব
পরম	দহদিহে	কুরাড়ী	খাই
বজ্রধারী	ধাউ	গঅণত	খাট
বালী	পাবত	গিবত	ঘরিণী
বিষমে	বণ	গরুআ	চারিবাসে
ভব	মণে	গুলী	ছাড়
ভুজঙ্গ	মহাসুহে	গুঞ্জরী	পড়িলা
মহাসুখে	মাআ	গুহাড়া	পাগল
মা	সিহর	চঞ্চলা	পোহাই
রসে	সবরী	চেরই	ফুটিলা
রে	হিঅ	ছাইলা	বাড়ির
রোষে		ছাড়,	বাড়ী
সগুণ		জাগন্তে	মারিল
স[illegible]		জোহ্না	রাতি
সমতুলা		ডালা	শিয়ালা
হ		ণইবমানি	শুন
হে		ণৈরামণি	সে
		তইলা	সেজি
		তহিঁ	হেরি

পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—	পুরাণ বাঙ্গালা—
তাঁবোলা	তাএলা	তিঅ	তোলি
তোহোরি	দারী	দিআঁ	দিধলি
ছুন্দোলা	নিবার্ণে	নিরামণি	নিরেসবন
পইসন্তি	পরহিণ	পাঁসের	পীচ্ছু
পুঞ্চআ	পাকেলা	পেক্ষ	পোহাইলি
ফিটিলি	ফিটেলি	বসই	বলী
বাড়্হী	বাণে	বালি	বালী
বিন্ধ	বিন্ধহ	বিলসন্তি	ভাইলা
ভেলা	মত্তা	মহাসুহে	মাতেলা
মালী	মেরি	মেহেলি	মোরাঙ্গি
মোহা	মৌলিল	লইআ	লাগেলি
লোড়িব	শরসন্ধানে	ষবরালি	যুকড্ড
যে	সান্ধি	সুন	সুনমে
সুন্দরী	হকএলা	হিণ্ডই	হেঞ্চে
হেরল			

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময়—৫ই পৌষ ১৩২১, অপরাহ্ণ ৫টা।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ বাণীনাথ নন্দী
„ নিখিলনাথ মৈত্র
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ
„ হারাণচন্দ্র চাক্লাদার
„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ
„ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ ডাঃ ললিতমোহন বসাক
„ মন্মথনাথ রায়
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ বসন্তরঞ্জন রায়
„ ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত চারুব্রত রায়
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী রায় বাহাদুর
„ শ্যামলাল গোস্বামী
„ হরেকৃষ্ণ চন্দ্র
„ করুণাচন্দ্র মজুমদার
„ নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ যতীন্দ্রনাথ সেন
„ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ কামাখ্যারাম ভট্টাচার্য্য
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ পঞ্চানন মিত্র
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
„ রামকমল সিংহ
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ শ্রীপতিকুমার মুখোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এমএ, বি এল (সম্পাদক)

„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
} সহকারী সম্পাদকগণ

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীরসিকচন্দ্র বসু মৈসামুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযোগেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী ২ শোভাবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীরামহরি গুপ্ত	"	শ্রীকুঞ্জবিহারী ভাদুড়ী বি এল্ উকীল, হাইকোর্ট, ৩৪।১ মদন মিত্রের লেন।
শ্রীভবতোষ মজুমদার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমণীন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত D. G. of Archeœlogy. Simla, East.
	"	শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ এম্ এ ঐ ঐ
	"	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত Department of Commerce of Industry, Govt. of India. Simla Hills.
	"	শ্রীবিনোদবিহারী ভাদুড়ী Communication to Delhi camp. Delhi.
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায় বি এ ম্যানেজার কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্, কুমিল্লা।
"	"	শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ এম বি ২৮ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়	শ্রীঅতুলানন্দ রায় চৌধুরী রাজমাতা কালীবাড়ী, মিঠাপুকুর, বর্দ্ধমান।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ শ্রীললিতমোহন বসাক ৬৭ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ ২৬।১ বৃন্দাবন পালের লেন।
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ।
		শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ ঐ ঐ

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ ১১৬ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, বেলেঘাটা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীঅহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এস্ সি ১৫ কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	"	শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি এস্ সি শিক্ষক, কলিকাতা একাডেমি।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী ৮ বাদুড়বাগান রো।

৩। নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	১। ভক্তি-রত্নহার
" যতীন্দ্রমোহন বসু	২। শিক্ষানবীশের পদ্য
" গিরিশচন্দ্র দত্ত	৩। সনাতন ধর্ম্মশিক্ষা (১ম পাঠ)
	৪। আর্য্য-নীতি-বিজ্ঞান (ঐ)
	৫। ঐ ঐ (উচ্চ পাঠ)
	৬। চারুনীতি-শিক্ষা
" কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	৭। সরল সন্দর্ভ
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮। স্বপ্ন-প্রয়াণ
	৯। ঐ
" সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০। জাপান
" হরিপদ মুখোপাধ্যায়	১১। রাণী দুর্গাবতী
	১২। দধীচি
" রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১৩। সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ
	১৪। হিন্দুস্থানী উপকথা
	১৫। আরব্যোপন্যাস (২য় খণ্ড)
" বামাপদ চট্টোপাধ্যায়	১৬। বৃহৎসারাবলী (৫ম খণ্ড, গৌরাঙ্গলীলা)
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়	১৭। বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ ও সাধু-জীবনী
Officer In charge Bengal Sect. Book Depot.	১৮। Annual Report of the Bengal Veterinary College, for 1913-14.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Superintendent, Govt. Printing. India.	১৯।	General Catalogue of all Publications of Govt. of India and Local Govts.—No. 22, Part I,
	২০।	Do Do II.
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	২১।	Prayag or Allahabad.
Officer In charge, Bengal Sect. Book Depot.	২২।	Bengal Dist. Gazetteers, Murshidabad.
Director, Geological Survey of India.	২৩।	Records of the Geological Survey of India, Vol 44. Part. III. 1914.
শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৪।	Bengal, past and present, Vol 8. part II. April to June, 1914.

৪। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন,—আমরা যখন ছাত্রবৃত্তি পড়ি, তখন ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের "প্রাকৃত ভূগোল" পড়িয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার কৃত প্রাকৃত ভূগোল সংক্রান্ত মানচিত্রের কথা পড়ি; কিন্তু তাহা আমি কখনও দেখিতে পাই নাই। কিন্তু সেই হইতে তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমার বড় কৌতূহল ছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভ্রাতা ৺উপেন্দ্রলাল মিত্রের পৌত্র শ্রীমান্ পঞ্চানন মিত্র এম্ এ আমার ছাত্র। তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে তাঁহাকে আমিই মানচিত্র সংগ্রহের কথা বলি। বহু দিন পরে আজ কয়েক দিবস হইল, তিনি সেই মানচিত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমাকে দিয়াছেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্ববৎসর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই মানচিত্রগুলি প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপাইয়াছিলেন। তত পূর্ব্বকালের মানচিত্র কি সুন্দর হইয়াছিল, তাহা আপনারা দেখুন। বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত প্রাকৃত ভূগোল-সংক্রান্ত মানচিত্র বোধ হয়, এই প্রথম; এগুলি এখন দুর্ল্লভ বস্তু। এগুলি সেই দুর্ল্লভ বস্তু বিবেচনায় এবং যে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম যুগে তাহাকে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ-সম্পদে সুসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের হাতের কাজ বলিয়া আমি এগুলি সাহিত্য-পরিষদে উপহার দিতেছি। শ্রীমান্ পঞ্চানন মিত্র আরও একখানি সুন্দর জিনিষ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এখানি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় কুমার মহেন্দ্রলাল মিত্রের লিখিত একখানি খাতা। তিনি ১২৭৭ সালের ৬ই কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই খাতাখানিতে অধিকাংশ পশু-পক্ষীর এবং মৎস্যের ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম অনুসারে সংস্কৃত বহু অভিধান এবং সংস্কৃত বহুবিধ সাহিত্য হইতে বিভিন্ন পশুর যত নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এই খাতাখানি সাহিত্য-পরিষদের শব্দ-সমিতির এবং পরিভাষা-সমিতির বিশেষ উপকারে আসিবে। কেহ যদি একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই খাতাখানি সাজাইয়া গুছাইয়া সুসম্পাদিত করিয়া ছাপাইবার ভার লয়েন, তাহা হইলে সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বহু প্রাণীর

সংস্কৃত নামমালায় একখানি সুন্দর সঙ্কলন-গ্রন্থ বাহির হইতে পারে। শ্রীমান্ পঞ্চানন এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতে পারেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় কুমার মহেন্দ্রলাল মিত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক বৎসর সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি জীববিদ্যা ও উদ্ভিদ-বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং কয়েক বৎসরে উক্ত বিজ্ঞানদ্বয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া বিলাতের সায়েন্স সোসাইটীর ফেলো নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া প্রধানতঃ অমরকোষ, বিশ্বকোষ ও মেদিনী কোষের সাহায্যে রুক্স্বর্গ এবং ব্রাণ্ডফোর্ডের ইংরাজী গ্রন্থের অনুসরণে রামেন্দ্রবাবু যে নাম-মালা দেখাইলেন, সেই নামমালা সঙ্কলন করেন। পরে হুকারের গ্রন্থ দেখিয়া ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নামগুলির পরিশুদ্ধি প্রায় সমাপ্ত করিয়া আনিয়াছিলেন। অবশেষে কোলব্রুকের আদর্শে সংস্কৃত মেদিনী ও বিশ্বকোষ-সম্পাদনে সবে মাত্র হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৩১৪ সালের ১১ই বৈশাখ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এই সঙ্গে আমি আর একখানি খাতা সাহিত্য-পরিষদে উপহার দিতেছি। শুনিয়াছি, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নির্দ্দেশমত আমার পিতামহ এই খাতা লিখিতেন। খাতাখানিতে প্রথমতঃ ইংরাজী শব্দগুলি অক্ষরানুসারে তালিকা করা হইয়াছে। পরে ক্রমশঃ তাহাদের সংস্কৃত বা বাঙ্গালা প্রতিশব্দ লিখিত হইতেছিল। এই শেষোক্ত কার্য্যটি সম্পন্ন হয় নাই। যাহা হউক, এই খাতাখানি হইতে সাহিত্য-পরিষৎ কিছু উপকার পাইলে সুখী হইব।' এই সঙ্গে তিনি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রণীত (1) European Scientific Terms for vernacular Text Books, (2) Age of the Ajanta caves, (3) Report on the Sanskrit mss. (4) Sanskrit mss. treating of Ancient Hindu Veterinary Art, (5) ভূতত্ত্বদর্শন (মানচিত্র) এবং একখানি Life of Rajendra-Lall Mitra নামে পুস্তিকা উপহার দেন।

রামেন্দ্র বাবু এই সকল দুর্ল্লভ উপহারের জন্য পঞ্চানন বাবুকে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, রাজার বৈজ্ঞানিক শব্দরচনা-প্রণালী পুস্তিকা-খানির মর্ম্মানুবাদ ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় জানাইলেন,—সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম নামে এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উদয়পুরের মহারাণার অন্যতম সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব মহাশয় এই সুবৃহৎ সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। যে সময় কলিকাতায় সার রাজা রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুম সঙ্কলন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই শব্দকল্পদ্রুম দেখিয়াই ব্যাসদেবজীর সংগীত বিষয়ে রাগকল্পদ্রুম প্রকাশে ইচ্ছা হয়। তজ্জন্য তিনি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং নানা স্থানের প্রধান প্রধান গায়কদিগের নিকট হইতে প্রচলিত নানা সুরের নানা ভাষার প্রাচীন ও

অর্ব্বাচীন বহু প্রসিদ্ধ গান সংগ্রহ করেন। বহু দেশ হইতে এবং বহু রাজার সভা হইতে বহুতর সঙ্গীতশাস্ত্রও সংগ্রহ করেন। এই সকল উপাদান হইতে তিনি এই সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম সঙ্কলন করেন। তিনি শব্দকল্পদ্রুমের ন্যায় সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমকেও সাত খণ্ডে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে অবশেষে উহাকে তিন খণ্ডে ছাপাইতে বাধ্য হয়েন। ১৯০০ সম্বতে (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার এই বৃহৎ গ্রন্থের ছাপা শেষ হয়। সে সময় তিনি অতি অল্পসংখ্যক পুস্তকই ছাপাইয়াছিলেন। কাজেই বহু কাল হইতে এই অমূল্য গ্রন্থখান অতিমাত্র দুর্ল্লভ হইয়া রহিয়াছে। সঙ্গীত বিষয়ে এত বড় মুদ্রিত গ্রন্থ ভারতে কেন, জগতের অপর কোন ভাষায় আছে কি না, জানি না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের পুস্তকাগারে এই দুর্ল্লভ গ্রন্থের এক খণ্ড ছিল। তিনি সেই খণ্ডটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দান করেন। তাঁহারই আগ্রহে, তাঁহারই সম্পূর্ণ ব্যয়ে সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থ ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ৭০৬ পৃষ্ঠায় ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাপাইতে রাজা বাহাদুরের পাঁচ হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থ নাগরী অক্ষরে ছাপান হইয়াছে। ইহাতে সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাটী, মারহাটী, আরবী, ফারসী, তৈলঙ্গী, তামিল, বাঙ্গালা, উড়িয়া, ইংরেজী, পেশয়ান ও রাজপুতানার নানা প্রদেশের ভাষায় গান সংগ্রহ আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যদিও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যেরই অনুশীলন করিয়া থাকেন, তথাপি এই গ্রন্থের এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রের গৌরব বিবেচনায় এই গ্রন্থের প্রকাশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার-বহির্ভূত হয় নাই। অধিকন্তু এই গ্রন্থে বিস্তর প্রাচীন লুপ্তপ্রায় বাঙ্গালা গান সঙ্কলিত আছে; এই গ্রন্থ-প্রকাশে অন্ততঃ সেই বাঙ্গালা গানগুলিও রক্ষা পাইল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই গ্রন্থের প্রচার হওয়া আবশ্যক। এই জন্য সাহিত্য-পরিষদের প্রচলিত প্রথা ত্যাগ করিয়া এই গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরেই মুদ্রিত হইল। আদর্শ পুস্তকে নানা প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র হইতে যে সমস্ত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, বলিতে কি, তাহার একটি শ্লোকও বিশুদ্ধরূপে ছাপা হয় নাই। এ জন্য সে সকল শ্লোকের পাঠ ঠিক করিবার নিমিত্ত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত নানা সঙ্গীতশাস্ত্র আমাকেও সংগ্রহ করিতে হইয়াছে এবং অধিকাংশ গানের পদাবলী ঠিক করিবার নিমিত্ত বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য লইতে হইয়াছে। যে বদান্য রাজা বাহাদুরের দয়ায় এই বিপুলায়তন সুদুর্ল্লভ সঙ্গীত-গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশিত হইল, তিনি এই গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎকেই দান করিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থ ছাপাইতে রাজা বাহাদুরের প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে। সে দিন যে মহানুভবের কৃপায় সাহিত্য-পরিষৎ স্থায়ী ধন-ভাণ্ডারে তের হাজার টাকা দান পাইয়াছেন, আজ আবার তাঁহারই কৃপায় এত বড় বিরাট গ্রন্থ-স্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎ প্রাপ্ত হইলেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সাহিত্য-পরিষদের প্রতি বদান্য রাজা বাহাদুরের স্নেহ কেমন অকৃত্রিম এবং কতটা গভীর। আমি এই জন্য সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে রাজা বাহাদুরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন,—এই গ্রন্থের বাঙ্গালা গানের অংশ পূর্ব্বকালে স্বতন্ত্র ছাপা হইয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান সভাপতি মহাশয় সাত আট বৎসর পূর্ব্বে তাহার এক খণ্ড সাহিত্য-পরিষদে উপহার দেন। তাহার পর রাজা বাহাদুর সমগ্র গ্রন্থখানি সাহিত্য-পরিষৎকে দেন। তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থখানি পুনরায় প্রকাশ করিবার জন্ত তিনি আমাকে অনুরোধ করেন। এত বড় গ্রন্থখানি পুনরায় প্রকাশ করিবার জন্ত তিনি আমাকে অনুরোধ করেন। এত বড় গ্রন্থ ছাপিতে ১০।১২ হাজার টাকা খরচ পড়িবে বলিয়া রাজা বাহাদুরের স্থায় পরমহিতৈষীর অনুরোধও সাহিত্য-পরিষৎ অর্থাভাবে এত দিন রক্ষা করিতে পারেন নাই। সুবিবেচক রাজা বাহাদুর সে জন্ত বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্টচিত্তে আগ্রহ সহকারে কিছু দিন পরে আমাকে জানান,—"আমিই উহার সমস্ত ব্যয় দিব, আপনি ছাপার বন্দোবস্ত করুন।" নাগরী অক্ষরে ছাপা হইবে বলিয়া আমি স্বতন্ত্র ভাবে নগেন্দ্র বাবুর সহিত উহার ছাপার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের প্রতি রাজা বাহাদুরের স্নেহ এতই অধিক যে, পুস্তক ছাপা প্রায় শেষ হইলে একবার মাত্র প্রার্থনা করিতেই রাজা বাহাদুর এই গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই দানের ফল হইয়াছে এই, যদি ভাগ্যবলে এই পুস্তকের সহস্র খণ্ড সাহিত্য-পরিষৎ বিক্রয় করিতে পারেন, তবে একেবারে ত্রিশ সহস্র টাকা পাইতে পারিবেন। রাজা বাহাদুরের ইচ্ছা যে, এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থে সাহিত্য-পরিষৎ ভবিষ্যতেও সঙ্গীতশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন এবং সে সকল গ্রন্থের স্বত্বও সাহিত্য-পরিষদেরই থাকিবে। রাজা বাহাদুরের এই মহৎ দানের জন্ত নগেন্দ্র বাবু যে ধন্তবাদ প্রস্তাব করিতেছেন, আমি তাহার সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—এক সময় গ্রন্থখানি কিরূপ দুর্লভ হইয়াছিল, তাহার একটা ঘটনা এই সময় বলিলে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ডাঃ গ্রিয়ারসন এই গ্রন্থখানির পরিচয় পাইয়া, ইহা দেখিবার জন্ত বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করেন। মেটকাফ হলে ইহার এক খণ্ড ছিল। তিনি জানিতে পারিয়া শুধু বহিখানি দেখিবার জন্তই মেট্‌কাফ্‌ হলের মেম্বর হন এবং বহিখানি আনিয়া তাহার বিবরণ লিখিবার ভার বেঙ্গল গভর্মেণ্টের হিন্দী অনুবাদক সোহনলালের উপর অর্পণ করেন। কার্য্যগতিকে রায় সোহনলাল পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে কার্য্য শেষ করিতে পারেন নাই। ডাঃ গ্রিয়ারসন কেবল বহিখানির জন্ত এই পাঁচ বৎসর কাল মেট্‌কাফ্‌ হলে চাঁদা দিয়াছিলেন। অবশেষে ডাঃ গ্রিয়ারসনের অনুরোধে আমি মাঝে পড়িয়া কাজ শেষ করিয়া দিয়াছিলাম এবং তিনিও অনর্থক চাঁদা দিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। সেই সময় এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথি কিনিতে গিয়া এক স্থানে আমি ইহার বাঙ্গালা গানের অংশ চারিখানি পাইয়াছিলাম। তাহারই একখানি সাহিত্য-পরিষদের জন্ত রামেন্দ্র বাবুকে দিয়াছিলাম। যে সময় রাজা সার রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুম সঙ্কলন করেন, সেই সময়ে "কল্পদ্রুম" নাম দিয়া গ্রন্থ সঙ্কলনের একটা খেয়াল পড়িয়া গিয়াছিল। এই রাগ-

কল্পদ্রুমের গ্রন্থকারও সেই যুগেরই লোক। ইনি সমস্ত ভারতের রাজা-রাজড়ার বাড়ী বাড়ী গিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থখানি ছাপান; গ্রন্থশেষে সেই সকল রাজার নাম ছাপান আছে। শব্দকল্পদ্রুম আর রাগকল্পদ্রুমের কথা আপনারা শুনিয়াছেন। ঐ সময়ে নেপালের রাজা রাজেন্দ্রবিক্রম আর একখানি কল্পদ্রুম সংগ্রহ করেন, সেখানি তন্ত্রকল্পদ্রুম। রাজা রাজেন্দ্রবিক্রম নানা কারণে নেপাল ছাড়িয়া কিছু দিনের জন্ত ইংরাজ-রাজত্বে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। নেপালের নিয়ম, রাজা যদি কোন কারণে স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত হইতে হয়। রাজেন্দ্রবিক্রম সুতরাং রাজ্যচ্যুত হন। তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রবিক্রমকে রাজা করা হয়। কিছু দিন পরে তিনি দেশে ফিরিয়া গেলে, আর কোন কর্ম্ম না থাকায় সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত হন। তিনি বহুবিধ তন্ত্র সংগ্রহ করিয়া তন্ত্রকল্পদ্রুম সঙ্কলন করিতে থাকেন। ১৪০০ চৌদ্দ শত পাতা লেখা হইলে তাঁহার দেহান্ত হয়। এই তন্ত্রকল্পদ্রুম আজিও ছাপা হয় নাই। উহার মধ্যে তিনি একটি বড় ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন। ভূমিকায় স্ববংশের পরিচয় দিয়া প্রায় পঞ্চাশ পাতায় আপনাদের একটু ছোট ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জাতিতে চৌহান রাজপুত। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের আদিপুরুষ নেপালে গিয়া সামান্ত একটু ভূমি দখল করিয়া বসেন। পরে ক্রমশঃ বর্ত্তমান নেপাল-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। যাহা হউক, এই রাগকল্পদ্রুমের সঙ্গে অনেক সাহিত্য-সম্বন্ধ জড়িত। সাহিত্য-পরিষৎকে এমন একখানি গ্রন্থের স্বত্বাধিকার দান করিয়া রাজা বাহাদুর ইহাকে বড়ই গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের দশাবতার তাম্রফলক সম্বন্ধে প্রবন্ধের সারাংশ বিজ্ঞাপন করেন।*

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত বৈদিক যজ্ঞের উপকরণাদি প্রদর্শন করিতে উঠিয়া বলিলেন,—কাশীতে এক সময়ে আমার সহিত বালমুকুন্দ মালবী নামে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডী এক ব্রাহ্মণের আলাপ হয়। ইনি শ্রৌত কর্ম্মকাণ্ডে বিশেষ পটু ছিলেন। মালবীরা রাণী দুর্গাবতীর সময় হইতে লেখা-পড়ার চর্চ্চা করিয়া সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছেন। বালমুকুন্দ মালবী বৈদিক ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিতেন এবং যজ্ঞাদিতে কোন না কোন ঋত্বিকের পদে ব্রতী হইতেন। এইরূপে কাজ-কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার ধারণা হয়, এখন তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহা যেন প্রাচীন পদ্ধতি-সিদ্ধ নয়। ইহার পর হইতে তিনি বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের পদ্ধতির পুথি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং সেই সকল পুথির সাহায্যে তিনি কোন কোন বিষয়ের সংস্কার করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন কোন যজ্ঞের নিয়ম এই, যজ্ঞান্তে যজ্ঞীয় পাত্রগুলি ঋত্বিকেরা পাইয়া থাকেন। তিনি অনেক যজ্ঞেই ব্রতী হইয়াছিলেন; কাজেই তাঁহার ঘরে কয়েক প্রস্থ যজ্ঞীয় পাত্র জমিয়াছিল। তাহারই মধ্য হইতে এক প্রস্থ তিনি আমাকে দান করেন। সেগুলি এই;—ইহার প্রত্যেকটির

* সম্পূর্ণ প্রবন্ধ পত্রিকার ২১শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বতন্ত্র নাম আছে, প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র কার্য্য আছে। কোনটি বা এক যজ্ঞে, কোনটি বা অন্য যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়। বালমুকুন্দ ইহাদের কতকগুলিতে নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমি এইগুলি আজ সাহিত্য-পরিষদে দেখাইব জানিয়া রামেন্দ্রবাবু একবার এগুলি দেখিতে চাহেন। তিনি ত্রিবেদী, আজ কাল তিনি বেদ লইয়া বড়ই নাড়াচাড়া করিতেছেন। বিশেষতঃ যজ্ঞকাণ্ডই তাঁহার ভাল করিয়া দেখা শুনা হইয়াছে। তিনি এগুলি দেখিয়াই বালমুকুন্দের দেওয়া নামের অনেক ভুল ধরিলেন। বলিলেন,—শাস্ত্রের বর্ণনার সহিত এ নামের এ পাত্র মিলে না। তাহার পর তিনি তাঁহার পাঁজিপুথি লইয়া পাত্রগুলির পরিচয় নির্ণয় করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং আমা অপেক্ষা তিনি আপনাদিগকে ভালই বুঝাইয়া দিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বৈদিক যজ্ঞীয় উপাদানগুলির ব্যবহার বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যজ্ঞপাত্রগুলির নাম ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করিয়া দিলে পর সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—ত্রিবেদী মহাশয় ত্রিবেদী হইলেও আজ চতুর্ব্বেদেরও কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। তবে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবেই ত্রিবেদী; কারণ, সামবেদীদের এ সকলের প্রয়োজন হয় না। গানে গানে তাঁহাদের সব শেষ হয়। বাঙ্গালীরা সমস্ত বেদ মুখস্থ করিত না। ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য তাহাদের যতটা প্রয়োজন হইত, ততটুকু পড়িত, ততটুকু মুখস্থ করিত এবং ততটুকুর অর্থ জানিয়া পড়িত। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের দ্বিবেদী, ত্রিবেদী ও চতুর্ব্বেদী উপাধি নাই; কিন্তু যিনি যে যজ্ঞ করিতেন, তদনুসারে তাঁহার প্রসিদ্ধি হইত। চট্টোপাধ্যায়-বংশে গঙ্গানন্দ নামে এক ব্যক্তির অবসথী উপাধি ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বাজপেয়ী উপাধি ছিল। এখনকার কালেও কয়েকটি বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণে এখনও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আছেন। ভিঙ্গার রাজা উদয়প্রতাপ একবার যজ্ঞ করিবার জন্য কাশীতে পুরোহিত সংগ্রহের জন্য লোক পাঠান। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি যাহাকে যে কাজের ভার দিব, তাহাকে সেই কাজ করাইতে হইবে। যাঁহার যেটুকু মুখস্থ আছে, তিনি সেইটুকু পারিবেন, আর কিছু পারিবেন না, এমন লোককে আমার প্রয়োজন নাই। এরূপ লোক উত্তর-ভারতে নাই, মহারাষ্ট্রে পাওয়া গেলনা; ত্রিবাঙ্কুরেই পাওয়া গেল এবং তাঁহাদের দ্বারা তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্যও হইল। শ্রীরঙ্গমে এখনও অগ্রহার আছে অর্থাৎ সেই গ্রামে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি বা অন্য কোন ব্রাহ্মণ বাস করিতে পারে না। কেবল গ্রামের এক প্রান্তে এক ঘর নাপিত ও আর এক প্রান্তে এক ঘর ধোপা আছে। বাঙ্গালা দেশে প্রায় হাজার বৎসর বেদের চর্চ্চা লোপ হইয়াছে। কাশীতে প্রায় লোপ হইয়া আসিয়াছে। সওয়াই জয়সিংহ ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্র বর্দ্ধনের জন্য যে পদ্ধতি হইয়াছিল, সেই পদ্ধতি লইয়া এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, কেবল অশ্ব মোচনের বেলা মীমাংসা হইল, স্বমণ্ডলের মধ্যে অশ্ব ঘুরিবে। এখনও দুই চারিটি পদ্ধতি পাওয়া যায়। রাজ্যাভিষেকের মধ্যে যে ঐন্দ্র অভিষেক আছে, তাহার পদ্ধতি আমার নিকটেই আছে। বাহা

হউক, রামেন্দ্র বাবুর কৃপায় এই যজ্ঞপাত্রগুলির কিছু কিছু পরিচয় আমরা পাইলাম। এই বিষয়ে তাঁহার প্রবল উৎসাহ। অতিমাত্র দুর্ব্বল হইয়াও আজ তিনি এই যজ্ঞপাত্রের ব্যাখ্যা করিবার জন্য যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ দেখাইলেন, তাহার ফলে, তাঁহার কোন অনিষ্ট না হইলেই আমরা সুখী হইব।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ জানাইয়া সভা-ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পরিদর্শন-বিবরণ

গত ১৯শে মাঘ (১৩২১) শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪॥০ টার সময় বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল মহোদয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই মাননীয় পি, সি, লায়ন, মাননীয় মিঃ এফ্, জে, মোনাহান (প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার), সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ সোয়ান (আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট), ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা, মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর, রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় (তাজহাট), মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, রাজা দামোদরদাস বর্ম্মন্ বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, মিঃ কিরণচন্দ্র দে আই সি এস্, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী (সেরপুর), শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু প্রভৃতি গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি), মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও কুমার শরৎকুমার রায়, (সহকারী সভাপতি), শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (সহকারী সম্পাদকগণ), শ্রীযুক্ত

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য ও কর্ম্মচারিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মাননীয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ লরেন্স জেঙ্কিন্স, মাননীয় মিঃ কামিং (চীফ সেক্রেটারী), মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, লালগোলার রাজা বাহাদুর, ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী, ডাঃ হরিধন দত্ত প্রভৃতি মান্যগণ্য কয়েক ব্যক্তি বিশেষ কারণে আসিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

যথাসময়ে লর্ড কারমাইকেল মিঃ গুরলে ও একজন এডিকঙ্গকে সঙ্গে লইয়া মোটরে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির নূতন মেরামত করিয়া ফুল-পাতা, কলাগাছ আর পূর্ণঘট দিয়া সাজান হইয়াছিল, নহবৎ বসিয়াছিল। লাট সাহেবের গাড়ী দেখা যাইবামাত্র নহবৎ বাজিয়া উঠিল। তাহার পর লাট সাহেব দরজায় নামিবামাত্র দুই দিক্ হইতে শঙ্খধ্বনি করিয়া মঙ্গলাচরণ করা হয়। দরজায় সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয়, সহকারী সভাপতি দেবপ্রসাদ বাবু ও কুমার শরৎকুমার, সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মাননীয় রাজা হৃষীকেশ লাহা, সার্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (সম্পাদক) এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক লাট সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়া সমাদরে মন্দিরে লইয়া আসিলেন। দরজার মধ্যে দরদালানে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যান্য সভ্য অনেকেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদিগকে লাট সাহেবের নিকট সংক্ষেপে পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাহার পর সকলে নিম্নতলে সাহিত্য-পরিষদের সুবৃহৎ ও কৌতূহলোদ্দীপক পুস্তকালয় দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মধ্যস্থলে ২৪ ফুট লম্বা দীর্ঘ টেবিলের উপর সাহিত্য-পরিষদের সযত্ন-সঞ্চিত প্রাচীন কালের ছাপা বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সাজান ছিল। পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী এই সকল দুর্লভ গ্রন্থ দেখাইয়া তাহাদের পরিচয় দিতে লাগিলেন। লাট সাহেব, মিঃ গুরলে, মাননীয় লায়ন প্রভৃতি বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম ছাপা বহি 'হালহেডের" গ্রামার, প্রথম সাহিত্য গ্রন্থ "বত্রিশ-সিংহাসন", প্রথম সংবাদপত্র "সমাচারদর্পণের" প্রথম সংখ্যা, প্রথম মাসিক পত্র "দিগ্দর্শন", প্রথম আইন-পুস্তক "আদালত-তিমিরনাশক", প্রথম অভিধান "মিলার সাহেবের বাক্যকোষ" (Vocabulary), প্রথম বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ "কথোপকথন" (Colloquies), প্রথম পঞ্জি

গ্রন্থ "কৃত্তিবাসের রামায়ণ" ইত্যাদি বহু গ্রন্থ দেখিয়া সন্তোষ ও বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তাহার পর বিদ্যাসাগর-পুস্তকালয়ের বহুমূল্য সুন্দর বাঁধান পুস্তকগুলি এবং পুস্তকালয়ের অন্যান্য সমস্ত পুস্তক পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

তাহার পর সকলে দ্বিতলে সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। এখানে প্রাচীরের কোলে কোলে সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার বহুবিধ প্রাচীন দ্রব্য টেবিলের উপর সাজান ছিল। সভাবেদীর উপর সাহিত্য-পরিষদের সঞ্চিত পুঁথির রাশি সাজান হইয়াছিল। প্রস্তর ও পিত্তলের নানাবিধ প্রাচীন প্রতিমা, প্রাচীন ইষ্টক-শিল্প, প্রাচীন রঙ্-করা খেলিবার তাস, বৈদিক যজ্ঞের কাষ্ঠ-পাত্রাদি, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখকগণের হস্তাক্ষর এবং ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, প্রাচীন তামা, রূপা, সোনা, সীসা ও পিত্তলের মুদ্রা, প্রাচীন ছবি, প্রাচীন রসায়ন-যন্ত্রের ছবি এবং কতকগুলি পুরাতন তাম্রলেখ ও শিলালেখ সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া, ভূতপূর্ব্ব চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লাট সাহেব ও অন্যান্য অভ্যাগতগণকে এই সকল দ্রব্যাদি দেখাইয়া তাহাদের পরিচয়াদি ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলেন।

তাহার পর লাট সাহেব পরিষদের পুঁথিশালায় প্রবেশ করিয়া সেখানে তিন সহস্রাধিক সংগৃহীত পুঁথি পরিদর্শন করিলেন।

অতঃপর লাট সাহেব ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সভায় আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে, সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের মুদ্রিত এক প্রস্থ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও এক প্রস্থ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা লাট সাহেবকে উপহার দিলেন। এই পুস্তকগুলি একটি কাষ্ঠের সুন্দর আধারে সাজাইয়া উত্তমরূপে বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বহুবাজারের পীতাম্বর সরকার কোম্পানী এই সুন্দর কাষ্ঠাধারটি প্রস্তুত করিয়া দিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। এই আধারটির মাথায় একখানি রূপার পাতে "বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, লোকপ্রিয়, বঙ্গমণ্ডলেশ্বর মহামহিমান্বিত লর্ড কারমাইকেল মহোদয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শ্রদ্ধাপূর্ণ উপহার" এই কথা খুদিয়া লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই রূপার পাতখানিও শিল্পের একটি নূতন নিদর্শন। ইহার অক্ষরগুলি গভীর করিয়া খুদিয়া দেওয়া নহে বা রূপার পাতখানি চাঁচিয়া অক্ষরগুলি উচু করিয়া কাটিয়া বাহির করা নহে বা ঢালাই করিয়া গড়িয়া দেওয়া নহে; কিন্তু নূতন এক প্রকার তক্ষণ-শিল্পের সাহায্যে অক্ষরগুলি উচু করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ভবানীপুরের দত্ত ঘোষ কোম্পানী এই নূতন শিল্পের প্রথম নিদর্শনস্বরূপ এই পাতখানি এই প্রথম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং সাহিত্য-পরিষৎই এইরূপ পাত এই প্রথম সাধারণ কার্য্যে ব্যবহার

করিলেন। পাতখানি দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল, সোনালী জমীর উপর চক্‌চকে শাদা অক্ষরগুলির বড়ই খোলতাই হইয়াছিল।

তাহার পর সভাপতি মহাশয় লাট সাহেবকে মালা পরাইয়া দিলেন। সমাগত ব্যক্তিবর্গকে আতর গোলাপ দেওয়া হইল। ইতিপূর্ব্বে সকলকেই এক একটি 'বটন হোল' নামক ফুলের গুচ্ছ দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর বঙ্গবাসি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের রচিত একটি "আবাহন" কবিতা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পাঠ করিলে সভাপতি মহাশয় বিহারী বাবুকে লাট সাহেবের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। লাট সাহেব স্মিতমুখে তাঁহাকে সমাদর করিলেন। তাহার পর শাস্ত্রী মহাশয় সমাগত সজ্জন-বর্গকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন,—

হে মহানুভব রাজগণ এবং সমবেত ব্যক্তিবর্গ, আজ আপনারা যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এখানে আসিয়াছেন এবং আসিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দুই হাজার সদস্যকে তাঁহাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি-সাধনের চেষ্টায় যে উৎসাহ দান করিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বয়স ২০ বৎসর মাত্র হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের ধনিসম্প্রদায়ের বদান্যতায়, বিশেষতঃ কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিশেষ অনুগ্রহে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কেবল যে ইহার গৌরবোচিত এই আশ্রয়স্থান—এই সুদৃশ্য অট্টালিকাটি নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছে, তাহা নহে; কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর এই অট্টালিকার পার্শ্বে আর এক খণ্ড জমি দান করিয়াছেন। সেই জমির উপর এই বাড়ীর মত আর একটি বাড়ী শীঘ্রই নির্ম্মিত হইবে, এবং সেই অট্টালিকা এই অট্টালিকার সহিত একত্র সংলগ্ন থাকিবে। সেখানে আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ মিঃ আর, সি দত্ত সি আই ই মহোদয়ের নামে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে চিত্রশালা স্থাপিত হইবে। তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালায় সুলেখক ছিলেন, সুবিদ্বান্ ছিলেন, উৎকৃষ্ট উপন্যাস-লেখক এবং সুকবি ছিলেন এবং রাজ্যশাসনে ও পরিচালনে তাঁহার উৎকৃষ্ট ক্ষমতা ছিল। তিনি এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে জীবন-পথে প্রথম অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদে যে কেবল বহুসংখ্যক বাঙ্গালা পুস্তক ও পুথি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা নহে, এখানে বঙ্গ-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নানারূপ স্মৃতি-নিদর্শন সংগৃহীত ও সঞ্চিত হইয়াছে। আপনারা দেখিয়াছেন যে, গত এক শত বৎসরের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় হইতে চন্দ্রনাথ বসু পর্য্যন্ত যে সকল বাঙ্গালী তাঁহাদের মাতৃভাষার ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য অপরিমেয় পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বহু জনের ছবি ইহার প্রাচীরে প্রাচীরে লম্বিত রহিয়াছে। বঙ্গেশ্বর এবং আপনারা সকলে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পরিষৎ-মন্দিরে স্থানাভাবের জন্য বড়ই অসুবিধা হইতেছে; কিন্তু নূতন বাড়ীতে যখন চিত্রশালা এবং ছবিগুলি স্থানান্তরিত হইবে,

তখন পুস্তক এবং পুথির জন্ত এ বাড়ীর চতুর্দ্দিকে আলমারী রাখিবার স্থান হইলে, এই কষ্ট দূর হইতে পারিবে। পরিষদের কার্য্যে পরিশ্রম করিতে, সাহিত্য এবং ইতিহাসের গবেষণায় আমাদের দেশের যুবকগণের উৎসাহের অভাব নাই এবং আমাদের দেশের রাজা, জমিদার এবং ধনিসম্প্রদায়েরও বদান্ততার অভাব নাই। বঙ্গেশ্বর, আপনার গুণগ্রাহী রাজপুরুষেরা সংপ্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রাচীন এবং প্রয়োজনীয় বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশের জন্ত বার্ষিক বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ইহার প্রতি আপনার এবং তাঁহাদিগের নিজের বিশেষ অনুগ্রহ এবং সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। আর আজ, বঙ্গেশ্বর, এখানে আপনার উপস্থিতিতে যে প্রচুর তৃপ্তি ও উৎসাহ লাভ হইল, তাহার ফলে ভবিষ্যতে আরও সুফল ফলিবে। আশা করি, সাহিত্য-পরিষৎ নূতন জমির দখল পাইলেই তাহাতে নূতন অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপনের জন্ত আবার, বঙ্গেশ্বর, আপনাকে এখানে পদার্পণ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে অনুরোধ করিব। অবশেষে হে সজ্জনবর্গ, আপনারা আজ এখানে অনুগ্রহপূর্ব্বক আসিয়া আমাদিগকে যেরূপ সম্মানিত ও উৎসাহিত করিলেন, তজ্জন্ত আপনাদিগকে ধন্তবাদ করিতেছি।

ইহার পর লাট সাহেব অল্প কথায়, সুললিত ভাষায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সকল বিভাগের কার্য্যেই সম্পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে লাট সাহেব সদলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সাহিত্য-পরিষদের গত ২০ বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ ইংরাজীতে ছাপাইয়া এই দিন অভ্যাগতবর্গকে দেওয়া হইয়াছিল। চিত্রশালার যে সকল কৌতূহলজনক বস্তু এই দিন প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাদের একটি ক্ষুদ্র পরিচয়-পুস্তিকাও এই দিন বিতরণ করা হয়। ২০ বৎসরের কার্য্য-বিবরণের মধ্যে যেখানি লাট সাহেবকে দেওয়া হয়, তাহার মলাটখানি উৎকৃষ্ট মখমলের মত চামড়ায় বিবিধ রঙ্গে ছাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইখানি সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী কে, বি, সেন ব্রাদার্স বিনামূল্যে ছাপাইয়া দেওয়ায় পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কার্য্য-বিবরণীর মলাটের উপর এবার পরিষৎ-মন্দিরের ছবি দেওয়া হইয়াছিল।

লাট সাহেব এবং তাঁহার শাসন-পরিষদের প্রধান সদস্ত মাননীয় মিঃ লায়ন সাহিত্য-পরিষদের পরিদর্শন-পুস্তকে সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মূল এবং অনুবাদ শেষে প্রকাশিত হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
১লা ফাল্গুন, ১৩২১।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, লোকপ্রিয়, বঙ্গমণ্ডলেশ্বর,

মহামহিমান্বিত শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল

মহোদয়ের

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে

অভিমত

I was delighted at being asked to visit the building of the Bangiya-Sahitya Parishad of which I had heard much praise; what I saw proved to me that the the praise, I had heard, was very well deserved. The Library is good and the Museum very interesting. I think the society is to be congratulated on the work it is doing. I am grateful for the books which the members have presented to me, and am looking forward to again visiting the Museum and seeing the collections at sometime when I can stay longer in the building. If I can anytime help the society, I shall be glad to do my best, for I think the society is helping Bengal.

(Sd.) Carmichael,
Governor of Bengal.
2nd February, 1915.

(অনুবাদ)

যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বহু প্রশংসা আমি শুনিয়াছিলাম, সে দিন আহূত হইয়া সেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দেখিতে গিয়াছিলাম এবং দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছি। যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, যে প্রশংসা শুনিয়াছিলাম, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে উহার উপযোগী। উহার পুস্তকাগারটি চমৎকার এবং চিত্রশালাটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। সাহিত্য-পরিষৎ যে সকল কাজ করিতেছে, আমার বিবেচনায় সে জন্য তাহাকে সমাদর করা কর্ত্তব্য। ইহার সদস্যগণ আমাকে যে সকল পুস্তক উপহার দিয়াছেন, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি এবং আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, ভবিষ্যতে আবার এই চিত্রশালা দেখিতে যাইব এবং আজকার অপেক্ষা অধিকক্ষণ থাকিয়া সংগৃহীত দ্রব্যগুলি বিশেষ ভাবে দেখিয়া আসিব। যদি কখন আমি এই সাহিত্য-পরিষৎকে সাহায্য করিতে পারি, আমি সানন্দে তাহা যথাসাধ্য করিব; কারণ, আমার মনে হয়, এই সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতেছে।

(স্বাঃ) কারমাইকেল,
বাঙ্গালার গভর্ণর,
২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫।

I am glad to have had an opportunity of visiting the home of the Bangiya-Sahitya Parishad. I am informed on high authority that its literary work is of the best quality and has earned for the society a notable reputation in European countries. At the present time such work is of very special value to the Bengali language and to Bengal.

(Sd) P. C, Lyon.
5.2.15.

অনুবাদ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরটি দেখিবার সুযোগ পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের বচন-প্রমাণে আমি জানিতে পারিলাম যে, এই সভার সাহিত্য-সংক্রান্ত কাজগুলি অতি উচ্চাঙ্গেরই হইতেছে এবং তাহারই বলে ইয়োরোপেও এই সভার সুযশ রটিয়াছে। আজকালকার কালে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এইরূপ কাজের একটা বিশেষ উপকারিতা আছে।

(স্বাঃ) পি, সি, লায়ন।
৫।২।১৫

বিশেষ অধিবেশন

গত ৯ই ফাল্গুন (১৩২১), ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯১৫), রবিবার অপরাহ্ণ ৫।॰ টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চট্টগ্রাম-শাখার সভাপতি নবীনচন্দ্র দাস এম্ এ, বি এল মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোকপ্রকাশের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেন হইয়াছিল।

সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শ্যামলাল মল্লিক মহাশয়ের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি হন।

সভাপতি মহাশয় উঠিয়া বলিলেন,—আপনারা সকলেই জানেন, আজ ভারতের এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। মাননীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত আজ সকল জায়গায় সকল প্রকার সভা-সমিতির কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, আফিস, কুঠীও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের সাহিত্য-পরিষদেরও কার্য্য বন্ধ করা উচিত। কিন্তু একটি

কার্য্য আমাদিগকে করিতে হইতেছে। আমাদিগের চট্টগ্রাম-শাখার সভাপতি নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশ করিবার নিমিত্ত আজ আমাদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইবার কথা। এই বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য আমাদের সারিয়া ফেলিতে হইবে। তাঁহার সহিত আমার বন্ধুতা ছিল, তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি যে তিন বৎসর কৃষ্ণনগরে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। সাহিত্য আলোচনায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। আদালতের কাজের অবসরে তিনি সর্ব্বদা সাহিত্য আলোচনা করিতেন। তাঁহার কৃষ্ণনগরের বাসাটিই সাহিত্য আলোচনার একটি কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, সকল সাহিত্যের আলোচনাই সেখানে হইত। এই সময়ে তিনি একটা শোক পাইয়াছিলেন; সেই শোকে কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া আসেন। কৃষ্ণনগরেই রঘুবংশের বাঙ্গালা অনুবাদ আরম্ভ হয়। রঘুবংশের পর ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ অনুবাদ করেন এবং তাহার পর মাঘের শিশুপালবধ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শিশুপালবধের অনুবাদ শেষ হয় নাই, দুই সর্গ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতায় সংস্কৃত গ্রন্থের নবীন বাবুর এই সকল অনুবাদ অতি চমৎকার। স্থানে স্থানে এমন সুন্দর হইয়াছে যে, অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। তিনি মেঘদূতের কতক অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সংকল্প ত্যাগ করেন। তাঁহার রঘুবংশের অনুবাদের সুমাদর কোন দিন ঘুচিবে না। তিনি যে কেবল সংস্কৃতেরই ভাল অনুবাদক ছিলেন, এমন নয়; Gray's Elegy আর Long-fellowর অনেক কবিতার উৎকৃষ্ট অনুবাদ তাঁহার আছে এবং কিছু কিছু ছাপাও হইয়াছে। তিনি চট্টগ্রামের শাখা-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। শাখা-পরিষদের উপর তাঁহার অতিশয় যত্ন ছিল। তাঁহার যত্নে তাহার অনেক উন্নতি হইয়াছে। সংপ্রতি তাঁহার একটি পুত্রবিয়োগ হওয়াতে এবং মামলা-মোকদ্দমায় বিব্রত হইয়া পড়ায়, তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি মানুষ হিসাবে দেবচরিত্র পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি ধীর ছিল। লোককে অবিশ্বাস তিনি করিতে পারিতেন না। দোকানদারেরা বলিত, এত ভাল মানুষকে ঠকাইলে ভগবান্ সহিবেন না। কিন্তু তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহার জন্য তিনি কিছুমাত্র নম্র হইতেন না। এ জন্য সারাজীবনে রাজসরকারে তিনি বেশী উন্নতি করিতে পারেন নাই।

মেদিনীপুর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—আমি আজ সাহিত্য-পরিষদে এই প্রথম আসিয়াছি। আসিয়াই আমার ভাগ্যে এই শোক-সভা মিলিয়াছে। নবীন বাবুর সঙ্গে আমার কখন পরিচয় ছিল না। আমি যখন হুগলীতে পড়ি, তখন নবীন বাবুর মহাভারতের অনুবাদ আমাদের পাঠ্য ছিল। তাঁহার মাঘের দুই সর্গের অনুবাদ আমি দেখিয়াছিলাম। নবীন বাবুর মত অনুবাদকের হস্তে ভাষার শক্তি বৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়। নবীন বাবুর কাছে অনেক আশা ছিল। কিন্তু আজ কয় দিন হইল, তাঁহার মৃত্যুতে তাহা মিটিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত প্রাচীন কাব্য-নাটকগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ হওয়া

আমি বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টির পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া মনে করি। নবীন বাবু অনুবাদের যে ধারা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষতি হইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চেষ্টা করুন, যাহাতে এই ধারা বজায় থাকে। আমি মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে এই শোকপ্রস্তাবে সহানুভূতি জানাইতেছি।

এই সময়ে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া পৌঁছিলেন। কলিকাতা বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর মহা-বিহারের মহাস্থবির গুণালঙ্কার ভিক্ষু মহাশয় বলিলেন,—নবীনচন্দ্র চট্টগ্রামের লোক, আমিও তাই। তিনি আমাদের চট্টল-মাতার সুসন্তান ও দেশের উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার গুণাবলীর কথা আমার অনেক জানা আছে, সে সকল আমি বর্ণনা করা অপেক্ষা আপনারা যে আজ তাঁহার মরণে তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া আমাদের সহিত সমান শোক অনুভব করিতেছেন, ইহাই সুশোভন হইয়াছে। আমরা যে বিশেষ রত্নটি হারাইয়াছি, তাহার ক্ষতি আমাদের শীঘ্র মিটিবে না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সমস্ত বাঙ্গালা দেশের মধ্যে মুখ্য সভা। এই সভা হইতে চট্টল-মাতার গুণবান্ পুত্রের বিয়োগে যে শোক প্রকাশ করা হইল, ইহাই আমাদের পক্ষে আরও গৌরবের বিষয়। আমিও চট্টগ্রামের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—নবীন বাবু সুকবি ছিলেন ও সুলেখক ছিলেন। ত্রিশ বৎসরের উপর তাঁহার সহিত আমার সৌহার্দ্দ্য ছিল। তিনি কেবল যে বাঙ্গালা ভাষাতেই ভাল লিখিতেন, তাহা নহে; তাঁহার ইংরাজী পুস্তক "Geography of Ancient India" খানিও বেশ ভাল বই। তিনি এ পুস্তক লিখিয়া কতটা সফল হইয়াছেন, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তবে তিনি এমন বিষয়ে বহি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আর তাঁহার বইখানির আদর হইয়াছে, ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়। তাঁহার কবিতার অনুবাদগুলি অতি মিষ্ট। সংস্কৃতের চারি চরণ কবিতার অনুবাদ বাঙ্গালায় তিনি অনেক স্থলে ঠিক চারি চরণেই করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, দুই ভাষাতেই তাঁহার সমান দখল ছিল। শেষ জীবনটায় তিনি নিজের দেশে বদলী হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি স্বদেশে বসিয়া মাতৃভাষার সেবা করিবেন। তাঁহারই যত্নে চট্টগ্রামে শাখা-পরিষৎ হইয়াছে এবং সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। এমন লোকের স্মৃতি রক্ষা হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—নবীনচন্দ্র দাসের শোকপ্রকাশ-সভায় দাঁড়াইয়া আজ আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে। শোকসভায় আনন্দ-প্রকাশ করাটা বিসদৃশ হইতে পারে, কিন্তু আমার আজ আনন্দ ধরিতেছে না। যে দেশের নবীন বাবু, আমিও সেই দেশের। আমাদের এই চাটগেঁয়েদের জন্য আপনারা একটা শোক অনুভব করিতেছেন, আমার আনন্দ সেই গৌরবে। আমার পূর্ব্ববক্তা সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই বিশেষ শোকসভার অনুষ্ঠানের জন্য মূল সাহিত্য-পরিষৎকে বিশেষরূপে

ধন্যবাদ জানাইতেছি। শাস্ত্রী মহাশয় যে স্মৃতিরক্ষার কথা বলিলেন, তাহার আয়োজন হইতেছে। চট্টগ্রামে দেব-পাহাড়ে নবীন বাবু "আরাম-মন্দির" নামে একখানি বাড়ী করিয়া গিয়াছেন। সেই পাহাড়ের উপর সেই বাড়ীতে তাঁহার একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার ভিত্তি গাঁথা হইয়া গিয়াছে। নবীন বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি আই ই মহাশয়ই ইহাতে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমি চট্টগ্রাম শাখা পরিষদের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অতঃপর সভাপতি বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত শোকপ্রস্তাব পাঠ করিলেন ;—"চট্টগ্রাম শাখার সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, সুকবি, সুলেখক, নানা সংস্কৃত-কাব্যের ও ইংরাজী কবিতার বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদক ও নানা সদ্‌গুণশালী নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ শোকানুভব করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছেন।" অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, এই শোকপ্রস্তাব কবিবর নবীনচন্দ্রের পুত্র নলিনচন্দ্রকে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎ বাবুকে ও চট্টগ্রাম শাখাপরিষদে পাঠান হউক।

সভাস্থ সকলে নবীন বাবুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া জানাইলেন, আমাদের শোকপ্রকাশের কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। ইতিমধ্যে সাহিত্য-পরিষদের আরও কয়েকজন হিতৈষী সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের মাসিক অধিবেশনের শেষে তাঁহাদের জন্য শোকপ্রকাশ করিবার কথা। মাসিক অধিবেশনের কাজ আমরা আজ করিব না, কিন্তু একটি শোকের ঘটনার সঙ্গে আমরা আর পাঁচটা শোকের কথাই কহিয়া শেষ করিতে চাই।

(১) ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি অল্প দিন হইল, সাহিত্য-পরিষদের সভ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিনেই ইহাকে এত ভালবাসিয়াছিলেন যে, সর্ব্বদাই এখানে আসিতেন, ইহার কাজে কর্ম্মে মিশিতেন। তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় ও রসায়ন-শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা সাহিত্য ও বিজ্ঞান লইয়া পরিশ্রম করিতেন এবং নানাবিধ নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার ও পরীক্ষায় নিবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীতে খুব বড় লাইব্রেরী ও লেবরেটরী আছে। তাঁহাকে হারাইয়া দেশের একজন পণ্ডিত লোক এবং পরিষদের একজন বিশেষ বন্ধুকে হারাইয়াছি।

(২) ত্রিপুরানিবাসী কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দেশের ইতিহাস লইয়া বহু কাল হইতে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ আছে। বাঙ্গালায় কয়েকখানি বহিও লিখিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস রাজমালা নামে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া দেশের একটি মস্ত অভাব দূর

করিয়া গিয়াছেন। শেষ দশায় তিনি তাঁহার লাইব্রেরীর ইতিহাসসংক্রান্ত সমস্ত বইগুলি সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইহার সভ্য ছিলেন না, অথচ ইহাকে এতটা ভালবাসিতেন। তাঁহাকে হারাইয়া আমাদের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে।

(৩) প্রিয়নাথ ঘোষ এম্ এ মহাশয় কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। ইনি সাহিত্য-পরিষদের বহু পুরাতন সভ্য। ইঁহারই চেষ্টায় আমরা স্বর্গীয় মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরকে সাহিত্য-পরিষদের আজীবন-সদস্যরূপে পাইয়াছিলাম। ইঁহারই চেষ্টায় কুচবিহার হইতে সাহিত্য-পরিষদের এই মন্দির-গঠনে অর্থ-সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, ইঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন যথার্থ হিতৈষী সভ্য হারাইলাম।

(৪) দেনুড়নিবাসী অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী সাহিত্য-পরিষদের সহায়ক সদস্য ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে সাহিত্য-পরিষৎ কতকগুলি প্রাচীন পুথি ও প্রাচীন মূর্ত্তি পাইয়াছেন। তিনি প্রাচীন ইতিহাসের ও প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিতেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধাদি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ হইত। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা একটি কর্ম্মী বন্ধু হারাইয়াছি। তিনি বহু দিন হইতে সাহিত্য লইয়া কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার লেখা কয়খানি বহিও ছাপা হইয়াছে।

(৫) কিশোরীমোহন রায় পাবনায় সাহিত্য-পরিষদের শাখা হইবার জন্য যে সাহিত্য-সমিতি হইয়াছে, তাহার সভাপতি ছিলেন। ইনি "সুরাজ" পত্রের সম্পাদক। কয়েকখানি বহিও ইনি লিখিয়া ছাপাইয়া গিয়াছেন। ইনিও সাহিত্য-পরিষদের একজন পুরাতন সভ্য ও হিতৈষী ছিলেন।

(৬) মহেন্দ্রনাথ দাস বি এল্ মহাশয় চট্টগ্রামের উকীল ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ছিল।

এই সকল সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যসেবী, পরিষদের সভ্য ও বন্ধুগণের মৃত্যুতে আমরা শোকপ্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি।

আর একটি কার্য্য আমাদিগকে করিতে হইবে। সেটিও এক মৃত পণ্ডিতের স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে। সুতরাং সে কার্য্যটিও আমরা আজ সারিয়া ফেলিব। পণ্ডিত হরিনাথ ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বাঙ্গালায় তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। তাঁহার পুত্র সবজজ রায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর তাঁহার একখানি সুন্দর চিত্র সাহিত্য-পরিষদে রাখিবার জন্য উপহার দিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জীবন-চরিত সম্বন্ধে একটি বিবরণ পড়িবেন, তাহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে আপনারা অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন;—

(৭) পণ্ডিত ৺হরিনাথ ন্যায়রত্ন। জন্ম জানুয়ারী ১৮২৫। মৃত্যু, জুন (জ্যৈষ্ঠ) ১৮৮৭।

বিদ্বৎপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন,—"শ্যামাচরণ সরকার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, দ্বারকানাথ বিদ্যা-ভূষণ, হরিনাথ শর্ম্মা, যাঁহারা প্রত্যেকেই সাহিত্যের—আমাদের যে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সাহিত্যের এক একটি দিক্‌পালরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত।" [পুরাতন প্রসঙ্গ, আর্য্যাবর্ত্ত, মাঘ, ১৩১৭]

আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত অপর কয়েকজন মহাত্মার পরিচয় অল্পবিস্তর জানেন ; কিন্তু শেষোক্ত হরিনাথ শর্ম্মা সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান বোধ হয়, একেবারেই নাই। ইঁহার পুরা নাম ৺হরিনাথ ন্যায়রত্ন, বংশোপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার প্রণীত "বিরাটপর্ব্ব", "মুদ্রারাক্ষস", রামের "অরণ্য-যাত্রা" ও "রচনাবলী" এক সময়ে বহু বিদ্যালয়ে প্রচলিত ছিল এবং ছাত্রবৃত্তি ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রপাঠ্য পুস্তকাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম তিনখানি সংস্কৃত হইতে ও শেষখানি ইংরাজী হইতে অনুবাদ। ৺হরিনাথের বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সঙ্গে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। তিনি ছাত্র-জীবনে সংস্কৃত কলেজে কাদম্বরীপ্রণেতা ৺তারাশঙ্কর তর্করত্ন, বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা ৺দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের সহপাঠী ছিলেন। তিনি প্রথমে বীটুন কলেজে পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েন, পরে অল্পকাল স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারের কার্য্য করেন, পরে দীর্ঘকাল সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষার শিক্ষক ছিলেন। কাউয়েল সাহেব ও ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর আমলে তিনি সংস্কৃত কলেজে কার্য্য করিতেন। ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের অধ্যক্ষতার আরম্ভকালেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালার পরীক্ষক ছিলেন। হেয়ার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত ও সেণ্ট্রাল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় হরিনাথের শ্যালক ও ভগ্নীপতি ছিলেন। হরিনাথের ৮টি পুত্র ও ৬ কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে চারিজন এক্ষণে জীবিত। জ্যেষ্ঠ পুত্র রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা জজ ছিলেন ; এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিদৃশ্যমান চিত্র তাঁহারই প্রদত্ত। ৺হরিনাথের দ্বিতীয় পুত্র দার্জ্জিলিঙ্গের বিখ্যাত উকীল, ৺মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (M. N. Banerji)। (বর্ত্তমান লেখক ৺হরিনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র।)

তাঁহার আদিম নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাঁচকুলি গ্রাম। হাবড়া শিবপুরে বিবাহ করিয়া তিনি পরে শিবপুরেই বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েন। বিধবাবিবাহ ব্যাপারে যখন সামাজিক আন্দোলন প্রবল ভাবে চলিতেছিল, সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্রবে ছিলেন বলিয়া, হরিনাথ ও তাঁহার স্বগ্রামবাসী তারাশঙ্কর

তর্করত্ন ও নিকটস্থ বিল্বগ্রামবাসী ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার সামাজিক নির্য্যাতন ভোগ করেন ও তজ্জন্য বাধ্য হইয়া স্ব স্ব বাসগ্রাম ত্যাগ করেন।

তিনি হাবড়া শিবপুরের উন্নতির জন্য হিতকর কার্য্যের বহু অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। শিবপুরে প্রথম স্কুল, ডাক্তারখানা, ক্লাব ও সখের থিয়েটার তিনিই স্থাপনা করেন। হাবড়া হিতকরী নামক সংবাদপত্র ও হাবড়া পীপল্‌স্ এসোসিয়েশন্ তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। তিনি এই সমস্ত সৎকীর্ত্তির জন্য সরকার ও সাধারণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। সরকারের নিকট হইতে Certificate of Honour প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে এতদঞ্চলে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তৎকালে গভর্ণমেণ্টের চাকরী করিলেও রাজনীতি-চর্চ্চার বাধা ছিল না।

প্রবন্ধ পড়া হইলে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—সংস্কৃতের অধ্যাপকেরা ইংরাজী জানিলেও ইংরাজী পড়াইতেন না। হরিনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ই সে নিয়ম উঠাইয়া সবই পড়াইতেন। আমি তাঁহার ক্লাসে কখনও পড়ি নাই, অথচ তিনি আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে আমি যাতায়াত করিতাম। তাঁহার স্বভাবগুণে তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। তাঁহার একটি উপদেশ সে কালের অনেক ছাত্রের হৃদয়ে গাঁথা আছে। আজ সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার ছবি প্রতিষ্ঠা করিতে সকলের অপেক্ষা আমার বেশী আনন্দ বোধ হইতেছে, একটু পুণ্যও মনে করিতেছি। অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় ছবির আবরণ উন্মোচন করিয়া দিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ছবিদাতা গোপাল বাবুকে এবং অধ্যাপক ললিত বাবুকে এই ছবিদান ও ছবিপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবার জন্য ধন্যবাদ জানাইলেন। ইহার পর সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—আরও একটি কার্য্য আমাদের আজই করিবার আছে। সেটির সহিত কোন শোকের সম্পর্ক নাই বটে; কিন্তু দুঃখের সম্পর্ক আছে। শ্রীমান্ রিথাও কিমোরা জাপানবাসী ভদ্রলোক, তিনি এ দেশে সংস্কৃত শিখিতে আসিয়াছিলেন। সংস্কৃত ত তিনি শিখিয়াছেনই, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাও শিখিয়াছেন। বাঙ্গালাও তিনি এমন শিখিয়াছেন যে, আজ তিনি আপনাদের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছেন এবং তাঁহার যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা বাঙ্গালাতেই বলিবেন। শ্রীমান্ কিমোরা আমার ছাত্র, তিনি আজ লেখাপড়া শিখিয়া দেশে ফিরিতেছেন, তাঁহাকে আজ আমি আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিব। তাঁহার যাহা বলিবার আছে, তিনি আপনাদিগকে বলিতেছেন।

অতঃপর শ্রীমান্ কিমোরা মহাশয় বলিলেন,—আজ আমি বিদায় লইতে আসিয়াছি। সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আজ এই অভ্যর্থনা পাইয়া আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছি। আমার মনে যে ভাব হইতেছে, তাহা আমি সব খুলিয়া বলিতে পারিব না। কারণ, বাঙ্গালার সকল কথা তেমন করিয়া বুঝাইয়া বলিবার মত আমি বাঙ্গালা বলিতে পারি না। আমার বাঙ্গালা বাঙ্গালীর বাঙ্গালা নয়—জাপানীর। আমি শুনিতে পারি, পড়িতে পারি, অনেকটা

বুঝিতে পারি, এই মাত্র। আমার ক্ষমতায় শিক্ষা হয় নাই; আপনাদের দয়ায় অনেকটা শিখিয়াছি। আপনারা আচার-ব্যবহারে আমাকে পরিবারস্থ একজনের মত পালন করিয়াছেন। বিদ্যা শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে অনেক কষ্ট পাইয়াছি। মানব মাত্রকেই শিক্ষার জন্য কষ্ট করিতে হইবে; জাপানেও হইত। কষ্টের জন্য আমি দুঃখিত হই নাই। কষ্ট করিয়া বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পালি,—দর্শন, সাহিত্য ও ধর্ম্ম-বিষয়ে যাহা শিখিয়াছি, তাহা জাপান-বাসীকে গিয়া দেখাইতে পারিব, এই আমার আনন্দ। আপনারা গুরু, আমি ছাত্র। গুরু-দক্ষিণা আমি দিতে পারিব না। কারণ, ধন-দ্রব্য আমার কিছু নাই। সেবা করিয়াও আমি দক্ষিণা দিতে পারিব না; কারণ, আমাকে দেশে যাইতে হইবে, যাহাদের জন্য শিখিয়াছি, তাহাদের কাছে ফিরিতে হইবে। ইহার জন্য আমি লজ্জিত নহি; কারণ, প্রাচীন জাপানের সভ্যতা, ধর্ম্ম, শিল্প, দর্শন—সব ভারতের দয়াতে। আমাদের দেশের কেহ কোন দিন দক্ষিণা দিতে পারে না। যদি বাঁচি, ফিরিয়া আসিয়া দক্ষিণা দিবার চেষ্টা করিব। আমাদের দেশের লোক ভারতের সম্বন্ধে মরিয়া গিয়াছে। ভারতের স্বরূপ জাপান জানে না। আপনারাও জাপানকে জানেন না। দুই দেশে কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা দুটি দেশই ভুলিয়া গিয়াছে। আমার প্রার্থনা, সে সম্বন্ধ হউক। সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র ভারতের রত্ন নয়, জগতের রত্ন। ভারতের শিক্ষা এখন বিদেশীর হাতে। হয় ত এক দিন জাপানীই আপনাদের অধ্যাপক হইয়া আসিয়া বসিবে। কিন্তু তাহা উচিত নয়। আপনারা নিজেরাই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করুন। এখনকার পণ্ডিতের শিক্ষা-প্রণালী আমরা বিদেশী—ধরিতে পারি না। জার্ম্মাণী বিদেশীকে শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের ভাব, শিক্ষার ভাব শিখাইতে পারে না। আমি জার্ম্মাণীতে যাই নাই। জীবন থাকিলে আমি আবার আপনাদের কাছে আসিব, শিখিব, আমায় পণ্ডিত করিয়া দিবেন। কয়েক বৎসর থাকিয়া এখনকার ভারতের চিত্র কি বুঝিলাম, তাহা একটু বলিতে চাই। বর্ত্তমান ভারত, আর প্রাচীন ভারত এক নয়। বড় বড় বিল্‌ডিং, এত আদালত, এত মকদ্দমা, বাপ্ রে বাপ্! মন্দির নাই, বৌদ্ধ মঠ নাই, বকশিস্ ভিক্ষা কথায় কথায়। কৃষ্ণ নামে ভিক্ষা—"রাধে কৃষ্ণ একটি পয়সা দাও।"—ত্রিবিধ দুঃখ-ত্রাতা ঈশ্বরের নামে ভিক্ষা করে। দেশ অত্যন্ত গরম, লোকে নানা রোগে মরে। এইটি বাহ্যিক ভারত। প্রাচীন ভারত, রামায়ণ মহাভারতের ভারত, আমি বুঝিতে চাই। যতটা দেখিয়াছি, প্রাচীন ভারত লোপ পায় নাই, গ্রামের মধ্যে আছে, আর বর্ত্তমান ভারত সহর জুড়িয়া আছে। গত ছয় মাসের মধ্যে আপনারা আমাকে বশ করিয়াছেন। আপনারা ধার্ম্মিক, প্রসন্নচিত্ত, শান্তস্বভাব ও দয়া-দাক্ষিণ্যপূর্ণ। আমরা বন্ধুকে বশীভূত করি, বন্ধুত্ব গেলে বশ্যতা যায়। আপনারা শান্তভাবে বশীভূত করেন। আপনারা ধর্ম্ম লইয়া সব করেন, অপরে টাকার জন্য সব করে। জাপানের পূর্ব্বপুরুষ মঙ্গলিয়া, সুমাত্রা বা পারস্যের লোক নয়। আমার মত স্বতন্ত্র। একটা আভাস দিব। জাপানের আদিম অধিবাসীরা বঙ্গ-মগধের লোক। আমাদের দেশে প্রাচীন পুস্তক না দেখিয়া তাহার সমস্ত প্রমাণ দিতে পারিব না, তবে কিছু কিছু দিতে পারি।

এই বলিয়া শ্রীমান্ কিমোরা মহাশয় ভারতের এবং জাপানের ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবহৃত কতক-গুলি চিহ্নের নক্সা আঁকিয়া নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন এবং সর্ব্বশেষে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে ধন্তবাদ জানাইয়া বসিলেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলিলেন,—শ্রীমান্ কিমোরা ছাত্ররূপে আসিয়া অধ্যাপকের অনেক বিদ্যাই আহরণ করিয়াছেন। তিনি কলাপে ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, বাঙ্গালাও যে এমন শিখিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হইয়াছে। স্বাধীন জাতির একটা বিশেষ গুণ এই যে, তাঁহারা কেবল অপরের ভূমি অধিকার করেন না, জ্ঞানও অধিকার করেন। তিনি দেশে যাইতেছেন। শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহারই সহিত জাপান-ভ্রমণে যাইতেছেন। এ সংযোগ ভালই হইয়াছে, উভয়ে উভয়ের বিশেষ সহায়তা পাইবেন। প্রার্থনা করি, নিরাপদে দেশে যান এবং কুশলে থাকুন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন,—শ্রীমান্ কিমোরা যখন প্রথম আমার কাছে আসেন, তখন আমি তাঁহাকে চিনিতাম না; আমি ইংরাজীতে কথা কহিতে গেলাম, তিনি বাঙ্গালায় উত্তর দিলেন, শুনিয়া আমি বিস্ময়ে ভরিয়া গেলাম। তাঁহার বাঙ্গালায় এত অনুরাগ যে, তিনি ৫।৬ মাসে এই বাঙ্গালা শিখিয়াছেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদের সভ্য হইয়া-ছেন। আজ তাঁহাকে আমরা বিদায় দিতে আসিয়াছি। প্রার্থনা করি, তিনি ভাল থাকুন। তিনি ছয় মাসে আমাদের ভাষা শিখিয়া গেলেন; কিন্তু আমরা তাঁহার কাছে জাপানী শিখিয়া লইতে পারিলাম না। তিনি ফিরিয়া আসিলে যদি বাঁচি ত শিখিব। স্বাধীন ও পরাধীন জাতির শিখিবার শক্তিতেও কত প্রভেদ, তাহা কিমোরাকে পাইয়া আমরা বুঝিলাম।

অতঃপর সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় উঠিয়া শ্রীমান্ কিমোরাকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দিয়া বলিলেন,—তুমি সমস্ত শিখিয়াছ, দেশে গিয়া সব শিখাইয়া দিবে। তোমার সহিত আমার সকল কথাই হইয়াছে। ইহাঁরাও যাহা বলিলেন, তাহা শুনিলে। এখন আশীর্ব্বাদ করি, নিরাপদে দেশে ফিরিয়া যাও।

অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় মাননীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, গোখলে মহাশয়ের পরিবারবর্গকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সমবেদনা জানাইয়া নিম্নলিখিত পত্র দেওয়া হইবে এবং Servant of India Societyকেও জানান হইবে এবং তাঁহার সম্মানার্থ সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকিল। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

এই দিন জাপানী Consol ও আরও কতকগুলি জাপানি ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কয়েক জন জাপানী উপস্থিত হইয়াছিলেন ও কয়েকজন আসিতে না পারায় পত্র দ্বারা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

To the Secretary, Servants of India Society, Poona.

Sir.

I beg to inform you that on the 21th February at the 8th General meeting of the B. S. P. a resolution waa passed unanimously expressing the deep sorrow of the Parishad at the untimely death of the Hon'ble G. K. Gokhale and all further ordinary proceedings of the meeting were postponed while the office of Parishad was also closed on the 22nd ultimo as a tribute of respect to the memory of the late illustrious deceased.

I hope you will kindly communicate this news to the relatives of the Late Hon'ble Mr Gokhale.

Yours &c.

(Sd) Haráprasad Shastry, President.

অতঃপর যথারীতি ধন্যবাদের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

সপ্তম স্থগিত অধিবেশন

গত ১৪ই চৈত্র (১৩২১), ২৮শে মার্চ্চ (১৯১৫), রবিবার অপরাহ্ণ ৫৷৷০ টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্থগিত ৭ম মাসিক অধিবেশন হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বিএ (সভাপতি)
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সেন শাস্ত্রী
শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাস্থবির
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র
" পুলিনবিহারী দত্ত
" নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" অম্বিকাচরণ মিত্র
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
" বাণীনাথ নন্দী
" করুণাচন্দ্র মজুমদার

শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্
" অমৃতগোপাল বসু
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বিএ
" কুঞ্জবিহারী মণ্ডল
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" মন্মথনাথ রায়
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" কৃষ্ণদাস বসাক

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বসু
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	" কানাইলাল মিত্র
" ভূপতিনাথ দাস	" রামকমল সিংহ
" দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী	" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" যাদবগোবিন্দ রায়	" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" নিত্যানন্দ রায়	" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" সতীশচন্দ্র গুহ	" ভোলানাথ কোঁচ
" মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" খগেন্দ্রচন্দ্র বসু	" সূর্য্যকুমার পাল

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
} সহকারী সম্পাদকগণ।

সভাপতি মহাশয় অনুপস্থিত থাকায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীনবকৃষ্ণ রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীহরিচরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ মীরাট্ কলেজের অধ্যাপক ও মিরাট-সাহিত্য-সম্মিলনের অন্যতম সহকারী সভাপতি। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য-ভূষণ, তত্ত্বনিধি, বিদ্যারত্ন, মিরাট সাহিত্য-সম্মিলন-সম্পাদক, মিরাট। শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় Chamber practitioner of law, মিরাট, সিটি, ওয়েষ্টার্ণ কাছারী রোড। ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার সেন এল্ এম এস, মিরাট, সিটি।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীনবকৃষ্ণ রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র এল, আর, সি, এস (এডিন), এল, আর, সি (এডিন), এল, আর, এফ পি ও এস (গ্লাসগো), মিরাট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩, মোহনলাল মিত্রের লেন, শ্যামবাজার।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদামোদরদাস বর্ম্মন্ ৫৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
শ্রীকালিদাস দত্ত	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত বি এ, জে, এম্ ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক, মজিলপুর, জয়নগর পোষ্ট, ২৪ পরগণা।
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	কুচবিহারাধিপ হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কুচবিহার।
শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল, শিক্ষক, ঢেঙ্কানল হাই স্কুল, উড়িষ্যা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	রায় শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।
		ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল, এম, এস, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীকালীচরণ মিত্র ১৮, ঘোষের লেন, কলিকাতা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীতারিণীপ্রসাদ সুর ১৪, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাহিত্যশাস্ত্রী		ডাঃ শ্রীযামিনীমোহন কর কাব্যবিনোদ, ২০২।১৪, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ সমাদ্দার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমন্মথনাথ দে এম্ এ, বি এল, উকীল, মোরাদপুর, পাটনা।
		শ্রীচন্দ্রভূষণ রায় এম্ এ, অধ্যাপক পাটনা কলেজ, মোরাদপুর, পাটনা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, হুগলী ও প্রবেশনরি ডেপুটী কলেক্টর, চুঁচুড়া।
কে, বি, ধন্বন্তরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার, সারসোল, ই,আই,আর।
"	"	শ্রীকৃষ্ণধন্বন্তরী বিশ্বরাজ চক্রবর্ত্তী এম ডি, জনক আশ্রম, বোধিখানা, যশোহর।
শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমুকুন্দনারায়ণ মুন্সী জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	"	শ্রীসুসন্তোষকুমার দে ১৭, চোরবাগান সেকেণ্ড লেন, বড়বাজার পোঃ।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"	শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ ৬৭, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	কবিরাজ শ্রীনীরদরঞ্জন সেন গুপ্ত কাব্যসাংখ্যতীর্থ, কবিরত্ন, ভগবান্ ঔষধালয়, ১০২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীশ্রীশচন্দ্র পাল ৪১, সিমলা রোড, হালসীবাগান।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীসুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬১, শিকদারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত	শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	শ্রীভোলানাথ দাস Coal Merchant, চন্দননগর।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	মাননীয় নবাব আলি চৌধুরী খাঁ বাহাদুর ২৭, ওয়েষ্টন লেন, কলিকাতা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজ বড়ুয়া শিবপুর।
বি, এল চৌধুরী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীভূদেবচন্দ্র রায় বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, শাঁকারীটোলা, ভবানীপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ, কিউরেটার, ঢাকা মিউজিয়ম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ভাইস্ চেয়ারম্যান, কলিকাতা কর্পোরেশন, ৩৩, ম্যাক্লিউড ষ্ট্রীট।
"	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি এল্, হাবড়ার উকীল, ১ লক্ষ্মণদাসের লেন, পঞ্চাননতলা, হাবড়া।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র বি এ, বি এল্, ৮, নবীন সরকারের লেন, বাগবাজার
"	"	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৮৪, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	শ্রীহেমাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীআশুতোষ রুদ্র ২৩, গৌরীবেড় লেন, কলিকাতা।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	"	শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার রায়, হাইকোর্টের উকীল, ৬, আনন্দচন্দ্র চাটুর্য্যের লেন, বাগবাজার।
মুন্সী আবদুল করিম	"	শ্রীসারদাচরণ দত্ত, প্রধান শিক্ষক, বাবুরহাট এচ্ ই স্কুল, বাবুরহাট, চট্টগ্রাম।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায় এফ আর এ এস্, পি আর এচ এস, এফ আর সি আই, ২ মধুসূদন চাটুর্য্যের লেন, টালা।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, কণ্ট্রাক্টর, ৩৫।৬।২ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রলাল বড়ুয়া উত্তর বাউজান, মুন্সেফী আদালত।
"	"	শ্রীরমেশচন্দ্র নাগ চাকি, ময়মনসিংহ।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক ২২।১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট বা ৪৫ বীডন ষ্ট্রীট।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	কুমার শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা আগরতলা, ত্রিপুরা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীভূতনাথ দত্ত ২ বীডন ষ্ট্রীট।
মুন্সী আব্দুল করিম	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	শ্রীরমেশচন্দ্র নন্দী, বি এস্‌সি, বি এল্, ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীবেণীমাধব দাসগুপ্ত মহাফেজ, প্রথম সবজজকোর্ট, চট্টগ্রাম।
শ্রীবৈদ্যনাথ সাহা	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কয়লার খনির স্বত্বাধিকারী, ৮১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু সেটেলমেণ্ট কাননগো, কাঁথি, মেদিনীপুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার একাউণ্টাণ্ট জেনারেল আফিসের অডিটার, ৩ কয়লাঘাটা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীঅসিতারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, আলিপুর, ২৩এ বেথুন রো।
"	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য শিক্ষক, কেয়া রোড, রাণীগঞ্জ।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	"	শ্রীহরিচরণ বিদ্যারত্ন ৫৬।৩ গ্রে ষ্ট্রীট।
রায় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় দি প্রাসাদ, পাথুরিয়াঘাটা।

তৎপরে গত ১৯শে মাঘ শুক্রবার অপরাহ্ণে বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল মহোদয় যে সাহিত্য-পরিষৎ দেখিতে আসিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়িয়া শুনাইলেন এবং গভর্ণর বাহাদুর পরিষৎ দেখিয়া গিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ইংরাজীতে পড়িয়া শুনাইলেন। (এই বিবরণ ও ঐ সকল অভিমত কার্য্য-বিবরণীতে মুদ্রিত হইয়াছে।)

অতঃপর এই অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত "ভাষার উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। তৎপরে পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জানান হইল।

অতঃপর সপ্তম মাসিক স্থগিত অধিবেশনের সভাভঙ্গ হয় এবং অবশিষ্ট কর্য্যাদি অষ্টম মাসিক অধিবেশনে নির্ব্বাহ করা হইবে বলিয়া স্থির হয়।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

গত ১৪ই চৈত্র, সন ১৩২১ সাল, ২৮শে মার্চ্চ (১৯১৫), রবিবার অপরাহ্ণ ৬৷৹ টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল,—

১। প্রদর্শন—(ক) দিনাজপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি, প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়। (খ) দিনাজপুর বহলায় প্রাপ্ত কতকগুলি মূর্ত্তি, প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ এম্ এ। (গ) তিব্বতীয় কেঙ্গুর পুথি (১২ খণ্ড) প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ। (ঘ) পরিষৎ-কর্ত্তৃক ক্রীত তিনটি বুদ্ধমূর্ত্তি। ২। প্রবন্ধপাঠ,— (ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের "লখ্‌নৌ সহরের নামের উৎপত্তি।" (খ) ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এস্ সি, এল এম এস মহাশয়ের "উদ্ভিদে গৌণকোষ বিদারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।" (গ) শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের "একখানি সত্যপীরের পাঁচালী" নামক প্রবন্ধ। ৩। শোকপ্রকাশ—(ক) মধুসূদন রায় বি এল্ ও (খ) সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৪। বিবিধ।

(সপ্তম স্থগিত অধিবেশনে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই সভায় উপস্থিত ছিলেন।)

যথাসময়ে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় একটি অষ্টভুজ গণেশ ও একটি মূর্ত্তির কেবল মস্তক দেখাইয়া বলিলেন,—এইগুলি দিনাজপুর জেলার বহলা গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে এই ভাঙ্গা মাথাটি সৌন্দর্য্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এমন সুন্দর মনোরম মূর্ত্তি প্রায় দেখা যায় না। তৎপরে শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি (বাসুদেব) দেখাইয়া ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন,—এই মূর্ত্তিটিও কিশোরীবাবু দিনাজপুরে পাইয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু এবং কিশোরী বাবুকে মূর্ত্তিগুলি উপহার দিবার জন্য যথারীতি ধন্যবাদ জানান হইল। তৎপরে একটি উপদেশ-মুদ্রায় অবস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি, একটি মহারাজ-লীলায় অবস্থিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি, আর একটি তারামূর্ত্তি দেখাইয়া ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন,—এই তিনটি মূর্ত্তি স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুরের সংগৃহীত। এত দিন এগুলি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রমেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট ছিল। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ এগুলি তাঁহার নিকট হইতে ৩০৲ ত্রিশ টাকা মূল্যে খরিদ করিয়াছেন। এক একটি পিঠে এক একটি লেখ আছে। তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন,—গত মাসিক অধিবেশনে আমরা পরিষদের জনৈক হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কৃপায় টেঙ্গুর নামক তিব্বতের সর্ব্বপ্রধান পুথি-সংগ্রহ পাইয়াছি। উহাতে ২২৫ খণ্ড পুথি আছে। এই পুথিগুলি সম্পূর্ণ নহে। ইহার আর এক ভাগ আছে। তাহার নাম কেঙ্গুর। এই ভাগে ১০৮ খানি পুথি আছে। টেঙ্গুর পুথিগুলি সতীশ বাবু ৩৫০০ তিন হাজার পাঁচ শত টাকা মূল্যে সংগ্রহ করিয়া

দিয়াছিলেন। উহা পাওয়া অবধি পরিষৎ কেঙ্গুর সংগ্রহ জন্ম আগ্রহ করিতেছিলেন। বিধাতার কৃপায় এক জন তিব্বতীয় লামা কেঙ্গুরের এক অংশ বিক্রয় করিতে আসেন। পরিষদের পরমহিতৈষী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই অংশ ৬০০৲ টাকা মূল্যে কিনিয়া দিয়াছেন। এই অংশে ১২ খানি পুথি আছে। লামা ইহার অবশিষ্ট পুথি ক্রমশঃ আনিয়া দিবেন বলিয়াছেন। টেঙ্গুরের পুথিগুলি তিব্বতীয় অক্ষরে তিব্বতীয় ভাষায় কাঠের ব্লকে ছাপা, কিন্তু কেঙ্গুরের এই পুথিগুলি তিব্বতীয় অক্ষরে তিব্বতীয় ভাষায় তিব্বতীয় কাগজে হাতে লেখা। এই মহাগ্রন্থের কতকাংশ দানের জন্ম আমি প্রস্তাব করিতেছি, রাখালবাবুকে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জানান হউক।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "লখ্‌নৌ সহরের নামের উৎপত্তি" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন,—কয়েকটি স্থলে প্রবন্ধ-লেখকের সহিত আমার মতভেদ আছে—

(১) বর্ত্তমান "কোশাম্বী" নামের উৎপত্তি কুসুমের বাগান হইতে।

(২) উদয়ন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক নহে, অর্দ্ধ শতাব্দী পরে তাঁহার জন্ম। বর্ত্তমান কোশাম্বী ও বৌদ্ধযুগের কোশাম্বী আমার মতে স্বতন্ত্র নহে। বর্ত্তমান কোশাম্বীতে যখন প্রতি বৈশাখী পুর্ণিমায় এখনও মেলা হইয়া থাকে, তখন উহা বৌদ্ধযুগের কোশাম্বী বটে। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব এই কোশাম্বীতে খুব ধুমধামেই হইত। সেই উৎসব ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান মেলার আকারে আজিও চলিয়া আসিতেছে। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে।)

অতঃপর শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত একখানি সত্যপীরের পাঁচালী নামক প্রবন্ধ সংক্ষেপে পাঠ করিলেন। এই (প্রবন্ধও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার "উদ্ভিদে গৌণকোষ বিদারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (এই প্রবন্ধও পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পরিষদের মৃত সদস্য (১) মধুসূদন রায় বি এল্ ও (২) সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন,—সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাহিত্য-সেবী ছিলেন। তিনি মাসিক পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার বাড়ী ময়মনসিংহ নবগ্রামে। ময়মনসিংহে যখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন হয়, তখন সতীশ বাবু সেখানকার একজন সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রমে সেই সম্মিলনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই এখানে আসা যাওয়া করিতেন এবং সাহিত্য-পরিষৎকে বিশেষ ভালবাসিতেন। তিনি কয়েকখানি

পুস্তক পরিষৎকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, সে জন্ত আমরা বিশেষ দুঃখিত।

ইহার পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনের নিমন্ত্রণ জানাইয়া বলিলেন,—সাহিত্য-পরিষদের সদস্তগণের মধ্যে যাঁহারা প্রতিনিধি হইয়া বর্দ্ধমানে যাইতে চাহেন, তাঁহারা নাম-ঠিকানা সত্বর পাঠাইয়া দিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

২৬শে বৈশাখ, ১৩২২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

আলোচ্য বিষয়;—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্ত নির্ব্বাচন ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। চিত্র-প্রতিষ্ঠা,—(স্বর্গীয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রদত্ত) স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তৈলচিত্র। ৫। প্রদর্শন,—(ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় প্রদত্ত বিষ্ণুপুরের তাস, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ ও শ্রীযুক্ত শিবদাস তেওয়ারী মহাশয়দ্বয় প্রদত্ত বরাহমূর্ত্তি, (গ) শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী এম্ ডি মহাশয় প্রদত্ত হরগৌরীমূর্ত্তি, (ঘ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়-প্রদত্ত অট্টহাসের চামুণ্ডামূর্ত্তি, (ঙ) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-প্রদত্ত কূর্ম্ম ও বিষ্ণুমূর্ত্তি, (চ) শ্রীযুক্ত ডাঃ উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ ডি, শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত অহিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের প্রদত্ত তিনটি বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং (ছ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, বি এল মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রাচীন সুবর্ণমুদ্রা। ৬। প্রবন্ধ-পাঠ,—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম"নামক প্রবন্ধ। ৭। শোক-প্রকাশ,—(ক) নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (খ) প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল ও (গ) চারুচন্দ্র মিত্র বি এ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৮ বিবিধ।

উপস্থিতি,—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত
„ পুলিনবিহারী দত্ত

শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল গফুর
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বসু
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়
" প্রমথনাথ দত্ত (ব্যারিষ্টার)	" ভুবনকৃষ্ণ মিত্র কবিবর
" হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ	" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
" আশুতোষ মহলানবীশ	" হেমচন্দ্র ঘোষ
" কৃষ্ণদাস বসাক	" অমৃতগোপাল বসু
" মন্মথনাথ রায়	" গোবিন্দলাল দাস
" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত	" সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
" ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	" অমৃতলাল দত্ত
" অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" নরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	" সূর্য্যকুমার পাল
" কিরণচন্দ্র দত্ত	" ভোলানাথ কোঁচ
" মন্মথনাথ মিত্র	" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" যতীন্দ্রমোহন রায়	" নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	" প্রবোধচন্দ্র রক্ষিত

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী সম্পাদক।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীঅরুণ সেন বি এ (ক্যাণ্টার), বার-এট্-ল, ৮০ লোয়ার সার্কুলার রোড।
শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত তত্ত্বরত্ন, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ দেব বি এ, বি ই, ইঞ্জিনিয়ার, স্পেশাল ওয়ার্ক ডিভিসন, বাঁকীপুর।
		শ্রীরামদেব মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বাঁকীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ডাঃ শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার, এল্ এম্ এস্, মোরাদপুর, পাটনা।
"	"	শ্রীচন্দ্রভূষণ রায় এম্ এ, পাটনা কলেজের অধ্যাপক, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীগঙ্গাধরদাস এম্ এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এ, বি এল, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীবদরীনাথ বর্ম্মা কাব্যতীর্থ, এম্এ, ইংরাজী অধ্যাপক, বি, এন কলেজ, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এন কলেজের অধ্যক্ষ, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রকুমার রায় বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	রায় বাহাদুর শ্রীবিনোদবিহারী মজুমদার বিএ, বিএল্, পাবলিক প্রসীকিউটর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীমিহিরনাথ রায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দাসগুপ্ত বি এল, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর, পাটনা।
"	"	শ্রীমন্মথনাথ দে বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সি আই ডি, বিহার এবং উড়িষ্যা আফিস, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাগচী, সি আই ডি, বিহার এবং উড়িষ্যা আফিস, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
	"	শ্রীশরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, সবজিবাগ, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
	"	শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ বি এল্, উকীল, ঐ।
	"	শ্রীইন্দ্রভূষণ বিশ্বাস বি এ, বি এল্, উকীল, ঐ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহারাণচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
,,	,,	শ্রীরামচন্দ্র ভাদুড়ী বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
,,	,,	শ্রীকিরণচন্দ্র সেন বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
,,	,,	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, কবিরঞ্জন, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
,,	,,	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
,,	,,	শ্রীপুরাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আবগারী সাব ইন্‌স্পেক্টর, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
,,	,,	শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, স্মৃতিরত্ন, এম্ এ, পাটনা কলেজের গণিতাধ্যাপক, মাথনিয়া কূয়া, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
,,	,,	শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী কলেক্টর, হাল মোকাম, বাঁকীপুর।
,,	,,	শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর এম্ এ, বি এন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
,,	,,	শ্রীঅন্নদাকুমার ঘোষ, হেড ক্লার্ক, একজিকিউটার ইঞ্জিনিয়ারের আফিস, ইষ্টার্ণ, সোন ডিভিশন, বাঁকীপুর।
,,	,,	শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এম্ এস্‌সি, পাটনা কলেজের অধ্যাপক, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
,,	,,	শ্রীকুমারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, পাটনা কলেজের লাবরেটরী, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
,,	,,	শ্রীসরোজকুমার চৌধুরী ৪০ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,,	,,	শ্রীরামবাহু ভট্টাচার্য্য বি এ, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বোর্ড অফ রেভিনিউ বিহার এবং উড়িষ্যা, মোরাদপুর, পাটনা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	রায়সাহেব শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, ডেপুটী কলেক্টর, বাঁকীপুর।
”	”	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বি এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
”	”	শ্রীরামকালী গুপ্ত এল্ এম্ এস্, মিঠাপুর, বাঁকীপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	”	শ্রীহেমন্তকুমার সরকার ওভারসিয়ার, কালনা, বর্দ্ধমান।
”	”	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, উকীল, বর্দ্ধমান।
”	”	শ্রীমন্মথনাথ রায় বরাকর, বর্দ্ধমান।
”	”	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন ৫২ ইণ্ডিয়ান্ মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরমেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ বড় বেলুন, বর্দ্ধমান।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীচুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এড়িয়াদহ এসোসিয়েসন লাইব্রেরী ও লিটারারী ক্লাবের সম্পাদক, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।
শ্রীমন্মনাথ রায়	”	শ্রীননীগোপাল রায় ৮৫ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
শ্রীভূতনাথ দত্ত	”	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সেন ৬ ডক্ ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	”	শ্রীললিতমোহন রায় ১৮১।৬ আপার সার্কুলার রোড।
”	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীললিতমোহন পাল ৮০ গ্রে ষ্ট্রীট।
শ্রীমন্মথনাথ রায়	”	শ্রীকৌশিকীমোহন সেন গুপ্ত ৭৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য সিদ্ধুবাসিনী রোড, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত ৬৬ গৌরীবেড়িয়া লেন, কলিকাতা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীগিরিজাকুমার বসু বাজে শিবপুর, হাবড়া।
শ্রীদেবেশচন্দ্র পাকড়াশী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	এস্, এম্, মসাউদ, জমিদার, মাড়গ্রাম, বীরভূম।
শ্রীগুরুদাস সরকার	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেণ্ট অফ পঞ্চায়েত, মাঝেরগ্রাম ইউনিয়ন, পোঃ অঃ মাঝের গ্রাম।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ নিয়োগী এম্ এ, ২৪ নীলরতন বাবুর ষ্ট্রীট, রাঁচী।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ চৌধুরী ৬ মহেন্দ্র বসুর লেন, শ্যামবাজার।
শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী	"	শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক, ৫১।৫ অখিল মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা।
"	"	পণ্ডিত শ্রীকালীনারায়ণ ভক্তিবিনোদ ভক্তি-কার্য্যালয়, হাবড়া কোওরবাগান, হাবড়া।
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	"	ডাঃ শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় এল্ সি পি এস্, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, নবাবপুর, ঢাকা।
শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	"	শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, উকীল, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
শ্রীদুর্গাদাস রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীগুরাণদিও মেহরা বড়খণ্ড, বর্দ্ধমান।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ ডিমনষ্ট্রেটর, সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ, ৩০ পার্ক ষ্ট্রীট।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	"	রায় শ্রীকিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর কাশীপুর, কলিকাতা।
শ্রীপশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে ১০ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত ১১ অবিনাশ মিত্রের লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীপশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম্ এ, বি এল্, ৩২।৩৩ ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন।
শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ৬ সিমলা ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ৪৪ রামকৃষ্ণপুর ঘাট রোড, হাওড়া।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম্ এ, ৬৫।১ হ্যারিসন রোড।
„	„	শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র বি এ, ৬ কলেজ স্কোয়ার।
শ্রীললিতমোহন পাল	„	শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভারতী-লাইব্রেরীর ম্যানেজার, সিরাজগঞ্জ।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	শ্রীঅবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ, বিএ, রেভিনিউ সেক্রেটারী, বর্দ্ধমানরাজ-পুরাতন চক, বর্দ্ধমান।
শ্রীরামকমল সিংহ	„	শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বি এ, বি এল্, গণেশতলা, দিনাজপুর।
মুন্সী আব্দুল করিম	„	মৌলবী মোজাফ্ফর আহাম্মদ মৌলবীবাজার, সুলকবাহার, চক্‌বাজার, চট্টগ্রাম।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	„	শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, মুন্সেফ, বর্দ্ধমান।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী ১এ কয়সার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„	শ্রীরামকমল সিংহ	কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার রায় কবিভূষণ ৭৩।৩ গ্রে ষ্ট্রীট।
শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগোলোকেন্দ্র নাথ দে ৬০ অখিল মিস্ত্রীর লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া ২২ রোজম্যারি লেন, হাবড়া।
		শ্রীললিতমোহন দাস, বর্দ্ধমান মহারাজের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী, বর্দ্ধমান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	কবিরাজ শ্রীশরৎচন্দ্র সেনগুপ্ত বিশারদ আয়ুর্ব্বেদিক সার্জ্জন, ৭ জয়গোপাল ভট্টাচার্য্যের লেন, বাগ্‌বাজার।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅটলকুমার সেন ১০ রাজেন্দ্রসেনের লেন, কাঁসারিপাড়া।
”	”	শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তী বি এল্, উকীল, হাইকোর্ট।
”	”	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উকীল, হাইকোর্ট, ভবানীপুর।
”	”	শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, ৭২ রসারোড।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু ট্রানস্লেটর, হাইকোর্ট, অরিজিনাল সাইড, রাজাবাগান জংশন রোড।
”	”	ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু রাজাবাগান জংশন রোড।
”	”	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ১৩ পদ্মনাথের লেন।
”	”	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুস্তফী রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	”	শ্রীপঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়, হাইকোর্টের উকীল, ভবানীপুর, সেক্রেটারী, ভার্বিনিয়া ক্লাব।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	আবদুল মজিদ বসুনিয়া বনগ্রাম, বীণাপাণি লাইব্রেরী, বি ডি রেলওয়ে, জলপাইগুড়ী।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅমূল্যরতন চট্টোপাধ্যায় এসোসিয়েটেড প্রেসিডেন্ট, বোম্বাই।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় ৩২ বকুলবাগান প্রথম লেন, ভবানীপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	”	শ্রীনলিনীমোহন সিংহ রামপুরহাট স্কুলের শিক্ষক, রামপুরহাট, বীরভূম।

অতঃপর নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জানান হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	১। মন্দিরা
	২। খঞ্জনী
	৩। সপ্তস্বরা
„ রামাচরণ মজুমদার	৪। বাঙ্গালার জমিদার
„ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫। সরলা
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৬। বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম ভাগ)
„ হরিদাস গোস্বামী	৭। শ্রীগৌর-গীতিকা
	৮। বিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ-গীতি
	৯। বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ
	১০। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত
„ কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	১১। বালিকা-বিনোদিনী
„ বিপিনবিহারী নন্দী	১২। অর্ঘ্য
	১৩। চন্দ
	১৪। চক্রধর
	১৫। নারী
	১৬। শিখ
	১৭। সপ্তকাণ্ড রাজস্থান
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	১৮। মালতী-মাধব
	১৯। বাঙ্গালীর প্রকৃতি (১ম ভাগ)
„ রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ	২০। সিদ্ধান্ত-রহস্য
„ আশুতোষ মহলানবীশ	২১। বিজন বিজয়া
„ আনন্দমোহন গুপ্ত	২২। পদ্মাঙ্কুর
„ অম্বিকাচরণ গুপ্ত	২৩। হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়
	২৪। পরলোকের পত্র
„ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর	২৫। Prevention of Small Pox.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt. Book-Depot.	২৬। Report on the Administration of Bengal for 1913-14.
	২৭। The Reports on the working of Municipalities in Bengal 1913-14.

উপহার দাতা		উপহৃত পুস্তক
Officer-in-Charge, Bengal Sectt. Book-Depot.	২৮।	Annual Progress Report on Forest Administration in Bengal for 1913-14.
	২৯।	Report on Survey & Settlement operations in Bengal for 1914.
Under Secretary to the Government of Bengal.	৩০।	Annual Progress Report of the Superintendent, Muhammedan and British Monuments, Northern Circle—1914.
Superintendent, Government Printing, India.	৩১।	Cotton Spinning and Weaving in Indian Mill's, 15.
	৩২।	Statistical Tables
	৩৩।	Statistical Tables relating to Banks of India.
	৩৪।	Report on the Progress of Agriculture in India for 1913-14.
	৩৫।	Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills for Feb. 1915.
Director, Geological Survey of India.	৩৬।৩৭।	Records of the Geological Survey of India. Vol. 44. Pt. IV & Vol. 45. Pt. 1.
Registrar, Calcutta University	৩৮।	Calcutta University Minutes Pt. 6—1913.
	৩৯।	Do. Do Pt. 5—1914.
শ্রীযুক্ত রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি	৪০।	Hindu Almanac Reform.

তৎপরে নিম্নলিখিত প্রাচীন পুথিগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত	১।	চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্যখণ্ড, হরিদাসনির্যাণ)
	২।	নাম-সংকীর্ত্তন
	৩।	গীতগোবিন্দ
	৪।	রুদ্রাধ্যায় (শুক্লযজুর্ব্বেদান্তর্গত)
	৫।	রাসপঞ্চাধ্যায়
	৬।	চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী
	৭।	চৈতন্যচরিতামৃত (আদিখণ্ডের উদ্ধৃত শ্লোক)
	৮।	ব্রহ্ম-সংহিতা (৫ম অধ্যায়)
	৯।	রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত	১০। আশ্রয়নির্ণয়
	১১। সেবাপরা সখী (স্মরণীয়)
	১২। আশ্রয়-নির্ণয় (সিদ্ধান্তমঞ্জরী)
„ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	১৩। হংসদূত
	১৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
	১৫। কৃষ্ণকর্ণামৃত
	১৬। জ্ঞানচন্দ্রিকা
	১৭। রাগানুগা ভক্তিলক্ষণ
	১৮। সংক্ষিপ্তসারের টিপ্পনী (ষষ্ঠ পাদ)
	১৯। উদ্ধৃত শ্লোক (চৈ° চ°, অন্ত্য°)
	২০। ঐ ঐ (মধ্যখণ্ড)
	২১। ঐ ঐ (আদিখণ্ড)
	২২। পদ্যাবলী
	২৩। কাব্যপ্রকাশ
	২৪। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ
	২৫। মহাভারত (সভাপর্ব্ব)
	২৬। কাশীখণ্ড (স্কন্দপুরাণান্তর্গত)
	২৭। মহাভারত (বনপর্ব্ব)
„ কামিনীনাথ রায়	২৮। „ (আদিপর্ব্ব)
	২৯। „ (সভাপর্ব্ব)
	৩০। শ্রীমদ্ভাগবত (১ম—৪র্থ স্কন্দ)
„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	৩১। অদ্বৈতমঙ্গল
ডাঃ লাহা এণ্ড সন্স	৩২। অঙ্গদ রায়বার
	৩৩। মহাভারত (আদিপর্ব্ব)
	৩৪। „ (বনপর্ব্ব)
	৩৫। „ (দ্রোণপর্ব্ব)
	৩৬। „ (শল্যপর্ব্ব)
	৩৭। „ (ঐষিকপর্ব্ব)
	৩৮। „ (সৌপ্তিকপর্ব্ব)
	৩৯। „ (স্বর্গারোহণপর্ব্ব)

(১) অতঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রদত্ত বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী অট্টহাস নামক তীর্থগ্রামে প্রাপ্ত একটি পাথরের দেবীমূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন,—যদিও এটিকে আজকার সভার নিমন্ত্রণ-পত্রে চামুণ্ডা-মূর্ত্তি বলিয়া লেখা হইয়াছে, কিন্তু এটি চামুণ্ডা, কি কোন্ মূর্ত্তি, তাহা স্থির হয় নাই। সে দিন এই মূর্ত্তিটি মিসেস হোমউডকে দেখাইয়াছিলাম, তাঁহারাও এই নূতন ধরণের মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তবে তাঁহারা বলিলেন যে, গোবিন্দ রাও সম্প্রতি মান্দ্রাজে এই প্রকার আসনে বসা একটি বাসুদেব-মূর্ত্তি পাইয়াছেন, এই আসনের নাম উৎকুটিকাসন।

তবে সে মূর্ত্তিটির সঙ্গে ইহার হাতের অবস্থান কিছু স্বতন্ত্র। এটি দেখিলেই মনে হয় যে, এটি কোন দেবীমূর্ত্তিই নহে, কোন ভাস্কর একটি ভাল পুতুল তৈয়ারী করিয়াছে, যেন বোধ হয়, কোন বুড়ী পিসিমা মাটিতে ভর দিয়া বসিয়া কাঁপিতেছেন। শ্বাসরোগে তাঁহার হাড় সার হইয়াছে, যন্ত্রণায় কোমরে মাত্র একটু কৌপীনের মত বস্ত্র আছে, গলায় কেশো রোগীর মত একখানি কবচও আছে, কিন্তু তাহা নহে। এটি যে দেবীমূর্ত্তি, তাহা নিশ্চয়; কারণ, ইহার আসনের নীচে দুইটি যে লাঞ্ছন আছে, তাহা দ্বারাই দেবতা বলিয়া বুঝা যায়। ইহার এক দিকে একটি ঘোড়া বা গাধার ন্যায় পশুর মূর্ত্তি আছে, এটি যেন দেবতার বাহন; আর এক দিকে হাত যোড় করিয়া একটি মানুষ বসিয়া আছে, এটি দেবতার উপাসক-মূর্ত্তি। ফলে এটি যে কি দেবতা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ইহার কোন ধ্যান এখনও পাওয়া যায় নাই। জিনিষটির কারুকার্য্য বড় উৎকৃষ্ট। শিল্প হিসাবে এটি অমূল্য বস্তু। এমন জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার দেহে এমন যে একটা সৌষ্ঠব, আর এই হাড়-সার মুখেও যে একটি প্রসন্ন ভাব ও একটু মৃদু হাসি দেখা যাইতেছে, তাহা বড় সামান্য কারিকরির পরিচয় নয়। এটি সকল দিক্ হইতেই দেখিবার জিনিষ, দেখাইবার জিনিষ, গবেষণা করিবার জিনিষ। সাহিত্য-পরিষদের এই ছোট যাদুঘরটিতে ইহার মধ্যেই কয়টি এমন মূর্ত্তি সংগ্রহ হইয়াছে, যাহা আর কোথাও নাই। এটিও সেইরূপ আর একটি মূর্ত্তি, এমন মূর্ত্তি আর কোথাও নাই। কাজেই নগেন্দ্র বাবু এটি সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষদের গৌরব আরও বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহাকে তজ্জন্য বিশেষ করিয়া ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

তাহার পর ব্যোমকেশ বাবু একে একে কতকগুলি মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন, এ বার বর্দ্ধমানের সাহিত্য-সম্মিলনে গিয়া অন্যান্য কাজের মধ্যে কিছু বিশেষ লাভ করিয়া আসা গিয়াছে।

(২) বর্দ্ধমানের পরিষৎ-শাখার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত শিবদাস তেওয়ারী মহাশয় সেখানকার প্রদর্শনীর জন্য কতকগুলি পাথরের মূর্ত্তি সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্য হইতে এই বরাহ-মূর্ত্তিটি সাহিত্য-পরিষদে দান করিয়াছেন। মূর্ত্তিটির মুখের দিক্‌টা ভাঙ্গা; কিন্তু অন্যান্য অংশ বেশ ভাল আছে। বরাহ অবতারে বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ নামে দৈত্যকে বধ করেন, এই মূর্ত্তিতে হিরণ্যাক্ষ অর্দ্ধ-নাগ অর্দ্ধ-মনুষ্যাকারে নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার মাথার উপরে সাপের ফণার আচ্ছাদন আছে। দেবতার বাম দিকের বাহুর উপর একটি মূর্ত্তি বসান আছে; সেটির মুখ-হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাজেই চেনা গেল না। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—বরাহমূর্ত্তিতে বরাহের দন্তের উপর পৃথিবীর মূর্ত্তি থাকে, কোথাও বা স্বতন্ত্র স্থানে থাকে, এটি পৃথিবীর মূর্ত্তিও হইতে পারে। কোন্ গ্রামে কোথা হইতে এই মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য রাখালরাজ বাবুকে পত্রাদি লেখা হইয়াছে।*

---

* সম্প্রতি রাখাল বাবু লিখিয়াছেন,—"২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান নগরের টিকরহাট পল্লীর দামোদরকুণ্ড নামক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় বহু দেবমূর্ত্তি ও প্রস্তর-স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে বহু লোক বহু স্থানে অনেকগুলি লইয়া গিয়াছে। এটি পথিপার্শ্বে পড়িয়া ছিল, আমি সন্ধান করিয়া বাহির করি।"

(৩) ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী এই হরগৌরী-মূর্ত্তিটি দান করিয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব কিছু নাই, তবে মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর। ইহার চালিখানির একটা কোণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে মাত্র; নতুবা শ্রীমূর্ত্তির বড় বেশী ক্ষতি হয় নাই। ইহারও প্রাপ্তিস্থানাদি জানা যায় নাই।

(৪) বর্দ্ধমান সম্মিলনের প্রদর্শনী হইতে আরও কতকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কাটোয়া দেমুড় গ্রামের শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কতকগুলি মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই কূর্ম্ম-মূর্ত্তিটি ও একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি দিয়াছেন। কূর্ম্মমূর্ত্তিটি কূর্ম্ম অবতারের মূর্ত্তি নহে, একখানি চৌকা পাথরে নক্সাকাটা চৌকোণা পাড়ের মধ্যে একটি কচ্ছপের আকৃতি খোদা। এখানি কূর্ম্মপীঠরূপে পূজা হইবার জন্য বা অন্য কোন্ হিসাবে তৈয়ারী, তাহা বুঝা যায় না।*

(৫) ডাক্তার ইউ, ডি ব্যানার্জ্জি যে বিষ্ণুমূর্ত্তিটি উপহার দিয়াছেন, ইহা নদীয়ার দেবগ্রাম বিক্রমপুরে দেবকুণ্ড নামে দীঘির মধ্যে প্রাপ্ত। অনেক দিন পূর্ব্বে ইহা পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটির বাম দিকের খানিকটা এমন ভাবে ভাঙ্গিয়াছে যে, দেখিলেই বোধ হয়, যেন কেহ কোন অস্ত্রের ঘায়ে কাটিয়া ফেলিয়াছে।

(৬) শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত অহিভূষণ মুখোপাধ্যায় দুইটি বিষ্ণুমূর্ত্তির ভগ্নাংশ দিয়াছেন; এগুলিও বর্দ্ধমান-যাত্রার লাভ।

তাহার পর ব্যোমকেশ বাবু একটি স্বর্ণমুদ্রা দেখাইয়া বলিলেন,—এ বার বর্দ্ধমান-যাত্রার বিশেষ লাভ এইটি। বর্দ্ধমানের উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় এম এ, বি এল্ মহাশয় এই স্বর্ণমুদ্রাটি সাহিত্য-পরিষদে দান করিয়াছেন। এটির এখনও বিশেষ বিবরণ উদ্ধার করা হয় নাই, তবে শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাড়াতাড়ি দেখিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, এটি নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের মুদ্রা। ইহারও প্রাপ্তি-স্থানাদির বিবরণ পরে প্রকাশ করা যাইবে।†

---

* সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কূর্ম্মমূর্ত্তিটির পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজরূপে পূজা হইত। পরে তাহারা পূজা করিতে অপারক হওয়ায় বড় বেলুনের শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জিউর যমুনা নামক গড়ের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। কিছু দিন পরে পঙ্কোদ্ধার করিবার সময় উহা পাওয়া যায়। উপস্থিত শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জিউর বাটীতে পড়িয়া থাকিত। আর বিষ্ণুমূর্ত্তিটি ও আরও দুই চারিটি মূর্ত্তি বড় বেলুনের পুষ্পুল্ দীঘী নামক এক গ্রাম্য পুষ্করিণীতে পাওয়া যায়। কিন্তু পঙ্কোদ্ধার করিতে করিতে কোদালের আঘাতে এই মূর্ত্তিটি ব্যতীত অপর সমস্ত মূর্ত্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়।"

† সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বর্দ্ধমান হইতে প্রায় ১৪ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে পাণ্ডুক গ্রাম নামে একটি জনপদ আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লুপ লাইনে ভেদিয়া নামে যে ষ্টেসন আছে, তথা হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইলে, পাণ্ডুক গ্রামের "রাজার পোতা ডাঙ্গা" নামক এক উচ্চ ভূভাগে উপনীত হওয়া যায়। এই স্থানে প্রাচীন ইষ্টক এবং মূল্যবান্ প্রস্তরখণ্ডও সময়ে সময়ে পাওয়া যায়। এই স্থানের ভূভাগ অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং বহু প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দ্বারা পরিপূর্ণ। পূর্ব্ব দিকে

তাহার পর শ্রীযুক্ত সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় বিষ্ণুপুরের দেশী গোল তাস দেখাইয়া বলিলেন,—আমাদের দেশে বহু দিন হইতে এই গোল তাসের চলন আছে। গোল তাস এখনও দিল্লী, জয়পুর, উড়িষ্যা, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। দিল্লী ও জয়পুরে এই তাস লইয়া জুয়া খেলা হয়। আমোদ করিয়াও লোকে এই তাস খেলে। উড়িষ্যায় ১২০ খানায় এক জোড়া হয়। মুসলমানী ভাষায় এই তাসের নাম গঞ্জিকা। উড়িষ্যায় গোঞ্জিকা বলে। উড়িষ্যায় তাসগুলিতে তারা, ফুল, ফল, চাঁদ প্রভৃতি প্রকৃতির জিনিষ লইয়া ফোঁটা আঁকা হয়।

বিষ্ণুপুরের এই তাসগুলিতে দুইটি ভাগ আছে। এক ভাগে ১২০ খানিতে এক জোড়া হয়। ইহাতে দশটি রঙ্, আর বারখানি করিয়া তাস থাকে। দশ অবতারের মূর্ত্তি ধরিয়া এই দশটি রঙ্ করা হইয়াছে। তাহা হইতেই এই তাসের নাম দশ-অবতার তাস। এই দশ অবতারের গণনার পরম্পরা কিন্তু স্বতন্ত্র হিসাবের,—(১) মৎস্য, (২) কূর্ম্ম, (৩) বরাহ, (৪) নৃসিংহ, (৫) বুদ্ধ, (৬) বামন, (৭) পরশুরাম, (৮) রাম, (৯) বলরাম, (১০) কল্কি। এই অবতারগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটির অর্থাৎ বুদ্ধ পর্য্যন্ত চতুর্ভুজ, বাকীগুলি সব দ্বিভুজ। এই তাসের রাজাগুলি অর্থাৎ অবতারের মূর্ত্তিগুলি মন্দিরমধ্যে দুইটি অনুচর মূর্ত্তির সহিত আঁকা, আর যেগুলিতে কেবল অবতার-মূর্ত্তি আঁকা, সেগুলির নাম মন্ত্রী। এই তাসে রাণী বা বিবি নাই। বাকী দশখানি ফোঁটার তাসে এক হইতে দশটি করিয়া ফোঁটা আছে। চতুর্ভুজ অবতারদিগের তাসে ছবি দুইখানির পরই দহলাখানিই বড় তাস, টেক্কাখানি এক ফোঁটা মাত্র, আর দ্বিভুজ অবতারদিগের তাসে ছবি দুখানির পরই টেক্কাখানি বড় তাস, দহলাখানি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। পাঁচ জনে এই তাস খেলিতে হয়। রাম সকল অবতারের শ্রেষ্ঠ। খেলিবার সময় রামের তাস পড়িলে অপর খেলুড়িদের প্রত্যেককে একবারে দুখানি করিয়া তাস ফেলিয়া যাইতে হয়। মৎস্যাবতারের ফোঁটার তাসগুলিতে ফোঁটার সংখ্যা অনুসারে মাছ, কূর্ম্মের কচ্ছপ, বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র, বুদ্ধের পদ্ম, বামনের কমণ্ডলু, রামের তীর, পরশুরামের পরশু, বলরামের গদা ও কল্কির তলোয়ার-চিহ্ন থাকে। প্রথমে তাস তাসাইয়া লইতে হয়, যে তাস দিবে, তাহার ডাহিনের ব্যক্তি কাটাইয়া

এক পাষাণখরী, দেবামূর্ত্তি, দক্ষিণে সুদৃশ্য সরোবর, উত্তরে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং তদুত্তরে পূর্ব্ব-বাহা কলনাদী অজয় নদ।

"রাজার পোতা" বহু প্রাচীন স্থান এবং ঐ স্থানে রাজার বাসস্থান ছিল ; সেই রাজার নাম পাণ্ডু ছিল এবং তিনি দ্বাপর যুগে এই স্থানে রাজত্ব করিতেন, ইহাই জনশ্রুতি।

গত ১৩১৮ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠের অজয় নদের প্রবল বন্যায় উক্ত পাণ্ডুক গ্রামের উত্তর-পশ্চিমস্থিত "রাজার পোতা ডাঙ্গার" কোন কোন অংশ খলিত হইয়া যায়। উত্তর-পূর্ব্ব অংশের এক খলিত স্থানে পাণ্ডুক গ্রাম-নিবাসী রাখাল মেটে উক্ত সুবর্ণমুদ্রাটি ও অন্যান্য আরও কয়েকটি মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। আমি সেই সুবর্ণমুদ্রাটি তাহার নিকট ২১, একুশ টাকা মূল্যে ক্রয় করি।"

দেয়। একবারে চারিখানি করিয়া তাস ভাগ করিয়া ডাহিনের দিক্ হইতে দিয়া যাইতে হয়। ভেস্তাইয়া না গেলে সকলেই ২৪ খানি করিয়া তাস পায়। ভেস্তাইয়া গেলে আবার নূতন করিয়া কাটাইয়া তাস দিতে হয়। যার হাতে রাম পড়ে, সেই প্রথমে খেলিবে। তাহাকে রাম ও আর একখানি কেঁাটার তাস খেলিতে হয়। রামের জন্য একবারে দশখানি তাসে এক পিঠ হয়। পিঠ লইয়া এই ব্যক্তিকেই আবার দেখিলে হয়; নতুবা সে অন্য কাহাকেও খেলিতে বলিলে সে খেলিতে পারে। যে যখন পিঠ পায়, সে নিজেই আবার খেলিতে পারে, না হয় অপর লোককে খেলিতে বলিতে পারে। আগে ছবিগুলি লইয়া খেলিতে হয়। হাতে ছবি থাকিতে কেঁাটার তাস খেলিতে নাই। ছবি ফুরাইলে কেঁাটার তাস খেলা যায়। খেলা হইলে প্রত্যেকের পিঠ গণা হয়। যাহার ২৪ খানার উপর পিঠ হয়, সেই প্রতি তাসে এক পয়সা, এক আনা, এক টাকা অর্থৎ যেমন বাজি ধরা হয়, সেই হিসাবে পায়। যাহার ২৪ খানার কম হয়, সেই পয়সা দেয়।

শুনা যায়, যখন বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজারা প্রতাপশালী ছিলেন, তখন তাঁহারা এই খেলা আবিষ্কার করেন। মল্ল রাজাদের একটা অব্দ ছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মল্লাব্দ চলিয়াছিল, তখন ১২০১ মল্লাব্দ ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ১১০০।১২০০ বৎসর পূর্ব্বে যে এই খেলাটা বাহির হইয়াছে, তাহা আমিও বিশ্বাস করি। ইহার কয়েকটি কারণ দিতেছি,—(১) হিন্দুর অবতার-গণনায় প্রাচীন রীতিতে বুদ্ধের স্থান নবম, কিন্তু এই তাসের গণনায় তাঁহাকে পঞ্চম করা হইয়াছে এবং চতুর্ভুজ করিয়া তাঁহাকে প্রথম পাঁচ অবতারের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। হিন্দুর প্রাচীন অবতার-গণনার ধারাটি আমরা খৃষ্টীয় ১২ শতকের কবি জয়দেবে, আর ১১ শতকের কবি ক্ষেমেন্দ্রে পাই। কাজেই বলিতে হয়, এই তাসের ধারাটি ইহার পূর্ব্বে অর্থাৎ হিন্দুদের অবতারপর্য্যায় ঠিক করিবার পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে তখন বুদ্ধকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তাসের মধ্যে বুদ্ধের যে ছবি আছে, তাহাতে বুদ্ধের আকৃতিতে কেবল মানুষের মত মুখ ও হাত দেওয়া হইয়াছে, আর কোন দেহের গঠন পরিষ্কার নহে। এই কারণে অর্দ্ধ-পশু, অর্দ্ধ-নরাকার নৃসিংহমূর্ত্তি, আর সম্পূর্ণ নরাকার, কিন্তু অপূর্ণ মানবমূর্ত্তি বামন—এই উভয়ের মধ্যস্থানে বুদ্ধের এই অর্দ্ধ-মানব অদ্ধ-পিণ্ডাকার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, মৎস্য হইতে মানব পর্য্যন্ত জীবদেহের অভিব্যক্তির একটা সামঞ্জস্য রাখিয়া তাসে ইহাঁকে পঞ্চম স্থান দেওয়া হইয়াছে। আর সেই জন্যই ইহাঁকে চতুর্ভুজও করা হইয়াছে। (২) বুদ্ধের কেঁাটার তাসগুলির চিহ্ন পদ্ম; সুতরাং বুদ্ধ যখন পদ্মপাণি নামে পরিচিত ছিলেন, তখন এই তাসের উৎপত্তি। মহাযান-মতে পদ্মই বুদ্ধের সর্ব্বপ্রধান চিহ্ন; সুতরাং বলিতে হয়, যখন বাঙ্গালায় মহাযান-মত খুব প্রবল, তখন এই তাসের উৎপত্তি। পাল-রাজাদিগের সময় খৃষ্টীয় ৮০০ হইতে ১২০০ শতের মধ্যে বাঙ্গালায় মহাযান-মতের প্রাদুর্ভাব ছিল। বুদ্ধের কেঁাটার তাসগুলিতে যে পদ্ম-চিহ্ন কেন দেওয়া হইল, তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এমন তিন জন লোক পাওয়া কঠিন।

এই তাসের আর এক ভাগে ৪০ খানি তাস আছে। তাহার খেলার ধরণ অন্য রকম। সমস্ত বলিবার অবসর আজ আমাদের নাই। তাসগুলি এখানে আছে, আপনারা দেখিতে পারেন।

তাহার পর ব্যোমকেশ বাবু কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের লিখিত "শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম" প্রবন্ধ পাঠ করিলে, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় প্রবন্ধ শুনিয়া বলিলেন,—আমার মনে হয়, শঙ্করাচার্য্য দুই জন ছিলেন; একজন মায়াবাদী, অপর একজন দেববাদী। যিনি মায়াবাদী, তিনি শাঙ্কর দর্শনের প্রচারক, আর যিনি দেববাদী, তিনিই দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি লিখিয়া গিয়াছেন।"

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—বাস্তবিকই শঙ্করাচার্য্য দুই জন ছিলেন। প্রসিদ্ধ শঙ্করই তিন ভাষ্য অর্থাৎ বেদান্ত, উপনিষৎ ও গীতা-ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন, অন্য জন গৌড়ীয় শঙ্কর, ইনি পরবর্ত্তী কালের লোক। প্রাচীন শঙ্কর গদ্য-রচনায় পটু ছিলেন। তবে মোহমুদ্গর-খানি নিশ্চয়ই তাঁহার। গৌড়ীয় শঙ্কর কয়েকখানি তন্ত্র সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন এবং অনেক-গুলি স্তোত্র ও স্তব লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আছে। রাঢ়ে তাঁহার বাড়ী ছিল। তাঁহার এখনও বংশ আছে, খুঁজিলে পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ গ্রন্থ গৌড়ীয় শঙ্করের, তাহা রাঢ়ের পণ্ডিতেরা বলিয়া দিতে পারেন। চৈতন্যের পূর্ব্বে ৪০ বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয় শঙ্কর বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার একটা অব্দ চলিত ছিল।

প্রাচীন শঙ্কর বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। তাঁহার যে দুইখানি জীবন-চরিত আছে, তাহাতে বাহ্লীক দেশ হইতে একেবারে বঙ্গদেশে আসার কথা পড়িয়া এইরূপই সন্দেহ হয়। শঙ্করের বেদান্তভাষ্যে বলবর্ম্মা রাজার উল্লেখ আছে। নৃসিংহ চারিয়ারের লিখিত বিবরণে দেখা যায়, শঙ্করাচার্য্যকে দক্ষিণ দেশের লোক বলিয়া ধরা হয়, বলবর্ম্মা সেই দেশের রাজা। বলবর্ম্মার লেখ পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার সময় ৮১৫ খৃষ্টাব্দ। শঙ্কর ৩৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। অতএব (৮১৫-৩৮)—৮৫৩ খৃষ্টাব্দ মোটামুটি শঙ্করের সময় ধরা যায়। কুমারিলের সময় লইয়া বিবাদ আছে। একখানি মালতী-মাধবের পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার পুষ্পিকায় জানা যায় যে, ভবভূতি কুমারিলের শিষ্য। ষ্টাইনের রাজতরঙ্গিণীতে ভবভূতিকে ৭৩৫ খৃষ্টাব্দের লোক বলা হইয়াছে। তাহা হইলে ভবভূতি ও কুমারিল দুই জনই শঙ্করের কিছু আগে। প্রবন্ধ-লেখক যে দেখাইয়াছেন, শঙ্কর বৌদ্ধমত রক্ষার জন্যই মায়াবাদ চালাইয়াছেন, এ কথা আর কেহ বলেন নাই। তবে বহু কাল হইতে একটা প্রবাদও আছে,—"মায়াবাদ-মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব হি" তাহার কারণ কি, তাহা জানি না। অতঃপর ৺নির্ব্বাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ৺চারুচন্দ্র মিত্র নামে তিন জন সদস্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল-নির্ণয়*

অনুসন্ধিৎসুগণের ঔৎসুক্যাতিশয্য এবং 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ বাঙ্গালা বর্ণমালার অল্প কয়েকটি অক্ষরের পরিবৃত্তি-অনুক্রমে পূর্ণতা লাভ লক্ষ্য করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

"কৃষ্ণকীর্ত্তন" চণ্ডীদাস-বিরচিত একখানি নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ। বিগত ১৩১৬ সালের শীত-ঋতুতে আমরা পুথিখানির সন্ধান পাই। ১৩১৮ সনে পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে উহা প্রদর্শিত হয়। পুথিখানি খণ্ডিত, শেষ অংশ পাওয়া যায় নাই। কাজেই উহার বয়স কত, নিশ্চয় করিয়া বলা দুরূহ। তবে যে কেহ দেখিয়াছেন, তাঁহাকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছে, পুথি সুপ্রাচীন। যাঁহারা ২।১০ খানি হস্তলিখিত পুথি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা ভারতীয় প্রাচীন লেখতত্ত্বের সহিত পরিচয় মাত্র রাখেন, তাঁহারা সকলেই পুথির লেখা সার্দ্ধ তিন শত বর্ষেরও পূর্ব্বের অনুমান করেন। কেহ কেহ এমনও প্রশ্ন করেন, উহা কি চণ্ডীদাসের হস্তাক্ষর? যাহা হউক, এক্ষণে আমরা লেখতত্ত্বের সাহায্যে আলোচ্য পুথিখানির লিপিকাল নিরূপণে প্রয়াস পাইব এবং তাহাই সমীচীন।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পূর্ব্বেই বাঙ্গালা বর্ণমালা প্রায় পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে, দেখিতে পাই। অবশ্য গঠনকার্য্য যে সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া চলিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল দুই চারিটি অক্ষরের বর্ত্তমান আকার পাইতে আরও তিন শত বর্ষ অতীত হইয়াছিল; অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তে আধুনিক বর্ণমালা সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে।

বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে[১] আধুনিক বর্ণমালার কৈশোরাবস্থা বলা চলে। আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নে উহার অক্ষরমালার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

ই—ইকারে বৃত্তদ্বয় মিলিত।

উ—উকারের ঊর্দ্ধভাগ কিঞ্চিৎ বক্র।

ক—ক'তে সূক্ষ্ম কোণের অভাব।

গ—গকারের মাত্রা ও দক্ষিণের সরলরেখা মিলিত হইয়া এক সমকোণের সৃষ্টি করিয়াছে।

চ—চ'র আকৃতি নাগরী এবং অধোদেশে শূন্যগর্ভ ত্রিভুজটি বামভাগে।

জ—জ কতকটা ইংরাজি εএর মত।

ড—ড উকারের অনুরূপ।

ণ—ণ মাত্রাহীন, গঠন অসম্পূর্ণ।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৯শ, ৫ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১ Epigraphia Indica, Vol. I, p. 307.

দ—দ'র পৃষ্ঠদেশ ককুদাকার, গঠন অসম্পূর্ণ।

ধ—ধ'র স্কন্ধে বাড়িটি নাই।

ন—ন'র পুঁটুলিটিকে মাত্রার সমান্তরাল একটি রেখা লম্বের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে।

প—প'র গঠন অসম্পূর্ণ।

ল—ল কতকটা আধুনিক দেবনাগর ত'র সদৃশ।

হ—হ'র গঠনক্রিয়া এখনও শেষ হয় নাই। উহার বামোর্দ্ধভাগে একটি গ্রন্থি এবং মাত্রার অভাব।

নিম্নলিখিত অক্ষর কয়টি অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট।

অ—অ'র কাকপদচিহ্ন অংশটিকে একটি বক্ররেখা মাত্রার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে।

ও—ওকারের গঠন সম্পূর্ণ।

খ—খ প্রায় সম্পূর্ণ, কেবল অধোদেশে একটা সূক্ষ্ম কোণের অভাব।

ঘ, ছ—ঘ ও ছ'র গঠন প্রায় সম্পূর্ণ।

ঝ—ঝ'র বামোর্দ্ধাংশ মুছিয়া ফেলিলেই উহার আধুনিক আকার পাওয়া যায়।

ঞ—ঞ'র গঠনও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

ঢ—ঢ কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দিরের খোদিত লিপির অনুরূপ।

ত, থ—ত, থ'র আকার অনেকটা সম্পূর্ণ।

ফ—ফ প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভ—ভও প্রায় সম্পূর্ণ।

য—য'র অধোদেশে কেবল একটি সূক্ষ্ম কোণের অভাব।

ব—ব'তে একটি অর্দ্ধবৃত্তাকার রেখা লম্বের সহিত সংযুক্ত।

শ—শ'র বামাঙ্গ অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে; দুইটি গ্রন্থির অভাব ও একটি খাঁজ অধিক।

ষ—ষ'র আকারও প্রায় সম্পূর্ণ, কেবল অধোদেশে একটি সূক্ষ্ম কোণের অভাব।

স—দেওপাড়া প্রশস্তিতে স'র চরম পরিণতি।

অতঃপর 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর এক একটি অক্ষর লইয়া প্রাচীন তাম্রশাসন ও প্রশস্তির অক্ষরের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

অ—অকারের দুইটি রূপ পাওয়া যায়। একটি আধুনিক রূপ,[১] অপরটি বিনায়কপালের লিপির[২] অনুরূপ; তুল°—'অনেক', কৃষ্ণকীর্ত্তন, পত্র ১৭৬, পৃষ্ঠা ২, পংক্তি ৬; 'অনুমতী' ২০৪।২।৫; 'অসম্মতী' ২০৫।২।১।

---

১ আধুনিক রূপের জন্য কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান নিষ্প্রয়োজন।

২ Indian Antiquary, Vol. xxvi, p. 140.

ই—তর্পণদীঘির তাম্রশাসনে[১] ইকারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন রূপ দৃষ্ট হয়; তুল°—'ইব' পং ১৩ এবং "ইহ" পংক্তি ৫৫।

কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুথি ও দেওপাড়ার প্রশস্তিতে উহার মধ্যবর্ত্তী রূপ দেখা যায়।

বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের খোদিতলিপিতে[২] ইকারের ঈষৎ অপুষ্ট আধুনিক রূপ প্রথম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উ—কমৌলি শাসনে[৩] উকারের প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়।

তর্পণদীঘির তাম্রশাসন ও কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উকারের মধ্যবর্ত্তী রূপ।

শান্তিদেবকৃত 'বোধিচর্য্যাবতার'এর হস্তলিখিত পুথিতে উকারের আধুনিক রূপ সর্ব্বপ্রথম দেখা যায়। পুথির উপকরণ তালপত্র। লিপিকাল বিক্রম-সংবৎ ১৪৯২ (খৃ° অ° ১৪৩৫)। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। কিন্তু 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ সর্ব্বত্রই শিখাহীন প্রাচীন রূপই পরিদৃষ্ট হয়; তুল°—'উল্লাসিত' ১৭৬।২।২; 'উপাএ' ১৭৬।২।৬; এটি অনেকটা গুজরাটের চালুক্যবংশীয় প্রথম ভীমদেবের (রাধানপুরের) তাম্রশাসনের[৪] অক্ষরানুরূপ।

ক—ক'র দ্বিবিধ রূপ। এক তর্পণদীঘির তাম্রশাসনের অক্ষরানুরূপ, তুল°—'করিল' ৯৯।১।৫; 'করে' ৯৯।১।৬; ইহার সহিত দেওপাড়া প্রশস্তির ক'র কতকটা সাদৃশ্য আছে। অপর আধুনিক রূপ বা আধুনিক রূপেরই পূর্ব্বাবস্থা। আকৃতি [ক-চিহ্ন] এইরূপ, তুল°—'কাহ্নাঞি' ৯৯।১।৫, 'বিকল' ৯৯।১।৬।

গ—অনেকটা দেওপাড়া প্রশস্তির অক্ষরানুরূপ।

ঘ—উদয় বর্ম্মার লিপির অক্ষরানুরূপ।

চ—দেওপাড়া প্রশস্তি, মান্দা খোদিতলিপি, কমৌলি তাম্রশাসন, তর্পণদীঘিশাসন, দিনাজপুরের স্তম্ভলিপি[৫] প্রভৃতিতে আমরা চ'র প্রাচীন রূপ দেখিতে পাই।

ঢাকার খোদিতলিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের খোদিতলিপি, গয়াস্থ গদাধর-মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপিতে[৬] চ'র মধ্যবর্ত্তী রূপগুলি পাওয়া যায়।

কেম্ব্রিজস্থ পুথিতে উহার আকারগত কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না।

'বোধিচর্য্যাবতার'এ তৎপরবর্ত্তী রূপ পাওয়া যায়।

---

১ Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XLIV, part I, p. 11; E. I., Vol. XII, p. 6.

২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ।

৩ E. I., Vol. II, p. 350.

৪ E. I. Vol. VI, p. 242.

৫ J. & P. A. S. B., New series, Vol. VI, p. 619.

৬ Mem. A. S. B., Vol. V, p. 78.

'কৃষ্ণকীর্ত্তন' পুঁথিতে তাহারও পরবর্ত্তী রূপ পাই, তুল°—'চাহে', 'চারি' ও 'চমকিত' ১৭৭।২।১; প্রাচীন ও মধ্যবর্ত্তী রূপও বিরল নহে। প্রাচীন রূপের দৃষ্টান্ত, 'বাচিআঁ' ৯৩।১।২, 'চিহ্নি' ৯৪।১।৩; মধ্যবর্ত্তী রূপের 'চিন্তিআঁ' ৯৫।১।১, 'উচিত' ১০০।২।১।

চকারের চরম পরিণতি মুসলমান-বিজয়ের অনেক পরে সংঘটিত হয় অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তভাগে বলা যাইতে পারে।

ছ—ছকার অনেকটা পরমার মহাকুমার উদয়বর্ম্মার লিপির[১] অক্ষরানুরূপ। আর এই রূপের ছ'রই ব্যবহার 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ অধিক, তুল° 'মিছাই' ১০১।২।৩, 'ছাড়ায়িল' ১০১।২।৬; ৮৫৫ শকের সুবর্ণবর্ষের লিপির[২] অক্ষরানুরূপ ছ কয়েক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়, তুল°—'কিছ' ১৭৬।২।৭, 'পুছিঞাঁ' ২০৪।২।৩; ছ'র আধুনিক রূপ ৬৬।২।১।

জ—জ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত বোধগয়ার শিলালিপির অক্ষরানুরূপ।

ট—ট অনেকটা মূলরাজের লিপির[৩] অক্ষরানুরূপ, কেবল মাথার আঁকড়িটি বেশী। অন্য প্রকার ট, তুল° 'কপাট', 'বাট' ২০৫।১।২।

ড—ড অনেকটা চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় ভীমদেবের লিপির[৪] অক্ষরানুরূপ, তুল°—'ডালত' ১৭৬।২।২; অধিকাংশ স্থলেই ড'র আধুনিক রূপ।

ঢ—ঢ ৪৩৫ সম্বতের নেপাল-লিপির সহিত সাদৃশ্য আছে।

ণ—ণকারের প্রাচীন, মধ্যবর্ত্তী ও আধুনিক ত্রিবিধ রূপই 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ পাওয়া যায়। ণ'র প্রাচীন রূপ আধুনিক ল; তুল°—'গুণী' ১৭৬।২।১, 'প্রাণ' ১৭৬।২।২; মধ্যবর্ত্তী রূপ (পেটকাটা) তুল°—'পরাণে' ৯২।১।৩, 'সখিগণ' ৯২।২।৪; আধুনিক রূপে কেবল শিখার অভাব।

ত—ত বোধগয়ায় শিলালিপির অক্ষরানুরূপ।

থ—থ অনেকটা দেওপাড়া-প্রশস্তির অক্ষরানুরূপ।

দ—দকারের মধ্যবর্ত্তী রূপের নিদর্শন বর্ত্তমান।

ধ—ধ'র প্রাচীন রূপ, তুল°—'ধর' ১৭৬।২।৭, 'মধুকর' ২০৪।১।৭।

প—প'র ত্রিবিধ আকার পাওয়া যায়। যথা,— প, প, প

ষ—ষ'তে প্রাচীন নিদর্শন আছে।

র—মান্দা খোদিতলিপিতে র'র প্রাচীন রূপ। কমৌলি ও তর্পণদীঘির শাসন, ঢাকায় লক্ষ্মণসেনের খোদিতলিপি, বোধগয়ায় অশোকচল্লের খোদিতলিপিতে আধুনিক ত্রিভুজাকার রূপ। কেম্ব্রিজে হস্তলিখিত পুঁথিতে বিন্দুহীন আধুনিক রূপ।

---

১ I. A., Vol. XVI, p. 254.

২ Sangli plates, I. A., Vol. XII, p. 249.

৩ Kadi plates, I. A., Vol. VI, p. 191.

৪ Kadi plates, I. A., Vol. VI, p. 194.

'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ অসমীয়া র'র সদৃশ ব'র পেটকাটা রূপ। ইহাই আধুনিক র'র অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী রূপ।

ল—মান্দা খোদিতলিপিতে ল'র প্রাচীন ও আধুনিক দ্বিবিধ রূপই পাওয়া যায়।

কমৌলি শাসনে ল'র ১২শ শতাব্দীর রূপ। উহা কতকটা নাগরী তকারের ন্যায়। ঢাকার খোদিতলিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের লিপি এবং গয়াস্থ গদাধর-মন্দিরের খোদিত লিপির সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে।

কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উহার আধুনিক রূপ। প্রাচীনেরা এখনও ঐরূপ ল'র ব্যবহার করেন। বেশীর ভাগ উহার নিম্নে একটি বিন্দু থাকে।

'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ ল'র দুইরূপ আকারই পাওয়া যায়। এক ণকারের অনুরূপ; আর এইটির ব্যবহারই অধিক। অপর আধুনিক রূপ, ১৭৬।২।১,২,৩,৪ ; ২০৪।২।৭।

শ—কমৌলি ও তর্পণদীঘির শাসনে শ'র প্রাচীন রূপ।

কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উহার মধ্যবর্ত্তী রূপ।

'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ উহার চরম পরিণতি প্রথম পরিলক্ষিত হয়।

হ—কমৌলি ও তর্পণদীঘি শাসনে হ'র প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়।

মধ্যবর্ত্তী রূপ যথাক্রমে দেওপাড়া প্রশস্তি, মান্দা খোদিতলিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের লিপি, গদাধর মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপি এবং কেম্ব্রিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে।

পরবর্ত্তী রূপ বোধিচর্য্যাবতার পুথিতে দেখিতে পাই। তখন হ'র গঠন সম্পূর্ণ হয় নাই।

ইহার অনতিকাল পরেই হ'র চরম পরিণতি সংঘটিত হইয়া থাকিবে এবং সেই পূর্ণাবয়ব হ আমরা প্রথম 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ দেখি।

ঋ-ফলার ন্যায় উকারের চিহ্নও পুথির প্রাচীনত্বের অন্যতম নিদর্শন।

সংখ্যাবাচক তিন, পাঁচ ও আটে প্রাচীন রূপ বিদ্যমান।

নীচের তালিকায় দেখা যায়, 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ এক একটি যুক্তাক্ষর দুই বা ততোধিক অক্ষরের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাও পুথির প্রাচীনত্বের পরিচায়ক।

অক্ষর-সাদৃশ্য

ঈ, ক্ল, গ্ণ, ন্দ, ল্ল, ন্দ, ন্ধ	প্রায় একরূপ।
উ, ড, ড়	একরূপ।
ও, ত্ত, ত্ত	একরূপ।
হ্ণ, হ্ল	অনেকটা একরূপ।
খ, স্থ	অনেকটা একরূপ।
ক্ষ, হ্ম	অনেকটা একরূপ।

ক্র, হ্র	একরূপ।
চ, ঠ	একরূপ।
ণ, ল	একরূপ।
ম্ম, হু, ক্ষ, ম্ন, ম্ব	অনেকটা একরূপ।
ম্ব, হৃ, ম্ব	একরূপ।
দৃ, ভৃ	প্রায় একরূপ ১৯।৮।১।২০১।১
ন্দ, ম্ন	একরূপ।
মু, ষ, ষু, স্থ	প্রায় একরূপ।
ষ, য়	একরূপ।
স্থ, স্ব, স্ম	প্রায় একরূপ।

১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'বোধিচর্য্যাবতার'এর পুথিতে আমরা চকারের মধ্যবর্ত্তী রূপ, ণকারের প্রাচীন রূপ, লকার ও হকারের মধ্যবর্ত্তী রূপ দেখিতে পাই। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ চ ও ণ'র প্রাচীন, মধ্যবর্ত্তী এবং আধুনিক এই ত্রিবিধ রূপ, ল'র মধ্যবর্ত্তী ও আধুনিক রূপ এবং হ'র আধুনিক রূপ দেখিয়া, প্রথমোল্লিখিত পুথি লিখিত হইবার অব্যবহিত পরে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' লিখিত হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। দুইখানি পুথির লিপিকালের ব্যবধান ২৫।৩০ বর্ষের অধিক মনে হয় না। ইতিপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে আধুনিক বাঙ্গালা বর্ণমালার গঠন সম্পূর্ণ হয়। আলোচ্য পুথিতে উ, জ, ঢ ও ধ'র প্রাচীন ও মধ্যবর্ত্তী রূপ, গ, ঘ, ছ, ট, থ, র ও ল'র মধ্যবর্ত্তী ও আধুনিক রূপ, অ, ক ও ড'র প্রাচীন ও আধুনিক রূপ এবং ত, শ, হ প্রভৃতি কয়েকটি অক্ষরের আধুনিক রূপের যুগপৎ সমাবেশ দেখিয়া উহার লিখন ১৫শ শতাব্দীর অন্তে বা তন্নিকটবর্ত্তী সময়ে সম্পাদিত হয়, নিঃসংশয়ে এরূপ নির্দ্ধারিত হইতে পারে। বর্ত্তমানে চণ্ডীদাসের কাল ১৪শ শতাব্দীর শেষ হইতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ধরা হয়। তাহা হইলে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর এই পুথিখানি কবির স্বহস্ত-লিখিত না হইলেও উহা তাঁহার জীবিতকালে লিপিবদ্ধ হয়, এরূপ বলিবার পক্ষে কোন বাধা নাই এবং এই পুথিখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীনতম বাঙ্গালা গ্রন্থ বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন*

ইহা সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত পঞ্চদশ প্রকার দর্শনের অন্যতম। ইহার প্রতিপাদক গ্রন্থগুলি প্রায়শঃ অমুদ্রিত রহিয়াছে ও ইহা কাশ্মীর প্রদেশেই একপ্রকার আবদ্ধ; এ জন্য ইহা বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত নহে। বসুগুপ্ত, কল্লট প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা; ভট্টোৎপল, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি আচার্য্যগণ ইহার প্রথয়িতা। এই দর্শনশাস্ত্র বেদমূলক নহে, ইহার ব্যাখ্যাতৃগণ কচিৎ উপনিষদ্‌বাক্য উদ্ধৃত করিলেও বৈদিক মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। তথাপি ইহাঁরা কতকগুলি বিশেষ তন্ত্রের বচনের সহিত এই দর্শনের মত সংবাদিত করিয়া ইহার শাস্ত্রীয়তা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই দর্শনের মূল অন্বেষণ করিলে যদিও ইহাকে অবৈদিক দর্শন বলিতে হয়, তথাপি ইহাকে অশাস্ত্রীয় বলা যায় না। শৈবদর্শন হইতে এই মতের উৎপত্তি হইয়াছে। শৈবদর্শনসমূহের মধ্যে পাশুপত মত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; ইহা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শৈবদর্শন বিস্তারিত হইয়াছে। কাশ্মীরদেশপ্রচলিত শৈব মতই কালক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন নাম লাভ করে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রতিষ্ঠাতৃগণ প্রচলিত শৈবদর্শনের সমস্ত প্রকার পরিভাষা, শ্রেণীবিভাগ, তত্ত্বসংখ্যা প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু মূল কথা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার অভিমত প্রচার করিয়াছেন। অতএব প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মূল পাশুপত দর্শন।

পাশুপতদর্শন অতি প্রাচীন। মহাভারত-রচনার সময়ে এই দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত ও শাস্ত্রানুযায়ী বলিয়া আদৃত হইত। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ব্বের একটি শ্লোক হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। সেই শ্লোকটি এই,—

সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
আত্মপ্রমাণান্যেতানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥ (১)

সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ, পাশুপত—এই সকল স্বতঃসিদ্ধ, কুতর্ক দ্বারা এই সকল মত নষ্ট করা উচিত নহে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, পাশুপত মতের সে সময় কিরূপ গৌরব ছিল। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রানুসারে তাঁহার ভাষ্যে বেদ ভিন্ন এই সকল

---

* উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত।

(১) অধুনা প্রচলিত মহাভারতে এই শ্লোকের শেষ দুই চরণের বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা,—

জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ।

যাহা হউক, এ পাঠেও পাশুপত মতের গৌরবের ন্যূনতা হয় না। কেন না, ইহাতেও পাশুপত শাস্ত্রকে বেদাদির সহিত সমশ্রেণীস্থ জ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্র বলা হইতেছে।

মতের প্রামাণ্য প্রথমে খণ্ডন করেন। তৎপরবর্ত্তী রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণ পাঞ্চরাত্র মতের সমর্থন করিলেও পাশুপতদর্শনের অপ্রামাণ্য বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের সহিত একমত হন। কেহই পাশুপতদর্শনের সমর্থনে অগ্রসর হন নাই। এ জন্ম পাশুপতদর্শন অধুনা প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মহাকবি বাণভট্টাদির সময়েও যে এই মত সুপ্রচলিত ছিল, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে বুঝা যায়। এক্ষণে মাধবাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণই ঐ মত জানিবার একমাত্র উপায়।

পাশুপত-মতাবলম্বিগণ মহাদেবকেই পরমেশ্বর বলেন। তাঁহারা জীবকে "পশু" শব্দে অভিহিত করেন এবং জীবগণের অধিপতি বলিয়া পরমেশ্বরকে পশুপতি আখ্যায় আখ্যাত করেন। ইহাঁদের মতে পরমেশ্বর জীবগণের কর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, কেন না, তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বতন্ত্র, কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। শৈব দার্শনিকগণ পাশুপত মতের এই অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। অতএব পরমেশ্বর কর্ম্মাদিসাপেক্ষকর্ত্তা। তাঁহারা আরও বলেন, এই মতই যুক্তিসিদ্ধ; কারণ, দেখ, যদি কেবল পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারেই সমস্ত সম্পন্ন হইত, তবে তিনি আমাদের আহার-বিহারাদির উপায়স্বরূপ হস্ত-পদাদির সৃষ্টি করিবেন কেন? আর নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য সৃষ্টি করিবারই বা আবশ্যকতা কি? তাঁহার ইচ্ছা হইলেই ত ভোজনাদি সকল কর্ম্মই অনায়াসে সুনিষ্পন্ন হইতে পারিত। আর দেখা যাইতেছে, কেহ প্রাসাদতুল্য গৃহে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় নিদ্রা যায়, কাহারও পক্ষে বা তরুতলে তৃণশয্যাও দুর্লভ। কেহ অমৃততুল্য সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিয়া অতিতৃপ্তিবশতঃ তাহাও ঠেলিয়া ফেলিতেছে, কাহারও পক্ষে বা পথে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট কদর্য্য অন্নও দুর্লভ। কেহ নৃত্য-গীতাদি প্রমোদে পরমানন্দে কাল যাপন করিতেছে, কাহারও পক্ষে বা দারিদ্র্য, শোক, পীড়া প্রভৃতির জন্ম ক্ষণকাল যাপন করাও দুঃসহ। এই সকল দেখিয়া ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্তৎব্যক্তির পূর্ব্বকৃত সুকৃত-দুষ্কৃতই তাহাদের বিসদৃশ ফলভোগের কারণ, অন্যথা কখনই এরূপ ঘটিতে পারিত না। কেন না, পরমেশ্বর পরম করুণাময়, সকলেরই পিতৃস্বরূপ ও হিতৈষী। তাঁহার স্নেহের ন্যূনতা বা আধিক্য নাই এবং এক জনের সুখ ও আর এক জনের দুঃখ হউক, ইহাও তাঁহার অভিপ্রেত নহে। যদি কেবল তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে সমস্ত হইত, তবে সকলেই সুখী হইত—কেহই দুঃখী থাকিত না। তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে আমাদের যে কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব-শক্তি আছে, আমরা সেই শক্তি তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করি বলিয়াই, আমরা নানাবিধ দুঃখ ভোগ করি। অতএব যাহার যেরূপ কর্ম্ম, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগে নিযুক্ত করেন বলিয়া, পরমেশ্বর যে কর্ম্মাদিসাপেক্ষ-কর্ত্তা, তাহাতে সন্দেহ কি? পরমেশ্বরের কর্ম্মনিরপেক্ষতা স্বীকার করিলে, তাঁহার উপর বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য, এই দুই দোষ আরোপিত করা হয়।

কিন্তু ইহাতে এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে যে, তাহা হইলে পরমেশ্বরের স্বতন্ত্রতা নষ্ট হইল। রাজা যদি অমাত্যাদির সাহায্য অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহার যেমন স্বাধীনতা নষ্ট হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও কর্ম্মাদিসাপেক্ষতায় স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় না। অন্তকর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়া যিনি যাহা সম্পন্ন করেন, তাঁহার সে বিষয়ে স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। যখন পরমেশ্বর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়াই জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছেন, তখন অবশ্যই পরমেশ্বরের স্বতন্ত্রতা অব্যাহত আছে।

ইহাঁরা যে কেবল পরমেশ্বরের কর্ম্মসাপেক্ষতা স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে। ইহাঁরা নৈয়ায়িকগণের মত জগতের উপাদানকেও ঈশ্বরনিরপেক্ষ বলেন। ইহাঁদের মতে ঈশ্বর জগৎ নির্ম্মাণ করেন মাত্র। জগতের উপাদান অনাদি পদার্থ। জীবগণও ঈশ্বরভিন্ন ও অনাদি। কতিপয় দার্শনিক এই বিষয়ে বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা জীবগণের কর্ম্মানুসারে ফলভোগ স্বীকার করেন, কিন্তু জীব ও জগদুপাদানের ঈশ্বরভিন্নতা স্বীকার করেন না। এই প্রকার মতভেদ অবলম্বন করিয়া, তাঁহারা প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন স্থাপিত করেন। কিন্তু অপরাপর অল্প প্রয়োজনীয় বিষয়ে শৈবদর্শনের সমস্ত বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা শৈবদর্শনোক্ত জীবের ত্রৈবিধ্য, ত্রিবিধ মল, ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব ও সমস্ত পরিভাষা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা শৈবগণের ন্যায় ভক্তবৎসল মহেশ্বরকেই জগদীশ্বর বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতিকে ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত জগদুপাদানরূপে অঙ্গীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—যেরূপ তপঃপ্রভাবশালী তাপসগণ, ইষ্টক চূর্ণ প্রভৃতি উপাদানসাপেক্ষ না হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে অট্টালিকা নির্ম্মাণ এবং স্ত্রী-সংসর্গ ব্যতিরেকেই মানস পুত্রাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগদীশ্বর কোন উপাদানের অপেক্ষা না করিয়া জীবের অদৃষ্ট অনুসারে জগন্নির্ম্মাণ করিতেছেন, পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই কোন কার্য্যের কারণ নহে। যখন উপাদান ব্যতিরেকেও যোগিগণ ইচ্ছাবশতঃ অট্টালিকাদি সম্পন্ন করিতে পারেন, তখন সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই বা কেন উপাদাননিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করিতে পারিবেন না? এই জন্য প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন-প্রতিষ্ঠাতা বসুগুপ্তাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

> নিরুপাদানসম্ভারমভিত্তাবেব তন্বতে।
> জগচ্চিত্রং নমস্তস্মৈ কলাশ্লাঘ্যায় শূলিনে॥

বর্ণ, তুলিকাদি উপকরণ-সম্ভার ব্যতিরেকেই যিনি অভিত্তিতে জগচ্চিত্র অঙ্কিত করেন, সেই অর্দ্ধেন্দুশেখর শূলপাণিকে নমস্কার।

এই জগন্নির্ম্মাণ-বিষয়ে জগদীশ্বর অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিয়োজিত নহেন এবং অন্য কোন বস্তুর সহায়তাও অবলম্বন করেন না, এ জন্য তাঁহাকে স্বতন্ত্র বলা যায়। তিনি নানাবিধ জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থ হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। আত্মচৈতন্য,

যুক্তি ও শাস্ত্রানুশাসন দ্বারা প্রমাণীকৃত জীবাত্মা হইতে তিনি ভিন্ন নহেন। যেমন স্বচ্ছ মুকুরে নানাবিধ দ্রব্য প্রতিবিম্বিত দেখা যায়, সেইরূপ পরমেশ্বর আপনাতে সমগ্র জগৎ প্রতিবিম্ববৎ প্রকাশিত করিতেছেন। বহুরূপী নট যেরূপ কখনও রাজা, কখনও বা ভিক্ষুক, কখনও পণ্ডিত, কখনও বা মূর্খ—এই প্রকার নানারূপে আপনাকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ জগন্নাট্যপ্রবর্ত্তক পরমেশ্বর নানা জীবরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। অতএব বাস্তবিক পক্ষে জীব পরমেশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল তাহার আপনাকে পরমেশ্বর বলিয়া চিনিবার অপেক্ষামাত্র আছে। এ জন্ত বাহ্য ও আভ্যন্তর পূজা ও প্রাণায়ামাদিপ্রয়াস সমস্তই নিষ্প্রয়োজন, কেবল প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি ও মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বিষয়বোধক শাস্ত্র পাঁচখানি—সূত্র, বৃত্তি, বিবৃতি এবং লঘু ও বৃহৎ বিমর্শিনী। সেই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রথম সূত্র এই,—

কথঞ্চিদাসাদ্য মহেশ্বরস্য
দাস্যং জনস্যাপ্যুপকারমিচ্ছন্।
সমস্তসম্পৎসমবাপ্তিহেতুং
তৎপ্রত্যভিজ্ঞামুপপাদয়ামি॥

কোন প্রকারে মহেশ্বরের দাস্য লাভ করিয়া ও লোকের উপকারে ইচ্ছুক হইয়া সমস্ত সম্পৎ প্রাপ্ত হইবার হেতুস্বরূপ মহেশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার (অর্থাৎ আপনাকে মহেশ্বর বলিয়া চিনিবার) উপায় বলিতেছি। "কোন প্রকারে" অর্থাৎ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে প্রাপ্ত তাঁহা হইতে অভিন্ন গুরুচরণারবিন্দের আরাধনা করিয়া। "লাভ করিয়া" অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ও নির্ব্বাধভাবে [মহেশ্বরের দাস্যের] ফল লাভ করিয়া। ইহা দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা ও শাস্ত্রকরণের যোগ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যথা প্রতারণার অবতারণা হইবে। মায়া উত্তীর্ণ হইলেও মহামায়ার অধীন বিষ্ণু, বিরিঞ্চি প্রভৃতি যাঁহার ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বর বলিয়া পরিগণিত, তিনিই অনন্ত-প্রকাশ, আনন্দ ও স্বাধীনতার আশ্রয় ভগবান্ "মহেশ্বর"। প্রভু যাঁহাকে স্বেচ্ছানুসারে সমস্ত দান করেন, তিনিই দাস [দীয়তে অস্মৈ ইতি দাসঃ]। যিনি মহেশ্বরের ন্যায় সকল স্বাধীনতার পাত্র, তিনিই মহেশ্বরের দাস। কারিকায় নির্ব্বিশেষ জনশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব এই শাস্ত্রের অধিকারীর বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। সকলেই এই শাস্ত্রে অধিকারী। মহেশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞাই সমস্ত সম্পৎ লাভের হেতু, কেন না, তদ্দ্বারা মহেশ্বরের দাস্য লাভ করিলে আর কিছুই প্রার্থনীয় থাকে না। এ জন্য ভট্টোৎপল বলিয়াছেন,—যাঁহারা ভক্তিসম্পন্ন, তাঁহাদের আর কি প্রার্থনীয় আছে? যাঁহারা ভক্তিদরিদ্র (ভক্তিশূন্য), তাঁহাদের অন্য প্রার্থনায় কি ফল?

উক্ত কারিকায় বহুব্রীহি সমাস দ্বারা সমস্ত-সম্পৎ-সমবাপ্তিই তাঁহার প্রত্যভিজ্ঞার হেতু—এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। আমরা যে অংশে জ্ঞাতা ও কর্ত্তা, সে অংশে আমরা ঈশ্বর; আমাদের শক্তি বর্দ্ধিত হইতে হইতে যখন আমরা সমস্ত জানিতে ও করিতে

পারিব, তখন আমরা পরমেশ্বরই হইব। অতএব সমগ্র শক্তিলাভ ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার হেতু। এই উপায়ের কথা পরে বিশেষভাবে বলা হইতেছে।

কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন, জীব যদি বাস্তবিকই পরমেশ্বর হয়, তবে প্রত্যভিজ্ঞারই বা কি প্রয়োজন ? আমার জানা না থাকিলেও বীজ সলিল-তাপাদির যথোপযুক্ত সাহায্য পাইলেই অঙ্কুরিত হইবে। সেইরূপ "আমি ঈশ্বর", এ কথা সত্য হইলে, আমার ঈশ্বরের স্থায় ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। বহ্নি কি বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে ? কিন্তু এরূপ আপত্তি করা অসঙ্গত। বীজ, অগ্নি প্রভৃতি বাহ্য বস্তু অজ্ঞাত থাকিলেও তাহার শক্তি তাহাকে প্রকাশ করে, কিন্তু মানসিক ব্যাপারে অপরিজ্ঞান ফল প্রকাশে বাধা দেয়, এরূপ স্থলে প্রত্যভিজ্ঞার প্রয়োজন আছে। আমার বাল্যকালের বন্ধু আমার পার্শ্বে বসিয়া থাকিলেও, বন্ধুর সহিত উপবেশনে যে পরমানন্দ উপস্থিত হয়, সে আনন্দ আমি ততক্ষণ উপভোগ করিতে পারিব না, যতক্ষণ না আমি তাঁহাকে বাল্যবন্ধু বলিয়া চিনিতে পারি। অদৃষ্ট নায়কে বদ্ধানুরাগা বিরহিণী কামিনীর কান্ত অস্তিকস্থিত হইলেও, তাঁহার বিরহ-দুঃখ ততক্ষণ সমভাবেই থাকিয়া যাইবে, যতক্ষণ না তিনি সমীপস্থ পুরুষকে স্বীয় বল্লভ বলিয়া চিনিতে পারিতেছেন। সেইরূপ যদিও বিশ্বেশ্বরই আমাদের আত্মা, আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকটস্থিত, তথাপি ততক্ষণ আমাদের দুঃখনিবৃত্তি বা পরমানন্দ লাভ হইবে না, যতক্ষণ না আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছি।

অতএব ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা আবশ্যক। কিন্তু মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনের সংগ্রহমাত্রকরণে ব্যাপৃত বলিয়া, কি উপায়ে প্রত্যভিজ্ঞা লাভ করিতে হয়, তাহা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করেন নাই। ক্ষেমরাজকৃত প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় হইতে নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। এই গ্রন্থে মাত্র কুড়িটি সূত্রে সমস্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বিবৃত হইয়াছে। ইহার কতকগুলি সূত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করা যাইতেছে।

চৈতন্য সর্ব্ব বস্তুর নিয়ামক, কিন্তু নিজে অন্য কোন বস্তু দ্বারা নিয়মিত হয় না, ইহা হইতেই সমস্ত জগৎ নিষ্পন্ন হয়। ইহা জগতের উৎপাদনে কোন উপাদানের অপেক্ষা করে না, স্বেচ্ছাক্রমে নিজেতে জগৎকে প্রকাশিত করে। কিন্তু চৈতন্য জগদ্রূপে পরিণত হয়, এরূপ বলা ঠিক নহে। দর্পণ যেরূপ স্বয়ং কোন রূপে পরিবর্ত্তিত হয় না, কিন্তু আপনাতে নানা বস্তু প্রকাশিত করে, সেইরূপ চৈতন্যও স্বয়ং অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া জগৎ প্রকাশিত করে। আবার দর্পণ যেরূপ মৃত্তিকা-বীজাদি কোন উপাদান না লইয়া, উদ্যানাদি প্রদর্শন করে, সেইরূপ চৈতন্যও স্বেচ্ছাক্রমে বিনা উপাদানে সমগ্র জগৎ প্রকাশিত করে। এই জগৎ নানা বৈচিত্র্যময়, কেন না, জীব ও জীবগণের ভোগ্য পদার্থ নানা প্রকার। জীব ও জীবগণের ভোগ্য পদার্থ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া নানা প্রকার হয়। জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদার্থ ভোগ করে, আবার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য জীবগণ পরস্পর অধিকতর ভিন্ন হয়। জীব ও ভোগ্য পদার্থ পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নানা বৈচিত্র্যযুক্ত হয়। এরূপ স্থলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় না, কেন না, এ স্থলে পরম্পরাশ্রয়ে

বৈচিত্র্যের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যেমন অন্ধ ও পঙ্গু পরস্পরের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলে, উহাদের কার্য্য অন্যোন্যাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বলা যাইতে পারে না, সেইরূপ উপরিউক্ত স্থলেও বৈচিত্র্যের উৎপত্তি অন্যোন্যাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বলা উচিত নহে। যেরূপ দুইখানি পাতলা তক্তা পরস্পরের আশ্রয়ে ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত হইলে, উহাদের ঊর্দ্ধস্থিতি অন্যোন্যাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বলা যাইতে পারে না, যেরূপ দুইখানি কাষ্ঠের পরস্পর সংঘর্ষে অগ্নি উত্থিত হইলে, ঐরূপ অগ্নির উৎপত্তি পরস্পরাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বলা যাইতে পারে না, সেইরূপ উপরিউক্ত স্থলেও বৈচিত্র্যের উৎপত্তি অন্যোন্যাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসম্ভব বলা উচিত নহে। এইরূপে জীব ও জীবভোগ্য পদার্থ পরস্পরপ্রভাবে নানাবিধ হওয়ায় বিশ্বও নানা বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়াছে।

অতঃপর জীবের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে। জীবে ও শিবে বাস্তবিক পক্ষে কোন ভেদ নাই, তবে শিবের মায়াশক্তি দ্বারা জীবের স্বরূপ অপ্রকাশিত রহিয়াছে বলিয়া জীব ও শিব ভিন্নবৎ প্রতীত হয়। যেরূপ অতি ক্ষুদ্র বীজে সুমহৎ বটবৃক্ষের স্বরূপ অনভিব্যক্ত ভাবে থাকে এবং অনুকূল অবস্থায় সেই অতিক্ষুদ্র বীজ যেরূপ মহামহীরুহে পরিণত হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্রশক্তি মানবেও পরমমহেশ্বরের সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বরিক ক্ষমতা অনভিব্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে এবং অনুকূল অবস্থায় সেই ক্ষুদ্রশক্তি মানবও পরমমাহেশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে। আরও যেমন ভগবানের শরীর এই বিশ্বই, সেইরূপ জীবের শরীরও সঙ্কুচিত বিশ্বাত্মক। মানব-শরীরের কোন্ অংশ বিশ্বের কোন্ অংশের অনুরূপ, তাহা নানা পুরাণ-তন্ত্রাদিতে বিবৃত হইয়াছে। তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য যোগিজনবোধ্য, এ জন্য তাহা উল্লিখিত হইল না। বস্তুতঃ জীব ও শিবের অভেদ-তত্ত্বই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের সার কথা। এই মতে এই তত্ত্বের পরিজ্ঞানেই মুক্তি হয় ও ইহার অপরিজ্ঞানেই বন্ধন হয়।

যখন চিদাত্মা পরমেশ্বর নিজের স্বাতন্ত্র্যবশতঃ আপনাকে নানা রূপে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাদিশক্তি বস্তুতঃ অসঙ্কুচিত থাকিলেও সঙ্কুচিতের ন্যায় প্রকাশ পায় এবং তখনই ইনি সংসারী জীবরূপে প্রতীয়মান হন। এই সময় তাঁহার অব্যাহত ইচ্ছাশক্তি অনভিব্যক্ত হওয়াতে, তিনি আপনাকে অপূর্ণ মনে করেন। তাঁহার জ্ঞানশক্তি সঙ্কুচিতবৎ হওয়ায়, তিনি দেহকেই আত্মা বলিয়া ভাবেন। তাঁহার ক্রিয়াশক্তি পরিমিত হওয়াতে তিনি শুভাশুভ অনুষ্ঠানে রত হন। তাঁহার অন্যান্য শক্তিও সঙ্কুচিতবৎ হইয়া যায়। এইরূপে তিনি শক্তি-দরিদ্র হইয়া সংসারী আখ্যা লাভ করেন। নিজের শক্তির বিকাশ হইলে, আবার শিব হন।

এখন মুক্তির উপায় বর্ণিত হইতেছে। চিদানন্দ লাভ হইলে অর্থাৎ স্বরূপাবস্থানের আনন্দ অনুভবের সামর্থ্য হইলে, "আমি চিন্মাত্র, দেহাদিভিন্ন", এইরূপ দৃঢ় প্রতিপত্তি জন্মে। এই সময় দেহাদির অনুভব বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও তখন "আমি দেহাদিভিন্ন চিন্মাত্র" এইরূপ প্রবলতর জ্ঞান বিদ্যমান থাকায়, দেহাদিজ্ঞান জীবকে বিপথচালিত করিতে

পারে না। এইরূপ অবস্থাকে জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে। চিদানন্দলাভ হইলে আত্মজ্ঞান ও জীবন্মুক্তি হয়। চিদানন্দলাভ কিরূপে হয়? মধ্যবিকাশ হইলে চিদানন্দলাভ হয়। মধ্য-বিকাশ কিরূপে হয়, তাহা বলা হইতেছে। সকলের অন্তরতমরূপে বর্ত্তমান ও সকল বস্তুর স্বরূপপ্রকাশক বলিয়া সংবিৎ (চৈতন্ত)কেই মধ্য বলা হয়। এই সংবিতের স্বরূপ মায়াদশায় পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবদেহকে আশ্রয় করে। এ জন্য জীবগণ দেহদ্বার ব্যতিরেকে জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। সংবিৎ অসংখ্য নাড়ীপথে সমস্ত দেহ আশ্রয় করিয়া আছে। তথাপি প্রধানতঃ ইহা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের মূল পর্য্যন্ত মধ্যমনাড়ী বা ব্রহ্মনাড়ী আশ্রয়ে অবস্থিত। কেন না, এই মধ্যম নাড়ী হইতে সকল মনোবৃত্তির উদয় হয় ও ইহাতেই সকল বৃত্তির লয় হয়। এরূপ হইলেও বদ্ধ জীবগণের সংবিৎ সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান করে। যখন এই সংবিতের সঙ্কোচভাব দূরীভূত হইয়া ইহা বিকশিত হয় অথবা মধ্যভূত ব্রহ্মনাড়ী বিকশিত হয়, তখন জীব চিদানন্দ লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হয়।

উপরিউক্ত মধ্যবিকাশের কতকগুলি উপায় কথিত হয়। (১) বিকল্পক্ষয়ের দ্বারা মধ্য বিকাশ হয়। এই উপায় সুখকর; কারণ, ইহাতে প্রাণায়াম, মুদ্রাবন্ধ প্রভৃতি যন্ত্রণাময় ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। আমাদের আত্মস্বরূপে অবস্থিতির প্রতিবন্ধক আমাদের মনের সঙ্কল্প-বিকল্প। আমরা যদি কিছুই চিন্তা না করি, তাহা হইলে সকল বিকল্প ক্ষয় হয় অর্থাৎ আমাদের মনে কোন প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প উপস্থিত হয় না এবং তাহা হইলেই আমরা স্বরূপে অবস্থান করিতে পারি এবং তাহা হইলেই সংবিতের বিকাশ হয়। আমাদের সমস্ত জ্ঞানেই কোন না কোন বাহ্য বিষয় রহিয়াছে। এই বাহ্য বিষয় ত্যাগ করিতে পারিলেই, শুদ্ধ চৈতন্ত-মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহাকে স্বরূপে অবস্থান বলে। তাহা হইতেই চিদানন্দ লাভ হয়। অতএব এই চিদানন্দ লাভ করিতে হইলে সমস্ত বাহ্য বিষয়ের চিন্তা ত্যাগ করিতে হয় বা অকিঞ্চিচ্চিন্তক হইতে হয়। তাহা হইলেই সংবিৎ বিকশিত হয়। শিবসূত্রে এই উপায়কে শাম্ভব উপায় বলা হইয়াছে এবং এই উপায়ই সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধদেবও শূন্য ভাবনা দ্বারা নির্ব্বাণ লাভের উপদেশ দিয়াছেন। (২) দ্বিতীয় উপায় শক্তি-সঙ্কোচ। এই উপায় কঠোপনিষদের চতুর্থ বল্লীর (বা দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম বল্লীর) প্রথম মন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়-সকল বহির্ম্মুখ করিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছেন, এজন্ত তাহারা বাহিরের বস্তুকেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোন উদ্যমশালী পুরুষ বাহ্য বস্তু হইতে উহাদিগকে ব্যাবৃত্ত বা সঙ্কুচিত করিয়া চিদানন্দ উপভোগ করিতে করিতে প্রত্যগাত্মাকে

দেখেন। (৩) তৃতীয় উপায় শক্তির বিকাশ অর্থাৎ অন্তর্নিগূঢ় সমস্ত শক্তির যুগপৎ বিস্ফারণ। আমরা যখন কোন বস্তু দেখি, তখন আমরা সেই বস্তুকে জানিতে পারি এবং নিজকেও আংশিক ভাবে (অর্থাৎ সেই বস্তুর দ্রষ্টৃরূপে) জানিতে পারি। অন্য বস্তু দেখিলে, নিজেকে সেই অন্য বস্তুর দ্রষ্টৃরূপে আংশিকভাবে জানিতে পারি। আবার যখন কোন শব্দ শুনি, তখন আমরা সেই শব্দকে জানিতে পারি এবং নিজেকেও আংশিকভাবে (অর্থাৎ সেই শব্দের শ্রোতৃরূপে) জানিতে পারি। এইরূপ আমরা সমস্ত সময়ই নিজেকে জানিতেছি বটে, কিন্তু তাহা আংশিকভাবে মাত্র। কিন্তু যদি চেষ্টা দ্বারা আমাদের সমস্ত গূঢ় শক্তির প্রয়োগ করিয়া আমরা নিজেকে সর্ব্বভাবে জানিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান হয় ও তাহাতেই চিদানন্দ লাভ করিতে পারি। কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের মন এক একটি বিষয়ই এক এক সময়ে গ্রহণ করে, এ জন্য আমরা কেবল আমাদিগকে আংশিক ভাবে জানিতে পারি। এই অপূর্ণতা দূর হইয়া সমস্ত শক্তির বিকাশ হইলেও শিবত্ব লাভ হয়। শিবসূত্রে এই উপায়কে শাক্ত উপায় বলা হইয়াছে। (৪) চতুর্থ উপায় বাহচ্ছেদ বা প্রাণাপানের গতি-বিচ্ছেদ। যোগসূত্রে ইহাকে সমাধিলাভের উপায় বলা হইয়াছে। জ্ঞানগর্ভে উক্ত হইয়াছে,—যে ব্যক্তি স্বরবর্ণরহিত ককারহকারাদি প্রায় বর্ণ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রাণাপানের গতি বিচ্ছেদ করে ও হৃৎপঙ্কজমধ্যে চিত্ত নিহিত করে, তাহার হৃদয়ান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া তাদৃশ ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার অঙ্কুর উদিত হয়, যাহা পশুরও পরমমাহেশ্বর্য্য জন্মাইতে সমর্থ। আস্তন্ত-কোটিনিভালন, আনন্দপূর্ণস্বাত্মভাবনা প্রভৃতি আরও নানা উপায়ে চিদানন্দ লাভ হইতে পারে।

উক্ত উপায়-সকলের অভ্যাসে নিত্য সমাধিলাভ হয়। তাহা হইলেই নিজের পূর্ণস্বরূপে অবস্থান ঘটে এবং ঈশ্বরতাপ্রাপ্তি হয়। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা ক্ষেমরাজকৃত প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় হইতে সংগৃহীত। এই গ্রন্থখানির রচনা সরল হইলেও, অপরিচিত পারি-ভাষিক শব্দসঙ্কুল বলিয়া ইহার অনেক স্থল বুঝা যায় না। যাহা বুঝা গেল, তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম উপরে বর্ণিত হইল।

শ্রীধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

———

জ্ঞানদাসের পদাবলী*

বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাসের স্থান অতি উচ্চ। বহু মনীষী সমালোচক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কেহ কেহ বা জ্ঞানদাস অপেক্ষা গোবিন্দদাসকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী সার্দ্ধ শতাধিক বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসই যে কবিত্ব-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে সমালোচকগণমধ্যে মত-ভেদ দেখা যায় না। স্বর্গীয় হেমবাবু ও নবীন-বাবুর মত বিভিন্ন প্রকৃতির দুই জন কবির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর, এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়া যেরূপ অসম্ভব, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। এই জটিল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে উল্লিখিত কবিদিগের মধ্যে কাহার কি বিশেষত্ব,—তাঁহারা কে কোন্ শ্রেণীর রচনায় অধিক দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা করাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক হয়; উহা মীমাংসিত হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে তুলনায় সমালোচনা কিয়ৎপরিমাণে সুসাধ্য হইতে পারে। জ্ঞান-দাস ও গোবিন্দদাস সমসাময়িক কবি ছিলেন; নরহরি চক্রবর্ত্তীর "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থের বর্ণনায় আমরা উভয়কেই তদানীন্তন অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনগণ সহকারে খেতুরীর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে উপস্থিত দেখিতে পাই। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস উভয়েই সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী; মৈথিল প্রভৃতি ভাষা-সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন এবং উভয়েই পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আদর্শে পদ-রচনা করিয়াছেন; তথাপি গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বিদ্যাপতির—বিশেষতঃ জয়দেবের প্রভাব যেরূপ সুস্পষ্ট, জ্ঞানদাসের পদাবলীতে সেরূপ নহে; তাঁহার পদ-সমূহে নায়কের স্বভাব-কবি চণ্ডীদাসের প্রভাবই সুপরিস্ফুট। গোবিন্দদাস যেরূপ জয়দেবের অপূর্ব্ব অনুকরণে সুললিত অনুপ্রাস-যোজনা, পদ-মাধুর্য্য ও অলঙ্কার-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া, আমাদিগের বিস্ময় ও প্রীতির উৎপাদন করেন, জ্ঞানদাসও সেইরূপ চণ্ডীদাসের ন্যায় প্রাঞ্জল ও সুগভীর রসপূর্ণ রচনায় আমাদিগকে বিমোহিত করিয়া থাকেন। জ্ঞানদাসের এই উৎকৃষ্ট পদগুলি প্রায় সমস্তই চণ্ডীদাসের ন্যায় অমিশ্র বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। গোবিন্দদাসের অমিশ্র বাঙ্গালা পদ দুই চারিটি পাওয়া গেলেও, সেইগুলি তাঁহার উৎকৃষ্ট পদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানদাসের—

"দেখ রি সখি শ্যামচন্দ
ইন্দুবদনি রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র যুবতিবৃন্দ
গাওয়ে রাগ-মালিকা॥

---

* রাজসাহী, উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ৮ম অধিবেশনে পঠিত।

মন্দ-পবন কুঞ্জ-ভবন
কুসুম-গন্ধ-মাধুরী।
মদন-রাজ নব সমাজ
ভ্রমর-ভ্রমরি-চাতুরী॥

প্রভৃতি ব্রজবুলি পদগুলি বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট মৈথিল ও ব্রজবুলি পদের সহিত তুলনার অযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে জ্ঞানদাসের—

"দেখ্যা আইলাম তারে সই দেখ্যা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে॥"

"সই কি না সে বঁধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীত
যেন দারিদ্রের হেম॥"

"হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥"

ইত্যাদি সরল, মধুর ও গভীর ভাবপূর্ণ বাঙ্গালা পদগুলির তুলনা-স্থল সমগ্র পদাবলি-সাহিত্যে ও বিরল। সুতরাং গোবিন্দদাসের ব্রজ-বুলি পদাবলী অনুপ্রাস, পদ-লালিত্য ও অলঙ্কার-পারিপাট্য বিষয়ে অতুলনীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও বাঙ্গালা ও ব্রজ-বুলি—উভয়বিধ উৎকৃষ্ট পদ-রচনায় দক্ষতা ও অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ-রচনার জন্য বাঙ্গালা ভাষার গীতি-কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান নির্দ্দেশ করিলে কোনরূপেই অসঙ্গত হইবে না।

এইরূপ একজন অতি শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবির পদাবলী বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়া যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা বলা বাহুল্য। দুঃখের বিষয় এই যে, স্বর্গগত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় ব্যতীত জ্ঞানদাসের সমগ্র পদাবলীর প্রকাশ-কার্য্যে আর কেহই অগ্রসর হন নাই। রমণীবাবু চণ্ডীদাসের পদাবলীর ন্যায় জ্ঞানদাসের পদাবলীরও একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু হস্তলিখিত প্রাচীন বিশুদ্ধ আদর্শ পুথির অসদ্ভাব কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, রমণীবাবুর চণ্ডীদাসের সংস্করণের ন্যায় জ্ঞানদাসের সংস্করণেও বহু স্থলে পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে ১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" শীর্ষক প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের পদাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে কর্ত্তব্যের অনুরোধে রমণী বাবুর কতকগুলি পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি প্রদর্শিত করিয়া বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছি। জ্ঞানদাসের কবিত্বের সমালোচনা ইতিপূর্ব্বে অল্প-বিস্তর অনেকেই

করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার পদাবলীর পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কোন আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না; সুতরাং অদ্য সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে সমাগত সুধীমণ্ডলীর সমক্ষে আমরা প্রচলিত প্রথা অনুসারে জ্ঞানদাসের কবিত্বের সমালোচনা না করিয়া যদি তাঁহার পদাবলীর উক্ত অসঙ্গতি ও উহা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি, তাহা হইলে বোধ হয়, অসঙ্গত কিংবা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রধানতঃ যে সকল কারণে জ্ঞানদাসের পদাবলীর পাঠ-বিকৃতি ঘটিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে সেই কারণগুলির উল্লেখ করিয়া পরে দৃষ্টান্ত সহ উহাদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

১ম। অক্ষর-বিনিময়-জনিত পাঠ-বিকৃতি। 'স' ও 'শ', 'ব' ও 'র', 'ল' ও 'ন', 'জ' ও 'য' এবং 'ও' ও 'তু' অক্ষরের বিনিময়-জনিত গোলযোগ ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল।

২য়। অক্ষরচ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতি।

৩য়। শব্দ-চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতি।

৪র্থ। অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগ-জনিত পাঠ-বিকৃতি।

৫ম। পদচ্ছেদের অভাব কিংবা অপ-ব্যবহার-জনিত পাঠ-বিকৃতি।

৬ষ্ঠ। ভণিতার গোলযোগে পাঠ-বিকৃতি।

৭ম। উল্লিখিত একাধিক কারণে পাঠ-বিকৃতি।

পাঠ-বিকৃতি ঘটিলে অর্থ-বিকৃতিও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; সুতরাং পাঠ-বিকৃতির উল্লিখিত কারণগুলি অর্থ-বিকৃতিরও কারণ বটে; পাঠ-বিকৃতি না থাকিলেও শব্দার্থের বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে প্রকৃত অর্থ-বোধ না হইয়া অসদ্ব্যাখ্যার কারণ হইতে পারে; এই জাতীয় অর্থের অসঙ্গতির কয়েকটি দৃষ্টান্তও আমরা প্রদর্শন করিব।

আমরা যথাক্রমে এই সকল পাঠ ও অর্থ-বিকৃতির সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

পাঠ-বিকৃতি

১ম। অক্ষর-বিনিময়

(১) 'স' ও 'শ'-কারের গোলযোগ

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে 'শ'কারের পরিবর্ত্তে প্রায় সর্ব্বত্রই স-কারের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; কিন্তু কোন কোন স্থলে 'স'কারের পরিবর্ত্তেও 'শ'কার ব্যবহৃত হইয়াছে। হিন্দী ও মৈথিলভাষায় 'শ'কার প্রায় সর্ব্বত্রই 'স'কার অর্থাৎ ইংরেজি (S) অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হয় বলিয়া, হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় 'শ্যাম', 'শাঙন', 'শিঙ্গার' প্রভৃতি শব্দ 'স্যাম', 'সাঙন', 'সিঙ্গার' লিখিত হইলেও বাঙ্গালা ভাষায়, এমন কি, ব্রজ-বুলি পদাবলীতে পর্য্যন্ত 'স' ও 'শ' ইংরেজি (sh) অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হওয়ায় ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য না করিয়া 'শ'কারের পরিবর্ত্তে 'স'কারের ব্যবহার নিরর্থক ও অসঙ্গত

বিবেচনায় বঙ্গীয় পদাবলীর সম্পাদকগণ আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার রীতি অনুসারেই 'স' ও 'শ'কারের পার্থক্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে 'স'-কারের বাহুল্যবশতঃ উহাতে যে ক্বচিৎ 'স'কারের পরিবর্ত্তেও 'শ'কার ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে, ইহা বিস্মৃত হওয়ায় পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা,—রমণী বাবুর সংস্করণে—

"শুনহ মাধব কহলুঁ তোয়
শমতি না দেই দিন রজনী রোয়॥"
১ম পৃষ্ঠা।

"এবে দিন দুই তিন দেখিয়ে আন ছান্দে।
ডাকিলে শমতি না দেয় আঁখি মেলি কান্দে॥"
৫ম পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'শমতি না দেই' বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন—"শান্তি প্রাপ্ত হয় না। শমতি—শমতা।" প্রথম উদাহরণে 'শান্তি' অর্থ কথঞ্চিৎ সংলগ্ন হইলেও 'ডাকিলে শমতি না দেয়' বাক্যে কোনরূপেই শান্তি বা 'শমতা' অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং এ স্থলে 'শমতি' শব্দের আর একটি সঙ্গত অর্থ খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক; সেইরূপ কোন অর্থের উদ্ভাবন করিতে না পারিয়াই বোধ হয় রমণীবাবু শেষোক্ত স্থলে 'শমতি' শব্দের অর্থ লিখেন নাই। বস্তুতঃ 'শান্তি' বা 'শমতা' অর্থ প্রথম উদাহরণেও সঙ্গত হইতে পারে না; 'শান্তি বা শমতা পাওয়া' অর্থে 'শান্তি বা শমতা দেওয়া' বাক্যের প্রয়োগ নিতান্ত বিরুদ্ধার্থজ্ঞাপক সন্দেহ নাই। আমাদিগের দৃষ্ট পদকল্পতরুর চারিখানা হস্তলিখিত পুথিতেই 'শমতি' স্থলে 'সমতি' পাঠ আছে। 'সমতি' শব্দটি সংস্কৃত 'সম্মতি' শব্দ-জাত; হিন্দী ভাষায় 'সম্মতি' অর্থে 'সুমৃতী' শব্দের ব্যবহার আছে*; সম্মতি অর্থে পদাবলি-সাহিত্যের অন্যত্রও 'সমতি' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যথা,—

"সরস-বিরসময়ি ইঙ্গিতে রসবতি
অসমতি সমতি বুঝাব।"
—রাধামোহন; পদকল্পতরুর ৪৪৮ সংখ্যক পদ।

জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত উদাহরণ দুইটিতে 'সমতি' পাঠ ও উহার 'সম্মতি' বা সাড়া দেওয়া অর্থই সুসঙ্গত; সুতরাং এ স্থলে যে 'স'কার ও 'শ'কারের গোলযোগ হেতু পাঠ-বিকৃতি ও তজ্জন্য অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা 'সাড়া দেওয়া' অর্থে 'সুমৈড় দেওয়া' বাক্যের ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনা হয় যে, 'সম্মতি' শব্দ হইতেই এই 'সুমড়ি' বা

* ডাক্তার ফ্যালনের হিন্দুস্থানী-ইংরেজী অভিধানে 'সুমৃতী' শব্দ দেখুন।

'সুমৈড়' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে ; কারণ, অন্ত্য 'ত' অক্ষর অপভ্রংশে 'ড়' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় একান্ত বিরল নহে। যথা—(সংস্কৃত) 'পতন'—(বাঙ্গালা) পড়ন ; (সংস্কৃত) 'উদ্ধৃত'—(বাঙ্গালা) 'উদড়া', (হিন্দী) 'উধেড়া' ; (সংস্কৃত) অৰ্দ্ধাবৃত—(বাঙ্গালা) 'আউদড়', 'আদুড়' ; (সংস্কৃত) 'নিগ্রিত'—(বাঙ্গালা) 'নিগড়া'। 'সাড়া' শব্দটির সহিত 'সুমৈড়' শব্দের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা চিন্তনীয়।

(২) 'ব'-কার ও 'র'-কারের গোলযোগ

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে 'ব' ও 'র' অক্ষর দুইটি সর্ব্বত্র বিভিন্নরূপে লিখিত হয় নাই। কোন কোন পুথিতে 'র' অক্ষর 'ব'-কারের ন্যায় এবং 'ব' অক্ষরটি 'ব্' অর্থাৎ হসন্ত 'ব'-কারের ন্যায় দৃষ্ট হয় ; হসন্ত চিহ্নটি আবার অনেক স্থলে লিপিকর-প্রমাদে পরিত্যক্ত হইয়া 'ব' ও 'র' অক্ষরের ভেদ-চিহ্ন লুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এরূপ স্থলে শব্দের অর্থ দ্বারা 'ব' ও 'র' স্থির করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই ; সুতরাং বিচার্য্য শব্দটির অর্থ না বুঝিতে পারায় অনেক সময়ে যে, 'ব' ও 'র'-কারের গোলযোগ হেতু পাঠ-বিভ্রাট ঘটিবে—ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। 'ব' ও 'র'-কারের গোলযোগের দৃষ্টান্ত পদাবলি-সাহিত্যে অনেক দেখা যায় ; আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

"মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়।
রমিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায়॥"—২০ পৃষ্ঠা
"তাহে হাসি কয় কথা খানি।
অমিয়া রমিয়া বিধুর পড়িল অবনী॥"—২১ পৃষ্ঠা।

বলা বাহুল্য যে, 'রমিয়া' পাঠে কোন সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না ; উভয় স্থলেই 'রমিয়া' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বমিয়া' পাঠ হইবে। 'বান্থা' এই অসমাপিকা ক্রিয়া-পদ ও 'বমিত' এই ক্ত প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ উভয়ের অপভ্রংশ হইতেই 'বমিয়া' শব্দ হইতে পারে ; দ্বিতীয় উদাহরণে 'বমন করিয়া' অর্থে 'বমিয়া' শব্দের প্রয়োগ ব্যাকরণ-সিদ্ধ নহে বলিয়া যাঁহারা আপত্তি করেন, তাঁহারা 'বমিয়া' শব্দের 'বমিত' অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন ; বস্তুতঃ 'বমিত' অর্থে 'বমিয়া' শব্দের প্রয়োগ পদাবলি-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না,—সুতরাং আমাদিগের মতে দ্বিতীয় উদাহরণের অশুদ্ধ প্রয়োগ কবি-প্রয়োগ বলিয়া সমর্থন করাই সমীচীন পন্থা।

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা,—

"দেখবি মোহন গোকুল-চন্দ।
রাধা রসবতী　　রসিকা-শিরোমণি
নব পরিচয় অনুবন্ধ॥"—২৭ পৃষ্ঠা।

"দেখবি সখি শ্যাম চন্দ
ইন্দুবদনী রাধিকা।" —১২১ পৃষ্ঠা

'দেখিবে' অর্থ এ স্থলে সুসঙ্গত নহে; আমাদিগের দৃষ্ট তিনখানা হস্তলিখিত পুথিতে 'দেখ রি' পাঠ আছে। 'রি' ও বাঙ্গালা 'রে' সমার্থক; প্রভেদ এই যে, হিন্দীতে স্ত্রীলোকের সম্বোধনেই 'রি' ব্যবহৃত হয়; যথা,—

"ঐসে বরখা রিতুমে কৈসে রহুঁ একলি
বীতি রয়না দিন বিপদ ভেল ভারি
এ রি সখি রি।"—হিন্দী গীত।

পদাবলি-সাহিত্যের অন্যত্রও 'রি' দৃষ্ট হয়; যথা,—

"আলি রি হামরা তোহারি কিয়ে নহিয়ে।
যো তুয়া দুখে দুখায়ত শতগুণ
তাহারে কি বেদন না কহিয়ে॥"
—বিন্দু; প-ক-ত, ৭১ সংখ্যক পদ।

পুনশ্চ যথা,—

"গিরিবর নিকট খেলত শ্যামসুন্দর
ঘূর্ণিত নয়ন বিশাল।
নৌতুন তৃণ হেরিয়া যমুনাতট
চঞ্চল ধার গোপাল॥"—৩৬ পৃষ্ঠা।

বলা বাহুল্য যে, 'ধার' পাঠে কোনই অর্থ হয় না; আমাদিগের দৃষ্ট সকলগুলি পুথিতেই 'ধাব' পাঠ আছে; উহাতে অর্থ হইবে—"নূতন তৃণ দেখিয়া গোপাল অর্থাৎ ধেনুর পাল (শ্রীকৃষ্ণ নহে) চঞ্চল-ভাবে যমুনার তটে ধাবিত হইতেছে।"

পুনশ্চ যথা—

"তোমার অধর-রস পানে মোর আশ।
করজ লিখিয়া লহ মুই তুয়া দাস॥"—২২০ পৃষ্ঠা।
"এত পরিহারে কহিয়ে তোমারে
মনে না ভাবিহ আন।
করজ লিখিয়া লেহয়ে আমার
দাস করি অভিমান॥"—২২১ পৃষ্ঠা।

'করজ' শব্দটি মুসলমান-অধিকার সময়ে আরবী ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। উদ্ধৃত স্থলে কর্জ্জপত্র (Bond) লিখা অর্থ সংলগ্ন হয় না; দাস-পত্র অর্থাৎ দাসরূপে আত্ম-বিক্রয়ই পদকর্তার অভিপ্রেত অর্থ। আমাদিগের দৃষ্ট তিনখানা হস্তলিখিত পুথিতে 'কবজ' পাঠ আছে; আরবী 'কবজ' শব্দের অর্থ 'রসিদ'; শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের

দেশে বিক্রয় কবালার সঙ্গে একখানা 'কবজ' লিখিত হইত; তাহাতে কবালার লিখিত মূল্যের টাকা প্রাপ্ত হইয়া বিক্রেতা ক্রেতাকে বিক্রীত ভূমির দখল ত্যাগ করিলেন—এইরূপ 'এবারত' লিখা থাকিত; উদ্ধৃত উদাহরণে ঠিক সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে; সুতরাং এ স্থলে 'কবজ'ই প্রকৃত পাঠ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৩) 'ল' ও 'ন'-কারের গোলযোগ

প্রাচীন পুথির 'ল' ও 'ন'-অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। লিপিকরদিগের অপ্রনিধানে অনেক স্থলেই সেই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি রক্ষিত না হওয়ায় 'ল' ও 'ন' অক্ষরের গোলযোগ হেতু পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিয়াছে।

'ল' ও 'ন'-কারের গোলযোগের সর্ব্বপ্রধান দৃষ্টান্ত 'নেহ' ও 'লেহ' শব্দদ্বয়। সংস্কৃত 'স্নেহ' শব্দের অপভ্রংশ হইতে 'সিনেহ' ও 'নেহ' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। পদাবলি-সাহিত্যের হস্তলিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থে 'সুলেহ' ও 'লেহ' শব্দেরও বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতির পদাবলির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'সুলেহ' ও 'লেহ' শব্দ অশুদ্ধ বিবেচনায় সর্ব্বত্রই 'সিনেহ' ও 'নেহ' লিখিয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয়, 'সিনেহ' ও 'নেহ' রূপ দুইটিই প্রাচীনতর। সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থালয়ে রক্ষিত পদকল্পতরুর একখানা পুথিতে আমরা কোথায়ও 'লেহ' বা 'সুলেহ' শব্দ পাই নাই, উহাদিগের পরিবর্ত্তে 'নেহ' ও 'সুনেহ' পাইয়াছি। হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যেও 'নেহ' শব্দেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; সুতরাং 'ল' ও 'ন' অক্ষরের গোলযোগ হইতেই প্রথমে 'লেহ' ও 'সুলেহ' শব্দ দুইটির উৎপত্তি হইয়াছে—ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু ভাষা-তত্ত্বের আলোচনা করিলে এইরূপ ভ্রান্ত সাদৃশ্যের (false analogy) অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে শব্দ একবার ভাষায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ না হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব। 'করিলুঁ', 'গেলুঁ' ইত্যাদি রূপ 'করিনু', 'গেনু' ইত্যাদি রূপ অপেক্ষা অধিক প্রাচীন ও বিশুদ্ধ হইলেও 'করিনু', 'গেনু' শব্দগুলিকে এখন অশুদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করা যাইতে পারে না। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে 'লেহ' ও 'সুলেহ' শব্দ দুইটিকেও পাঠ-বিকৃতির উদাহরণস্বরূপ গণ্য করা অসঙ্গত বিবেচনায় আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে অন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি; যথা,—

"অলখিতে হৃদয়ক   অন্তর অপহর
পাশরিণ না হয় স্বপনে।"—২২ পৃষ্ঠা।

"পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ।
নীপ-নিকরে কিয়ে পূজন অনঙ্গ॥"—২৪ পৃষ্ঠা।

"জ্ঞানদাস কহে কান্নাই পাগুনি কর দূর।
চরণে পরাও তুমি কনয় নূপুর॥"—১০০ পৃষ্ঠা।

প্রথম উদাহরণের 'পাশরিণ' পাঠ অর্থ-শূন্য; উহার স্থলে 'পাসরিল' পাঠ হইবে;

'পাসরিল' শব্দের অর্থ 'পাসরণ' অর্থাৎ বিস্মরণের যোগ্য। যোগ্য অর্থে ও অতীত কালের 'ক্ত' প্রত্যয়ের অর্থে কৃদন্ত-বিভক্তি 'ইল'-প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ পদাবলি-সাহিত্যে অনেক আছে; যথা,—

"যে চিতে দড়াঞাছি সেই সে হয়।
খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়॥"—জ্ঞানদাস, ১১৭ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ ক্ষিপ্ত বাণ রক্ষণের যোগ্য নহে।

দ্বিতীয় উদাহরণের 'পূজন' স্থলে 'পূজল' পাঠই সমীচীন বটে; 'পূজল' শব্দের কর্তৃ-পদ 'তনু'; পংক্তিদ্বয়ের অর্থ এই যে,—"(শ্রীরাধার) দেহ (শ্রীকৃষ্ণের) পুনঃপ্রসঙ্গে রোমাঞ্চিত হইয়া রহিল; (ঐ তনু) কদম্ব-সমূহ দ্বারা কি (প্রেম-দেবতা) কন্দর্পকে (সন্তুষ্ট করার জন্য) পূজা করিল?"

তৃতীয় উদাহরণের পংক্তি-দ্বয়,—

"প্রাণনাথ কি বলিব তোরে।
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে॥ ধ্রু॥
তোমার পীত ধটী আমারে দেহ পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলাইয়া কবরী॥"

ইত্যাদি পদটির ভণিতা। শ্রীরাধার সখী-স্থানীয় পদ-কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—"ওহে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি (শ্রীরাধার) পাশুনি (?) দূর কর এবং চরণে স্বর্ণ-নূপুর পরিধান করাও।" রমণী বাবু 'পাশুনি' শব্দটি 'পিশুন' বা 'পৈশুন্য' শব্দের অপভ্রংশ মনে করিয়াই বোধ হয় লিখিয়াছেন—"পাশুনি—পাপ"। 'পাশুনি' শব্দের অস্তিত্ব ও উহার উল্লিখিত অর্থ তর্ক-স্থলে স্বীকার করিয়া লইলেও উহাতে যে এ স্থলে নিতান্ত হাস্য-জনক অর্থ হয়, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। বস্তুতঃ 'পাশুনি' শব্দই নাই; 'পাশুলি' শব্দই 'ল' ও 'ন' অক্ষরের গোলযোগ হেতু 'পাশুনি' লিখিত হইয়াছে। 'পাশুলি' স্ত্রীলোকের পরিধেয় পা-ঝাঁপ কিংবা ঐ জাতীয় কোন অলঙ্কার হইবে; জ্ঞানদাস শ্রীরাধার সম্পূর্ণ পুরুষীকরণ উদ্দেশ্যে তাঁহার 'পাশুলী' খসাইয়া উহার পরিবর্ত্তে পুরুষ-অলঙ্কার নূপুর পরিধান করাইবার জন্য সময়োচিত উপদেশ প্রদান করিয়া, কৌশলে একটু রসিকতা করিয়া লইয়াছেন; কেন না, নায়ক কর্ত্তৃক নায়িকার চরণ ধারণ নিতান্তই হাস্যকর ও সখীদিগের কৌতুক-জনক, সন্দেহ নাই।

(৪) 'জ' ও 'য'-কারের গোলযোগ

প্রাচীন পুথিতে 'য' অক্ষরের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ স্থলে 'জ' অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন স্থলে 'য়' অক্ষরটির পুঁটুলি লিপিকর-ভ্রমে পরিত্যক্ত হওয়ায় 'য়' অক্ষরটি প্রথমে 'য' অক্ষরে এবং পরে আবার কোন পণ্ডিতম্মন্য লিপিকর কর্ত্তৃক 'জ' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিষম গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। সেইরূপ অনেক স্থলে 'অ' ও 'আ' অক্ষরের পরিবর্ত্তে

'য়' ও 'য়া' অক্ষর ব্যবহৃত হওয়ায়, 'য়' ও 'য়া' অক্ষরের পুটুলি ভুলে পরিত্যক্ত হইয়া আগে 'য' ও 'যা' অক্ষরে এবং পরে উহাই 'জ' ও 'জা' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে ইহার দুইটি হাস্যজনক উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা ;—

"হামরা দুহুঁ জন পথে একু মেলি।
সুজান জন সঙ্গে করু আন খেলি॥"—২৮ পৃষ্ঠা।

"উচ্চণ্ড দেখিয়া বেলা　　ডাকিতে আইনু মোরা
যতেক গোকুলের রাখ জান।
একেলা মন্দির মাঝে　　আছ তুমি কোন কাজে
এ তোমার কেমন ঠাকুরাণ॥"—৩২ পৃষ্ঠা।

প্রথম উদাহরণের 'সুজান' পাঠ-স্থলে 'সো আন' পাঠ হইবে। 'সো আন' শব্দদ্বয় কোন পুথিতে 'সো য়ান' লিখিত হওয়ায় ও 'য়' অক্ষরের পুটুলিটি ভুলে পরিত্যক্ত হওয়ায় 'সো যান' শব্দই পরে কোন পণ্ডিতম্মন্য লিপিকর কর্ত্তৃক 'সুজান' শব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় উদাহরণে 'রাখ জান' কিংবা 'রাখজান' কোন পাঠেই অর্থ হয় না ; 'রাখয়াল' শব্দটির 'য়' অক্ষরের পুটুলি ভ্রমে পরিত্যক্ত হওয়ায় ও পরে 'য' অক্ষর 'জ' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এই আপাত-দুর্ব্বোধ্য পাঠ-বিকৃতির সৃষ্টি করিয়াছে। 'রাখয়াল' ও 'ঠাকুরাল' শব্দের অন্ত্য 'ল' অক্ষর 'ল' ও 'ন'-কারের গোলযোগে 'ন' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। 'ঠাকুরাণী' শব্দের অপভ্রংশ 'ঠাকুরাণ' শব্দ থাকিলেও, এ স্থলে উহা প্রযুক্ত হইতে পারে না ; এ স্থলের 'ঠাকুরাল' শব্দ 'ঠাকুরালি' শব্দেরই রূপান্তর এবং উহার অর্থ 'বড়মানষি'।

(৫) 'ও' ও 'তু' অক্ষরের গোলযোগ

অনেক প্রাচীন পুথিতেই 'ও' অক্ষর ও 'তু' অক্ষর দেখিতে একই প্রকার। সুতরাং উহাদিগের গোলযোগে যে পাঠ-বিভ্রাট ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেখুন,—

"উলট কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞানদাসের পহুঁ জিয়ে তুই অবলম্ব।"—৫৫ পৃষ্ঠা।

'তুই' পাঠে কোনই অর্থ হয় না। উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয় শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনাত্মক 'ঢল ঢল কসিত কাঞ্চন-তনু গোরী' ইত্যাদি পদের ভণিতা। জ্ঞানদাস অপূর্ব্ব রসিকতার সহিত বলিতেছেন,—"(শ্রীরাধার) উরু উল্‌টা কদলী-তরু (স্বরূপ) ও নিতম্ব বিশাল (অর্থাৎ ঘটের স্বরূপ) ; জ্ঞানদাসের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ (জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায়) উহা আশ্রয় করিয়া (ভব-সাগরে) বাঁচিয়া আছেন।" এ স্থলে 'ওই' শব্দ প্রাচীন পুথিতে 'তুই' শব্দের সমানাকার বলিয়া পরবর্ত্তী লিপিকর কর্ত্তৃক ভ্রমবশতঃ 'তুই' শব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

(৬) অন্যান্য অক্ষরের বিপর্য্যাস হেতু পাঠ-বিকৃতি

অন্যান্য অক্ষরের বিপর্য্যাস-বশতঃও অনেক স্থলে পাঠ-বিকৃতি দৃষ্ট হয়; আমরা নিম্নে উহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি,—

"এ সখি এ সখি দেখলু নারী।
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি॥"—২৯ পৃষ্ঠা।

'নায়িকার দর্শন-জনিত আনন্দে যুগ-চতুষ্টয়কে হরণ করিল'—এরূপ অর্থ যে নিতান্তই অসংলগ্ন, তাহা বলা বাহুল্য। এই পদটি পদকল্পতরু গ্রন্থে নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংগৃহীত "পদরত্নাকর" গ্রন্থে—"হেরইতে হরখে" ইত্যাদি স্থলে "হেরইতে হরখ রহল যুগ চারি॥" পাঠ আছে;—উহার অর্থ এই যে, "(নায়িকাকে) দেখিলে (সেই) হর্ষ যুগ-চতুষ্টয়-পরিমিত কাল স্থায়ী হইল।" (অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার দ্বারা হর্ষের প্রাবল্য ব্যঞ্জিত হইতেছে)।

পুনশ্চ সেই পদে—

"পরসে পুছলুঁ হাম তাকর নাম।
জ্ঞানদাস কহব রসিক সুজান॥"—২৯ পৃষ্ঠা।

এ স্থলে 'পরসে' শব্দের 'স্পর্শ করিয়া' অর্থ কোন রূপেই সংলগ্ন হয় না; 'পর সেঁ' পাঠ কল্পনা করিয়া 'অন্যের নিকট হইতে' অর্থ করিলে যদিও কিঞ্চিৎ সংলগ্ন হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানদাস প্রভৃতি বঙ্গীয় পদকর্ত্তাদিগের পদাবলীতে 'পর সেঁ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না; সেইরূপ অর্থ পদ-কর্ত্তার অভিপ্রেত হইলে তিনি 'পর সঞে' লিখিতেন। 'পর সঞে' পাঠ কোন পুথিতে নাই এবং কল্পনা করিলেও তদ্দ্বারা ছন্দোভঙ্গ ঘটে; সুতরাং 'পরসে' পাঠের পরিবর্ত্তে পদরত্নাকর গ্রন্থের 'পরখে' পাঠই সমীচীন বোধ হয়। 'পরখে' অর্থাৎ পরোক্ষে, কি না শ্রীরাধার অসমক্ষে আমি তাঁহার নাম (নিকটস্থ লোকদিগকে) জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহাই ঐ পংক্তির অর্থ। অপরিচিত কুল-কামিনীর নিকট নাম জিজ্ঞাসা কিংবা তাঁহার সমক্ষে অন্যের নিকট তাঁহার নাম-জিজ্ঞাসা—ইহার কোনটিই ভদ্রোচিত নহে; সে জন্যই—

"জ্ঞানদাস কহ রসিক সুজান॥"

অর্থাৎ জ্ঞানদাস তাহা দেখিয়া কহিতেছেন, (হে শ্রীকৃষ্ণ!) তুমি বিলক্ষণ রসিক ও সজ্জন বটে। পদ-রত্নাকরের 'জ্ঞানদাস কহ' পাঠই শুদ্ধ; কারণ, 'কহব' পাঠে ছন্দঃপতন ঘটে ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ প্রয়োগের কোন সার্থকতাও দেখা যায় না।

পুনশ্চ——

"ভুলিল চকোর চাঁদ জনু পাওল
মন্দিরে নাচয়ে ফেরি।"—৩৯ পৃষ্ঠা।

'ভুলিল' পাঠে ভাল অর্থ হয় না ; 'ভুখিল' অর্থাৎ ক্ষুধিত চকোর যেন চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইল, ইহাই সঙ্গত অর্থ বটে।

পুনশ্চ—

"সজনি ও কথা কথন নয়।
শ্যাম সুনাগর গুণের সাগর
পড়িনু কোলে ঘুমায় ॥ ধ্রু ॥—৮২ পৃষ্ঠা।

পদকল্পতরুর চারিখানা হস্তলিখিত পুথিতে 'কথন' স্থলে 'কহিল' এবং পদরত্নাকরে 'কথন' পাঠ আছে। 'কহিল নয়' অর্থাৎ 'কহিবার যোগ্য নয়'। পদরত্নাকরের 'কথন' পাঠ অপেক্ষা 'কহিল' পাঠই সমীচীন। 'কথন' শব্দের 'থ' অক্ষরটি সাদৃশ্যবশতঃ 'থ' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হইয়াই যে এই পাঠ-বিকৃতির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পুনশ্চ —

"বয়স কিশোর মোহন ঠাম
নিরখি মুরছি পতত কাম
সজল জলদ শ্যাম ধাম
পিঙল বসন দামিনী।"—১২৬ পৃষ্ঠা।

আমাদিগের দৃষ্ট সকল পুথিতেই 'পতত' স্থলে 'পড়ত' পাঠ আছে ; উহাই সঙ্গত পাঠ। কারণ, হিন্দী, মৈথিল কিম্বা বাঙ্গালা পদাবলি-সাহিত্যে 'পত' ধাতুর অপভ্রংশ-জাত 'পড়ই', 'পড়ত', 'পড়ল' ইত্যাদি পদেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, 'পতই', 'পতত', 'পতল' ইত্যাদি প্রয়োগ কোথাও পাওয়া যায় না।

'পিঙল বসন দামিনী' বাক্যের 'পিঙল' পাঠ বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থে ও উহার আদর্শ পুথিতে পাওয়া গেলেও উহা সমর্থনযোগ্য নহে। 'পিঙল' শব্দে পীত-বর্ণ বুঝায় না, সুতরাং উহা শ্রীকৃষ্ণের তড়িদ্বর্ণ পীত বসনের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না। চণ্ডীদাসের 'পরাণনাথকে সপনে দেখিনু' ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদের—

'পিয়ল বরণ বসনখানিতে
মুখানি আমার মোছে।'

বাক্যের ন্যায় এ স্থলেও তিনখানা প্রাচীন পুথিতেই 'পিয়ল' পাঠ আছে ; 'পীত' শব্দ হইতেই অপভ্রংশ 'পিয়ল' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ; ইহার অন্ত্য 'ল' অক্ষরটি 'শ্যামল', 'পিঙ্গল' প্রভৃতি লকারান্ত শব্দের ভ্রান্ত-সাদৃশ্য হইতে জাত বলিয়াই বিবেচনা হয়।

পুনশ্চ—

"যে মোর করমে লিখন আছিল
বিহি ঘটাওল মোরে।
তোমরা কুলবতী দেখিনু চুকতি
কুল লৈয়া থাক ঘরে ॥"—১৭৩ পৃষ্ঠা।

'দেখিনু চুকতি' বাক্যের 'চুকতি' পাঠে এখানে কোনই অর্থ হয় না; বটতলার মুদ্রিত পুস্তকে ও উহার আদর্শ পুথিতে 'দেখিনু মুকতি', "পদরসসার" পুথিতে 'দেখিলে মুকতি' পদরত্নাকর ও পদকল্পতরুর অন্যতম পুথিতে 'দেখিলে মুরতি' এবং অন্য দুইখানা পুথিতে 'দেখিলে কুমতি' পাঠ আছে। শেষোক্ত পাঠের অর্থ—'কুলবতী তোমরা আমার কুবুদ্ধি দেখিলে; (সুতরাং সতর্ক হও) কুল রক্ষা করিয়া গৃহে থাক।' 'তোমরা কুলবতী, তোমাদিগকে দেখিলে মুক্তি হয়', এইরূপ অর্থ করিলে তীব্র বিদ্রূপ প্রকাশ পায়,—প্রিয়-সখীদিগের প্রতি সেইরূপ বিদ্রূপোক্তি করার কোন কারণ দেখা যায় না।

পুনশ্চ—

"রস নবলেশ দেখায়লি গোরী।
পায়লি রতন পুন লেয়লি ছোড়ি॥"—২১৭ পৃষ্ঠা।

'ছোড়ি' পাঠ সম্পূর্ণ নিরর্থক। 'ছোড়ি' স্থলে শুদ্ধ পাঠ 'চোরি' হইবে। ইহার প্রায় সদৃশ ভাব গোবিন্দদাসের একটি পদে দৃষ্ট হয়; যথা,—

"হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি।
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি॥"
প-ক-ত, ৫২ সংখ্যক পদ।

পুনশ্চ—

"হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ।
নলিনী বিছায়ত কণ্টক-শেজ॥"—২৩৫ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'উগ' একটি পৃথক্ শব্দ মনে করিয়া উহার অর্থ লিখিয়াছেন 'উগ্র'। বস্তুতঃ 'উগ্র' অর্থে 'উগ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না; ঐরূপ শব্দ বা অর্থ থাকিলেও 'হতে' শব্দটিকে 'হৈতে' কল্পনা করিয়া 'হিমকর দিনকর-তেজ হইতে উগ্র' এরূপ দূরান্বয় ও দুরন্বয় না করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। আমাদিগের দৃষ্ট সকল পুথিতেই 'উগইতে' পাঠ আছে; 'উগইতে' শব্দের অর্থ এখানে 'উদিত হইলে'; সুতরাং 'হিমকর উগইতে' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—'চন্দ্র উদিত হইলে সূর্য্যের তেজ (বিস্তার করে) অর্থাৎ শ্রীরাধার বিরহ-জনিত সন্তাপ হেতু শীতরশ্মি চন্দ্রও উষ্ণ-রশ্মি সূর্য্যের ন্যায় অসহ্য বোধ হয়।'

এইরূপ অক্ষর-বিপর্য্যাস-জনিত পাঠ-বিকৃতির উদাহরণ আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলীতে আরও কয়েকটি প্রাপ্ত হইয়াছি;—বাহুল্য-ভয়ে তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

২য়। অক্ষর-চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতি

নানা কারণেই অক্ষর-চ্যুতি ঘটিতে পারে; একই অক্ষর কোন শব্দে পাশাপাশি ভাবে একাধিক বার প্রযুক্ত হইলে, লিপিকর-ভ্রমে দুই একটি পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক বটে। আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে অক্ষরচ্যুতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি;—

"অপরূপ পবনে সঘন তনু দোলত
গগন সহিত দ্বিজরাজ।
চঞ্চল চরণ- কমল মণি নূপুর
শবদ মঙ্গল পুর॥"—৭৩ পৃষ্ঠা।

পদকল্পতরুর সকল পুথিতেই 'শবদ' স্থলে 'সশবদ' পাঠ আছে; তবে কোন কোন পুথিতে প্রাচীন রীতি অনুসারে উহা 'সসবদ' লিখিত হইয়াছে। এই 'সসবদ' শব্দে 'স' অক্ষরটি পাশাপাশি ভাবে দুইবার প্রযুক্ত হওয়ায় উহা ভ্রম-জনিত বিবেচনা করিয়া নিরক্ষর ছন্দোজ্ঞান-হীন লিপিকর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় ও তৎপরে পণ্ডিতম্মন্য কোন লিপিকর কর্ত্তৃক 'সবদ' 'শবদ'রূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ায়ই এই পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিয়াছে। অক্ষর-চ্যুতিতে প্রায়শই অর্থের অসঙ্গতি ও ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়া থাকে; সুতরাং অর্থ-বিচার ও ছন্দোবিজ্ঞানই এই শ্রেণীর পাঠ-বিকৃতি নির্ণয়ের প্রধান উপায়। অর্থ ও ছন্দোবিচার দ্বারা বর্ণ-চ্যুতি অনুমিত হইলে যদি কোন প্রাচীন পুথির পাঠের দ্বারা অর্থ ও ছন্দের অসঙ্গতি বিদূরিত হয়, তাহা হইলে উহাই যে প্রকৃত পাঠ, তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। উদ্ধৃত উদাহরণে 'সশবদ' পাঠ গ্রহণ না করিলে অর্থের অসঙ্গতি ও ছন্দোদোষ নিবারিত হয় না, সুতরাং উহাই শুদ্ধ পাঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা,—

"একসরি যাইতে যমুনা-তীর।
অলখিতে আওল শ্যাম-শরীর॥
অম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস।
কত বেরি হেরি হেরি মৃদু মৃদু হাস॥"—৯২ পৃষ্ঠা।

এ স্থলে 'অম্বরে অর্থাৎ বস্ত্রে আমার অঙ্গ উদাস অর্থাৎ উন্মুক্ত ছিল'—এই বাক্যটি বিরুদ্ধার্থ বলিয়াই বিবেচনা হয়; পদকল্পতরুর দুইখানা পুথিতে 'অসম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস' পাঠ আছে। পদাবলি-সাহিত্যে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বের অক্ষর বিবক্ষা (Option) বশতঃ কখনও গুরু, কখনও লঘু হয়, সুতরাং এ স্থলে 'অম্বরে' ও 'অসম্বরে' উভয় পাঠেই ছন্দ বজায় থাকে। সুতরাং কেবল অর্থের অসঙ্গতি দর্শনেই অম্বরে পাঠের পরিবর্ত্তে 'অসম্বরে' পাঠ স্বীকার করিতে হইবে। ইহা বর্ণ-বিপর্য্যাস ও বর্ণচ্যুতি উভয়বিধ কারণ-জনিত পাঠ-বিকৃতির দৃষ্টান্ত বটে।

পুনশ্চ—

"বীণ রবাব মুরজ পিনাস।
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥"—১১৫ পৃষ্ঠা।

'পিনাস' শব্দটির সহিত একটা সাহিত্যিক বাগ্‌যুদ্ধের ইতিহাস বিজড়িত রহিয়াছে; তাহা না বলিলে চলিতেছে না। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক স্বর্গীয় জগবন্ধু বাবুর কিংবা শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু কিংবা শ্রীযুক্ত সারদা বাবু—ইহাঁদিগের মধ্যে কে, আমাদিগের ঠিক স্মরণ নাই, বিদ্যাপতির "ঋতুপতি রাতি রসিকবর রাজ।" ইত্যাদি সানুপ্রাস পদের—

"রটতি রবাব মহতী কপিনাশ।
রাধারমণ করু মুরলী বিলাস ॥"

পংক্তি-দ্বয়ের টীকা করিতে যাইয়া 'মহতী' ও 'কপিনাশ' পৃথক্ শব্দ স্থির করিয়া 'কপিনাশ' শব্দের অর্থ 'এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র' লিখায়, স্বর্গীয় কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার বিদ্যাপতির সংস্করণে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন,—"কপিনাশ নামে কোন বাদ্যযন্ত্র আছে, ইহা কেবল আধুনিক কোন প্রভুর টীকাতেই দেখিলাম। অন্য কোথাও শুনি নাই!" কাব্যবিশারদ মহাশয়ের এই উক্তির কেহ প্রতিবাদ করিয়াছেন কি না, জানি না; বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু কাব্যবিশারদ মহাশয়ের বহু পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতির সুমীমাংসা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও নিঃসন্দেহে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ধৃত—"রটতি রবাব মহতীক পিনাশ" পাঠ এবং তাঁহার প্রতিপাদিত 'মহতীক', 'পিনাশ' বা 'পিনাক' শব্দের বাদ্যযন্ত্র অর্থই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; তবে 'মহতীক' পাঠে ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য্য বলিয়া তিনি 'মহতীক' স্থলে 'মহতিক' পাঠ গ্রহণ করিয়া 'মহতিক'—'মহতী (নারদ-বীণা) বৃহৎ বীণা' অর্থ লিখিয়াছেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার উক্তির পোষকতায় জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে ছন্দোভঙ্গ-দোষ-দুষ্ট "বীণ রবাব মুরজ পিনাস" ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'বীণ রবাব মুরজ পিনাস" পংক্তিতে যে একমাত্রাত্মক একটি অক্ষরের অভাব অনুভূত হয়, উহা ছন্দোবিৎ পাঠকবর্গকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না; আমরা ছন্দোভঙ্গের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলাম যে, বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থ ও উহার আদর্শ পুথি ব্যতীত আর সকল পুথিতেই 'বীণ রবাব মুরজ কপিনাস' পাঠ আছে; এই পাঠে ছন্দ বজায় থাকে এবং 'পিনাস' বলিয়া যে শব্দ নাই, 'কপিনাশ'ই প্রকৃত শব্দ, তাহাও প্রমাণিত করে; কেন না, 'মহতী' শব্দের স্থলে গায়ের জোরে 'মহতীক' পাঠ কল্পনা করিলেও 'মুরজ' এই সুপ্রচলিত শব্দের স্থলে 'মুরজক' শব্দ কল্পনা করা বাতুলের পক্ষেও অসম্ভব; সুতরাং নিরপেক্ষ সমালোচক যে 'রটতি রবাব মহতি কপিনাশ' এবং 'বীণ রবাব মুরজ কপিনাশ' শুদ্ধ পাঠ বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন,—ইহা বলাই বাহুল্য। 'পিনাক' বা 'পিনাস' (?) বাদ্যযন্ত্র যেরূপ অপ্রচলিত,—'কপিনাস'ও সেরূপ অপ্রচলিত বটে,—সুতরাং এরূপ বাদ্যযন্ত্রের নাম শুনি নাই—এইরূপ আপত্তি উভয় পক্ষেই সমান প্রযোজ্য। জ্ঞানদাসের পদেই 'কপিনাস' ও 'পিনাক' যন্ত্রের একত্র প্রয়োগ আছে; যথা,—

"বিণা কপিনাস পিনাক ভাল
সপ্ত স্বর বাজত তাল
এ সর-মণ্ডল মন্দিরা ডম্ফ
মেলি কতহু গায়নী।"—প-ক ত, ১২৭৮ সংখ্যক পদ।

এ স্থলে 'কপিনাস' ও 'পিনাক' যে পৃথক্ বাদ্যযন্ত্র—তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; কোন সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তি 'মহীতক' ও 'মুরজক' শব্দের ন্যায় যদি 'বিণাক' শব্দেও 'বীণা' বুঝেন, তাহা হইলে 'পিনাস' ও 'পিনাক' একই বাদ্যযন্ত্রের কি জন্য যে পুনরুক্তি হইয়াছে, তজ্জন্য আরও যে কত সূক্ষ্ম কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে, তাহা স্থূলবুদ্ধি আমাদিগের চিন্তার অগম্য। রমণী বাবুর সংস্করণে উদ্ধৃত কলিটি এইরূপ লিখিত হইয়াছে; যথা,—

"বিশাল পিনাক ভাল
সপ্ত স্বর বাজত তাল
এ সব রস-মণ্ডল
মন্দিরা ডম্বু কেলি কতহুঁ গায়নী।"—১২৬ পৃষ্ঠা।

এই পাঠে অক্ষর-বিপর্য্যাস, অক্ষর-চ্যুতি ও শব্দচ্যুতি-জনতি অর্থ ও ছন্দের অসঙ্গতি অনিবার্য্য; সুতরাং পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পাঠই সমীচীন বটে। পদাবলী-সাহিত্যে 'পিনাক' নামক যন্ত্রেরই প্রয়োগ আছে; 'পিনাস' বা 'পিনাশ' বলিয়া কোন শব্দ নাই।

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা,—

"সখি মোর নব অনুরাগে।
পরবশ জীউ না রবে পুনভাগে॥"—১৬৪ পৃষ্ঠা।

'পরবশ জীউ না' ইত্যাদি বাক্য অর্থ-শূন্য। পদকল্পতরুর তিনখানা পুঁথিতে 'পরবশ জিউ না উবরে পুন ভাগে' ও একখানা পুঁথিতে 'উবরে' স্থলে 'উরবে' পাঠ আছে; 'উরবে' পাঠের 'উ' অক্ষরটি লিপিকর-দোষে পরিত্যক্ত হওয়াতেই 'পরবশ জীউ না রবে' ইত্যাদি পাঠ-বিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়াছে। পুঁথিগুলিতে 'জীউ' পাঠই আছে, কিন্তু 'পরবশ জীউ না রবে পুনভাগে' লিখিলে ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য্য হয় বলিয়া 'জীউ' স্থলে 'জিউ' পাঠ কল্পিত হইয়াছে। 'উবর' ধাতুর অর্থ মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্দ-কোষে—"উবর... ধাতু, (সং উদ্বৃত্ত ধাতু। হিং উবর, ওং মং ওহল ধাতু) উবরি—উদ্বৃত্ত হই; প্রঃ—প্রসাদ উবরিল খায় সহস্রেক জন (চৈঃ চঃ)। (অপ্রচঃ)" লিখিত হইয়াছে। 'না উবরে' বাক্যের অর্থ 'উদ্বৃত্ত হয় না' অর্থাৎ 'বিচ্ছিন্ন না হইয়া, কণ্ঠায় কণ্ঠায় পূর্ণ হইয়া থাকে'—এইরূপ অর্থ করিলে 'পরবশ জিউ না উবরে পুনভাগে' এই দুরূহ পংক্তির অর্থ বেশ সংলগ্ন হয়। শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন যে, নব অনুরাগ হেতু কৃষ্ণ-প্রেমের বশীভূত তাঁহার প্রাণ পুণ্য-ভাগ্য হেতু (কৃষ্ণ-প্রেম হইতে) বিচ্ছিন্ন না হইয়া (উহাতেই) পরিপূর্ণ রহিয়াছে। 'আঁখে

রৈয়া আঁখে নহে সদা রহে চিতে। সে রস নিরস নহে জাগিতে ঘুমিতে॥' ইত্যাদি পরবর্ত্তী কলিগুলি দ্বারাও এইরূপ অর্থই সমর্থিত হয়।

৩য়। শব্দ-চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতি

নানা কারণেই শব্দ-চ্যুতি ঘটিতে পারে। প্রাচীন পুথিতে একটি শব্দের পাশাপাশি স্থলে পুনরুক্তি হইলে, সেই শব্দটি বারংবার না লিখিয়া, পুনরুক্তি-জ্ঞাপক ২, ৩ প্রভৃতি অক্ষর ব্যবহৃত হইত। এরূপ স্থলে সেই সাঙ্কেতিক অঙ্ক-চিহ্নটি লিপিকর-ভ্রমে পরিত্যক্ত হইলে যে শব্দচ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিবে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। এইরূপ বিকৃতি দ্বারা ছন্দের মধ্যে একটা ফাঁক পড়িয়া যায় বলিয়া শব্দচ্যুতি সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত যথা—

"গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে রহু আরতি অনেক॥"—৭০ পৃষ্ঠা।

এখানে যে 'বয়ান' শব্দের পূর্ব্বে বা পরে একটি শব্দ পড়িয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ-মাত্রেই প্রতীত হয়; 'গলে গলে', 'হিয়ে হিয়ে' বাক্যগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে 'বয়ানে' স্থলেও যে 'বয়ানে বয়ানে' প্রকৃত পাঠ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। হস্তলিখিত পুথিতেও তাহাই পাওয়া যাইতেছে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, অক্ষর-চ্যুতির দৃষ্টান্ত অপেক্ষা শব্দ-চ্যুতির দৃষ্টান্ত খুব বিরল। জমা-খরচ-লিখক মুহুরীদিগের পক্ষে প্রযোজ্য "হাজারে বেজার নহি শতে করি ভয়। ঈশ্বর না করে যেন দশ পাঁচ হয়॥" (অর্থাৎ ঠিকে হাজারের অঙ্ক ভুল হইলে ভয় করি না—শতের অঙ্ক ভুল হইলে অল্প ভয় করি, ঈশ্বর না করুন, যেন দশক কিম্বা এককের অঙ্ক ভুল না হয়—কেন না, সেই ভুল বাহির করা কঠিন)। এই উক্তিটি নকলনবিশদিগের পক্ষেও প্রযোজ্য বটে। একটি পংক্তি পড়িয়া গেলে তাহা সহজেই ধরা যায়,—একটি শব্দ পড়িলে তাহা ধরা তদপেক্ষা অনেক কঠিন; একটি অক্ষর পড়িয়া গেলে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা নিতান্তই কঠিন কার্য্য, সুতরাং এ অবস্থায় শব্দচ্যুতি অপেক্ষা অক্ষর-চ্যুতির দৃষ্টান্ত যে অনেক বেশী পাওয়া যাইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

৪র্থ। অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগ-জনিত পাঠ-বিকৃতি

অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগ স্থলে প্রায়শঃই লিপিকর-প্রমাদবশতঃ একই শব্দের পুনরুক্তি দৃষ্ট হয়; ছন্দঃপতন ও অর্থের অসঙ্গতি দর্শনে সহজেই এই জাতীয় পাঠ-বিকৃতি নির্ণীত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত যথা,—

"রাধা মাধব রতি-রস কেলি।
বিদগধ নাগর নাগর বৈদগধি মেলি॥"—৭৪ পৃষ্ঠা।

বলা বাহুল্য যে, দ্বিতীয় পংক্তিতে লিপিকর-প্রমাদবশতঃ একটি 'নাগর' শব্দ পুনরুক্ত হওয়ায় ছন্দঃপতন ও অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে।

অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগের আর একটি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বোদ্ধৃত—

"এ সব রস মণ্ডল

মন্দিরা ডম্বু কেলি কতহুঁ গায়নী।"

পংক্তিদ্বয়ে দৃষ্ট হইবে; উহাতে 'রস' শব্দটি অতিরিক্ত লিখিত হইয়াছে; উহার 'সব' শব্দটি 'ব' ও 'র' অক্ষরের বিনিময়ের উদাহরণ বটে; শুদ্ধ পাঠ যে 'এ সর মণ্ডল' হইবে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

৫ম। পদচ্ছেদের অভাব কিংবা অপব্যবহার-জনিত পাঠ-বিকৃতি

পাঠ-বিকৃতির কারণ-সমূহের মধ্যে এই কারণটি সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র ও কৌতুক-জনক। প্রাচীন পুথিতে অনেক সময়েই পৃথক্ পৃথক্ শব্দের মধ্যেও ফাঁক দেওয়া হইত না; অনেক হিন্দী মুদ্রিত পুস্তকেও এই অদ্ভুত প্রথা দেখা যায়; এরূপ স্থলে পরবর্ত্তী লিপিকর সদিচ্ছা হেতু শব্দগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া লিখিতে যাইয়া, অনেক সময়েই যে ভ্রমবশতঃ শব্দগুলিকে মিশাইয়া ফেলিয়া, তাহা হইতে অনেক অশ্রুত-পূর্ব্ব অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি করিয়া বসিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ১৩১৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় "প্রাচীন পদাবলীর পাঠ-ভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে এই জাতীয় পাঠ-বিকৃতির কয়েকটি কৌতুকাবহ উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি। এখানে জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে সেইরূপ কয়েকটি উদাহরণ দেখাইব।

শ্রীরাধার বাল্য-লীলার একটি পদে মাতা কীর্ত্তিদা বালিকা রাধাকে বলিতেছেন,—

"বিহান হইতে　　কাহার বাটীতে

কোথা গিয়াছিলা বল।

এ ক্ষীর মোদক　　চিনীক দলক

কে তোরে আঁচরে দেল॥"—৫৯ পৃষ্ঠা।

শ্রীরাধা উত্তরে বলিতেছেন,—এক অপরিচিতা গোয়ালিনী আমাকে পথ হইতে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইয়া, নানারূপ আদর-যত্ন করিয়া—

"তবে মোর গোরা　　গাখানি মাজিয়া

নাস বেশ বনাইয়া।

হরষিত মোরে　　পাঠাইয়া দেল

এ সব আঁচরে দিয়া॥"—৬১ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'এ সব' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"চিনীর দলক ইত্যাদি।" সংস্কৃত 'দলি' শব্দ হইতে পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় প্রচলিত 'দলা' ও পশ্চিম-বাঙ্গালার 'ডেলা' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে; এই অর্থে সংস্কৃত কিংবা ভাষা-সাহিত্যে 'দলক' শব্দের ব্যবহার নাই; কিন্তু রমণী বাবু কিংবা তাঁহার আদর্শ পুথির লিপিকর 'কদলক' (কলা) শব্দের আদ্য 'ক' অক্ষরটিকে ষষ্ঠী বিভক্তির

চিহ্ন মনে করিয়া, 'চিনী কদলক' অর্থাৎ চিনী ও কলা না বুঝিয়া "চিনীর দলক" বুঝিয়াছেন। জ্ঞানদাসের এই খাঁটি বাঙ্গালা পদটিতে কোথাও ষষ্ঠী বিভক্তি-সূচক 'ক' দেখা যায় না; তার পরে 'ডেলা' অর্থে 'দলক' শব্দই নাই; সুতরাং 'চিনি কদলক'ই যে বিশুদ্ধ পাঠ ও স্বাভাবিক বর্ণনা, তাহাতে বোধ হয়, কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা,—

"কানুক রীত ভীত মঝু চিতহিঁ
না জানি কি হয়ে পরিণামে।
ঐছন পিরীতিক রস নাহি হোয়ত
যৈছন কি রস মানে॥"—২০৬ পৃষ্ঠা।

এটি মানিনী শ্রীরাধার সখীর প্রতি উক্তি। রমণী বাবুর গৃহীত পাঠে চতুর্থ পংক্তির কোনই অর্থ হয় না; তিনি অর্থ করার জন্য চেষ্টাও করেন নাই। পদকল্পতরুর হস্তলিখিত পুথিতে উদ্ধৃত পংক্তিগুলির স্থলে নিম্নলিখিত পাঠ আছে; যথা,—

"কানুক রীত ভীত মঝু চীতহিঁ
না জানি কি হয়ে পরিণামে।
ঐছন পিরিতক বশ নাহি হোয়ত
যৈছন কীর সমানে॥"

অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণের রীতি দেখিয়া আমার চিত্তে ভীতি হইতেছে; না জানি, পরিণামে কি হয়! এইরূপ (লোক) প্রেমের বশ হয় না—যেমন টিয়া পাখীর ন্যায়। কোন কোন প্রাচীন পুথিতে 'বশ' স্থলে 'বস' লিখিত হইয়াছে, সুতরাং 'ব' ও 'র' অক্ষরের গোলযোগে উহা 'রস' পঠিত হওয়া বিচিত্র নহে—কিন্তু 'যৈছন কীর সমানে' পংক্তিটির দুইটি শব্দ ভাঙ্গিয়া তিনটি করিয়া 'যৈছন কি রস মানে' বাক্যের ন্যায় একটি হেঁয়ালির সৃষ্টি করা যে নিতান্ত কৌতুকজনক, তাহা বলা বাহুল্য।

পুনশ্চ—

"জীবন যৌবন সফল করি মানসি
কানু হেন বিদগধ নাহ।
জ্ঞানদাস কহে কতিহুঁ না শুনিয়ে
পিরিতি কহই নিরবাহ॥"—২০৪ পৃষ্ঠা।

উদ্ধৃত পাঠে 'পিরিতি নির্ব্বাহ কহিতেছে' এইরূপ অদ্ভুত অর্থ ছাড়া চতুর্থ পংক্তির কোন অর্থ হয় না। প্রকৃত পাঠ,—

"জ্ঞানদাস কহে কতিহুঁ না শুনিয়ে
পিরিতিক ইহ নিরবাহ॥"

অর্থাৎ জ্ঞানদাস কহিতেছেন,—পিরিতির এই নির্ব্বাহ অর্থাৎ অবসান কোথাও শুনি

নাই। পদকল্পতরুর চারিখানা পুথি ও পদ-রত্নাকর পুথিতে শেষোক্ত বিশুদ্ধ পাঠই আছে; সুতরাং 'পিরিতি কহই নিরবাহ' পাঠ যে অসঙ্গত পদচ্ছেদ ও অক্ষর-বিপর্য্যাসের সম্মিলিত উদাহরণ, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না!

পূর্ব্বোদ্ধৃত 'হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ' পংক্তিটিও এইরূপ অসঙ্গত পদচ্ছেদ ও অক্ষর-বিপর্য্যাসের উদাহরণ বটে।

আমরা বাহুল্য ভয়ে ভ্রান্ত পদচ্ছেদের আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব।

মানিনী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

"শুন শুন মাধব না বোলহ আর।
কি ফল আছয়ে এত পরিহার॥
পাওল তুয়া সঞে প্রেমক মূল।
খোয়লু সরবস নিরমল কুল॥
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ।
দূরে কর কৈতব ভ্রমরতি আশ॥"—২২৪ পৃষ্ঠা।

'ভ্রমরতি আশ' যে কীদৃশ পদার্থ, তাহা রমণী বাবু লিখেন নাই, আমাদিগেরও বোধগম্য হয় নাই। পদকল্পতরুর একখানা প্রাচীন পুথিতে আমরা 'ভ্রমরতি আশ' অংশের পরিবর্ত্তে 'ভ্রমর তিয়াস' ও অন্য একখানা পুথিতে 'ভ্রম তিয়াস' পাঠ পাইয়াছি। 'ভ্রম তিয়াস' পাঠে ছন্দঃপতন দ্বারা একটি অক্ষরের চ্যুতি সহজেই অনুমিত হয়; সুতরাং 'ভ্রমর তিয়াষ' বা 'ভ্রমর তিয়াস'ই যে শব্দ, তাহা একরূপ নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। মূর্দ্ধণ্য 'ষ' যে স্থলে 'খ' লিখিত না হয়, সেরূপ স্থলে উহার পরিবর্ত্তে অনেক প্রাচীন পুথিতেই 'স' ব্যবহৃত দেখা যায়; সুতরাং 'তিয়াষ' ও 'তিয়াস' যে একই 'তৃষা' শব্দের রূপান্তর, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভ্রমরের ন্যায় তৃষ্ণা যার—এইরূপ বহুব্রীহি-সমাস দ্বারা 'ভ্রমর-তৃষ্ণ' ও তাহার অপভ্রংশ 'ভ্রমর-তিয়াষ' শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে; উহাতে অর্থও সুসঙ্গত হয়। সুতরাং আমরা 'ভ্রমরতি আশ' পাঠটিকেও ভ্রান্ত পদচ্ছেদ ও 'শ' ও 'স'-কারের গোলযোগজনিত পাঠ-বিকৃতির উদাহরণ বলিয়াই বিবেচনা করি।

৬ষ্ঠ। ভণিতার গোলযোগ-জনিত পাঠ-বিকৃতি

ভণিতা-পরিবর্ত্তনের কয়েকটি স্বাভাবিক কারণ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বোক্ত "প্রাচীন পদাবলীর পাঠ-ভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি; অতএব এ স্থলে উহার পুনরুক্তি করা অনাবশ্যক। কেবল রচনা-দর্শনে কোন একটি পদ জ্ঞানদাসের রচিত কিংবা অন্য কোন কবির রচিত, তাহা স্থির করা বিশেষজ্ঞের পক্ষেও সহজসাধ্য নহে।

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।

ইত্যাদি জ্ঞানদাসের সুবিখ্যাত পদে কোন কোন প্রাচীন পুথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে। পদটি যে চণ্ডীদাসের অযোগ্য নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে; সুতরাং এরূপ স্থলে ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত সত্য-নির্দ্ধারণের অন্য উপায় নাই। জ্ঞানদাসের আরও কয়েকটি পদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। আমরা রমণী বাবুর জ্ঞান-দাস হইতে কয়েকটি উদাহরণ দেখাইব।

রমণী বাবুর উদ্ধৃত 'করে কর মোড়ি মিনতি করু মো সঞে' ইত্যাদি (২০৮ পৃষ্ঠার) ব্রজ-বুলি পদটি পদকল্পতরু ও পদরসসার পুথিগুলিতে ঘনশ্যামের ভণিতাযুক্ত দেখা যায়। এ স্থলেও রচনা-দর্শনে সত্য নির্দ্ধারণ সুসাধ্য নহে। রমণী বাবুর ২০৯ পৃষ্ঠার "মানিনি হাম কহিয়ে তুয়া লাগি" ইত্যাদি ব্রজ-বুলি পদটিতে পদকল্পতরু গ্রন্থে কোন ভণিতা নাই; পদ-রত্নাকর গ্রন্থে বলরামের ভণিতা আছে। রমণীবাবুর সংস্করণে জ্ঞানদাসের ভণিতাটি যে ভাবে সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে উহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা স্থির করিতে অধিক বিলম্ব হয় না; এই পদটির প্রথমাংশে শ্রীরাধা অকারণে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করায় সখী তাঁহাকে নানা-রূপ প্রবোধ দিতেছেন,—ইহাই বর্ণিত হইয়াছে; পদকল্পতরুর অন্তিম কলিটি এই—

"তুহুঁ ধনি গুণবতি বুঝি করহ রীতি
পরিজন ঐছন ভাব।
শুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদ গদ
অনুমতি করল প্রকাশ॥"—৫২০ সংখ্যক পদ।

এখন শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুনর্ম্মিলনের অনুমতি আভাসে প্রকাশ করিলেন বলিয়াই যে পদ-কর্ত্তা এক নিশ্বাসে মিলন করাইয়া ছাড়িবেন, ইহা স্বাভাবিক বোধ হয় না; রমণী বাবুর জ্ঞানদাস কিন্তু তাহাই করিয়াছেন। উদ্ধৃত কলির পরেই তিনি লিখিতেছেন,—

"জ্ঞানদাস কহে সুন্দরী সুন্দর
মিলহি কুঞ্জক মাঝ।
হের নয়ন মোর সফল কর তুঁ
যুগল পরমহি সাজ॥"

এই ভণিতার ভাব কিংবা ভাষা যে জ্ঞানদাসের উপযুক্ত নহে, বিশেষজ্ঞ না হইলেও তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি। পক্ষান্তরে পদরত্নাকরের ভণিতাটি কিরূপ কৌশলপূর্ণ দেখুন,—

"তুহুঁ ধনি গুণবতি বুঝি করহ রীতি
ঐছন বলরাম-ভাষ।
শুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদগদ
অনুমতি করল প্রকাশ॥"

পদকর্ত্তারা সখী-ভাবেই লীলা দর্শন ও লীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং সখীর

মুখের শেষ কথাটি কাড়িয়া লইয়া পদ-কর্ত্তা নিজের নাম দিয়া উহা বলায় দোষের কারণ না হইয়া সুকৌশলে কবির লীলা-তন্ময়তাই প্রকাশ করিতেছে। এই পদটির অন্য কোন রচয়িতা ঐতিহাসিক প্রমাণে স্থিরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত উল্লিখিত কারণে আমরা উহা বলরাম-দাসের রচিত বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইব।

রমণী বাবুর উদ্ধৃত ২১১ পৃষ্ঠার "শুন শুন সুন্দরি আর কত সাধসি মান" ইত্যাদি পদটিতে পদকল্পতরু ও পদরত্নাকর পুথিগুলিতে জ্ঞানদাসের পরিবর্ত্তে গোবিন্দদাসের ভণিতা আছে। রমণী বাবুর উদ্ধৃত পাঠেও অনেক অনৈক্য দেখা যায়। রমণী বাবুর ধৃত পাঠের মূল কি, প্রকাশ নাই। সুতরাং পদকল্পতরু ও পদরত্নাকরের প্রমাণ অনুসারে এই পদটি গোবিন্দদাসের রচিত বলিয়াই অনুমান করা সঙ্গত বিবেচনা করি।

রমণী বাবুর উদ্ধৃত ২৩৪ পৃষ্ঠার "ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটিতে পদকল্পতরু ও পদরত্নাকর গ্রন্থে বিদ্যাপতির ভণিতা আছে; বিদ্যাপতির সকল সংস্করণেই উহা বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্তর্গত করা হইয়াছে; এই পদের রচনার সহিত বিদ্যাপতির রচনার যেরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়, জ্ঞানদাসের রচনার সহিত সেরূপ সাদৃশ্য নাই; সুতরাং ইহা বিদ্যাপতির পদ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

৭ম। একাধিক কারণে পাঠ-বিকৃতি

একই স্থলে একাধিক কারণ কার্য্যকর হইয়া কিরূপে পাঠ-বিকৃতির জটিলতা সম্পাদন করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত—"এ সব রস-মণ্ডল", "পরবশ জীউ না রবে", "হিমকর উগ হতে", "পিরিতি কহই নিরবাহ", "যৈছন কি রস মানে" পাঠ-বিকৃতির উদাহরণগুলিতেই প্রাপ্ত হইয়াছি,—এ স্থলে উহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

যেখানে প্রকৃত পক্ষে কোন পাঠ-বিকৃতি নাই, কিন্তু টীকাকারের ভ্রমবশতঃ অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, উহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইলেই আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইবে। রমণী বাবু জ্ঞানদাসের দুরূহ বাক্যাবলীর প্রায়শঃই টীকা করেন নাই; কিন্তু স্থানে স্থানে কতিপয় দুরূহ শব্দের অর্থ দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সংস্করণে এইরূপ অসদ্ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত বড় বেশী পাওয়া যায় নাই; পাঠ-বিকৃতি-জনিত অর্থের অসঙ্গতির বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না।

(১) জ্ঞানদাসের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিত "কহইতে সো ধনী বচন না শুন।" ইত্যাদি বয়ঃ-সন্ধি-বর্ণনার পদের—

"কুবলয় কর চীর চিকুর চিয়াব।
কিয়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝাব॥"

এই দুর্ব্বোধ্য পংক্তিদ্বয়ের অর্থ নির্ণয়ের জন্য কোন প্রয়াস না পাইয়া, রমণী বাবু কেবল 'চিয়াব' শব্দের অর্থ 'বিন্যাস' লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। 'চিয়াব' শব্দের এরূপ অর্থ তিনি

কিরূপে পাইলেন, বুঝা যায় না। পূর্ব্বে 'চিকুর' আছে বলিয়াই কি 'চিয়াব' শব্দের অর্থ 'বিন্যাস' বলিতে হইবে ? আমরা পদাবলি-সাহিত্যে কেবল জাগরণার্থক 'চি' ধাতুর পদ পাইয়াছি ; যথা,—

"কহে বন্ধু রামানন্দে আনন্দে আছিনু নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায়।"—প-ক-ত, ১৪৫ পদ।

'চিয়াইল' অর্থাৎ 'জাগাইল'। পুনশ্চ -

"বলরাম তুমি নাকি আমার পরাণ লৈয়া বনে যাইছ।
যারে চিয়াইয়া দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠেরে সাজাইছ॥"—প-ক-ত, ১১৭৭ পদ।

'চিয়াইয়া' অর্থাৎ 'জাগাইয়া'। 'চিয়াব' এই 'চি' ধাতুর তিঙন্ত পদ হইলে উহার অর্থ 'জাগাইব' হইবে। আর যদি মৈথিল ব্যাকরণানুসারে করা, দেখা ইত্যাদি অর্থে 'করব', 'দেখব' ইত্যাদি বিশেষ্য পদের ন্যায় 'জাগা' অর্থে 'চিয়াব' বিশেষ্য পদ সিদ্ধ হইয়াছে মনে করা যায়, তাহা হইলে 'চিয়াব' শব্দের অর্থ 'জাগরণ' (awakening) হইবে ; কিন্তু বলা আবশ্যক যে, মৈথিল ব্যাকরণানুযায়ী 'করব', 'দেখব' ইত্যাদি বিশেষ্য পদের ব্যবহার আমরা বঙ্গীয় পদাবলি-সাহিত্যে কোথায়ও পাই নাই। বস্তুতঃ ইহার কোন অর্থই এখানে সংলগ্ন হয় না। বিশেষজ্ঞগণ 'চিয়াব' শব্দের এবং উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ের কোন সদর্থের উদ্ভাবন করিতে পারিলে, জ্ঞানদাসের একটি হেঁয়ালীর মীমাংসা হইতে পারিবে।

(২) "কটি পীত বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুলকলঙ্কের কোড়া॥"—৯ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'কোড়া' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'মূল'। মূল অর্থে 'কোড়া' শব্দের প্রয়োগ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্দকোষে 'কোড়া' বা 'কোঁড়া' শব্দ নাই,—'কোঁড়' ও 'কুঁড়ী' শব্দ আছে। তিনি 'কোঁড়' শব্দের অর্থ—"শাখার অগ্র" ও 'কুঁড়ী' শব্দের অর্থ 'পুষ্পের মুকুল' লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা পদকল্পতরুর পুথিগুলিতে 'কোড়া' শব্দের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র 'কোঁড়া' পাঠই পাইয়াছি। যথা,—

"কি খেনে দেখিলুঁ গোরা নবীন কামের কোঁড়া
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।"—প-ক-ত, ১১৭ পদ।

'কুল-কলঙ্কের কোঁড়া' ও 'কামের কোঁড়া' উভয় স্থলেই 'কুট্মল' বা 'কুঁড়ী' অর্থই ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ ও সুসঙ্গত। 'বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে কুল-কলঙ্কের কুঁড়ীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন' এবং 'গোরা নব-জাত কামের কুঁড়ী স্বরূপ' বলায় কুল-কলঙ্ক ও কন্দর্প যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের রূপে যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে ; ইহার পরে যখন উহা ফুল ও ফলরূপে বিকসিত ও পরিণত হইবে, তখন না জানি কি হইবে !—'কোঁড়া' শব্দের ধ্বনি দ্বারা ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

(৩) "সর্ব্ব অঙ্গ ভূষিত গো-ক্ষুরের ধূলা।
উরু পর ঢুলিছে বনফুলমালা॥"—৪২ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'উরু' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'বক্ষঃস্থল'। জ্ঞানদাসের ষোড়শ গোপালের রূপ-বর্ণনায় আরও দুই স্থলে 'উরু' বা 'উর' শব্দের প্রয়োগ আছে ; যথা,—

"উরু পর দোলে দোলা তুলসীর দাম।
ভুবনমোহন রূপ অতি অনুপাম॥"—৪৫ পৃষ্ঠা।
"উর পরে দোলে কিবা নব গুঞ্জা-মাল।
কণ্ঠতটে হার চারু মুকুতা প্রবাল॥"—৪৫ পৃষ্ঠা।

বস্তুতঃ এখানে 'উর' কিংবা 'উরু'—যাহাই প্রকৃত পাঠ হউক না কেন, 'উরু' শব্দের এরূপ সৃষ্টিছাড়া অর্থ করার কোনই কারণ দেখা যায় না। বনফুল-মালা কণ্ঠে ধারণ করিলেও তাহা উরু পর্য্যন্ত দোদুল্যমান হওয়া অস্বাভাবিক নহে ; আমরা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-বেশের যে চিত্র সচরাচর দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহার বন-মালা জানু-বিলম্বীই দৃষ্ট হয় ; সুতরাং 'উরু পর ঢুলিছে বন-ফুল-মালা' বলিলে, কোনরূপেই উহা অসঙ্গত হয় না। তথাপি পাঠের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিলে উদ্ধৃত শ্লোকত্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় উদাহরণে 'উর' এবং প্রথম ও তৃতীয় উদাহরণে 'উরু' পাঠই সঙ্গত বিবেচনা হয়। জ্ঞানদাসের ন্যায় ভক্ত পদ-কর্ত্তা যে তুলসীর মাল্য সুবল-নামক গোপালের নিম্ন-অঙ্গ উরুতে স্পর্শ করাইতে সম্মত হইবেন,—এরূপ বিশ্বাস হয় না ; পক্ষান্তরে বহুমূল্য মুক্তা ও প্রবালের হার কণ্ঠ-তট ছাড়িয়া বড় নিম্নে যাইতে দেখা যায় না—সুতরাং উহার সহিত বৈষম্য (contrast) দেখাইবার জন্য বন-মালার ন্যায় সুলভ্য গুঞ্জাহারকে উরুবিলম্বিরূপে বর্ণিত করাই স্বাভাবিক ও সমীচীন বোধ হয়।

(৪) "মলয়জ পবন সহিতে ভেল মিত।
নিরখি নিশাকর যুবজন হিত॥"—১১১ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'মিত' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'অনুমিত'। এটি বসন্ত-বর্ণনার পদ ; 'পরিমিত' ব্যতীত 'অনুমিত' অর্থে 'মিত' শব্দের প্রয়োগ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ নহে এবং সংস্কৃত, কি ভাষা-সাহিত্যেও তাদৃশ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। এখানে 'মিত' শব্দের অর্থ 'মিত্রতা' ; অর্থাৎ চন্দ্রকে যুবজনের হিতকারী দেখিয়া, (সেই দৃষ্টান্তে যুবজনের হিত আচরণ করার জন্য) মলয়জ পবনের সহিত বসন্তের মিত্রতা হইল অর্থাৎ মলয়-পবনের সাহায্যে বসন্তও চন্দ্রের ন্যায় যুবজনের হিত আচরণে প্রবৃত্ত হইল।

(৫) "বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁ গায়।
শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়॥
হেম মরকতে জনু জড়িত পণ্ডার।
তাহে বেঢ়ল গজমোতিম হার॥"—১১৬ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'পণ্ডার' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'প্রণালী'। 'পণ্ডার' শব্দের 'প্রণালী' অর্থ

আছে, তর্ক-স্থলে ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও এ স্থলে যে তদ্দ্বারা কোন সদর্থ হয় না, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ এখানে 'পঙার' শব্দের সর্ব্ব-বাদি-সম্মত প্রসিদ্ধ 'প্রবাল' অর্থ ধরিলেই সুন্দর সংলগ্ন হয়। অর্থাৎ আবীরের অরুণ-বর্ণে রঞ্জিত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শ্রম-জল-বিন্দুগুলি আলোহিত প্রবালের ন্যায় লক্ষিত হওয়ায়, স্বর্ণ ও মরকতের সহিত যেন প্রবাল জড়িত রহিয়াছে, এরূপ বোধ হইতেছে। 'পঙার' শব্দের 'প্রণালী' অর্থ কল্পনা করিলে এ স্থলে উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়।

(৬) "কি যশ অপযশ না ভায় গৃহ-বাস
হইলোঁ কুলের খাঁথার।"—১৬৭ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু "খাঁথার' স্থলে 'অঙ্গার' গীতাচিন্তামণি এবং লীলাসমুদ্র।" এইরূপ লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; 'খাঁথার' শব্দের অর্থ-নিরূপণের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু বাঙ্গালা-শব্দ-কোষে 'খাকার' শব্দের উৎপত্তি ফারসী 'খাক' শব্দ হইতে স্থির করিয়া উহার অর্থ 'অঙ্গার, পাংশু' লিখিয়াছেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কুলের খাকার' বাক্যটিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার "গৌর-পদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থের তৃতীয় পরিশিষ্টে 'খাঁকারি' শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে, 'হাঁকারি ও খাঁকারি 'দুইটি শব্দ প্রায় তুল্যার্থক। হাঁকারি (হুঙ্কার) করিয়া অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে, খাঁকারিও তাই। গলার উচ্চ শব্দ করাকে রাঢ়দেশে "গলা খাঁকারা" বলে; থু-থু, কাস প্রভৃতি পরিত্যাগের সময় গলায় যে শব্দ হয়, তাহাকেও বলে। তুলসীদাস হরিনাম-মাহাত্ম্যপ্রকাশে বলিয়াছেন,—

"হ"কার কহরিতে খাঁকার সমেত অন্তর মল বাহিরায়।
'রি'কার কহরিতে কবাট পড়ে সকল অনঘ হোই যায়॥"

তিনি ইহাও লিখিয়াছেন,—"শ্রীহট্ট অঞ্চলে খাঁকারি শব্দে লজ্জা বুঝায়।" বস্তুতঃ 'খাঁথার' শব্দের উৎপত্তি আজ পর্য্যন্তও সন্দিগ্ধ বটে। 'খাঁথার', 'খাঁকার' বা 'খাকার' শব্দের উৎপত্তি যে শব্দ হইতেই হউক না কেন, 'খাঁথার' ও 'খাঁথারি' শব্দ দুইটি যে ভাবে পদাবলি-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে উহাদিগের অর্থ 'অঙ্গার' না হইয়া 'লজ্জা' কিংবা 'কলঙ্ক' অর্থই অধিক সংলগ্ন হয়। যেমন—

"কেমন কানাই সেই কেমন মুরতি সই
কেমন বা তাহার বেভার।
রাধার বন্ধুয়া বলি সব লোক ডাকে তারে
সেই মোর কুলের খাঁথার॥"—প-ক-ত, ৯০৬ সংখ্যক পদ।

এ স্থলে যে 'কলঙ্ক' অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থই সংলগ্ন হয় না, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। এই অর্থ 'হইলোঁ কুলের খাঁথার' ইত্যাদি স্থলেও অসংলগ্ন হয় না; সুতরাং এক স্থলে 'অঙ্গার' ও অন্য স্থলে 'কলঙ্ক' এইরূপ বিভিন্ন অর্থ কল্পনা না করিয়া শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রচলিত সর্ব্বতোভদ্র অর্থটি গ্রহণ করাই সুবিধাজনক বোধ করি।

(৭) "সৎ ঔষধ তার কদম্বের তলা।

জীয়াইতে থাকে সাধ তথা নিয়া পেলা ॥"—১৯১ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'পেলা' শব্দটির অর্থ লিখিয়াছেন—'পলায়ন কর'। 'পেলা' শব্দের এরূপ অর্থ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ কিংবা পদাবলি-সাহিত্যে প্রচলিত নহে। 'পলায়ন কর' অর্থ এখানে একেবারেই সংলগ্ন হয় না। প্রাচীন পুথিতে 'ফেল' ধাতুর 'ফেলে', 'ফেলিল', 'ফেলা' ইত্যাদি পদের পরিবর্ত্তে প্রায় সর্ব্বত্র 'পেলে', 'পেলিল', 'পেলা' ইত্যাদি রূপ দৃষ্ট হয়; আধুনিক লিপিকরগণ কিম্বা প্রাচীন পদাবলীর আধুনিক সম্পাদকগণ অনেক স্থলেই উহা সংশোধিত (?) করিয়া 'ফেলে', 'ফেলিল' ইত্যাদি আধুনিক রূপ চালাইয়াছেন। এ স্থলে যেরূপেই হউক, প্রাচীন রূপটি রহিয়া গিয়াছে বলিয়াই উহার অর্থ-সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রম জন্মাইয়াছে। আমরা 'পেল' ধাতুর কয়েকটি প্রয়োগ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"গৌরীদাস আদি করি　　চন্দন পিচকা ভরি

গদাধরের অঙ্গে দেয় পেলি।"

"স্বরূপ নিজগণ সাথে　　আবির লইয়া হাতে

সঘনে পেলায় গোরা গায়।"— প-ক-ত, ১৪৩৩ পদ।

"কারো অঙ্গে কেহো কেহো জল পেলি মারে।

গৌরাঙ্গ পেলিয়া জল মারে গদাধরে ॥"—প-ক-ত, ১১০৮ পদ।

(৮) "তাম্বুল কর্পূর　　খপুরে পুন রাখয়ে

বাসিত বারি সমীপ ॥"—১৯৯ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'খপুর' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'ঘটে'। সংস্কৃত 'খর্পর' (অপভ্রংশ 'খাপরা') শব্দের সহিত 'খপুর' শব্দের আকার-গত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে ও 'খপুরে' শব্দের পরে 'রাখয়ে' ক্রিয়া-পদ থাকায় খাপরার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কর্পূর তাম্বূল রাখা যাইতে পারে,—বোধ হয়, উভয়বিধ কারণেই রমণী বাবু ঐরূপ অর্থ লিখিয়াছেন; কিন্তু 'খপুর' শব্দের অর্থ তাহা নহে। সংস্কৃত 'খপুর' শব্দের অর্থ 'গুবাক' অর্থাৎ 'সুপারি'। এই গুবাক অর্থেই ইহা পদাবলি-সাহিত্যে বহু স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। পদামৃতসমুদ্রের সঙ্কলয়িতা, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পদ-কর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্দদাসের—

"সাজল কুসুম-　　সেজ পুন সাজই

জারই জারল বাতি।

বাসিত খপুর　　কপূরে পুন বাসই

ভৈ গেল মদন-ভরাঁতি ॥"

শ্লোকটির 'খপুর' শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন—"খপুরো গুবাকঃ, "গুবাকঃ খপুর" ইত্যমরশাসনাৎ।" সুতরাং 'খপুরে' শব্দের অন্ত্য 'এ'কার অধিকরণ-কারকের বিভক্তি

নহে—ইহা কর্ম্মকারকের বিভক্তি। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন অজ্ঞাত শব্দের অর্থ করিতে গেলে যে সময়ে সময়ে কিরূপ বিড়ম্বিত হইতে হয়, ইহা তাহার একটি সুন্দর উদাহরণ বটে।

(৯) "ঐছন পুরুখ কতিহুঁ নাহি দেখি।
আপন দিব তোহে হরি না উপেখি॥—২১২ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'আপন দিব তোহে' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ লিখিয়াছেন,—"তোমার দিব্য, তুমি হরিকে উপেক্ষা করিও না"। বৈষ্ণব-কবির পদাবলীতে আছে,—সুচতুরা শ্রীরাধা নিজের সতীত্ব সম্বন্ধে ননদীর নিকট দিব্য করিতে হইলে 'ননদীর মাথা খাই' বলিয়া দিব করিতেন। সেইরূপ এ স্থলে বক্ত্রী শ্রীরাধার সপত্নী হইলে, শ্রীরাধার দিব্য করিলে অসঙ্গত হইত না; কিন্তু বক্ত্রী শ্রীরাধার সপত্নী না হইয়া প্রিয়-সখী হওয়ায় কথাটা কিছু অস্বাভাবিক হইতেছে। তার পর 'তোহে' শব্দের অর্থ 'তোমাকে' কিম্বা 'তোমার নিকটে' না করিয়া কোনমতেই 'তুমি' করা যায় না—সুতরাং 'আপন দিব তোহে' বাক্যের অর্থ হয় যে,—"তোমাকে নিজের দিব্য দিতেছি, হরিকে উপেক্ষা করিও না।" 'নিজের দিব্য' বলিলে দিব্যকারিণী সখীর দিব্য না বুঝাইয়া উহা শ্রীরাধার দিব্য বুঝাইতে পারে না; সুতরাং সরল অর্থ হইল যে, সখী বলিতেছেন,—"আমার দিব্য, তুমি হরিকে উপেক্ষা করিও না।"

আর একটি দৃষ্টান্ত দিলেই আজিকার বক্তব্য শেষ হইবে।

(১০) "চান্দে চান্দে কমলে কমলে এক মেলি।
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঞি করে কেলি॥
শিখিকোরে ভুজগিনী নাহি দুঃখ শোক।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক॥"—৭১ পৃষ্ঠা।

রমণী বাবু 'কোক' শব্দের অর্থ 'চক্রবাক' লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, এখানে যমুনা-জল ও চক্রবাক শব্দে কাহাকে বুঝাইতেছে, তিনি সে সম্বন্ধে কোন বাক্য-ব্যয় করেন নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাঁহার বাঙ্গালা-শব্দ-কোষে 'কোক' শব্দের অর্থ 'বন্য কুকুর; নেকড়া বাঘ' লিখিয়া উহার প্রয়োগ-স্থলস্বরূপ জ্ঞানদাসের "যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক॥" পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে অশিক্ষিত লোকের রচিত গ্রাম্য কৃষ্ণ-যাত্রার বিদ্রূপাত্মক একটি শ্লোক শুনিয়াছিলাম,—

"কালীদহ সায়রে কৃষ্ণ দিলেন সাঁতার।
কেউ বলে কালিয়া কুত্তা কেউ বলে দাঁতাল॥"

পূর্ব্ববঙ্গে বৃহৎ দন্তযুক্ত শূকরকে গ্রাম্য ভাষায় 'দাঁতাল' বলে। বস্তুতঃ বিদ্রূপ (parody) ব্যতীত যে 'বন্য কুকুর' বা 'নেকড়া' বাঘের মত অর্থ এখানে আসিতে পারে, ইহা মনে করিতে

আমাদিগকে প্রথমে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। পরে বুঝা গেল, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর ন্যায় বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তির উক্তিতে এবং বাঙ্গালা-শব্দ-কোষের ন্যায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে ঘুণাক্ষরেও বিভ্রমের আশঙ্কা করা যাইতে পারে না; সুতরাং সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু রমণী বাবুর সংস্করণ দেখেন নাই কিংবা দেখিয়া থাকিলেও 'কোক' শব্দের প্রতিপাদ্য কি, তাহা বুঝিতে না পারায়, অর্থ-সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি না করিয়া অপ্রণিধানবশতঃই ঐরূপ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকে আমরা ভাষাতত্ত্ব-বিৎ, সুপণ্ডিত, সাহিত্যসেবী বলিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা করি,—তাঁহার এই প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে অপ্রতিভ করা কিংবা নিজে বাহাদুরি লওয়ার ইচ্ছা আমাদিগের নাই,—উহার স্থলও ইহা নহে; কারণ, আমাদিগের বিশ্বাস, সংস্কৃত-সাহিত্যে কিম্বা পদাবলি-সহিত্যে যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, তাঁহারা সকলেই এ স্থলে 'কোক' বা 'চক্রবাক' শব্দের প্রতিপাদ্য যে কি, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন,—শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুও হয় ত এত ক্ষণে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক ভাবিয়া হাস্য করিতেছেন,—সুতরাং এই কৌতুকাবহ ভ্রম-প্রদর্শনের উদ্দেশ্য বাহাদুরী নহে,—বৈষ্ণব কবির পদাবলী কিংবা সেই জাতীয় প্রাচীন সাহিত্যের শব্দার্থ ও তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে কিরূপ অবহিত হওয়া আবশ্যক, সামান্য অপ্রণিধানে কিরূপ হাস্যজনক ভ্রমের উৎপত্তি হইতে পারে, ইহার এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্য দৃষ্টান্ত না পাওয়াতেই আমরা এই অপ্রীতিকর আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। ভরসা করি, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

উপসংহারে সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে সমাগত সহৃদয় সাহিত্য-সেবিগণের নিকটে আমরা সানুনয়ে নিবেদন করি, বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর পল্লবগ্রাহি-আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা গভীর-ভাবে উহার মধ্যে নিমগ্ন হউন। সেইরূপ করিতে হইলে, সংস্কৃত-সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ও মৈথিল-সাহিত্যেরও বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক হইবে; কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের পারদর্শিতা লইয়া বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অনেক খ্যাত-নামা পণ্ডিতও বিড়ম্বিত হইয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা না করিয়াও যাঁহারা দীর্ঘকাল যাবৎ বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা এই ক্ষেত্রে সেইরূপ বিড়ম্বিত না হইলেও প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দার্থের ব্যুৎপত্তি-গত আলোচনায় অক্ষমতারই পরিচয় দিয়া থাকেন; সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞতা লাভ এবং হিন্দী ও মৈথিল ভাষা ও সাহিত্যে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াই পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত সঙ্গত। বৈষ্ণব-কবির কাব্য প্রেম, ভক্তি ও আনন্দের অনন্ত আধার; তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া শ্রদ্ধান্বিত অন্তঃকরণে গভীর-ভাবে উহাতে নিমগ্ন হইলে, উহা হইতেই আমরা মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পুষ্টিকর প্রচুর খাদ্য প্রাপ্ত হইব;—অনশন-ক্লিষ্ট আমাদিগকে আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে হইবে না,—আর আমাদিগকে বিফল-মনোরথ হইয়া নিরানন্দ জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে হইবে না। ভগবান্ করুন, সেই দিন আবার আসুক,

রোগ-শোক-ক্লিষ্ট এই বঙ্গে আবার ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীর প্রবাহিত হইয়া, নব বসন্তের সহিত নব জীবনের সঞ্চার করুক, আবার অবিরল কোকিল-কূজিতের ন্যায় অসংখ্য কবি-কণ্ঠে সুললিত কবিতার ঝঙ্কার উঠিয়া বঙ্গের গগন-প্রান্তর প্লাবিত করুক; আবার বাঙ্গালী জয়দেব ও চণ্ডীদাসের বংশধর বলিয়া গর্ব্ব করিয়া ধন্য হউক।

রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলনে এই প্রবন্ধ পাঠ করার পরে আমরা 'ভক্তি-রত্নাকর' গ্রন্থের ৫ম তরঙ্গে সঙ্গীত-দামোদরের নিম্নলিখিত শ্লোকে নানাবিধ বীণা-যন্ত্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে 'পিণাকী' ও 'কবিলাস' নামক বীণার উল্লেখ পাইয়াছি, যথা,—'ঔড়ম্বরী পিণাকীচ নিবন্ধঃ পুষ্কলস্তথা ॥' 'কবিলাসো মধুস্যন্দী ঘোণেত্যাদি ততং ভবেৎ ॥' 'কবিলাস' ও 'পিণাকী' শব্দের অপভ্রংশ হইতেই পদাবলি-সাহিত্যের 'কপিনাস' ও 'পিণাক' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

জঙ্গিপুরের (মুরশিদাবাদ) গ্রাম্য শব্দ

কোন জেলার সর্ব্বত্র গ্রাম্য শব্দ একরূপ হইতে পারে না। মুরশিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রাম্য শব্দের সহিত সদর মহকুমার গ্রাম্য শব্দের বহু সাদৃশ্য আছে; কিন্তু কাঁদি মহকুমার গ্রাম্য শব্দের সহিত সাদৃশ্য বড় অল্প। এই মহকুমার পশ্চিমে বীরভূম ও উত্তরে মালদহ জেলা। মুরশিদাবাদ জেলার উত্তর প্রান্তে এই মহকুমা অবস্থিত। এ অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দে হিন্দীর প্রাধান্য বেশ বুঝিতে পারা যায়।

গ্রাম্য ভাষা হইতে অধিবাসীদিগের উপনিবেশের যুগ স্পষ্ট বোঝা যায়। এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসী মাল, তিওর, বাগ্‌দি, কুড়োল, চাঁড়াল, পুঁড়ো, কৈবর্ত্ত, ডোম; পরে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ কায়স্থও আসিয়াছিল। দ্বিতীয় যুগের অধিবাসী মুসলমান, রাজপুত, আহীর প্রভৃতি। ইহারা প্রায় বিহার হইতে আসিয়াছিল। তৃতীয় যুগের অধিবাসী ৬০।৭০ বৎসরের মধ্যে চাকরি উপলক্ষে দক্ষিণাঞ্চল হইতে আসিয়াছে।

সাধারণ ভাবে এ অঞ্চলের উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষত্ব নিয়ে লিখিতেছি। যেখানে দক্ষিণাঞ্চলে আকার স্থানে ওকার উচ্চারিত হয়, এ অঞ্চলে সে স্থানে কতক লোক ঠিক আকার উচ্চারণ করে, অধিকাংশ লোক বক্র একার অর্থাৎ য-ফলা আকার উচ্চারণ করিবে। যেমন, জুতা—দক্ষিণে জুতো, মালদহে ও হিন্দীতে জুতা, এ অঞ্চলে জুতা ও জুত্যা (য-ফলা আকার আছে বলিয়াও দ্বিত্ব উচ্চারণ হইবে না।) দক্ষিণাঞ্চলে (অর্থাৎ দক্ষিণরাঢ়, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান) বেটা, ফেল্‌, দেখ্‌ প্রভৃতি শব্দের একার বক্রোচ্চারিত হয়, এ অঞ্চলে তদতিরিক্ত শব্দেও একার বক্র হয়; যেমন—তেল, বেল, মেলা, এ অঞ্চলে ত্যাল, ব্যাল, ম্যালা উচ্চারিত হয়। অনর্থক চন্দ্রবিন্দু-যোগ কোথাও কোথাও হইয়া থাকে; যেমন—ঘোঁড়া, পোঁকা, সাঁপ। দক্ষিণাঞ্চলেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কাঁচ, জোঁক, হাঁসি শুনিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এখানে র-কার ও ড়-কারের প্রভেদ বড় নাই। পাঠশালায় পড়ান হয়—"ডয়ে বিন্দু র।" অনেকেই র ও ড় উচ্চারণ করিতে পারে না, যাহা পারে, তাহা উভয়ের মাঝামাঝি। তবে ঢ়-কার উচ্চারণে এ অঞ্চলের লোক বেশ দক্ষতা দেখায়। সংস্কৃত "বৃদ্ধ" হইতে প্রাকৃত বুড্‌ঢ। ইহা হইতে গ্রাম্য বুঢ়া, এ দেশে বুঢ়্যা। দক্ষিণাঞ্চলে গ্রাম্য শব্দে পদের আদিস্থিত হকার বা বর্গের হ-জাত ২য় ও ৪র্থ বর্ণ ঠিক উচ্চারিত হয়, কিন্তু এরূপ বর্ণ পদের অন্ত স্থানে থাকিলে দক্ষিণাঞ্চলবাসী ঠিক উচ্চারণ করিতে পারে না, বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণস্থানে যথাক্রমে ১ম ও ৩য় বর্ণ উচ্চারণ করিয়া ফেলে। পূর্ব্ববঙ্গে আদিস্থিত ২য় ও ৪র্থ বর্ণও যথাযথ উচ্চারিত হয় না। হিন্দিতে যেমন, এ অঞ্চলেও তেমনি সমস্ত বর্ণই পূর্ণ উচ্চারিত হয়। হিন্দীতে মাথা, এ অঞ্চলে মাথা, দক্ষিণাঞ্চলে মাতা। হিন্দীতে রাখ্‌ দে, জঙ্গিপুরে রেখে দে, দক্ষিণাঞ্চলে রেকে দে। অনেকে বলেন, দক্ষিণা-

ঞ্চলবাসী এইরূপে গ্রাম্য ভাষাকে কোমল করেন। ইহা শরীর ও জিহ্বার দুর্ব্বলতা-ব্যঞ্জক বলিয়া মনে হয়।

ফির, শুন, উঠ প্রভৃতি ধাতুর ইকার ও উকারের গুণে দক্ষিণাঞ্চলে ফের, শোন, ওঠ হয়। এ দিকে এখনও সর্ব্বত্রই যথাযথ বিনা গুণে উচ্চারিত হয়। যথা,—সে শুনে না, উঠে, ফিরে ইত্যাদি। হিন্দীতে বোল্ (ক্রিয়া) এ দেশে বুল, দক্ষিণে বল।

কতকগুলি ধাতুর অসাধারণ রূপ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণে—আছে অথবা ছিল, এ দিকে আছে, আছিল হয়। দক্ষিণে 'যাইতেছ', 'খাইতেছ', গ্রাম্য ভাষায় যাচ্ছ, খাচ্ছ। এ দিকে যেছো, খেছো। দক্ষিণে 'হইয়া+আছে' হইতে 'হইয়াছে', 'হয়েছে' রূপ। এ দিকে হইল+আছে, হইতে হ'লছে; এইরূপ গেলছে (গিয়াছে)। দক্ষিণাঞ্চলে 'কাজটা করিও' স্থলে সংক্ষেপে 'ক'রো' হইয়াছে, এ দিকে এখনও 'করিও' আছে। নদীয়ার ন্যায় এ দিকেও মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার শেষে আকার হয়। নদীয়ায় ও এ অঞ্চলে "খাবা", "যাবা", কলিকাতা ও হুগলীতে "খাবে", "যাবে"।

সম্বোধনে হে, টে, রে প্রভৃতির প্রয়োগ হয়। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের সহিত প্রয়োগে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। দক্ষিণে 'ওহে রাম শুন্‌চো'; এ দিকে ওরূপ প্রয়োগ ভিন্ন আরও দুই প্রকারে 'হে' ব্যবহৃত হয়। 'রাম হে শুনছো ? ও রাম শুনছো হে ?' অনাদরে 'রে'র প্রয়োগ 'হে'র ন্যায় তিন প্রকারে হয়। দক্ষিণাঞ্চলে স্ত্রীলোকের সম্বোধনে অনাদরে 'ওলো', 'লো'র যেখানে প্রয়োগ হয়, এ দেশে সে স্থানে 'ওটে', 'টে'র প্রয়োগ হইয়া থাকে। এ অঞ্চলের মুসলমান এবং যে সকল জাতি এখনও মাঝে মাঝে হিন্দী বলে, তাহাদের মধ্যে সম্বোধনে অনাদরে 'রে' স্থানে 'বে' ব্যবহার হয়। যথা—'শুন্‌ছিস বে'।

'তাহাই হউক' এই অর্থে দক্ষিণে 'আচ্ছা' কথার প্রয়োগ আছে। এ দিকে 'আচ্ছা' এবং 'হোক' উভয় প্রয়োগই দেখা যায়। যথা—'যেও, আচ্ছা', কিম্বা 'যেও, হোক'।

দক্ষিণাঞ্চলে 'ইত্যাদি' অর্থে সহচর শব্দ প্রয়োগের সময় প্রায়ই একার্থের বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়; যথা,—ঘর-বাড়ী, তরি-তরকারী, কাপড়-চোপড়; কিন্তু এ অঞ্চলে দ্বিতীয় শব্দটি 'ট' দিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে, যেমন—ঘর-টর, তরকারী-টরকারী, কাপড়-টাপড়।

অদস্ শব্দজাত সর্ব্বনামের সম্ভ্রমের প্রয়োগে এ অঞ্চলে উনি, উনারে, উনার হয়। দক্ষিণাঞ্চলে উনি, ওঁকে, ওঁর হয়। সেইরূপ ইদম্ শব্দজাত ইনি, ইনাকে, ইনার হয়। দক্ষিণাঞ্চলে ইনি, এঁকে, এঁর হইয়া থাকে।

প্রাকৃতে যেমন আদিস্থিত র-স্থানে স্বরবর্ণ ও স্বরবর্ণস্থানে র হয়, এ অঞ্চলে প্রাকৃত জনের মধ্যে কেহ কেহ সেইরূপ প্রয়োগ করে। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, ইহারা চেষ্টা করিলেও অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না। যে 'রাম বাবু' স্থানে 'আম বাবু' বলে এবং 'আম' স্থানে 'রাম' বলে, সে আদিতে র উচ্চারণ নিশ্চয়ই করিতে পারে।

মুসলমানদিগের মধ্যে এ অঞ্চলে কতকগুলি এমন শব্দের প্রয়োগ আছে, যাহা হিন্দু-

দিগের মধ্যে কচিৎ দৃষ্ট হয়। যেমন ভো'র (পা), পোঁহাৎ (প্রভাত), বোর (বদর, কুল), বোরভ্যান্ (প্রাতঃকাল), হামি (আমি), সুঁই (সুঁচী), ধাগা (মোটা সুঁতা), পুছ কর (প্রশ্ন কর), ত্যাপ্‌পহোর (তৃতীয় প্রহর), ঘাটা (পথ), হামারথের (আমাদিগের), শুৎ (শো, শয়ন কর)। সম্বোধনে হিন্দীর ন্যায় 'গে'র ব্যবহার আছে; যথা—হাঁগে মা, দক্ষিণে হ্যাঁগো মা। এ দিকের প্রাকৃত জন বলে—শুন্যাছিলাম, বহু মুসলমানে বলে—শুন্যাছিনু। আশ্চর্য্যের কথা, মুরশিদাবাদের দক্ষিণে বা বীরভূম, বর্দ্ধমানে ক্রিয়ার শেষে এই 'নু'র প্রয়োগ দেখি নাই। এমন কি, হুগলী জেলার উত্তরাংশেও এরূপ প্রয়োগ নাই। হুগলী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে এরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

এ অঞ্চলে চাঁই নামক একপ্রকার জাতি তরি-তরকারী উৎপাদন করে; ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা মাথায় করিয়া হাটে বাজারে তাহা বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। ইহাদিগকে সাধারণে মোল্লান (মণ্ডলানী) বলে। পুরুষের উপাধি মণ্ডল। এই জাতি ভাগলপুর জেলায় প্রচলিত হিন্দীতে কথোপকথন করিয়া থাকে।

জঙ্গিপুর মহকুমার পশ্চিম ভাগে যেখানে এঁটেল মাটি দেখা যায়, সেই স্থান হইতে রাঢ় আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থান হইতে রাঢ়ের ভাষার বিশেষত্বও আরম্ভ হইয়াছে। এ অঞ্চলের অন্য লোকে বলিবে—ঘরখানা পড়ে গেল, জঙ্গিপুরের পশ্চিম ভাগে বলিবে—ঘরখানা পড়ি গেল; আর একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূমে বলিবে—পড়িং গেল। বীরভূমের দক্ষিণে ও বাঁকুড়ায় 'ং' চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হইবে; যেমন—খেঁয়ে।

পূর্ব্বে এ অঞ্চলে বহু রেশম-সূত্র ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইত। জঙ্গিপুরে এককালে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রেশম-কুঠী ছিল। এখনও কিছু কিছু রেশমী সূতা ও কাপড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। রেশম-শিল্পের বহু পারিভাষিক শব্দের প্রচলন আছে। সঞ্চ (সঞ্চিত কোষ) কাটিয়া যে প্রজাপতি বাহির হয়, তাহাকে 'চোখ্‌রি' বলে। চোখ্‌রি ডিম পাড়িয়া মরিয়া গেলে কিয়দ্দিবস পরে ডিম হইতে 'পোলু' বাহির হয়। তখন চতুর্দ্দিকে বাখারি-বাঁধা মাটি, গোবর-লেপা দরমা বা চাটায়ে পোলু রাখা হয়। ইহাকে ডালা বলে। পোলু 'পাত' অর্থাৎ তুঁতপাতা খাইয়া বড় হইয়া পাকিলে অর্থাৎ হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিলে "চঁধার্কিতে" রাখা হয়, তখন পোলু 'কোআ' (কোষ) প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বাস করে। এই কোআ হইতে সূতা বাহির করিতে বিলম্ব হইলে কোআ কাটিয়া চোখ্‌রি বাহির হয়, তজ্জন্য "কুপী"তে (দরমা-নির্ম্মিত প্রায় ২।২॥০ হাত উচ্চ গোলাকার আধার) ভরিয়া উত্তপ্ত তন্দুরে রাখিয়া কোআর মধ্যস্থ কীট নষ্ট করা হয়। ইহার পরে যে সময়ে ইচ্ছা, উত্তপ্ত জলে ফেলিয়া এই কোআ হইতে সূতা বাহির করা হয়। এই সূতায় গরদকাপড় হয়। আর "মুহকাটা" (চোখারি বাহির হইয়া গেলে) কোআ হইতে যে মোটা সূতা বাহির হয়, তাহা হইতে মটকা কাপড় হয়। যেখানে সূতা বাহির করা হয়, তাহাকে "ঘাই" বলে, যাহাতে সূতা জড়ান হয়, তাহার নাম "ভোহোবিল"। অনেকগুলি "ঘাই"

একত্রে থাকিলে সেরূপ কারখানাকে "বানোক" বলে। যে ব্যক্তি কোআ গরম জলে ফেলিয়া সূতা বাহির করে, সে "কাটানি"। যে তোহোবিল ঘুরাইয়া সূতা জড়ায়, সে "পাকদার"। বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ চারি বার কোআ জন্মে। এই সময়কে "বন্দো" বলে।

নিম্নে বর্ণানুক্রমে কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ দিলাম। atএ aর ন্যায় একারের বক্র উচ্চারণ বুঝাইতে উল্টা একার ও গ্রস্ত ইকারের জন্য বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্ভাবিত শৃঙ্গ-চিহ্ন দিলে ভাল হইত। কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা না হইলে সেরূপ ছাপা হইতে পারে না বলিয়া সে সংকল্প ত্যাগ করিলাম। কোন বর্ণে য-ফলা আকার দিলে বঙ্গদেশে দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। এই শব্দগুলিতে কোথাও দ্বিত্ব উচ্চারণ হইলে দুইটি অক্ষর দিয়াছি, নতুবা সর্ব্বত্র হিন্দীর ন্যায় একটি বর্ণের উচ্চারণ হইবে। যেখানে অকারের উচ্চারণ 'ও' হইয়াছে, সেখানে ও-কার দিয়াছি, বন্ধনীর মধ্যে দ থাকিলে বুঝিতে হইবে, শব্দটি দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত আছে। প্রাং (প্রাকৃত), হিং (হিন্দী), আং (আরবী), ফাং (ফারসী), সং (সংস্কৃত) প্রভৃতি সাঙ্কেতিক অক্ষর ব্যবহার করিয়াছি।

অ

অদের—উহাদের। অনুপাম (কলা)—মর্ত্তমান। অন্না—পুং মহিষ। অরা—উঁহারা। অদের, অরা, সং অদস্‌শব্দজাত। দক্ষিণাঞ্চলে ওদের, ওরা।

আ

আইটা—বড় চিংড়ী। আউস্—আশুধান্য। আওটান—(দুগ্ধ) গরম করা (সং আবর্ত্তন), আক—ইক্ষু, আকাল—দুর্ভিক্ষ। আকাবাকি—তাড়াতাড়ি। আকর্ষী—আঁকুসী(দ)। আক্রা—অক্রেয়। আখা—চুল্লী।

আগা'ল, আগ্‌ডুহি—বাঁশের বা গাছের সর্ব্বোচ্চ অংশ।

আগল্যা—আগড়া (দ)।

আগ্‌বোল—দৈব কার্য্যের জন্য আগে তুলিয়া রাখা মিষ্টান্নাদি।

আঙ্গারখা (হিং)—জামা (দ)। আঙ্গন্যা—আঙ্গিনা। আঘুন—অগ্রহায়ণ।

আছিল—ছিল। আছিল্যা—যাহা ছিলা হয় নাই। আজাই—মাতামহ।

আজার—খালি। আজরে—খালি করে। আতোষবাজি—বর্দ্ধমান অঞ্চলে, কারখানা। বাজি (দ)।

আথ্‌লা—কুম্ভকারের মৃণ্ময় যন্ত্রবিশেষ, উহার উপর হাঁড়ী কলসীর তলদেশ রাখিয়া পিটে। অনেকে ইহাতে পোষা পায়রাকে পানীয় জল দেয়।

আদাবাদি, আনাআনি—বিবাদ, মনোবিবাদ। আনখা (হিং)—আশ্চর্য্য।

আনাজ—চৈতালী, রবিখন্দ। আদোখি—গুড়চিনির পাটালি (দ)।

আবাস্তা—দুরবস্থা। আমচুর—আমসী (দ)। আমতা, আমট—আমসত্ব (দ)।

আমসোপরি—পেয়ারা। পেয়ারা হইতে আমের বিভিন্নতা বুঝাইতে আমকে "জাৎ"-আম বলে।

আম্বোল—অম্ল। দক্ষিণাঞ্চলে অম্লব্যঞ্জনকে "অম্বোল", বিশেষণে "টক্" বলে। এ দিকে উভয় অর্থেই "আম্বোল"।

আরি—ছোট করাত। আঢ়ি—বেত্রনির্ম্মিত ক্ষুদ্র আধার। আড়ি(দ), আর্ষী—দর্পণ।

আলকাপ, কাপ, কাটাকাপ—অদ্ভুত কার্য্য বা যে লোক অদ্ভুত কার্য্য করে। কয়েক বৎসর হইল, এ অঞ্চলে যাত্রার দলের ন্যায় গানের দল হইয়াছে। ইহাকেও আলকাপ বলে।

আল্‌গিনি—সং আলগ্নী-শব্দজাত। যাহাতে বস্ত্রাদি রাখিলে মৃত্তিকায় লগ্ন হইবে না। আল্‌না (দং)।

আল্‌গা—অলগ্ন। আল্‌গোছে—না ছুঁইয়া। আলাঙ্গা (হিং) পৃথক্।

আলোগ্‌লতা—এই লতার মূল মাটিতে থাকে না। অনেকে বোধ হয়, ইহাকে স্বর্ণলতা বলে।

আঁলো চাল—আতপ চাউল। আশোজ—অশৌচ। ওশুদ্ (দ)। আসান (হি)—কিঞ্চিৎ সুস্থ।

আঁশর্‌যাল—আরশোলা, তেলে পোকা। আঁটবে—ধরিবে (দ)।

আঁকুরি—ভিজান ছোলা মটর আদি। আঁছোই (পড়া)—পোকা (পড়া। আঁধার্‌সা (হি)—তণ্ডুলচূর্ণজাত মিষ্টান্নবিশেষ। ইস্যারা (হি)—ইঙ্গিত।

উকুন—উৎকুণ, ইকুন (দ)। উকুন্থা—চোর কাঁটা (দ) নামক তৃণ।

উথ্‌র্‌যা—বর্দ্ধমানাধিপতি ৺মহারাজ মহাতাপচাঁদের জনক ৺প্রাণকৃষ্ণ কপূর-প্রণীত "হরিহরমঙ্গল" পুস্তকে এ কথার প্রয়োগ দেখিয়াছি। মুড়্‌কী (দ)।

উচ্যা—(হিং) উচা। উচ্চ। উছোট—হোঁচোট (দ)।

উচ্ছুগ্‌গু—উৎসর্গ। উজ্যান—উজান, স্রোতের বিপরীত দিক্।

উজ্যার—শেষ। অসন্তোষের সহিত কথাটার প্রয়োগ হয়।

উঠ্‌ন্থা—মুদিখানা হইতে ধারে প্রত্যহ দ্রব্যাদি আনয়ন।

উব্‌ক্যার—উপকার।

উব্‌টন—অঙ্গরাগবিশেষ। এ অঞ্চলের ছত্রি বা রাজপুত জাতির বিবাহে শুধু হরিদ্রার পরিবর্ত্তে বর-কন্যার জন্য এই অঙ্গরাগ ব্যবহৃত হয়। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে আছে,—"উবটন হরিদ্রা মাথায় বেহুল্যার অঙ্গে"।

উর্ব্বন—বমি। উল্যা—উলু (খড়)। উল্ক্যাপাত—অদ্ভুত লোক (অবজ্ঞায়, উপহাসে)।

উড়োল—মৎস্যবিশেষ, সর্ব্বদাই জলের উপর সন্তরণ করিয়া বেড়ায়।

উস্‌নো (চাল)—উষ্ণ শব্দজাত। সেদ্ধো চাল (দ)।

এ, ও

এও—মাতামহী। এল্‌পোন্‌—আলিপনা। এস্‌ক্যা—তণ্ডুল-চূর্ণে প্রস্তুত কৃটির ন্যায় খাদ্যবিশেষ। আ'স্‌কে (দ)।

এঁঠো, জুঠ্যা—উচ্ছিষ্ট ও সোক্‌রি (দ) উভয় অর্থেই প্রয়োগ হয়।

এঁঠ্যাল—এঁটেল (দ)। এঁঠ্যাতল—যেখানে উচ্ছিষ্ট ফেলা হয়।

ওকি—বমি। দক্ষিণাঞ্চলে বমির চেষ্টা অর্থে উকি কথার প্রয়োগ হয়।

ওখো'ল—(সং) উদূখল, (প্রাং) ওক্‌খল।

ওত—আড়াল। (সং) একান্ত, (প্রাং) ওঁত।

ওয়—শেষ। ওল্‌হান—গোরুর বাঁটের উপরিস্থিত উচ্চ অঙ্গ।

ওসার—(হি) বিস্তার।

ক

কচাল—তর্ক, বিবাদ। কদ্‌ব্যাল—কপিত্থ।

কর্ত্তাবাবা, কর্ত্তামা—মাতামহ, মাতামহী, পিতামহ, পিতামহী।

কল্লা—(১) ভাণ, ছল। (২) তিক্ত ফলবিশেষ, এই অর্থে "কর্ল্লা"রূপেও উচ্চারিত হয়। দক্ষিণাঞ্চলের উচ্ছে ও কর্ল্লা এ দিকে পুঁটুল্যা কল্লা ও চৈঁয়া (চাঁই শব্দজাত) কল্লা।

কাকা—খুল্লতাত ও জ্যেষ্ঠতাত উভয় অর্থে। শিশু (দ) "খুড়া জ্যেঠা" অপেক্ষা "কাকা" কথা সহজে উচ্চারণ করিতে পারে। যে সকল নিকট আত্মীয়কে শিশু প্রায়ই নিকটে দেখে, তাঁহাদের নাম শিশুর ভাষায় একবর্ণজাত; যেমন মামা, বাবা, দাদা, দিদি ইত্যাদি।

কাগজা, কাগ্‌জী (লেবু)—(দ) কাগ্‌জী, পাতি।

কাঙ্‌নী—কঙ্কণ। কাজিয়া—বিবাদ।

কা'ট—(তেলের) সরিষার তেলের পাত্রে যে ময়লা জমে।

কাঠা—(১) বেত্রনির্ম্মিত ক্ষুদ্র আধার, পূর্ব্বে কাষ্ঠের হইত। (দ) খুঁচি কুনকে। (২) জমীর মাপ ৩২০ বর্গ হাত।

কাঢ়া—(১) সং ক্বাথ, প্রাং কাঢ়। (দ) পাচন। (২) ব্যবহার করা; যেমন—হাঁড়ি কাঢ়া, রা কাঢ়া (কথা কহা)।

কাঢ়াই—সং কটাহ, প্রাং কড়াহ। (দ) কড়াই, কড়া। ইহা লৌহ, পিত্তল, কিম্বা মৃত্তিকার হইতে পারে।

কাতারি—মৃণ্ময় ক্ষুদ্র পাত্রবিশেষ, অম্ল দই জমাইবার জন্য বেশী ব্যবহার হয়।

কাতি—কাটারি অপেক্ষা ক্ষুদ্র লৌহাস্ত্র।

কান্তি—কটাহ (লৌহের)।

কান্‌টা—কানাচ (দ)। বাড়ীর পশ্চাৎ দিক্‌।

কানি—পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।

কাদা মাছ—বা'ন মাছ (দ)।

কাবারি—বাখারি (দ)।

কাম (হি)—কর্ম্ম।

কাম্‌হাই—অনুপস্থিতি।

কাম্‌রা—ধনীর সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ (বৈঠকখানা)। ইং chamber বা camera হইতে।

কালাই—মাষ কলাই (দ)। এই "মাষ কলাই"এর "কলাই" দক্ষিণাঞ্চলে কোথাও "কড়াই" হয়। কলাই শব্দে ছোলা, মটর, মসুর প্রভৃতিকে বুঝায়। কিন্তু কালাই কথার সেরূপ প্রয়োগ নাই।

কাহানী—কাহিনী। উপকথা (দ)।

কাহিল—পীড়িত। দক্ষিণাঞ্চলে কোথাও কোথাও 'দুর্ব্বল' অর্থে প্রয়োগ আছে।

কাহট্যাল—বিবাদ।

কিপ্পোন—কৃপণ।

কিফ্যাৎ—লাভ, সুলভ।

কিয়ারি—(১) কুকুর, গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর ঘা হইলে আরোগ্য জন্য মন্ত্র প্রয়োগ। মন্ত্র-প্রয়োগকর্ত্তাকে পীড়িত পশুর নিকট যাইতে হয় না। (২) পুষ্পোদ্যানের আলবাল।

কিরা্যা—শপথ। হিং কিরিআ।

কিষ্‌ষ্যাণ—কৃষাণ।

কুঠি—(১) বড় কারখানা, যেমন রেশম কুঠি। (২) যেখানে তেজারতি কারবার হয়। (৩) কাঁচা মাটির তৈয়ারী শস্য রাখিবার আধার।

কুঢ্যা—অলস। (দ) কুড়ে, কুঁড়ে।

কুঢোল—কুঠার।

কুঠৈ—কোন স্থানে, কোন ঠাঁই।

কুদা (হিং)—লাফান।

কুমঢ্যা—(১) হিং কোঁহোরা, সং কুষ্মাণ্ড। ভত্যা (হিং ভতুয়া) ও সুজ্জুভেদে দুই প্রকার; দক্ষিণাঞ্চলে প্রথম প্রকার দেশী, ছাঁচি বা চাল কুমড়ো, ২য় প্রকার বিলিতি কুমড়ো। (২) নৌকার এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত উপরের লম্বা কাষ্ঠখণ্ড।

কুহর্যা—ভাণ।

কুশো'র—ইক্ষু।

কেস্তা—কা'স্তে (দ)।

কোআ—রেশম-কীটের কোষ।

কোঠা—খড়ের ঘরের মাটির ছাদ। কোঠায় জিনিষ-পত্র রাখা চলে।

কোত্তি—কোথায়।

কোথু—কোথাও।

কোদা—(১) তৃণজাতীয় শস্যবিশেষ। (হিং) কোদো। (২) হাম ব্যাধি।

কোদোল—সং কুদ্দাল।

কোপ্‌ট্যা—ছোট সরা। দক্ষিণাঞ্চলে যে সকল কার্য্যে মাটির "খুরি" ব্যবহৃত হয়, এ দিকে সেই কার্য্যে "কপ্‌ট্যা"র কাজ হয়।

কোপ্‌রা—নদী গ্রীষ্মকালে দূরে চলিয়া গেলে যে গর্ত্তে জল সঞ্চিত থাকে।

কোপা—ছাদ পিটিবার 'পিটুনে' (দ)।

কোবিত্তর, কোইতর—(হিং) কবুতর। (দ) পায়রা।

কোয়্যা, কোয়া—কাক।

কোরমী—দেধানের গাছ, দেখিতে ভুট্টা বা মকাই গাছের ন্যায়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য উৎপাদিত হয়।

কোলবর—নীত-বর (দ)।

কোলগ্যা—কলিকা (ধূম পানের)। (দ) কোলকে।

কোহিন্ত্যা—কনুই (দ)। সং কফোণি, প্রাং কহোণি সম্ভব।

কঁচ্যা—(১) ছোট থলি। (২) কেঁচো (দ)।

কাঁক্যাল—কটি।

কাঁকিল্যা—সরু লম্বা আকারের মৎস্যবিশেষ।

কাঁকোই—চিরুণী। সং কঙ্কতিকা, হিং কাঙ্ঘোই।

কাঁঠাল—কাঁটাল (দ)।

কাঁথি—খোলা চালার মধ্যে রান্না-ঘর হইলে গৃহস্থেরা প্রায়ই ২।৩ দিকে ২॥০ হাত আন্দাজ উচ্চ মাটির প্রাচীর স্বহস্তে নির্ম্মাণ করে। ইহাই কাঁথি।

কাঁড়ি—কোঠা অর্থাৎ মাটির ছাদের নিম্নস্থ বাঁশ, কিম্বা কাঠের কড়ি।

কুঁজ্‌র্যা—খুচরা তরকারী-বিক্রেতা। ফ'রে (দ)।

কুঁড়্যা—কুটীর, (দ) কুঁড়ে। এ দিকের কুঁড়ে নৌকা বা গো-গাড়ীর ছই এর ন্যায়। দক্ষিণাঞ্চলে খড়ের ক্ষুদ্র ঘরকে কুঁড়ে বলে।

কুঁহা—কোয়াসা (দ) কুজ্‌ঝটিকা।

কুঁয়া—কূপ। পাতকো (কলিকাতার)।

কেঁল্যাই, কেউরী—কেল্যাই (দ)।

কোঁখা—কক্ষ। সং কুক্ষা শব্দজাত।

খ

খঞ্চা—কাঠের থালা। বারকোষ (দ)।

খন্তা—মৃত্তিকা খননের শস্ত্র। ইহার ফলার সহিত কাঠের হাতল থাকে।

খরা—গ্রীষ্মকাল।

খর—খদির (সং)। প্রাং খইর।

খরচা (মাছ)—চুণো মাছ (দ)।

খাচ্ রা—দুষ্ট। সং খচ্চর শব্দজাত।

খাজুর—খর্জ্জুর (সং)। পূর্ব্বে সাধু ভাষায় রাঢ়ে খাজুর ছিল, এখন খেজুর হইয়াছে। প্রাং খজ্জুর হইতে খাজুর হইবার কথা। আদিতে একার আসিতে পারে না।

খাট—সং খট্বা। দড়ির খাট।

খাপ্ রা (হিং)—খোলা (দ)। যথা—খাপ্ রার ঘর।

খাবোল—গ্রাস।

খাম্বা—সং স্তম্ভ, প্রাং খম্ভো। থাম (দ)।

খান্‌গী—বেশ্যা।

খানোখা—অনর্থক।

খ্যাঁর—ঘর ছাইবার খড়, পশ্বাদির খাদ্যকে এ দেশে খ্যার বলে না।

খাস্‌তান—শ্রান্ত হওয়া। ফাং ভাষায় খাস্ত্ অর্থে আহত হওয়া।

খিটক্যাল—ময়লা।

খীর—পায়স।

খীরস্যা—ঘনাবর্ত্তিত দুগ্ধ, খীর (দ)।

খিয়্যা (হিং)—শশা।

খুর‍্যা—(১) গরুর পায়ের ঘা। (২) খাট বা তক্তাপোষের পায়া।

খুরি—ধাতুর ছোট বাটি।

খুর্সি—টুল।

খেস্যাল—কলহপ্রিয়। স্ত্রীলোকের প্রতি প্রযুক্ত হয়।

খোরা—ধাতুর বড় বাটি।

খোরি (মাছ)—খয়রা মাছ (দ)।

খোরোট—মাটির ঘরের দেয়ালে মাটির প্রলেপ দিয়া মসৃণ করা।

খোস্‌কা—ডুমুর (দ)। দক্ষিণাঞ্চলের যজ্ঞডুমুর, এ দেশে ডোমো'র।

খাঁকার (হিং)—গয়ের (দ)।

খিঁচরী (হিং)—খেচরান্ন।

খুঁট্যা—খোঁটা (দ)।

খুঁতি—ছোট থলি।

খোঁটা—নিন্দা। ভারতচন্দ্রে প্রয়োগ আছে।

গ

গড্যা—সং গর্ত্ত, প্রা° গড্ড। ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোবা (দ)।

গঢ়োন—গঠন। প্রাকৃত ভাষায় অনাদিস্থিত ঠ স্থানে ঢ হয়। দক্ষিণাঞ্চলে ঢ়-কারের উচ্চারণ নাই, সে স্থানে ড় হয়।

গন্ধভাজিল্যা—গাঁদাল পাতা (দ) (?)।

গল্‌হোই—নৌকার অগ্রভাগ।

গলাসী—গরুর গলার দড়ি।

গস্ত—দোকানের দ্রব্য লইয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয়। বাসনের দোকানদারে এ কথা বেশী ব্যবহার করে। কলিকাতায় ছোট দোকানদারে পাইকারী মাল খরিদ করাকে গস্ত করা বলে।

গহম্—গোধূম। হিং গেহুঁ।

গহমা—বিষধর সর্পবিশেষ, খ'য়ে গোখ্‌রো (দ)।

গহান্—পথ, মুসলমানেরাই ব্যবহার করে।

গহ্না—গ্রহণ (চন্দ্র-সূর্য্যের)।

গা—গিয়ে, গে (দ)। ক্রিয়ার সহিত ব্যবহার করা হয়; যথা—করগা = কর গিয়ে, করগে (দ)। আসন্ন ভবিষ্যতে আদেশ বা অবজ্ঞায় ব্যবহার হয়।

গাওনা—দ্বিরাগমন, (দ) ঘর বসত।

গাছষষ্ঠী—অরণ্যষষ্ঠী।

গাজোল—বাদল।

গাঁজ্‌ল্যা—গেঁজে (দ)। মোটা সূতার থলিবিশেষ, ইহাতে টাকা পয়সা রাখিয়া কোমরে বাঁধা হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকে ব্যবহার করে।

গাঁজিল্যা—শিয়ালকাঁটা।

গাধা পুন্ন্যা—পুনর্নবা।

গাভ্‌রা—পুং বিড়াল।

গায়া—ইষ্টকালয়ের গাঁথনী করিবার কর্দ্দম।

গাড়া—পোঁতা (দ)।

গাঢ়া—গর্ত্ত।

গারোরি—মেষপালক জাতি।

গারোল—বৃহৎজাতীয় মেষ।

গালা, গালান্—(দ) গুলি, গুলো, গুলিন্।

গিথ্যান্—গৃহিণী।

গিন্নার—অহঙ্কার।

গিধ্নী—গৃধিণী।

গিরস্তালী—গৃহস্থালী।

গিড়োন—গ্রহণ (চন্দ্র-সূর্য্যের)।

গুচ্চের—অনেকগুলি। সংখ্যাধিক্যে অসন্তুষ্ট হইলে প্রয়োগ হয়।

গুচ্ছি—ডাংগুলি, ভাঁটা আদি খেলিবার ক্ষুদ্র গর্ত্ত।

গুজ্যার—খেয়াঘাট, ফাং গুজারা।

গুঠি—(১) আঁঠি, (২) দাবা পাশার ঘুটি (দ)।

গুঠিং—ক্ষুদ্রাকারের গোল পাথর, ইহা রাস্তায় দেওয়া হয় ও ইহা পোড়াইলে চূণ হয়। ঘুটিং (দ)।

গুড্ডি (হি)—ঘুরি (দ)।

গুদ্দ্যা—শাঁস (দ)। ফলের মধ্যস্থ শস্ত।

গুধ্যা, গুধি—খোকা, খুকি (দ)।

গুল্ল্যা—গুল্‌ফ।

গুলি—ক্ষুদ্র গোলাকার পদার্থ। (১) আফিমের গুলি। এই অর্থে "মদক" (হিং) শব্দেরও ব্যবহার হয়। (২) খেলিবার গুলি, পূর্ব্বে গালার হইত, (৩) বন্দুকের গুলি। গোলা শব্দে ক্ষুদ্রার্থে ই প্রত্যয়। হিন্দিতে এখনও "গোলি" বলে।

গুড়—তিন প্রকারের গুড় ব্যবহৃত হয়। (১) চাকী—পশ্চিম হইতে আমদানী, কড়া পাক করিয়া নামাইয়া কাঠের পাত্রে ঢালা হয়। জমাট বাঁধিয়া গেলে বিক্রয় হয়। (২) ভেলি—বড়ই অপরিষ্কার, আকের পাতা ও ডাটা গুড়ে মিশ্রিত থাকে। চাকীর ন্যায় জমাট, কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র ও গোল। (৩) সারো—দক্ষিণাঞ্চলের দানাদার তরল গুড়।

গুষ্টি—পিতা; পূর্ব্বপুরুষ। বংশ।

গুহ্য—স্বপক্ষের খেলোআড়।

গোকুল (ফুল)—বকপুষ্প।

গোটকুন—গড়াই মাছ (দ)।

গোরো—গৌরবর্ণ।

গোলা—(১) গৃহস্থের শস্য রাখিবার স্থান। ইহা দরমা বা চাটাই দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। উপরে খড়ের ছাউনি থাকে। (২) আড়ত।

গোসা, গোঁসা—ক্রোধ। এ দেশের উপকথার রাজপুত্র "গোঁসা-ঘরে" শয়ন করিত।

গোহিল—গোশালা, গোয়াল (দ)।

গাঁধি পোকা—পেদো পোকা (দ)।

গিঁট, গিঁট্যা—গ্রন্থি।

গিঁট বন্ধন—বিবাহকালে পাত্র-পাত্রীর বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন। গাঁটছড়া (দ)।

গুঁড়্যা—গবাদি পশুর খাদ্যরূপে চৈতালির শুষ্ক গাছের চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। ভুষি (দ)।

ঘ

ঘরামু—ঘরামি (দ)।

ঘিষ্ট্যান—ঘর্ষণ।

ঘিস্‌ক্যাপ—সূত্রধরের যে অস্ত্রে কাষ্ঠের পৃষ্ঠ সমতল করা হয়।

ঘোরাচি—ঝাড়-লণ্ঠন জ্বালিবার জন্য সিঁড়িযুক্ত কাষ্ঠের উচ্চ মঞ্চ।

ঘোর‍্যা—বোআল জাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। ইতর লোকে খায়।

ঘোর‍্যাল—মেছো কুমীর (দ)। ঘরিআল (হিং)।

ঘোসি—ঘুঁটে (দ)।

চ

চঠোই—চড়ুই পাখী।

চাকৃতি—রুটি লুচি বেলিবার গোল কাষ্ঠখণ্ড। চাকা (দ)।

চাকিয়া—জলপান করিবার কাংস্য পাত্রবিশেষ।

চাকু—ছুরি।

চাখা, চাখ্‌নী—আস্বাদন।

চাট—(১) পশ্বাদির পদাঘাত। (২) নেশাখোর (মাতাল, গুলিখোর) নেশা করিয়া যে আহার্য্য খায়।

চাটাই—দরমা। বাঁশ, নল ছেঁচা, তালপত্র বা খর্জ্জুরপত্রের চাটাই হয়।

চাপোর—করতল দ্বারা প্রহার।

চাব্‌কি—ঘুন্‌সি (দ)।

চাভাল—চোআল (দ)।

চাভুক্—চাবুক্ (দ)।

চাভি—(১) জালবিশেষ। (২) তালা খুলিবার চাবি (দ)। বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া অঞ্চলে এই অর্থে চাবিকাটি, কাটি বা খাটি বলে।

চামচিক্যা—চর্ম্মচটিকা।

চালা—(১) সাধারণতঃ প্রাচীরহীন খড়ের গৃহ। ইহার এক দিকে প্রাচীর থাকিতে পারে। (২) শব্দ ; যেমন—চালা কর = শব্দ কর = ডাক।

চালি—(১) প্রতিমার চালচিত্তির (দ)। পশ্চিমাঞ্চল হইতে শালকাষ্ঠ নৌকার সহিত বাঁধিয়া ভাসাইয়া লইয়া আইসে। ইহাকে কাঠের চালি বলে।

চালোন—চালুনী (দ)।

চিথো'ল—মৎস্যবিশেষ।

চিন্‌হ্যায়—পরিচয়।

চিন্‌হো—চিনিয়া লও।

চিহ্নোৎ—চিহ্ন।

চিপো—নিঙরাও (দ)।

চিমর‍্যা—যাহা সহজে ভাঙ্গা যায় না। যেমন চিম্‌র‍্যা কাঠ, চিম্‌র‍্যা মুড়ি (দঃ মিওনো মুড়ি)।

চিম্মু—খেলিবার সময় যে প্রবঞ্চনা করে।

চিয়ান—জাগান।

চিয়ারি—বাঁশের ধারাল ত্বক্‌।

চির‍্যা—চিঁড়ে (দ)।

চুক্যা—অম্ল শাকবিশেষ।

চুকোই—বাসনের আকারের ছেলেদের মাটির খেলানা।

চুনকাম—কোলি ফিরান (দ)।

চুন্‌হারি—চুন প্রস্তুতকারক।

চুমুক—পিতলের ক্ষুদ্র জলপাত্র।

চোআ—তামাক মাখিবার আকের গুড়ের মাৎ।

চোকোর—গমের জাঁতা-ভাঙ্গা আটা চালিয়া লইলে যে ভুষি (দ) হয়।

চোঙ্গা—এক পাব্‌ বাঁশের এক দিকের গাঁট কাটিয়া ফেলিলে যে পাত্র হয়। তৈলিক তৈল বিক্রয়ের সময় মাপরূপে ব্যবহার করে। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের চোঙ্গা গোআলারা ব্যবহার করে।

চোটকি—চর্ম্মপাদুকাবিশেষ। পদতলের আকারের এক খণ্ড মোটা চামড়ার কয়েক স্থানে চামড়ার ফিতা লাগাইলে ইহা প্রস্তুত হয়।

চোত্যালি—চৈত্র মাসের ফসল; যেমন—ছোলা, মটর, গম ইত্যাদি।

চোপা—চেহারা। দুর্ব্বল বা পীড়িত ব্যক্তির চেহারাতেই বিশেষরূপে প্রযুক্ত হয়।

চোপোর (রাত)—চারি প্রহর অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি।

চৌকী—(১) তক্তাপোষ (দ)। (২) পাহারার স্থান, পাহারা দেওয়া।

চ্যাওরা—বিস্তৃত।

চ্যাঙ্‌রা—ছেলে মানুষ।

চ্যাঙ্‌রামু—ছেলে-মানুসি (দ)।

চ্যালা—(১) ক্ষুদ্র মাছবিশেষ। (২) জ্বালানি কাঠের লম্বা টুক্‌রা।

চ্যাল্‌হা—সন্ন্যাসীর শিষ্য।

চঁদোণী—রাঁধুনী (দ) মশলা।

চাঁঙারি—বাঁশের বেতির প্রস্তুত ঝরি।

চাঁছি—(১) ঘন বা শুষ্কপ্রায় ক্ষীর। (২) দুধ আওটানর পরে কড়াইয়ের গায়ে যাহা লাগিয়া থাকে।

চোঁকা—ফলের ত্বক্।

ছ

ছরোৎ—খাটিবার শক্তি।

ছাৎ—ছাদ।

ছাতা—ছত্র, ছাতি (দ)। এ অঞ্চলের "ব্যাংএর ছাতা" বর্দ্ধমানে "ছাতু"। এই ছাতু বর্দ্ধমানে রাঁধিয়া খায়। বিহারেও লোকে খায়। এ অঞ্চলের লোকে ইহা খাওয়া দূরের কথা, অস্পৃশ্য জ্ঞান করে।

ছাহা—ছাওয়া (দ)। যেমন ঘর ছাহা, দড়ির খাট ছাহা।

ছাপ্পোর (খাট)—পালঙ্ক।

ছিট্যাস্ লাগা—খাল ধরা (দ)।

ছিস্তার—নষ্টা স্ত্রীলোক।

ছিপি—ছোট থালা।

ছিম্‌রি, ছিমি—শুঁটি (দ)।

ছিল্‌ক্যা—ফলাদির সরু ত্বক্।

ছুটি (সজিনার)—খাড়া (দ)। ডাঁটা (বর্দ্ধমানে)।

ছুআছুৎ—অপবিত্র স্থানে গমন হেতু অস্পৃশ্য।

ছুল্লু—যে ছেলেমান্‌সি করে।

ছেঞ্চ্যা—ছাঁচতলা (দ)।

ছেয়তন্—সপ্তপর্ণ (সং), ছত্তিবন্ন (প্রাং), ছাতিম (দ)।

ছোটি—প্রসূতির ষষ্ঠ দিবস। (প্রাং) ছট্‌ঠি।

ছ্যাওআ—উদূখল।

ছ্যানা—দুগ্ধের ছানা (দ)।

ছঁওকান—সাঁৎলান (দ)।

ছ্যাঁচা—সত্য।

ছিঁক—হাঁচি।

ছেঁচ্‌কি—খুন্তি (দ)।

ছেঁক্র্যা—ছায়া।

জ

জঞ্জাল—বিপদ্।

জল-কাঁথি—জলের কলসীর জন্য উচ্চ মৃন্ময় বেদী।

জল্‌হোই—নৌকার তক্তা আঁটিবার পেরেক।

জাওন—মাটির দেওয়াল বা প্রাচীরের জন্য প্রস্তুত কর্দ্দম।

জাগ—(১) কাল রঙ্গের পায়রা। (২) গাছে ২।৪টি আম পাকিলে অবশিষ্ট কাঁচা আম পাকিবার জন্য ঘরে পাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখা।

জাগা—স্থান। জায়গা (দ)।

জাফ্‌রি—ক্ষুদ্র চারা গাছকে পশ্বাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাখারি বা কঞ্চির ঘেরা।

জামা—ছত্রি বা রাজপুত জাতির বিবাহে বরের জামা। ইহার নিম্নভাগ ঘাগ্‌রার ন্যায়, উপরিভাগ চাপ্‌কানের মত। পৌরাণিক চিত্রে রাজাদিগের গাত্রাবরণ এইরূপ দেখা যায়।

জামাল গোঠা—এক প্রকার গুল্ম, বেড়া দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণাঞ্চলে ইহাকে "ভ্যারাণ্ডা" বলে। নদীয়ায় "কচা"। এ অঞ্চলে "এরণ্ড"কে "ভ্যারাণ্ডা" বলে।

জাল মাছ—চিংড়ী।

জাংহ্‌—(জঙ্ঘা শব্দজাত) উরু।

জিআলা—জিউলী (দ)। চালার খুঁটিরূপে ব্যবহৃত হয়। এ গাছগুলি আমড়াজাতীয়। ডাল কাটিয়া লাগাইলেই গাছ হয়। সহজে মরে না বলিয়া জী(ব)আলা নাম হইয়া থাকিবে।

জিওল—শিঙ্গী মাছ।

জিজ্যা—ভগিনীপতি। কেবল ছত্রি জাতি কথাটি আহ্বানেও ব্যবহার করে। দক্ষিণাঞ্চলে ভগিনীপতিকে ডাকিবার সময় কোন সম্বন্ধবাচক শব্দের ব্যবহার হয় না। উপাধির পরে "মহাশয়" বা "মশায়" শব্দের ব্যবহার হয়। কোন বালকের ভগিনীপতিকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"উনি তোমার কে?" দক্ষিণাঞ্চলের বালক উত্তর করিয়াছিল,—"উনি আমার মিত্তির মোশায়"।

জিতুয়া—জিতাষ্টমীব্রত।

জিদ্দি—(ফাং) জিদ্দ্‌। আবদার (দ)।

জিম্মা—কাহারও রক্ষণাধীনে রাখা।

জিল্‌পী—মিষ্টান্নবিশেষ। জিলিপি (দ)।

জুয়ায় না—করা উচিত নহে।

জো—উপায়।

জোখা—মাপ।

জোল্যা—আম আনিবার জন্য দড়ির ঝোলা।

জুঁহি—(সং) যুথী, (প্রাং) জুহী, (দ) জুঁই ফুল।

ঝ

ঝারি—গাড়ু।

ঝাঁঝা—ছাঁকনা (দ)।

ঝাল—(১) ঝাল আস্বাদ। (২) ডাল্‌নার ন্যায় তরকারী।

ঝালপাত—তেজপাত।

ঝাল-ঝোপ্‌পা—যে গাছের ডাল উচ্চে নাই, তাহার ডাল হইতে লাফাইয়া একরূপ খেলা।

ঝুন্‌ক্যা—মালসার ন্যায় ক্ষুদ্র হাঁড়ি।

ঝুরি—তেলে-ভাজা গুড়ে পাক করা বেশনের মিষ্টান্ন। (বর্দ্ধমানে) সিঁড়ি।

ঝাঁপ—আগর (দ)।

ঝাঁজ্‌রি—ছিদ্রবিশিষ্ট মাটির হাঁড়ি। মুড়ি ভাজিবার সময় ব্যবহার হয়।

ঝিঁক্‌রান—নাড়া দেওয়া।

ঝুঁটি—খোঁপা (দ)।

ঝেঁট্যান—ঝাঁট দেওয়া আবর্জ্জনা।

ট

টাট—দোকানদারের গদি বা বসিবার স্থান।

টাটি—দরমার প্রস্তুত বেড়া।

টাপ্পোর, টপ্পোর—ছোই (দ) (গাড়ী বা নৌকার)।

টিক্‌লি—(হিং) টিকুলী। টিপ ? (দ)।

টুসি—ডগা (দ)।

টোকা—ধুচুনী (দ)।

টোক্‌রা—বলদকে জাব দিবার জন্য গোগাড়ীর গাড়োয়ানেরা বড় চাঙারির ন্যায় এক প্রকার আধার ব্যবহার করে। ইহাকেই টোক্‌রা বলে। ইহাতে জল দিলেও পড়ে না।

টোস্তা—শুক্‌নো (আম)।

ট্যাংরা—মৎস্যবিশেষ।

ট্যাঢ়া—বক্র।

ট্যারা—যে একটু বক্রদৃষ্টিতে দেখে।

ঠ

ঠসা—বধির।

ঠাট—রঙ্গ, কৌতুক।

ঠায়ো—দণ্ডায়মান। (হিং) ঠহর।

ঠাওরাও—থামো।

ঠিলি—পিতলের ক্ষুদ্র কলসী।

ঠুসি—আম পাড়িবার জালি।

ঠোঙা—পাতার আধার। দোনা (দ)।

ঠাঁই—স্থান।

ড

ডর—ভয়। ডরফুক্‌না—ভীরু, ভয়-তরাসে (দ)।

ডণ্ডোবৎ—প্রণাম।

ডহরা—নৌকার খোল

ডহোর—তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত রাজপথ।

ডাণ্ঠাফুতি—ডাংগুলি (দ) খেলা।

ডাহুক—ডাক (পাখী)।

ডাঙ্গা—স্থল। (দ) ড্যাঙ্গা।

ডানকুনি—স্রোতের মুখে নাতিবিস্তৃত জলধারা আটকাইয়া মৎস্য ধরিবার ফাঁদ।

ডাব্‌ঠি—তালি (দ) (বস্ত্রের)।

ডাবোর—পাথরের বড় বাটী।

ডাব্‌রি—ঐ ছোট, ক্ষুদ্রার্থে "ই" প্রয়োগ।

ডাহিন—(১) ডাইনী (দ), সং ডাকিনী। (২) দক্ষিণ (সং)। দাহিণ (প্রাং)।

ডুম্‌নি—পগারের পাশের প্রণালী।

ডিহি—(১) এক তৌজিভুক্ত বিভিন্ন গ্রাম লইয়া জমীদারির অংশ। (২) পরিত্যক্ত উচ্চ বাস্তুভূমি। ভিটা (দ)।

ডিব্যা—কৌটো (দ)। (হিং) ডিবিআ।

ডেহোল—দয়েল পাখী (দ)।

ডেল্‌হারি—যাহারা দাইল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। যখন রেল হওয়ার পূর্ব্বে পশ্চিমের মাল লইয়া নৌকা যাতায়াত করিত, তখন জঙ্গিপুরে টোল আদায় হইত বলিয়া মাঝিরা এইখানে খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিত। সেই সময় এই ডেল্‌হারির দল ভাগলপুর অঞ্চল হইতে আসিয়া জঙ্গিপুরে উপনিবেশ স্থাপন করে।

ডেহুরী—ধনীদিগের কাছারী-বাড়ীর সদর দ্বার।

ডোরা—লাল রঙ্গীন রেশমের মোটা সূতা। এই ডোরা হাতে বাঁধা হয় বলিয়া সূর্য্যের ব্রতকে "ডোরা খোলা" ও "ডোরা বাঁধা" বলে।

ডোমোর—যজ্ঞডুম্বুর।

ডোল—কূপ হইতে জল তুলিবার লৌহ পাত্র।

ড্যাহোর—ক্রমশঃ, পর পর।

ড্যাঙ্গারো—কলহ।

ডাঁরা—গঙ্গার পার্শ্বস্থ স্বাভাবিক খাল।

ডাঁরি—ডেঙ্গো ডাঁটা (দ)।

ডাঁ'রঘরা—বাড়ীর ভিতরের লম্বা চালা-ঘর।

ডাঁ্যাকা—সাপের ছানা। হুগলীতে সোলুই।

ঢ

ঢাকি—বৃহদাকার ঝুরি।

ঢেরি—স্তূপ।

ঢোলাই—ঢোলের বাদ্য সহযোগে ঘোষণা। ঢ্যাঁরা (দ)।

ঢোক্—তরল দ্রব্য একেবারে যতটুকু পান করা যায়।

ঢেম্নী—উপপত্নী।

ঢিঁস্ক্যাল—ঢেঁকিশালা।

ঢুঁরা (হি)—অনুসন্ধান করা।

ঢ্যাকা—ধাক্কা।

ঢ্যাকার—উদ্গার। ঢোঁআ ঢেকুর (দ)=এ দিকে "খয়া ঢ্যাকার"।

ত

তক্ (হি)—পর্য্যন্ত।

তক্রার (হি)—তর্ক। বর্দ্ধমানে "তক্রাজ"।

তরা—যখন গ্রীষ্মকালে নদীতে এত কম জল থাকে যে, হাঁটিয়া পার হওয়া যায়, তখন লোকে বলে,—নদীতে "তরা" পড়িয়াছে।

তহো—ভাঁজ। (সং) স্তবক।

তাই—মাটির কড়া। তিজেল (দ)।

তাক্—কোলোঙ্গা (দ)।

তাকা—দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

তালবীচি—তাল-শাঁস (দ)।

তাহোই—ভাই বা ভগিনীর শ্বশুর।

তারাজু (হি)—দাঁড়ীপাল্লা।

তারোআল—তরবারি।

তালাই—তালপত্রের চাটাই।

তীর-বয়্গা (হি)—কোড়ি বয়োগা (দ)।

তিষ্‌য়া—তৃষা।

তুমার, তুমাকে—তোমার, তোমাকে।

তুমরি—তুবড়ি (দ)।

তোস্বীর (হি)—বাঁধান ছবি।

ত্যানা—ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।

থ

থয়লা—বস্তা।

থাও—থা (দ)। ডুব-জলে মাটি নাগাল পাইলে "থাও" পাওয়া বলে।

থুক—থুতু (দ)। এ অঞ্চলে একেবারে ফেলে, তাই "থুক্", আর দক্ষিণাঞ্চলে দুই বারে ফেলে তাই "থুথু" কি ?

থুৎনী—চিবুক।

থুব্র্যা—অব্যূঢ়।

থোকা—গুচ্ছ।

থোআ—রাখা।

দ

দঢ়ো—(সং) দৃঢ়, (প্রাং) দঢ়। দড়ো (দ)।

দরোদ (হি)—ব্যথা।

দুরমাহা (হি)—বেতন।

দাই—ধাত্রী।

দর্পোণ—পিতলের দর্পণ। বিবাহে বর হস্তে করিয়া লইয়া যায়। ইহা নাপিতেরা রাখে। কাঁচ আবিষ্কারের পূর্ব্বে এইরূপ দর্পণেই লোকে মুখ দেখিত। বর মাঝে মাঝে মুখ দেখিবার জন্য সঙ্গে রাখিত। এখনকার এ দর্পণে আর মুখ দেখা যায় না। ইহা প্রথা মাত্র দাঁড়াইয়াছে।

দা, দাও—কাটারি।

দাউলী—ছোট কাটারি।

দাগ (হি)—চিহ্ন।

দাল—ডা'ল (দ)। দিক্ (হি)—বিরক্তি। দিঘল—দীর্ঘ।

দিলোই, দিল্লি—দিউলী (দ), মৃণ্ময় ক্ষুদ্র দীপ।

দিপগাছা—দে'লকো (দ)।

দিয়ার—নদীর চড়া। (দ্বীপচর হইতে ?)।

দিস্তা—ঠিকানা।

দুপ্‌প্রহোর—দ্বিপ্রহর।

দুমুঠি—দোপাটি (ফুল)।

দুআর—দ্বার।

দুব্র্যা—দুর্ব্বা।

দোম্‌রান—দু-ভাঁজ করা।

দোর্যুন—পলা (তেলের)।

দোহিল—দয়েল (পাখী)।

দোহোর—দুখানি মোটা সুতি চাদর (এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয়)।

দোহোরা—দুফেরা।

ধ

ধলো—ধবল। শাদা।

ধান্দা—কাজ কর্ম্ম।

ধুপ—ধুনো (দ)।

ধুপ্‌চি—ধুনোচি (দ)।

ধুম্যা—(১) ধুম। (২) ধুঁদুল (দ)।

ধুলোট—দোলের কিম্বা ২৪ প্রহরের পর দিন যে কীর্ত্তনের বা গানের দল বাহির হয়, তাহাতে আমোদ করিয়া লোকে পরস্পরের গায়ে ধূলা নিক্ষেপ করে। এইরূপে নগর প্রদক্ষিণ করার নাম ধুলোট।

ধোকোর—চটের বস্তা।

ন

নবান—নবান্ন।

নর মাদি—মদ্দা মেদি (দ)। পশু-পক্ষীর পুং স্ত্রী-ভেদে ব্যবহৃত হয়।

নয়ানজুলি—নর্দ্দমা (দ)। পয়োনালী।

নাতিপোতা—দৌহিত্র, পৌত্র। দক্ষিণাঞ্চলে উভয় অর্থেই "নাতি" শব্দের ব্যবহার হয়।

নাথ—দুষ্ট গরু কিম্বা মহিষের নাকে ছিদ্র করিয়া যে দড়ি বাঁধা হয়।

নাপা—ওজন ও মাপ করা উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়।

নামানি—ওলাউঠা।

নাহা—স্নান করা। (প্রাং) ণ্‌হান।

নাং—উপপতি।

নাড়া—মুণ্ডিত মস্তক। নিছনি—বরের বা দেবমূর্ত্তির পান দিয়া গাল সেঁকা। নিভ্যান—নির্ব্বাণ করা।

নিশান—পতাকা।

নিশানা—লক্ষ্য করা।

নিমকি—লেবুর আচার।

নিয়ান—বাটালি।

নিরান—শস্যক্ষেত্র হইতে আগাছা উৎপাটন।

নিষুতি—নিশীথ।

মুক্যাচুন্নি—লুকোচুরি, (দ) খেলা।

• নেপুর (প্রাং)—নূপুর।

নেঢ্যা—পাছা (দ)।

প

পচ্‌রা—খোস-পাচড়া (দ)।

পচ্‌কা—মাছ-মারা বরশা।

পটোল্লতি—পল্‌তা (দ)।

পঢ়ে—(সং) পঠতি, (প্রাং) পঢ়ই, (দ) পড়ে।

পদ্মচাকা—পদ্মের টাটি (দ)।

পরথ্‌—পরীক্ষা। বর্দ্ধমানে "পরফ্‌"।

পল্‌হোই—পীরামিডের ন্যায় মাছ ধরিবার যন্ত্র।

পলোয়ারি—কিনারা উঁচু থালা।

পাউলি—কাঁসার জলপাত্রবিশেষ।

পাগার—ক্ষেত্রের উচ্চ আলি।

পাঘা—গরুর দড়ি।

• পা'ট—মজুর।

পাটা—শিল (দ)।

পাটি—খেজুরের চাটাই।

পাস্ত—তুঁতপাতা।

পাতনা—মাটির ডাবা (দ)।

পাতান—ধানের আগরা (দ)।

পাতকাঠি—প্যাঁকাটি (দ)।

পাথ্‌রা—পাথরের থালা।

পাথ্‌রি—পাথর বাটি।

পাথাল—আড়ভাবে (দ)।

পান মিঠাই—পানের আকারের গজার ন্যায় মিষ্টান্ন।

• পান্‌সী—দীর্ঘ আরোহীর নৌকা। প্রায় ১২।১৪ খানি দাঁড় থাকে।

পানিতাওয়া—পান্তুয়া (দ)।

পাব্‌তা—ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ।

পাভ্‌রা—ডালের বা বাঁশের ছোট টুক্‌রা। আমের ন্যায় ফল, নীচে হইতে পাভ্‌রা ছুঁড়িয়া পাড়া যায়।

পায়না—কৃষকের যষ্টি।

পায়জোব—পায়ের অলঙ্কার। পাঁজোর (দ)?।

পারা—পুং মহিষ।

পারোস—পরিবেশন।

পাল্‌হান—গরুর বাঁটের উপরিভাগ।

পাশা—(১) কর্ণের অলঙ্কার, (২) খেলা।

পাসানো (মাঁড়)—গড়ান (ফেন) (দ)।

পাহাড়—যথা—ঢেঁকিতে পাহাড় দেওয়া।

পাংখা (হি)—তালের পাখা।

পিঠ্যা—পিষ্টক (সং), পীট্ঠ (প্রাং)।

পিঠ্যালী—আঁস্‌সেওড়া (দ) ও কাষ্ঠে সারহীন মধ্যমাকারের বৃক্ষবিশেষকে বুঝায়।

পিদিম—প্রদীপ।

পির্‌যান—(১) পীর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। (২) জামা (দ)।

পিল্‌হোই—প্লীহা।

পিস্‌রি—৫ সের। পসুরি (দ)।

পিহুনি—জাঁতার নিকট মোড়ার মত বসিবার মাটির বেদী।

পিহান—মাটির কুঠির মাটির গোল ঢাকনা।

পিঁর্‌যা—পীঠ (সং), পীঢ় (প্রাং), পিঁড়ি (দ)।

পিঁর্‌যা—মাটির ঘরের সম্মুখের বারান্দা।

পুআল—আউশ ধান্যের শুষ্ক খড়।

পুআলি পুআলো—বেগুণ, কপি প্রভৃতির চারা গাছ।

পুট্‌কি—মলদ্বার।

পুড়োৎ—পুরোহিত।

পুরি (হি)—লুচি (দ)।

পুল—চারাগাছ।

পুস্ত্যা—মাটির ঘরের প্রাচীরের ভিত্তি মজবুৎ করিবার জন্য পার্শ্বে মাটি দিয়া বাঁধান হয়, ইহাই "পুস্ত্যা"।

পুস্তোক্—ঘোড়ার লাথি।

পুন্‌হা—পুণ্যাহ।

পেকোর—অশ্বত্থ।

পেক্যার—পাইকার।

পেছ্যা—ঝুরি (দ)।

পেন্‌স্যা—পান্‌সে (দ)। স্বাদহীন।

পেল্যা—(১) পাইলা (ক্রিয়া), (২) বড় হাঁড়ি।

• পেহ্যা—গাড়ীর চাকা। (হিং) পাহিয়া।

পোক্তো—মজবুৎ, দৃঢ়।

পোখো'র—(সং) পুষ্কর, (প্রাং) পোক্খোর, পুকুর (দ)।

পোচ্ছিম—(সং) পশ্চিম, (প্রাং) পচ্ছিম।

পোহা—(১) শেষ হওয়া, যথা—রা'ত্ পোহাল। (২) তাপ গ্রহণ করা—যেমন আগুন পোহান।

পোলু—রেশম-কীট।

পঁহুচি—হস্তের রৌপ্যের অলঙ্কারবিশেষ; এখন প্রায় অপ্রচলিত। পৈঁছে (দ ?)।

পাঁজর—(সং পঞ্জর শব্দজাত)। পার্শ্ব (শরীরের ও স্থানের); যেমন ঘরের পাঁজরে।

পাঁহুটি—পৈঠে (দ)।

পাঁহুটা—পদচিহ্ন।

পিঁজ্‌র‍্যা—পিঞ্জর।

পিঁধ্—পরিধান কর।

পিঁধনে—পরিধানে।

. পিঁপিআ—পেঁপে (দ)।

পুঁকুর‍্যা—পোকা লাগা।

পুঁড়্যা—কৃষিজীবী জাতিবিশেষ। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পুণ্ড্র। ইহারা এখন পুণ্ডরীক বলিয়া পরিচয় দেয়।

পুঁথোল—পুঁতুল (দ)।

পোঁটা—সিক্নি (দ)।

পোঁদেরো—১৫।

প্যাট্‌রা—সে কালের বেতের বাক্স। প্যাড়া (দ)।

প্যাটারি—(হিং) পেটারি। ফানুষ (দ)।

প্যাকাম্—সঙ্‌ (দ)।

প্যাখ্‌না—ন্যাকামি (দ)।

প্যারাই—মুষ্কচ্ছেদন (গবাদির)।

ফ

ফাটক—কয়েদ (দ)।

ফাতা—মাছ ধরিবার ফাত্‌না (দ)।

ফানুষ—আকাশ-প্রদীপের নিমিত্ত অভ্রনির্ম্মিত আলোকাধার।

ফিরকি—একহারা। গাঁদা, দোপাটি প্রভৃতি ফুল সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়।

ফুট্যা—ছিদ্রযুক্ত।

ফুট্যানি—অহঙ্কার।

ফেরুয়া—জলপাত্রবিশেষ।

ফোৎ—মৃত, ধ্বংসপ্রাপ্ত।

ফোতা—উড়্‌নী (দ)।

ফোচ্‌ক্যা—ফাজিল (দ)।

ফেঁস্তার—ঘর ছাইবার ঘাসবিশেষ।

ফেঁচু—ফিঙ্গে পাখী (দ)।

ফ্যার—দাঁড়ী-পাল্লার পাষাণ (দ)।

ব

বছোর—বৎসর (সং), বচ্ছর (প্রাং)।

বজ্জাৎ (হি)—দুষ্ট।

বৎ—ব্রত।

বত্তোর—শস্যের বীজ বপনের সময়।

ব'স্তে—বেঁচে। দক্ষিণে "বেঁচে-বস্তে"র সহচর শব্দরূপে ব্যবহার আছে, পৃথক্ ব্যবহার নাই।

বরাৎ—অদৃষ্ট।

বড়্—বট বৃক্ষ। প্রাকৃতে অনাদিস্থিত ট স্থানে ড হয়।

বড়া—ফুলুরি (দ)।

বাউলি—রন্ধনের বেড়ী (দ)।

বাগুন—বেগুন (দ)।

বাচ্চা—ছানা (দ)।

বাজু—তাবিজ (দ) অলঙ্কার।

বাট্‌খারা—যাহা দ্বারা ওজন হয়।

বাট্‌পার—জুয়াচোর।

বাটা—তাম্বুল রাখিবার পাত্র।

বাড্ডা—বড়, অতিশয়।

বাৎসা—বাতাসা।

বাতাচিতি—চিতিসাপ।

বাত্তি—বাখারি

বাতি—প্রদীপ।

বাথান—গো-মহিষাদির থাকিবার উন্মুক্ত স্থান।

বাদাবাদি—বিবাদ।

বাদাম—(১) বুট, ছোলা। (২) ফল।

বান—বন্যা। জোয়ারের বান এ অঞ্চলে অজ্ঞাত।

বানানো—প্রস্তুত করা।

বানোক—রেশম প্রস্তুতের স্থান।

বাবু—(১) পিতা, (২) বড় লোক।

বাব্‌রি—লম্বা চুল (পুরুষের)।

বালুন—মুড়ি দুই প্রকারে ভাজে। ১ম প্রকার—গরম বালিতে চাউল দিয়া কুঁচি দিয়া মুড়িগুলি তুলিয়া লওয়া হয়। ২য় প্রকারে মুড়ি হইলে বালি সুদ্ধ মুড়ি ছিদ্রযুক্ত হাঁড়িতে দেওয়া হয়। এই হাঁড়িটি নাড়িলে বালি নীচে পড়িয়া যায়, মুড়ি পৃথক্ হয়। এই প্রকারে মুড়ি ভাজাকে বালুনে ভাজা বলে। ছিদ্রযুক্ত হাঁড়িটির নাম "বালুন"।

বাস্তোকি—বেতো(দ)শাক।

বাঢ়া (ক্রি)—(সং বর্দ্ধতে, প্রাং বড্ঢই) এ অঞ্চলে "গাছ বাঢ়ে", দক্ষিণে "বাড়ে"।

বাঢ়ুন—ঝাঁটা। পশ্চিমে ঝাঁট দেওয়াকে "বাহরনা" বলে।

বাহাল—স্থায়ী। হিন্দিতে বাহাল=নিযুক্ত।

বাহান—মাচা (দ)। লাউ, শশা প্রভৃতি গাছের আশ্রয়-মঞ্চ।

বাহনা—(১) ছল, ভান, (২) ধান ভানা (দ)।

বাংলা—বৈঠকখানা।

বিউনী—(১) বিনুনি (দ)। (২) বেণী।

বিকুলি—ব্যাকুলতা।

বিচোন—বীজ।

বিজ্‌লি—(সং) বিদ্যুৎ, (প্রাং) বিজ্জুলী।

বিজি—নকুল (প্রাণী)।

বিজোটা—বাজু (দ) অলঙ্কার।

বিটি—কন্যা।

বিয়াল—বিড়াল।

বিহা—বিবাহ।

বিহাই—বৈবাহিক। বিহান্—ঐ পত্নী।

বু'লতে—বলিতে।

বেকুব—(ফাং) বেওয়াকুফ্। অশিক্ষিত, অজ্ঞান।

বেগ্চ্যা—(ফাং) বাগ্চা। বাগান।

বেয়্যাল—বাগানের ফলের ক্রেতা।

বেলি—হিং বেলা। (সং) বেলফুল।

বেহুদ্যা—(ফাং) বেহুদা। নির্ব্বোধ।

বেশ্যা, বেস্তা—(১) রাসি, যাহা টাট্কা নহে, (২) ২২ সংখ্যা জ্ঞাপক ; যেমন ধোবাকে ২২ খানা কাপড় দিলে ১ বেশ্যা হয় ; মাটির প্রাচীর নির্ম্মাণের সময় একেবারে যতটা উচ্চ হয়, তাহাকে ১ রদা বলে, ইহা দৈর্ঘ্যে ২২ হাত হইলে ১ বেশ্যা বলে।

বো—বধূ (সং), বহু (প্রাং)।

বোক্রি (হিং)—ছাগল।

বোগন্না—বাসনের দোকানদার লেখে "বহুগুণা", বহু গুণ আছে বলিয়া কি ? (দ) বো'গ্নো।

বোগ্যা—কলা গাছের পাতার নিম্নের অংশ, যাহা গাছের উপরে থাকে। পেটো (দ)।

বোঠ্যা—হস্তচালিত ক্ষুদ্র দাঁড়। ব'ঠে (দ)।

বোঠি—বঁটি (দ)।

বোন্শী—বঁড়শী (দ) মাছ ধরিবার।

বোম্—বোমা (দ)।

বোরা—(১) বস্তা, (২) বরবটি কলাই, (৩) বোরো ধান।

বোর‍্যাগী—বৈষ্ণব বৈরাগী।

বোর্সী—আগুন রাখিবার জন্য কাঁচা মাটির পাত্র।

বোর্ষুন—বৃষ্টির জল।

বোল্ (কথা)—বল্ (দ), বোল্ (হিং)। ক্রিয়ারূপে স্থানে স্থানে বুল্ হয়, যেমন এ দিকে "বুলছিস, বুলবি না", দক্ষিণে "বোলছিস, বোল্বি না"।

বো'ল—বকুল।

বোল্লা—বোল্তা (দ)।

বোল্যা—(খড়মের) বোলো, বোগ্লো (দ)।

বোহিন—(হিং) বহিন, ভগিনী (সং), বুন, বোন (দ)।

বোহির‍্যা—(সং) বধির, (প্রাং) বহির।

বোহোনি—বোউনি (দ), দোকানদারের প্রথম বিক্রয়।

বোহোনু—ভগিনীপতি।

ব্যাওরা—(হিং) বেওরা, বিধবা।

ব্যাগাত্তা—মিনতি।

ব্যামো—রোগ।

ব্যায়হা—বেহায়া (ফাং), নির্লজ্জ।

ব্যাড়া—বেষ্টন।

বাঁশরা—বাঁশবন।

বাঁশী—(১) বংশী, (২) সানাই।

বাঁহিচ—(১) নৌকার বাচ (race), (২) নৌকায় বেড়ান (অল্পক্ষণের জন্য)।

বাঁহিচ্যা—ধান ছাঁটিতে দেওয়া।

বাঁহুক—বাঁক (দ)।

বুঁদি—প্রতিমা নির্ম্মাণের প্রথমাবস্থায় খড় দিয়া একটা আকার গড়ে। ইহাকে বুঁদি বাঁধা বলে। এক গোছা খড় একত্রে বাঁধিলেই বুঁদি হয়।

বুঁদিয়া—(হিং) ক্ষুদ্র গোলাকার মিঠাই বিশেষ। সং বিন্দু, হিং বুঁদ; ইহা হইতে বুঁদিয়া, দক্ষিণে বোঁদে।

বেঁঠ্যা—বেঁটে (দ)। খর্ব্বাকার।

বোঁড়্যা—(১) বিঁড়ে (দ)। (২) দাবা খেলার বোঁড়ে।

ব্যাঁক্—(প্রায়ই) নদীর বক্রাংশ।

ব্যাতাঝার—চ্যামনা (দ) সাপ।

ভ

ভ'র—সমস্ত, যেমন দিন ভ'র—সমস্ত দিন।

ভাও—দর।

ভাঁজ—ভ্রাতৃজায়া।

ভাজা—মুড়ি (চাউলের)।

ভাজি—ভাজা তরকারী।

ভাটা—ইটের পাঁজা (দ)।

ভাতখাওনী—অন্নপ্রাশন।

ভাতিজ্যা—ভ্রাতুষ্পুত্র। (ভ্রাতৃজ শব্দজাত ?)

ভাপ—বাষ্পের উত্তাপ। (প্রাং) বপ্ফ।

ভারবোল—পৌষ মাসে ইতর লোকে সন্ধ্যা বেলায় একরূপ গান গাহিয়া বেড়ায়, মাসের শেষে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা লইয়া ভোজন করে। এই গানের প্রথম পংক্তি "তোরা ভার বোল ভার বোল" ইত্যাদি।

ভিনো—ভিন্ন।

ভুক্ত্যান—শোধ (হিসাবে)।

ভুনি—কাপড়ের কোঁচা।

ভুজ্যারি—একরূপ পশ্চিমের জাতি। ইহারা সর্ব্বদা বালি গরম রাখে, কেহ শস্যাদি ভাজিতে গেলে তৎক্ষণাৎ ভাজিয়া দেয়।

ভুম্‌কুরি—বুদ্বুদ।

ভেক লওয়া—বৈষ্ণব হওয়া।

ভেট্যাল—স্রোতের দিক্।

ভেস্তিয়ে—গোলমাল ক'রে (তাস খেলায়)।

ভোগা—ফাঁকি।

ভোজ—ঘগ্‌গি (দ)।

ভোজী—বহুজী, ভ্রাতৃজায়া। এ কথাটি হিন্দুস্থানী ঔপনিবেশিকগণ ব্যবহার করে।

ভ্যাল্‌সান—মুখ ভ্যাংচানো (দ)।

ভ্যাঁড়াপোড়া—বহ্নি উৎসব (দোলে)।

ম

মট্‌কা, মোট্‌কি—মাটির বৃহৎ জলাধার, জালা (দ)।

ময়া—মৌরুলা মাছ।

মস্তো—বৃহৎ।

মহোচ্ছব—বৈষ্ণবদিগের মহোৎসব।

মাওরা—মা-মরা, মাতৃহীন।

মাকুন্দ্যা—গুম্ফবিহীন।

মা'গ—স্ত্রী।

মাচান—মঞ্চ।

মাথা'ল, মাথোল—টোকা (দ), কৃষকের বাঁশের মস্তকাবরণ।

মাদুয়ান—মাদি ঘোড়া, অশ্বী।

মারিক্‌মারা—মারামারি।

মাড়—মণ্ড (ভাতের), ফেণ (দ)।

মালকোঁচা—মল্লকচ্ছ (?), কোঁচা পশ্চাৎ দিকে গুঁজিলে "মালকোঁচা" হয়।

মালী—মালাকর।

মালোই—নারিকেলের মালা (দ)।

মাহাতাব্—রং-মশাল (দ)।

মাহোই—ভাই-ভগিনীর শাশুড়ী। সং মাতৃক (?), (প্রাং) মাউও।

মিত্যা—মিত্র। একনাম হইলে মিত্যা, নতুবা বঁধু বা বন্ধু পাতায়।

মিরক্যা—মীরগেল মাছ (দ)।

মিহোনোৎ (হি)—পরিশ্রম।

মুগ শাঁওলী—মুগের পিষ্টক।

মুচি—কাঁসা, পিত্তল ও সোনা গলাইবার মাটির পাত্র।

মুনোফা—(হি) লাভ।

মুরি—নর্দ্দমা।

মুঢ়্যা—কাটা গাছের গুঁড়ি (যাহা মাটির মধ্যে থাকে)

মেছ্যা আল্লাদ—কেউটে (দ)।

মেতোর—মধ্যম। যেমন—মেতোর-বৌ।

মেয়া—স্ত্রী।

মেল্‌তে—ছড়াইতে।

মোছ (হিং)—গোঁপ (দ)।

মোধুচুস্কি—টুনটুনি পাখী (দ)।

মোর (বরের)—মুকুট (সং), মউড় (প্রাং)।

মোরিচ—লঙ্কা।

মো'ল—মুকুল (সং), মউল (প্রাং)।

মোস্‌রি—মসুরি।

মোহোজিদ্—মস্‌জিদ।

মোহোনা—কোন নদীর যে স্থান হইতে অন্ত নদী বহির্গত হয়।

মোহোবিল—প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় বিভিন্ন প্রতিমার মিলন।

মোহোরি—মৌরী।

ম্যার—কলার ভেলা।

ম্যালা—(১) মেলা, (২) বহু।

য

যও—যব।

যোগানো—রক্ষা করা, আগ্‌লানো (দ)।

যোগানদার—সাময়িক রক্ষক, আগল্‌দার (দ)।

র

রগ—শিরা।

রহোর (হি)—অড়হর।

রাম পটোল—ভিণ্ডি, ঢেঁরস (দ), রামতরোই (বিহারে), রামঝিঙে (বাঁকুড়ায়)।

রা—কথা, শব্দ।

রাল—ধুনা গলাইয়া সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত আঠা।

রিক্যাবী—রেকাব (দ), রকাবী (ফাং)।

রুখু—রুক্ষ, তৈলবিহীন।

রুহি—রুই (দ)।

রোজ—প্রত্যহ, ফাং রোজ = দিন।

রোজকার—উপার্জ্জন। (ফাং) রোজগার।

র‍্যাজা—রেজা (দ), রাজমিস্ত্রীর মজুর।

ল

লগ্ বা—লোগি (দ), দীর্ঘ বংশখণ্ডের অগ্রে এক টুক্‌রা বাখারি বাঁধিয়া প্রস্তুত হয়। ছোট হইলে আকর্ষী।

লগোন ধরা—বিবাহে আশীর্ব্বাদ করা।

লঙ্ঘোন—জ্বরাদি রোগে উপবাস।

লট্‌কানো—টাঙ্গানো।

লট্‌কোন—একরূপ ফলের পীত বর্ণের বীজ। ইহা হইতে রং হয়। লট্‌কনা।

লবোডক—লাউডগা (দ) সাপ।

লয়া—নব, নূতন।

লহলা—রুইজাতীয় মৎস্যবিশেষ।

লা—নৌকা।

লাওয়া—লাজ (সং), খৈ। রাজপুত জাতির বিবাহে খৈ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

লাগা (ক্রি)—(১) ব্যথা পাওয়া, (২) বোধ হওয়া, যেমন—জিনিষটা কেমন লাগ্‌ছে।

লাঙ্গোল্যা—বিদে (দ)।

লাট্টু—লাটিম (দ)।

লালোচ (হি)—লোভ।

লাহা—(১) লাক্ষা, (২) স্নান (সং), ণহান (প্রাং), ণ্হানা (হিং), নাওয়া (দ)।

লাহারি—(১) কৃষকের জল-খাবার, (২) গালার দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারী জাতিবিশেষ।

লিখি—উকুনের ছানা।

লিভ্যাও (ক্রি)—নির্ব্বাণ কর।

লুটিআ—ঘটির আকারের ক্ষুদ্র জলপাত্র।

লেগে—(১) জন্য, (২) লাগিআ।

লেল্‌ছ্যা—লোভী, (হিং) লাল্‌চি।

লোক্—চুপ।

লোক্‌রি (হি)—জ্বালানি কাঠ।

লোগ্‌ঘি—প্রস্রাব।

লোটা (হি)—ঘটি।

লোট্যা—নটে শাক (দ)।

লোড়ি—লাঠি।

লৌকিত্যা—লৌকিকতা, নৌকতা (দ)।

ল্যাচা—ফুল ঝাঁটা (দ)।

ল্যাল্‌হা –যে অধিকবয়স্ক ব্যক্তি জিহ্বার দুর্ব্বলতার জন্য সমস্ত বর্ণ স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে না, ছোট ছেলের ন্যায় আধ আধ কথা বলে।

শ

শানা—(১) মাখা, যেমন—আটা শানা। (২) বস্ত্রের তানা, টানা সূতা।

শানি—গবাদির ছানি, জাব (দ)।

শামাদান (আং)—মোমবাতির আলোকাধার।

শিয়াল—শৃগাল (সং), (প্রাং) সিআল।

শিওর—শায়িত অবস্থায় মস্তকের দিক্।

শিক—সরু লোহার দণ্ড। এ অঞ্চলের "হুঁক্যার শিক", দক্ষিণে "হুঁকোর গজ"।

শিকলি—শৃঙ্খল (সং), শেকোল (দ)।

শিকোর—মূল (গাছের)।

শিত্যান—বিছানার মাথার দিক্।

শিশ্‌কি—ক্ষুদ্র ছিদ্র।

শিস্যা—(১) সীসা, (২) শিশু কাঠ।

শুকট্যা—শুষ্ক।

শুঝা—দেখা। দক্ষিণে "বোঝা সোঝা"র ব্যবহার আছে, পৃথক্ প্রয়োগ নাই।

শুবচনী—"শুভচণ্ডী"র পূজা।

শো—(১) (ক্রি) শয়ন কর্, (২) জাতিবিশেষ, ইহাদের জল অচল। দক্ষিণের শুঁড়ীদিগের সহিত এক কি না, বলা যায় না।

শোধা—জিজ্ঞাসা কর্।

শ্যাকোরকন্দ—(হিং) শকরকন্দ, যাহার কন্দ শকর অর্থাৎ চিনির ন্যায় মিষ্ট। দুই প্রকারের হয়—লাল ও শাদা। লালগুলি দক্ষিণে "রাঙ্গা আলু" নামে কথিত।

শিঁক্যা—শিকে (দ)।

শোঁআস—শশা।

স

সৎমা—বিমাতা।

সন্‌বাবা, সনমা—ভাই-ভগিনীর শ্বশুর শাশুড়ী।

সন্দেশ—মিষ্টান্ন। দক্ষিণে কাঁচাগোল্লা "সন্দেশ" নাম পাইয়াছে।

সন্ধ্যামুনি—কৃষ্ণকলি (দ) ফুল।

সপ্—দক্ষিণে সপ লম্বা, মাদুর ছোট। এ দিকে উভয় অর্থেই সপ।

সভাই, সব্‌ভাই—সকলে। (দ) সবাই।

সম্বোরা—পাঁচ ফোড়ন (দ)।

সরান্, সরোক—সদর রাস্তা।

সল্লা—(আং) সলা, পরামর্শ।

সহোবোৎ—সৎ লোকের সঙ্গ। (ফাং)

সং—প্রহসন (যাত্রার)। জঙ্গিপুরে দোলের সময় গীত-বাদ্য সহকারে লোকে নানারূপ সাজিয়া বাহির হয়, ইহাকেও সং বলে।

সঁৎ—সঙ্গ।

সহাত্তর—৭০। সাগ্‌রিত—শিষ্য। সাক্‌রেত (দ), শাগীর্দ্দ (ফাং)।

সাজ্‌না—সোজ্‌নে (দ)।

সা'ৎ—(আং) সাআৎ=মুহূর্ত্ত। প্রথম শুভ মুহূর্ত্ত, দোকানদারের প্রথম বিক্রয়। বিজয়া দশমীর দিন প্রাতঃকালে শিল্পী ও কৃষক নানারূপ দ্রব্য গৃহস্থ-বাড়ী দিয়া পয়সা ও মুড়ি পায়। পুরোহিত আসিয়া ঘট-স্থাপনা করিয়া কিঞ্চিৎ পূজা-অর্চ্চনাও করে, ইহাকেও সা'ৎ করা বলে।

সাতভেয়া—ছাতার (দ) পাখী যেখানে থাকে। ৬।৭টি একত্রে দেখা যায়।

সাতাশী—(১) ৮৭, (২) রাজপুত জাতির বিবাহে ছায়ামণ্ডপে কলসের উপর সরাতে সরিষার পুঁটুলি বাঁধিয়া সরিষার তৈল জ্বালান হয়। এই আলোকাধারের নাম সাতাশী।

সাবেক—পূর্ব্বের। (আং) সাবিক।

সামাট—উদূখলের মুষল। এক খণ্ড কাষ্ঠদণ্ডের মুখে "সামি" অর্থাৎ লোহার বেড় আঁটা থাকে। তাই সামি+আঁটা হইতে "সামাট" বোধ হয়।

সামি—কাষ্ঠ বা বংশদণ্ডের অগ্রভাগে আঁটা লোহার বেড়।

সাম্‌নাসাম্‌নি—সুমুক-সুমুকী (দ)।

সায়া—মাটির সরা (দ)।

সারোক—শালিক (দ) পাখী।

সাহান—সান (দ), ইঁট, চুন-সুরকী দিয়া বাঁধান স্থান।

সাহানি—শানাই (দ)।

সাহার—সার (জমীর)। সাঁওই—(হিং) সেওই। মাথা ময়দা চাউলের ন্যায় ছোট ছোট টুক্‌রা করিয়া শুকান হয়। ইহার পায়স করিয়া লোকে খায়।

সাহুক্যার—(হিং)—ধন ।

সাঁকো—পুল।

সাঁজাল—সন্ধ্যায় গোশালায় ধূমোৎপাদন।

সাঁজো—দধিবীজ।

সাঁকালো—শীঘ্র।

সেঁদুর—(সং) সিন্দুর, (প্রাং) সেন্দুর।

সোঁৎ—স্রোত।

সিঝ্যানো—সিদ্ধ করা।

সিদ্ধোপোড়া—ভাতে ভাত (দ)।

সিধ্যা—(১) সিদে (দ), সরল। (২) রন্ধনের দ্রব্যাদি, যেমন- চাউল, দাইল প্রদান।

সিয়ান, সিয়ানা—চালাক, চতুর।

সিংর্যা—সিঙ্গারা (হি), পানফল।

সুব্র্যা—খাদ-মিশ্রিত রৌপ্য।

সুরকি—(১) দৌড়, (২) ইষ্টকচূর্ণ।

সুরুক—(ফাং) সুর্‌খ্ = রক্ত। এ অঞ্চলে বলে "লাল সুরুক", অতিশয় লাল।

সুস্তার—সুবিধা, উপকার ।

সোআরি—যান, পাল্‌কি।

সোনাগুধি—স্বর্ণগোধিকা, গোসাপ।

সোরকি—বর্‌সা।

সোরুচুকুলি—চাউল দাইল মিশ্রিত রুটির মত পিষ্টক। সোঁখা—ঘ্রান লওয়া।

সোঁটা—বড় মোটা লাঠি। সোঁথ্যা—তীর্থযাত্রার সাথী।

সোঁধা—(সং) সুগন্ধ, (প্রাং) সুঅন্ধ। কোন দ্রব্য ভাজিলে এক প্রকার যে গন্ধ বাহির হয়।

স্যাঁকারো—স্বর্ণকার।

হ

হয়রান—শ্রান্ত। (আং) হয়রান = বিস্মিত।

হল্‌হোল্যা—হেলে (দ) সাপ।

হলো'দ্—(সং) হরিদ্রা, (প্রাং) হলদ্দা, (দ) হোলুদ্।

হাওলে—ধীরে।

হাওলোৎ—বিনা লেখা-পড়ায় অল্প দিনের জন্য ধার দেওয়া। (আং) হাওয়ালাৎ—কাহারও জিম্মায় রাখা।

হাডুগুডু (খেলা)—কবাটি খেলা (দ)।

হাল—(১) লাঙ্গল। (২) অবস্থা, দুরবস্থা (আং)।

হিল্সা, ইল্সা—ইলিস্ মাছ (দ)।

হুব্—সাহস। (আং) হুব্ব্=প্রীতি, বন্ধুত্ব, ইচ্ছা।

হুব্যাহুব—অবিকল। (হিং) হুবহু।

হুর‍্যাহুরি—গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি।

হুলিয়ে—(কুকুর) লেলিয়ে (দ)।

হেঠ্যা, হোঠ্যা—অবিবেচক।

হেত্যার—অস্ত্র। (হিং) হাথিআর।

হেল্ক্যা—হাল্কা (দ)।

হে'লতে—সাঁতরাইতে।

হোক—"হউক" শব্দজাত। দক্ষিণাঞ্চলে যথায় "আচ্ছা" প্রয়োগ হয়, এ দিকে তথায় "হোক" কথার প্রয়োগ হইয়া থাকে। দক্ষিণে "রাম যেও বাবা আচ্ছা", এ দিকে "রাম যেও বাবা হোক"।

হোঁট্যা—হাঁটু (দ)।

হোঁস্যা—(হি) হাঁসুয়া, পাতলা ফলকবিশিষ্ট কাটারির ন্যায় অস্ত্র ; ইহা শস্যাদি কাটিতে ব্যবহৃত হয়। (দ) কা'স্তে।

হ্যাদে—আহ্বানে, মনোযোগ আকর্ষণে সম্বোধন-পদ। অর্থ—এ দিকে দেখ।

হ্যারে—এখানে।

হ্যালান—(১) (দ) হেলান, ঠেস্। (২) সন্তরণযোগ্য, যথা—হ্যালান জল=সাঁতারজল।

শ্রীরাখালরাজ রায়

'জ্ঞানদাসের পদাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধের

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯৪	১০	বত্নাকর	রত্নাকর
১৯৫	২১	অব্দের	শব্দের
২০০	৮	দিব	দিব্য
২০২	৩	সুলললিত	সুললিত

৫—৯ পংক্তিগুলি প্রবন্ধের উপসংহার না হইয়া ১৮৮ পৃষ্ঠার ২৯ পংক্তি-স্থিত 'পিনাক' ও 'কপিনাশ' শব্দের পাদ-টীকা হইবে।

কয়েকটি প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীত

বিগত পূর্ব্ববৎসর "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে" যোগ দিবার জন্য আমি কলিকাতায় আসিলে আমাদের "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে"র স্বনামধন্য সভাপতি পরমশ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় আমাকে চট্টগ্রামের পল্লী-সঙ্গীত সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু এত কাল নানা কার্য্য-ব্যস্ততায় তাঁহার সে আদেশ প্রতিপালন করিবার অবসর পাই নাই। সম্প্রতি সংগৃহীত কয়েকখানি প্রাচীন পুথির মধ্যে একখানি হস্তলিখিত সঙ্গীত-পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তাহা হইতে কয়েকটি সঙ্গীত যদৃচ্ছাক্রমে সঙ্কলন করিয়া এবং জনৈক পল্লীবৃদ্ধের নিকট শ্রুত কয়েকটি সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিয়া চট্টগ্রামের প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীতের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

সঙ্গীত-পুস্তিকাখানি শ্রীনীলমণি বিশ্বাস এবং শ্রীরামরত্ন দাসদাসস্য কর্তৃক ১২০৭ মঘী সনে বিরচিত হইয়াছে। চট্টগ্রামে এখন ১২৭৭ মঘী সন চলিতেছে। সুতরাং এই পুথিখানির বয়স সত্তর বৎসর। কিন্তু ইহার লিখনভঙ্গী, বর্ণবিন্যাস, কাগজ প্রভৃতি দেখিলে ইহাকে আরও পুরাতন বলিয়া স্বভাবতই মনে হয়। লেখকদ্বয়ের কোন পরিচয় পুস্তকের মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে রামরত্ন দাস লিখিয়াছেন, চট্টগ্রামের অন্তর্গত কোয়েপাড়া গ্রামে তাঁহার বাড়ী; সম্ভবতঃ উভয় লেখকই এক গ্রামবাসী হইবেন।

এই সঙ্গীত-পুস্তিকাখানির একটি বিশেষ বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার আছে। আমরা জানি, প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য শ্যাম ও শ্যামা-সঙ্গীতেই সমধিক মুখরিত ও অলঙ্কৃত। কিন্তু এ পুস্তকখানির সমস্ত সঙ্গীতই রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও লব-কুশের বিষয়ে প্রণীত। এ সম্বন্ধে লেখকগণের মৌলিকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ ভাবের সঙ্গীত-পুস্তিকা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে আর আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, আমি অবগত নহি।

আমি প্রাচীন সঙ্গীত-পুস্তিকা হইতে যে সকল সঙ্গীত এ স্থলে উদ্ধৃত করিব, সেগুলির বর্ণবিন্যাসাদি অধুনা-প্রচলিত রীতির অনুসারে পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিয়া লইব না। সে অধিকার আমার নাই; কেন না, প্রাচীনতার হিসাবে এগুলি যেমন বিশেষ মূল্যবান্, তেমনি আদরণীয় ও রক্ষণীয়। তবে যে সকল শব্দ বুঝিতে পাঠকগণের একান্ত অসুবিধা হইবে, পাদটীকায় সে সকল শব্দ সংশোধন করিয়া লিখিলাম।

১ম সঙ্গীত

ও ভাই সত্য বল না কৈর না ছলনা : প্রাণের ভাই লক্ষন শুনমনি রে ॥ যুগ্য রথ লইয়ে আলি রে আলয়ে কোন বনে রেখে চন্দ্রাননিরে ॥ মম মন্দ মতি : পতি হয়ে সতি বিনা দোসে দিলাম বনবাস : না ভাবিলাম ত্রাস :। গর্ভ্ত পঞ্চ মাস :। করি গন্তনাস হইল সর্ব্বনাস :। শুনিআ কুজনার কুবচন :। হিতাহিত চিথে[১] না করিলাম সোচনা[২] :। তেজিলাম জনকনন্দিনিরে ॥ সিতা নিরক্ষন না করে লক্ষন প্রান জায়ে জায়ে না জায়ে লক্ষন :। ইচ্ছা হএ মন গরল ভক্ষন করি মরি বিলক্ষন :। পুন না করিব ঐ মুখ দ্রসন[৩] বিনা দোসে করিলাম ঔপক্ষন[৪] বনে দিলাম একাকিনিরে ॥

১। চিত্তে। ২। বিবেচনা। ৩। দর্শন। ৪। উপেক্ষা।

২য় সঙ্গীত

মা তোমার কি চিন্তে কর কি চিন্তে চিন্ত চিন্তামনি ইন্দিবর স্যাম ॥ তারে জে করে চিন্তে :। তাহার হরে চিন্তে :। সেই ধরে চিন্তামনি নাম : ॥ সদায় ঐ রাম জার ভাবনা :। জে ভাবে ভাবে তাহারে •। সে ভাবে উহারে •। তাহার সে ভাব জান না ০ ॥ বিপদে নাহি জায় ঐ পদ মনে •। অঘোর কাননে ভুবন বনে ০। রাষ্ট বেদাগমে •। বিসম দুর্গমে ০। তারে তারে দয়াময় রাম : ॥

৩য় সঙ্গীত

মম প্রতি রাম : কেন হলে বাম : অবিশ্রাম মম মন শ্রীপদে ০। তব দাসি রহি : কোন দুসী নহি•। বনবাসি হই কি অপরাধে০ ॥ অস্তাপী ঐ পদে নাহি হই দুসী : জন্তপী হইএ থাকি দাসি দুসী : ॥ রাম হে :। জারে স্থান দিলে পাএ : তারে পুনরাএ কর কিবা হাএ হাএ মরি হে খেদে ০। রাম তুমি গুরু গুনান্নিত দিনদয়ান্বিত : বিচারে পণ্ডিত : ভুবনে কহে : ॥ আমার কিবা কুআচার : হয়েছে প্রচার : কৈরে কি বিচার : বনে দিলে ছলে০ ॥ সুখে থাকি কিবা মরিগো দুখে : রাম নাম কভু না ছোরিব মুখে : রাম হে ॥ সুন কৃপাধাম[১] দুর্ব্বাদলের স্যাম : নৈলে কি রামনাম : সে পরে বিপদে ০। বিনা দোসে ভার্জ্যে : বন মাজে তের্জ্যে : সুখে যদি রার্জ্যে থাক হে তুমি। সতিবতি যতি : গর্ব্বেতে সন্তুতি : বিনা দোসে বনে দিলে হে স্যামি ০ ॥ দয়াময় নাম বেদেতে প্রকাশ : কিন্তু এখন তাহা না হএ বিশ্বাষ• ॥ রাম হে০ ॥ আমার গর্ভ পঞ্চ মাস : দিলে বনবাস তবে কিছু ত্রাস নাই স্ত্রিবধে ০।

৪র্থ সঙ্গীত

গর্ব্ব কর না থর্ব্ব হইবে নিশ্চয় :। সত্রুঘন জদি আমাকে না চিন ॥ আগে কর রন ॥ এখনি পাবে তবে পরিচয়। আমরা বোন্দহি[২] তোমার বির্দ্ধ[৩] রামের জজ্ঞ হয়০। ধর্নুদ্ধর নাম ধর :। জদি থাকে সাধ্য ॥ তবে কর জুদ্ধ০। এথায় গালবাদ্য কর :। তুমি ত রামের ভাই ॥ কর রামের বড়াই ॥ আমরা তোর রামের রাখি কি ভয় ॥ অভিপ্রায় বুঝা জায় ॥ সিষু দেখি তুচ্ছ হএ অতিসয় ॥ আমরা লব কুশ নাম ধরি ॥ না মরি সমরে গতি কি তোমারে ত্রিন[৪] হেন জ্ঞান করি :। আজুকার সমরে বাচিবে না মরিবে এককালে পাটাইব জমায়[৫] ॥

৫ম সঙ্গীত

কোথা য়সময়[৬] হরি কর (?) করুনানিদান০। ঔরিগন আইল দেখি হরিতে জানকির প্রান০ ॥ সিংহ য়রি ব্যাঘ্র য়রি : বিসম ভুজঙ্গ অরি : সব য়রি ভয়ঙ্করি কর হরি পরিত্রান ॥ অরিগন[৭] হেরি হরি : কর কৃপাময় হরি : সব য়রি হর হরি কর করুনা প্রদান ॥

৬ষ্ঠ সঙ্গীত

দেবর ডারাও ওহে বারেক ডারাও০। সুন লক্ষন ধানুকী আমি শ্রীরামের জানকী০ ॥ কার কাছে রাইকে জাও তাএ বৈলে জাও০ ॥ ডারাও ডারাও দেবর ডাকিলে সুন না ভএ কিহে আমি তোমার সঙ্গে জাবো না •। বারেক ডারায়ে সুন গুটী দুই কথা০। অহে

১। কৃপাধাম—কৃপাময়। ২। বেঁধেছি। ৩। বৃদ্ধ। ৪। তৃণ। ৫। যমালয়।
৬। এ সময়। ৭। অরিগণ।

সিতানাথের সিতা তুমি ফেলে জাও হে কোথা৹। অহে লক্ষন রামের ভয়ে কঠিন হৃদয়। ভ্রায়াজায়া১ বৈলে তোমার দয়া নাহি হএ ৹। বনে দিলে তব ভায়া ৹। গর্ব্ববতি আপন জায়া ৹। তুমি ত তাহান ভায়া ৹। নাহি দয়ামায়া ৹। দেবর বনে দিলে ক্ষেতি নাই ঃ লক্ষন আমি বলি তাই ৹। কাহার আশ্রমে রভো ভয় পাই ৹। ভালো হয় গুববন২ করাইলে দরসন আনিএ ছলে দেবর ফেলে জাও ৹। তুমি মনেতে ভাইব না সঙ্গেতে জাব না ৹। তোমার রামের কিরায়৩ একবার ফিরে চাও ॥

৭ম সঙ্গীত

এ কি ধন্যে কার কন্যে কি লাবন্যে মরি হাএ হাএ॥ একা কি জন্যে এ ঘোর অরন্যে রাম রাম বৈলে উঠে পরে ধাএ॥ তরিত জরিত ভরিত রূপ৹। সসোধরাধরে মুধার কুপ ঃ। আসিয়া পসিল মৃগসী লুপ্ত তত্র গাত্র মাত্র নেত্র দেখা জাএ ঃ॥ সিন্দুরবিন্দু অধর ভালে ৹। কেসর বেসর নাসাএ দোলে ৹। তাহে কন্যমূলে। সোভে কর্ণ্যফুলে। সোভে লোভে কত কামে মোহ জাএ ॥ করিকুম্ভ জিনি বক্ষবাকাখানি হরিমাঝা জিনি কটী সোভনি। রামরম্ভাতরু জিনি উরু গুরু চরন সরনে কি বনের প্রাএ ॥

৮ম সঙ্গীত

কেনে গো কাননে একাকী ভ্রমনে দু নয়ানে বহিছে বারি ৹। কিবা ভাইবে মনে ৹। কান্দেছ আপনে ৹। রাম রাম বৈলে ফুকরি ফুকরি ৹॥ পতিত ভুসন গলিত কেস বসনাভরন কিছু নাই লেস ৹। বনে বনভেষ দেখি গো বিসেষ ৹। রাম হাসিকেস(?) তবু কিঅ দেবি ৹॥ রাজার নন্দিনি ৹। মনে হেন গনি ৹। কেনে একাকিনি ৹। হইএ দুঃখিনি। গলিতনয়নি এ বিন্দুবরনি ৹। কান্দে কেনে বলি হরি হরি ৹॥

৯ম সঙ্গীত

আমাকে বোল রে বাছা হনুমান। বল রে স্বরূপে হইল রন কিরূপে॥ দেথ তেনেয়(?) আমা সেই বল স্বন (?) আমাঅ অনাথি করিলে॥ পাথারে ভাসাইলে॥ আমার কুলের সত্রু হইল দুইটী কুসন্তান॥ কিরূপে তোমারে করিল বন্দন॥ তাহি বল বাছা পবন-নন্দন॥ কিরূপে মৌল ভরত সত্রুঘন॥ মম প্রান সম দেবর লক্ষন॥ কিরূপে সমরে সত্রুঘন মরে॥ গেল কিরূপে রঘুনাথের গেল প্রান॥

১০ম সঙ্গীত

চল ঘরে জাই॥ আর কেহ নাই ঃ॥ তুমি আমি দুটী ভাই বিনে॥ মনে হেন জ্ঞান॥ বুঝি জাবে প্রান॥ ধানুকি লক্ষনের ধনুর্ব্বান॥ কাল জম প্রায়॥ ঐ দেখা জায়॥ এ কি হোল দায়॥ না দেখি উপায়॥ হাএ প্রান জায়॥ কি বিধি ঘটায়॥ না সেবিলাম মাএর চরনে একেতে দুঃখিনি॥ জানকি জননি॥ লবকুস বলে সদায় পাগলিনি॥ তাতে জদি তুমি আমি প্রানে মরি॥ দুঃখিনিকে কে মা বলিবে বলে॥

১১শ সঙ্গীত

সুন গুনধাম রাম বাম সিতা প্রতি হইয় না ৹। তোমার দয়া হএ না৹। বিনা দোসে বনবাসে দিবে অঙ্গনা ৹। সুন ঃ শ্রীরাম ধানুকী ৹। বিবচনা হইলো এ কী ৹। ঐ পদ

১। ভ্রাতৃজায়া। ২। তপোবন। ৩। দিব্যে, শপথে।

বহি মা জানকী অন্য জানে না ॥ জে সীতার কারনে তবো। নাম হইল রাম রাঘব। সে সিতাকে ভিন্য ভাব। কি বিবেচনা। সিতা জদি অপরাধি হইএ থাকে গুনিনিধি। বনে দেওা১ নহে বিধি২ ॥ যুন মন্ত্রনা ॥ তব কানন গহিয়ে জাইতে বৈল না। একে সিতা কুলবতি। পঞ্চ মাসের গর্ব্ভবতি। হেন সিতা তেজে পতি। প্রানে সহে না ॥ পাএ ধরি গলবাসে। এই ভিক্ষা দেও দাসে। সিতা মাকে বনভাসে জেতে বৈল না ॥

একবার আমি সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ মুসলমান গৃহস্থ আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি সেই দিগন্তপ্রসারিত বেলাভূমির উপরে বসিয়া অনন্ত আকাশ ও সাগর প্রতিধ্বনিত করিয়া, অশ্রান্ত জলকল্লোলের তালে তালে আপনার মধুর কণ্ঠ মিলাইয়া গাইতে লাগিলেন ;—

১। (ওরে) যাইবার কালে সঙ্গে নিবা কিরে ভাই সদাগর,—অসমের২ সারথী কেও নাই। নওয়া সুকাখানি৩ লৈয়া, বাণিজ্যেতে আইলাম ধাইয়া, ঘাটেতে পুরানা হৈয়া যায় রে ভাই সদাগর। ভবে আসিয়াছ মন, কামাইলা কিবা ধন, যাইবার কালে সঙ্গে নিবা কি। (রে ভাই সদাগর)। নির্ব্বোধ জল্লালে বলে, সুকাটী আন্যা দি পালে, ঠেকিল সুকা ঠাডা বালুর চড়ে। (রে ভাই সদাগর।)

২। শ্যাম ও পরবাসী রে। (ঘোষা) কারে কইয়ম দুঃখের কথা কেবা শুনে কানে। দরেয়াতে ধুল গুঁজরে ভিগু মারে বানে। উজান ঘাঁডায় ধুল গুঁজরে পিড়া লই যায় হোতে। গঙ্গা মরে জল তিয়াসে, বরমা মরে শীতে। লাহুর দরিয়ার মাঝে নিরঞ্জনের খেলা, পাথর ভাসিয়া উড়ে, তল পড়ি যায় সোলা। লাহুর দরিয়ার ঢেউ বেঙ্গে ধরি খায়, পাথর ছেদিল ঘুণে কেবা প্রত্যয় যায় ॥

৩। আগমের ভেদ তোমরা জান পণ্ডিত। মরণের ভেদ তোমরা জান পণ্ডিত। বারুইগিয়ে গাছ কোঁদাতে বারুইরে কোঁদায় গাছে। দাঁয়বা৪ ছিড়ি দড়ি খাইল, জাল্যারে দৌড়ায় মাছে ॥

জোম পহরে৫ ধান হুয়াত৬ দিল, পাতিলাত দিল বাড়া৭ মাদার গাছে ধরিয়াছে আঠ্যা কলার ছড়া আঁআঁসত৮ পাঁআস (?) নিল পাঁআস রৈল ডালে। তিন গরু দি নয় হাল চয়, ছিবায়৯ মানুষ গিলে।

৪। মন, সাধু জেইনে ছিলাম তোরে। এ কি করিলি আর, এ কি ব্যবহার, যে কর্ম্ম তোমার জানাব কাহারে। আশ্বাসে বিশ্বাস জন্মাইয়ে আমার, মহাজ্ঞান ধন করিলি অধিকার, শেষে ভুলাইলে কালীর নাম আমার, এ দেহ-ভাণ্ডার অর্পিলি শত্রুরে। জ্ঞান-মাজষ্ট্রেরে দরখাস্ত করিব, ব্রহ্মময়ীর পাশে যাইতে তোরে নিব, তিনটি কাল তোমায় আবদ্ধ রাখিব, তারিণীর শ্রীচরণ-কারাগারে।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

১। দেওয়া। ২। অসময়ের। ৩। নূতন নৌকাখানি। ৪। গাভী।
৫। জুমিয়াদের পাহাড়, যেখানে জুমিয়ারা শস্য বপন করে। ৬। শুকাইতে।
৭। ধানভানা। ৮। আকাশেতে। ৯। বর্শার ছিপ।

আসামে শ্রীচৈতন্য *

প্রাচীন কামরূপ তন্ত্রশাস্ত্রের জন্মভূমি বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। এক দিন এই দেশ তান্ত্রিক উপাসনার কেন্দ্রস্থল ছিল। এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াই তন্ত্রশাস্ত্র সমগ্র ভারতবর্ষ, তিব্বত, চীন এবং জাপান দেশ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং তন্ত্রোক্ত সর্ব্বপ্রধান মহাপীঠ ৺কামাখ্যার অবস্থিতিও এই দেশেই; কিন্তু তাহা হইলেও আজ যে এই দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই দেশের অধিবাসিগণের বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বন সম্বন্ধে একটি রহস্যজনক প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদটি এই যে, একদা বিষ্ণু গরুড়-বাহনে ৺কামাখ্যা পীঠের উপর দিয়া আকাশপথে চলিয়া যাইতেছিলেন। ৺কামাখ্যার অনুচর বটুকভৈরবের তাহা সহ্য হইল না; তিনি বিষ্ণুকে গরুড়ের স্কন্ধ হইতে অবতরণ করাইয়া পীঠ-লঙ্ঘন-স্পর্দ্ধার প্রতিশোধস্বরূপ বন্দী করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অনুচর কর্ত্তৃক বিষ্ণু এইরূপ লাঞ্ছিত হইবার কথা শ্রবণ করিয়া, কামাখ্যা ঠাকুরাণী শশব্যস্তে আসিয়া নিজ হস্তে বিষ্ণুর বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন এবং বটুকভৈরবকেও তাহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনেক গঞ্জনা করিলেন। বিষ্ণু কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, কামাখ্যাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, এই দেশবাসী লোকগণ কামাখ্যার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর উপাসক হইবে। কামাখ্যা বিষ্ণুর অভিসম্পাত শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং বলিলেন,—আমার অনুচরের দোষে আমাকে অভিসম্পাত করা আপনার উচিত হয় নাই। সে যাহা-হউক, আমিও বলিলাম, এ দেশবাসীরা বৈষ্ণবমার্গ অবলম্বন করিলেও চিরকালই মৎস্য-মাংসাশী হইয়া শাক্তাচার-পরায়ণ থাকিবে। এই দেশবাসী বৈষ্ণবেরা অনেকেই যে মৎস্য-মাংস আহার করিয়া থাকেন, তাহা ঠিক। এই প্রবাদের ভিত্তি যাহাই হউক না কেন, তন্ত্রপ্রধান দেশে বৈষ্ণব-প্রাধান্যকে লক্ষ্য করিয়াই যে এই প্রবাদ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই দেশের বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীরা কয়েকটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা,—দামোদরী, মহাপুরুষীয়া, হরিদেবী এবং চৈতন্যপন্থী। প্রথম তিন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকেরা এই দেশবাসী লোক ছিলেন। এই দেশে চৈতন্যপন্থীরা কখন কিরূপে আসিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম যে, কামরূপ বিভাগে হাজো অঞ্চলে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসিয়াছিলেন বলিয়া এক জনশ্রুতি বহু কাল হইতে প্রচলিত আছে। হাজোতে মণিকূট নামক একটি ছোট পাহাড় আছে এবং তাহার শিখরদেশে হয়গ্রীব মাধবের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটী-শাখার অধিবেশনে পঠিত।

আছে। এই পাহাড়ের পাদদেশে একটি গহ্বর আছে এবং তাহার সন্নিকটে বরাহকুণ্ডের অবস্থিতি। এই গহ্বরটিকে লোকে "চৈতন্যঘোপা" বলিয়া থাকে এবং চৈতন্যদেব কিয়ৎ-কাল এই গহ্বরে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যেখানে চৈতন্যদেব বসিয়াছিলেন এবং যে স্থানে তিনি দণ্ড-কমণ্ডলু রাখিয়াছিলেন, তাহাও সেখানকার লোকেরা আজ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ইহা একটি জনশ্রুতি মাত্র। হাজো অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার এই জনশ্রুতি জানা থাকিলেও, কেবল এক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই কোনও ঐতিহাসিক তথ্যে উপনীত হওয়া যায় না। এই জনশ্রুতি আমার বহু কাল হইতে জানা থাকিলেও এত দিন আমি তাহাতে কোন আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই; বরং চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে সব পুস্তক বঙ্গদেশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে চৈতন্যদেবের কামরূপ আগমন সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ দেখিতে না পাইয়া, এই জনশ্রুতির সত্যতা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহই উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিন হইল, শ্রীযুক্ত লম্বমুরাম চৌধুরী মহাশয় "সৎসম্প্রদায় কথা" নামক এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই পুস্তিকাতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য-দেব যে কেবল হয়গ্রীব মাধব পর্য্যন্তই আসিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি পরশুরামকুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। পরশুরামকুণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি আরও কতক দিন হাজোর ঘোপাতে থাকিয়া উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সম্বন্ধে ভট্টদেব তাঁহার বিরচিত "সৎসম্প্রদায়কথা"তে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"পাচে মহাপ্রভু তৈরপরা আসি করতিয়ার তীরে রহিলা। পাচে যেথন রাজা নরনারায়ণ হই উপর দেশর পরা অনেক লোকক নমাই আনি শঙ্করক গোমোস্তা পাতি রাজ্য বসাইবে দিছে মাত্র, তেথনে চৈতন্যভারতী প্রভু মাধব দর্শনে মণিকুটে আসিলা। বরাহকুণ্ডর উপরে গোঁফাত রহি মাধব দর্শন হৈল। পাচে রত্নেশ্বর বিপ্রক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াই রত্নপাঠক নাম দি মাধবর দ্বারত ভাগবত পঢ়িবে দিলা আরু যাত্রা মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন কর্ম্মকো মাধবর দ্বারত প্রবর্ত্তাইলা। পাচে মহাপ্রভু পরশুকুঠারে যাই নামর নির্ণয় লেখি ব্রহ্মকুণ্ডত স্নান করি উলটি আসি সেই গোফাতে রহিলা। পাচে মাগুরীর কণ্ঠভূষণক আরু কবিশেখরক, কণ্ঠাহার কন্দলীক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াইলা। পাচে হাতে বীণা ধরি কৃষ্ণনাম গাই নারদর শ্রেষ্ঠা দেখাইলা। সেই বেলা দামোদরে মাধব দেখিতে মণিকুটে যাই তাঙ্ক দেখি দুর্ল্লভ লাভ ভৈলা বুলি প্রণাম করি বোলে—হে মহাপ্রভু, মঞি দরিদ্র ব্রাহ্মণে কিছো আশীষ মাগোঁ। চৈতন্যে বোলে—কেন মতে তুমি দরিদ্র ভৈলা। দামোদরে বোলে—স্বদেশর পরা নামি আহন্তে তাঁতীমরাত নৌকা বুরি সর্ব্বস্ব উটিলু। তিনটি প্রাণী ঝাঁজিত ধরি দিগম্বরে তরিলোঁ। পাচে শঙ্করে বস্ত্র তিনিখানি পরিধান করাই নিকটে রাখিছে। পাচে চৈতন্যে বোলে,—হে দামোদর নশ্বর বস্তুত খেদ নকরা। তুমি ঈশ্বরর পার্ষদ। লক্ষ্মীর কোপে গৌতমর বংশত জন্মিছা। পুনু তান বরে তিনি পীঠত পূজ্য হই নিজ ঐশ্বর্য্যকে পাইবা। এই রহস্য কহি তাঙ্ক তত্ত্বজ্ঞান দি উড়েষাক গৈলা।" সৎসম্প্র-দায়কথা—৩০ পৃষ্ঠা।

সৎসম্প্রদায়কথা পুস্তক হইতে উদ্ধৃত এই অংশে তিনটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। প্রথম চৈতন্যদেব যখন কামরূপে আগমন করেন, তখন শিববংশীয় মহারাজ নরনারায়ণ সবে মাত্র রাজপাটে বসিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তিনি হাজোর মাধব-দেবালয়ে কিয়ৎ-কাল বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহার সহিত দেবদামোদরের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। তৃতীয়, তিনি পরশুরামকুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এই বিষয় তিনটির ঐতি-হাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে আমরা এখন আলোচনা করিব।

নরনারায়ণ রাজার রাজত্ব-কাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। মিষ্টার গেইট তাঁহার Koch kings of Kamrup প্রবন্ধে* নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৩৪-১৫৮৪ স্থির করিয়াছেন। তিনি ঐ প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

Three different dates are assigned for the time when he (Naranarayan) ascended the throne in succession to his father Visva Singha viz, 1528 A.D. by Gunabhiram, 1534 in Prasiddhanarayan's Vamsabali and 1555 by Ramchandra Ghosh. His death is said to have occured in 1584 A.D. and Prasiddhanarayan's Vamsavali and Gunabhiram's Assam Burauji agree in fixing 1581 as the date of Raghu's accession to power in the Eastern part of the old Koch kingdom, while the inscription in the Hayagriva temple at Hajo, which was built during his reign and bears the date 1583 A.D. helps to confirm this as the date of the division of the kingdom.

মিষ্টার গেইট নরনারায়ণের সময় ১৫৩৪—১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ স্থির করিতে গিয়া নানা যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বের শেষ কাল যে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ ছিল, মিষ্টার গেইট সেই সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত হইয়াছেন; কিন্তু রাজত্বের আরম্ভ-কাল স্থিরীকরণ সম্বন্ধে যুক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, It is less easy to come to a definite conclusion regarding the date of his accession. বাস্তবিক কথাও তাই। আমরা নরনারায়ণের শেষকাল মিঃ গেইটের অনুবর্ত্তী হইয়া ১৫৮৪ বলিয়াই গ্রহণ করিলাম; কিন্তু তাঁহার রাজত্বের আদিকাল ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ বলিয়া মনে করি; কেননা স্বর্গীয় রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া-বাহাদুর এবং আসামের ইতিহাস-লেখক মিষ্টার রবিন্সন সাহেব উভয়েই এই কালকেই নরনারায়ণের রাজত্বের আদি কাল বলিয়া তাঁহাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ এই কাল চৈতন্য-দেবের কালের সঙ্গেও গরমিল হয় না। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিত পুস্তকের ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুর হইতে

* *vide* Journal, Asiatic Society of Bengal, Vol. *LXII*, part I. no 4, 1893.

বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রথমে যশোড়া গ্রামে গেলেন, তথায় জগদীশ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। * * * তাহার পর শ্রীচৈতন্যদেব আর একবার শ্রীহট্টে আগমন করেন। প্রথমতঃ বুরুঙ্গায় গমন করিয়া পরে ঢাকাদক্ষিণে পিতামহী-সদনে উপস্থিত হন। * * ঢাকা-দক্ষিণ হইতে চলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব কামরূপ প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে গিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। হাজো নামক স্থানে এখনও লোকে শ্রীচৈতন্যের গোফা বলিয়া একটি স্থান দেখাইয়া থাকে।" ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, যে জনশ্রুতির কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা শ্রীহট্ট অঞ্চলেও প্রচলিত আছে। অচ্যুতচরণ বাবুর মতেও "এই সকল স্থান দর্শনান্তে তিনি পুনঃ শান্তিপুরে উপস্থিত হন এবং সেই মুহূর্ত্তেই নীলাচলে যাইতে প্রস্তুত হন।" চৈতন্যদেব দ্বিতীয় বার শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর; কিন্তু অচ্যুত বাবু তাহার কোনও সময় নির্ণয় করেন নাই। সৎসম্প্রদায়কথা অনুসারে, তিনি সবে নরনারায়ণ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এমন সময় কামরূপে আসিয়াছিলেন। রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর এবং মিষ্টার রবিন্সনের নির্দ্ধারিত ১৫২৮ খৃষ্টাব্দকে নরনারায়ণের রাজত্বের আদিকাল ধরিলেই এই ঘটনা সম্ভবপর হয়। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ ধরিলে ইহা অসম্ভব হইবে, কেন না, চৈতন্যদেব ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দেই ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহা হইলে চৈতন্যদেবের কামরূপ আগমন ঘটনা হইতে নরনারায়ণের প্রকৃত রাজত্বকাল যে ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ ছিল, সেই সম্বন্ধে আমরা কতকটা ঐতিহাসিক আলোক প্রাপ্ত হইলাম।

এখন আমরা চৈতন্যদেবের হাজো বাস এবং তথায় দামোদর দেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ বিষয়ে আলোচনা করিব। ভট্টদেব তাঁহার 'সৎসম্প্রদায়কথা' তিনখানা পুথি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন ;—

চৈতন্যসংগ্রহং দৃষ্ট্বা সংগ্রহং কৃষ্ণভারতেঃ।
নৃসিংহকৃত্যমালোক্য কথয়ামি কথামিমাম্ ॥

তিনি এখানে কোন্ চৈতন্যসংগ্রহকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। কৃষ্ণ-ভারতীর সংগ্রহ এবং নৃসিংহকৃত্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই দুইখানিই অসমীয়া ভাষায় লিখিত পুথি। প্রথমখানা অসমীয়া গদ্যভাষায় লিখিত এবং দ্বিতীয়খানার রচনা পদ্যময়। ভট্টদেব এই দুইখানা পুথির উল্লেখ করাতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই দুইখানা পুথি ভট্টদেবের পূর্ব্বকালের। কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা এখনও কিছুই জানিতে পারি নাই। আশা করা যায় এক দিন তাঁহাদের বিষয়েও কিছু জানা যাইবে। কৃষ্ণভারতী তাঁহার পুথিতে লিখিয়াছেন ;—

"পাচে প্রভু মাধবক দরশন করি বরাহকুণ্ডর উপরে গোফাত রহিয়া রত্নেশ্বরক শরণ করায়া মাধবর দ্বারত ভাগবত কহিবাক দিল। পাচে তান নাম বহ্নপাঠক হৈল। আরো মাণ্ডরী গ্রামর কণ্ঠভূষণক দীক্ষা শিক্ষা দিয়া ভাগবত পাঠ করিবাক আজ্ঞা দিলা। আরো

কণ্ঠাহার কন্দলীকো কৃপা করি, আরো কবিশেখর ব্রাহ্মণক নাম ধর্ম্ম দিলা। পাচে মহাপ্রভু জগন্নাথর মঠর ভিতরে যোগাসনে বসি কাহাকো দেখা নেদিলা।"

ইহা হইতেও দেখা যায়, চৈতন্যদেব মাধব-মন্দিরের সন্নিকটে একটি গহ্বরে ছিলেন এবং তথায় এই দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। তিনি হাজো হইতে নীলাচলে চলিয়া যান।

নৃসিংহকৃত্য এই ঘটনাকে এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"তৈব হন্তে প্রভু কামরূপে গৈয়া
মণিকূট গীরি পাইলা।
বরাহ কুণ্ডর উপর গোফাত
চৈতন্য প্রভু রহিলা॥
রত্ন পাঠকক শরণ লগাই
ভাগবত পাঠ দিলা॥ ২৪
মাগুরী গ্রামর কণ্ঠভূষণক
কণ্ঠাহার কন্দলীক।
কবিন্দ্র দ্বিজক কবিশেখরক
চৈতন্যে নাম দিলেক॥
যাত্রা মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম
মণিকূটে প্রবর্ত্তাই।
তৈর পরা আসি মৌন হুয়া রৈলা
ওড়েষা নগর পাই॥" ২৫

এই পুথি দুইখানি হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখা যাইতেছে যে, ভট্টদেব, কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহের সহিত এই সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন।

এইখানে নৃসিংহকৃত্য সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ করিতে হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে, আমরা নৃসিংহের কৃত মূল পুথিখানি এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কৃষ্ণ আচার্য্য নামক এক জন এই দেশীয় কবি 'সন্তবংশাবলী' নাম দিয়া নৃসিংহের কৃত পুথিকে অসমীয়া পদ্য ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। সন্তবংশাবলী যে নৃসিংহের পুথির পদ্য সংস্করণ, সেই সম্বন্ধে কৃষ্ণাচার্য্য তাঁহার পুথির এক যায়গায় এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"শুনা নরনারী ইতো সন্তবংশাবলী।
জগতকে শুদ্ধ করে যার পদধূলি॥
নৃসিংহর কথা ইতো সন্তবে সে পদ।
ইহার শ্রবণে করে পাতক উচ্ছেদ॥" ৫৩

এইখানে একটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, যদিও এই দুইখানা পুথিতে চৈতন্যদেবের হাজোর গোফাঁতে বাসের এবং সেখানে কতিপয় এ দেশীয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিবার কথা আছে, তথাপি তাঁহার সহিত দামোদর দেবের সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা হইলে ভট্টদেব এই কথা কোথা হইতে পাইলেন? ভট্টদেব দামোদর দেবের সর্ব্বপ্রধান এবং অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। বোধ হয়, দামোদর দেবের নিজ মুখ হইতেই তিনি এই কথা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহ, ভট্টদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক ছিলেন এবং তাঁহাদের ভিতর কাহারও হয় ত এই কথা বিদিত ছিল না। চৈতন্যদেবের সঙ্গে যে দামোদরদেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা দামোদরদেবের চরিত্রপুথিও স্বীকার করে এবং দামোদর-সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ৺নীলকণ্ঠদাসের রচিত দামোদরচরিত্রে এই বিষয় এইরূপ ভাবে উল্লিখিত আছে ;—

"দামোদর পাচে কামরূপক আসিলা ॥
বল্লেশ্বর গ্রামে কতো দিন আছিলন্ত।
তথা হন্তে প্রতিদিনে মণিকূটে যান্ত ॥৮২
আসিলন্ত চৈতন্য নারদ বেশ ধরি।
দামোদরে আরাধিলা ভক্তিভাব করি ॥
সাক্ষাতে সে বিষ্ণুরূপ ঋষিয়ে দেখিলা।
জীব উদ্ধারিতে তাঙ্ক তত্ত্বজ্ঞান দিলা ॥৮৩
পরম আনন্দে দুয়ো দুইকো আশ্বাসিলা।
তথা হন্তে চৈতন্য যে ওড়েষাক গৈলা ॥"

এই প্রবন্ধে যে কয়খানা পুথির উল্লেখ করা হইল, তাহার ভিতর "সৎসম্প্রদায় কথা" ছাড়া একখানি পুথিও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই সব পুথি প্রকাশিত হইলে বোধ হয়, এই সম্বন্ধে আরও নূতন ঐতিহাসিক তথ্য জানা যাইবে। এতগুলি পুথির এবং জনশ্রুতির সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া যদি আমরা চৈতন্যদেবের কামরূপ আগমনকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করি, তাহা হইলে জানি না, আমাদের কোনও বিষয়ের ঐতিহাসিক তত্ত্বে উপনীত হইবার আর কি সম্বল আছে।

এখন আমাদের তৃতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়াছে, চৈতন্যদেবের পরশুরামকুণ্ড যাত্রা। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণভারতী কিম্বা নৃসিংহ, কোনও উল্লেখ করেন নাই; কেবল ভট্টদেব তাঁহার সৎসম্প্রদায়কথাতেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এখন কথা হইয়াছে, আমরা একমাত্র ভট্টদেবের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই চৈতন্যদেবের পরশুরামকুণ্ড যাত্রাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি না? আমরা বলি—পারি; কেন না, ভট্টদেব একজন যে-সে লোক

ছিলেন না। কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহ, ভট্টদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক হইলেও, তাঁহাদের এক জনও ভট্টদেবের সমকক্ষ ছিলেন না। সৎসম্প্রদায়কথার লিখা, কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহের লিখার সঙ্গে তুলনা করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়, ভট্টদেব ইহাঁদের দুই জন হইতে কত উচ্চে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভট্টদেব দামোদরদেবের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য। তিনি দামোদরদেবের সমসাময়িক লোক ছিলেন। দামোদরদেবের কাল ১৪৮৮ হইতে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ। ভট্টদেব সংস্কৃত এবং দেশীয় ভাষায় এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন; তিনি সমগ্র ভাগবত পুরাণকে অসমীয়া গদ্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রাঞ্জল অসমীয়া গদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন এবং সৎসম্প্রদায়কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই কয়খানি পুস্তক দেশীয় ভাষায় রচিত। তাঁহাকে অসমীয়া ভাষায় গদ্য সাহিত্যের স্থষ্টিকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ভগবদ্ভক্তিবিবেক নামক সংস্কৃত গ্রন্থ আসামে প্রচলিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি অনুপম গ্রন্থ এবং তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় এবং হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁহার উপর দামোদরদেবের এত দূর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ছিল যে, তাঁহার মঠের ভার তাঁহার আত্মীয় স্বজনের উপর না রাখিয়া তাঁহারই উপর অর্পণ করেন। তাঁহার উপাধি কবিরত্ন ছিল এবং তিনি "কবিরত্ন" নামেই আসামে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। দামোদরদেব যখন তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত অসমীয়া গদ্যে অনুবাদ করিতে আদেশ করেন, তখন তাঁহাকে এই ভাবে বলিয়াছিলেন;—

> "শুনা কবিরত্ন তুমি ব্যাস সমসর।
> তুমি মোর বান্ধব অপর দামোদর॥
> * * * *
> আরু এক জগত ঈশ্বর আজ্ঞা ধরা।
> কথাবন্ধে এক খণ্ড ভাগবত করা॥" রামরায় দাস।

ঈদৃশ এক জন মহৎ ব্যক্তি যে বিশেষরূপে না জানিয়া না শুনিয়া চৈতন্যদেব সম্বন্ধে একটা অমূলক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবেন, ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই কথা অলীক বলিয়া বিশ্বাস করিলে তিনি কখনই ইহাকে তাঁহার পুস্তকে স্থান দিতেন না। বিশেষতঃ পরশুরামকুণ্ড ভারতবর্ষে একটি চিরপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। চৈতন্যদেবের জীবন-চরিত্র হইতে দেখা যায় যে, তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি কামরূপে কেদার-মাধব পর্য্যন্ত আসিয়া পরশুরামকুণ্ডে না গিয়া ফিরিয়া যাইবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নয়। হয় ত তিনি পরশুরামকুণ্ডে যাইবার জন্যই কামরূপ অঞ্চলে আসিয়া থাকিবেন।

উপসংহারে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে, আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে প্রকাশিত চৈতন্যদেব সম্বন্ধে গ্রন্থাবলীতে চৈতন্যদেবের আসাম আগমনের কোনও উল্লেখ নাই বলিয়াই যে এই কথাকে ঐতিহাসিক সত্য নয় বলিয়া প্রত্যাখান করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নয়

অল্প কাল মাত্র হইল, বঙ্গদেশে প্রত্নতত্ত্বের উপর শিক্ষিত লোকদের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কত নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে, কত পুরাতন কাহিনী— যাহা এত দিন ইতিহাস বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল, ভ্রান্তমত বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? আসামের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে এখনও রীতিমত কোন অনুসন্ধান হয় নাই; কখন যে হইবে, তাহাও বলিতে পারি না। বঙ্গ এবং আসাম, এই দুই দেশ এত সন্নিকটবর্ত্তী এবং দুই দেশের অধিবাসীদিগের ভিতর ধর্ম্ম, সমাজ, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে এত সৌসাদৃশ্য যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে এক দেশের লোক অপর দেশের লোকের সহিত নানা ভাবে সম্পর্কিত ছিল বলিয়া সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। বঙ্গদেশের লোক আসাম দেশে এবং আসাম দেশের লোক বঙ্গদেশে চলিয়া গিয়া সেই সেই দেশের লোক বলিয়া পরিগণিত হওয়ার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের অনেক অংশ পূর্ব্বে কামরূপ বলিয়াই প্রখ্যাত ছিল। আজ কাল আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুগ্রহে পরস্পরকে যতটা দূর বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি, পূর্ব্বে যে সেরূপ ছিল না, তাহা সাহস করিরা বলা যাইতে পারে। সেই জন্য অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে আসাম সম্বন্ধে এবং আসামে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বরং না হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দেবগোস্বামী
(আসাম)

মানভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত

মানভূম জেলার অধিকাংশ অধিবাসী অনার্য্য কোলবংশীয়। মোট জেলার লোকসংখ্যা ১৫৪৮০০০। কুর্ম্মি, সাঁওতাল, ভূমিজ ও বাউরিজাতীয় ব্যক্তিগণ সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গত লোক-গণনায় জানা গিয়াছে যে, এই জেলায় কুর্ম্মির সংখ্যা—২৯২০০০, সাঁওতালের সংখ্যা—২৩২০০০, ভূমিজের সংখ্যা—১১৬০০০, বাউরির সংখ্যা—১০৬০০০।

কোলবংশীয় অনার্য্যগণ নৃত্য-গীতে বিশেষ অনুরক্ত। পূজা-পার্ব্বণ ও বিবাহাদি উৎসবে কোল-পল্লী সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে। নৃত্য-গীত তাহাদের উৎসবের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। সারা দিন মজুরি করিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিবার সময় কোল-রমণীগণ হাট-মাঠ, পথ-ঘাট সঙ্গীতে প্লাবিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবার সময়ও তাহাদের গানের বিরাম নাই। প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত অশিক্ষিত জাতি-সকল যখন প্রাণ খুলিয়া গান ধরে, তখন তাহাদের আন্তরিক ভাবোচ্ছ্বাস দৃষ্টে সদা চিন্তাপরায়ণ সভ্য জাতিগণের হিংসা হইবার কথা।

কুর্ম্মিগণ আচার-ব্যবহার ও শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সভ্য জাতিগণের ন্যায় তাহাদেরও হৃদয়পটে সমাজ-সমস্যার ছায়া পড়িয়াছে। এখনকার কুর্ম্মি-সমাজে রমণীগণের নৃত্য ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। হয় ত পূর্ব্বদেশাগত বাঙ্গালীর অনুকরণে তাহাদের সমাজ হইতে রমণীগণের সঙ্গীতও এক দিন উঠিয়া যাইবে।

কোল-রমণীগণ যে সকল গানে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া থাকে, অনেক সময়ে সেই সকল গানের কোন বিশেষ অর্থ থাকে না। গানের ভাষায় অনেক সময়ে ব্যাকরণের শৃঙ্খল বা ছন্দালঙ্কারের কিম্বা রাগরাগিণীর নিগড় থাকে না। কিন্তু এই প্রকার গান গাহিয়া কোলগণ যে প্রকার আনন্দ অনুভব করে, মার্জ্জিত-রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ধ্রুপদ ও চৌতালে অনেক সময় সে প্রকার আনন্দ উপভোগের সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন না।

কোলগণের সঙ্গীতের সাহচর্য্য করিবার জন্য অনেক সময়ে কোন বাদ্যের প্রয়োজন হয় না। নৃত্যের সহিত যে সকল গান গীত হয়, প্রায় সেই সকল গানের সহিত মাদোল ও বংশীর ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। সাঁওতালগণ বাঙ্গালা গান গাহিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত তাহারা সাঁওতালি ভাষায় রচিত গানও গাহে। অপর জাতিরা কেবল বাঙ্গালা গান গাহিয়া থাকে। কয়েকটি বাঙ্গালা গানের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১)

নাগর১ যাছন্২ গো
ভাত হাতে৩ টাঙ্গিয়া৪ ঝলকায়ে৫
বাইরালেন৬ কুঁকড়ি ডাকে৭
সোঝো গ্যালেন্ কুলিবাটে৮
চুটিয়া৯ ফুঁকিয়্যা১০।
ভাত খাবার বেলা হ'ল
এখ্‌নো নাগর না আইল
(কোন বাটে) কেঁদ১১ খাছন্ মহুল বনে।

(২)

জামপাটা১২ চিরি চিরি নৌকা বনাব১৩
নৌকায় নহর১৪ চলি যাব
বাপ্‌ ঘরে তেল্‌পালে তড়্‌কা১৫ ঝল্‌মল্ করে।
আম্‌পাতে তড়্‌কা মাঝ্‌লে
তড়্‌কা ঝল্‌মল্ করে।

(৩)

তেঁতুল পাতে ধান মেলেছি গো
পায়রা রাজা ঘুরি ফিরি খায়।

---

(১) নাগর—রসিক পুরুষ।
(২) যাছন্—গিয়াছেন।
(৩) ভাত হাতে—ভাত খাইবার হাতে, অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তে।
(৪) টাঙ্গিয়া—টাঙ্গি, এতদ্দেশীয় এক প্রকার অস্ত্র।
(৫) ঝল্‌কায়ে—নাড়িতে নাড়িতে।
(৬) বাইরালেন—বাহিরে গিয়াছেন।
(৭) কুঁকড়ি ডাকে—কুক্কুট ডাকিবার সময়, অতি প্রত্যুষে।
(৮) কুলিবাটে—গ্রাম্য রাস্তার দিকে।
(৯) চুটিয়া—চুটি, এক প্রকার বিড়ি বা চুরুট।
(১০) ফুঁকিয়্যা—টানিতে টানিতে।
(১১) কেঁদ—এতদ্দেশীয় এক প্রকার বন্য ফল।
(১২) জামপাট—জাম গাছের পাটা বা তক্তা।
(১৩) বনাব—তৈয়ার করিব।
(১৪) নহর—বাপের বাড়ী।
(১৫) তড়্‌কা—কাণের ফুল।

ভাল রে পায়রা তোরে দেখিব রে
তোরি পাখায় সিপাহী সাজাব।

(৪)

ডেহিরির[১] উপর ডেহিরি দাদা
ডেহিরি কত দূর রে,
লোয়াগড় চাঁদড়া[২]
দেশ কত দূর রে।

(৫)

কোন ফুলের সঙ্গে পীরিতি করিব
কোন ফুলের সঙ্গে যাব রে সজনি,
যুঁহি ফুলের সঙ্গে পীরিতি করিব
গুলাব ফুলের সঙ্গে যাব রে সজনি!

অনেক গানে প্রশ্নোত্তর থাকে। গানের প্রথম অংশে প্রশ্ন ও শেষাংশে তাহার উত্তর থাকে। এই প্রকার গানে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়। এই প্রকার কয়েকটি গানের দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(৬)

(প্রশ্ন) কোন্ সয়[৩] বাইরায় খড়ি পিঁপড়ি[৪]
কোন্ সঁয় বাইরায় ধেনু গাই।
কোন্ সঁয় বাইরায় সাঁগুকা বিটিয়া[৫]
দুয়ো খোড়ে[৬] আর্‌তা লাগায়ে?

(উত্তর) টিলা[৭] সঁয় বাইরায় খড়ি পিঁপড়ি
বাথান[৮] সঁয় বাইরায় ধেনু গাই।
ঘর সঁয় বাইরায় শাঁগুকা বিটিয়া
দুয়ো খোড়ে আর্‌তা লাগায়ে।

---

(১) ডেহিরি—চৌকাঠ।
(২) গ্রামের নাম।
(৩) কোন্‌-সঁয়—কোন্ স্থান হইতে।
(৪) খড়ি পিঁপড়ি—শ্বেত বর্ণের পিপীলিকা, উই।
(৫) সাঁগুকা বিটিয়া—শাশুড়ীর কন্যা, স্ত্রী।
(৬) দুয়ো খোড়ে—দুই পায়ে।
(৭) টিলা—উই-ঢিবি।
(৮) বাথান—গোঠ।

(৭)

(প্রশ্ন) কেত্তি[১] জানল[২] বরদা[৩] চৈত বৈশাক্
কৈসে[৪] জানল আষাঢ় মাস।
কৈসে জানল বরদা আশিন ভাদর্
কৈসে জানল বরদা কাতিক মাস্॥
(উত্তর) ধুলায় জানল বরদা চৈত বৈশাক্
কাদায় জানল আষাঢ় মাস।
আসে জানল বরদা আশিন ভাদর
শিঞারে[৫] জানল বরদা কাতিক মাস॥

(৮)

কোন্ ঠাঞে[৬] ফোটে হর্দিরে[৭] ঝিঙ্গা ফুল,
ঝাঁটি গাঁধায়[৮] ফোটে হর্দিরে ঝিঙ্গা ফুল।
কোন্ ঠাঞে ফোটে লাল সালুকের ফুল,
মালদহে ফোটে লাল সালুকের ফুল।

প্রশ্নোত্তরের গান ব্যতীত অন্য প্রকার আর কয়েকটি গানের নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল।

(৯)

ও বাছা ফুচুর[৯]
তুই নাকি পুরবাসে[১০] যাবি?
পুরবাসে গেলে বাছা
মাড়[১১] কুথা পাবি?

---

(১) কেত্তি—কিরূপে।
(২) জানল—জানিতে পারিল।
(৩) বরদা—গাভী।
(৪) কৈসে—কিসের দ্বারা।
(৫) শিঞারে—সাজ-সজ্জায়। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় এ দেশে গরুর গা চিত্রিত করিতে হয়।
(৬) ঠাঞে—স্থানে।
(৭) হর্দিরে—হরিদ্রা রঙের।
(৮) ঝাঁটি গাঁধায়—বন্য কাষ্ঠে নির্ম্মিত মাচার উপর।
(৯) ফুচু—লোকের নাম।
(১০) পুরবাস—প্রবাস।
(১১ মাড়—ভাতের ফেন।

(১০)

বাপ্ হঁয়ে আনেছে বর
সই, দোষ দিব কি পরকে ?
কিবা শিবের রূপের ছটা
গায়ে ভসম্ মাথায় জটা
ঢাকের মতন মোটা সোটা
যম লেগেছে বল্‌কে ।

(১১)

কোনহ ডালে কুইলিনী[১] কুড়ুরছে[২]
শ্যামবঁধু, কোন ডালে তার বাসা ?
আগহি[৩] ডালে কুইলিনী কুড়ুরছে
শ্যাম বঁধু, মাঝ্ ডালে তার বাসা ।
ছাঁওকে[৪] পাড়ব মাটিকে মারব
বাঁসাটি বাণে ভাসাব ।
বহুত যতনে সাগর বাঁধব ।
সাগর শুখাল মাণিক লুকাল
অভাগীর কপালের দোষে ।

দশম ও একাদশ সংখ্যক গান দুইটি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে রচিত বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গদেশীয় গান এতদ্দেশীয় ভাষার ছাঁচে ঢালিয়া এই গান রচিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় লোকগণ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। পূর্ব্বদেশাগত বৈষ্ণবগণ এতদ্দেশে বিস্তর বৈষ্ণব পদ আমদানি করিয়াছেন। দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে মাদোলের বাদ্য সহকারে স্থানে স্থানে অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ বৈষ্ণব পদ গীত হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে বৈষ্ণবগণ দেশ ও পাত্রের উপযোগী করিবার জন্য গানের স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। আবার স্থানে স্থানে অক্ষুণ্ণ বৈষ্ণব গানও শ্রুত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত গানটি স্থানে স্থানে গাহিতে শোনা গিয়াছে।

গগনে উদিতে ভানু ছল করে বলে কানু
শোন্ সখি, শোন্

---

(১) কুইলিনী—কোকিলবধূ।
(২) কুড়ুরছে—গান করিতেছে।
(৩) আগহি—উপরের।
(৪) ছাঁওকে—ছায়াকে।

আমরা গোয়ালা জাতি দেবি ভগবতী

(ও তাই গেল আজ্ রাতি)

রাখাল সনে বিদ্যমান কপিলাকে দিব দান

শোন্ সখি, শোন্। ইত্যাদি

এই প্রকার গান গাহিবার ও শুনিবার জন্য কোলজাতীয় পুরুষ ও রমণীগণের উদ্যম ও আগ্রহ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

শ্রীহরিনাথ ঘোষ

---

1 Percent এর প্রতিশব্দ

One Percent, Two perce t প্রভৃতি কথার বাঙ্গালা কি ? আমি যত দূর জানি, সহজ কথায় এতদর্থবোধক কিছু শব্দ আমাদের নাই। ডাক্তারী পুস্তকেই এই কথাগুলি বেশী ব্যবহার করিতে হয়। কেহ কেহ বাঙ্গালা অক্ষরে "ওয়ান্ পারসেণ্ট', "টু পারসেণ্ট" লিখিয়া গোলমাল এড়াইয়াছেন; কেহ বা খাটী বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া "শতকরা এক ভাগ দ্রব, শতকরা দুই ভাগ দ্রব" ইত্যাদি লিখিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে শতকরার হিসাবের বহুল ব্যবহার না থাকায় আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা হইতেও কোন সাহায্য পাওয়া যায় না।

পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে "One percent, Two percent" প্রভৃতির একটি সুন্দর প্রতিশব্দ আছে। কথাটি জমী ক্রয়ে ও কমিশনের হিসাব কষিতে ব্যবহৃত হয়। এক শত টাকা মূল্যে ক্রীত জমীর বার্ষিক আয় ৫৲ টাকা হইলে ঐ ক্রয়কে "পাঁচোত্তরা" ক্রয় বলে। এইরূপে "চারোত্তরা, আটোত্তরা, সাড়ে সাতোত্তরা" প্রভৃতি কথারও ব্যবহার আছে। যদি কোন জমীর আয় চারি টাকা হয় ও মূল্য ৯০৲ টাকা হয়, তবে তাহা প্রায় "সাড়ে চারোত্তরা" হইল। "এই জমী কি দরে কেনা হইয়াছে", এই প্রশ্নের উত্তরে "পাঁচোত্তরা কিনিয়াছি" কিংবা "ছয়োত্তরা কিনিয়াছি", এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হয়; প্রশ্নকর্ত্তা, উত্তরদাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী শ্রোতা কাহারও বুঝিবার বাকী থাকে না।

কমিশন কষিবার সময়ও ঐরূপ। বড় বড় মামলা-মোকদ্দমা বা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মধ্যবর্ত্তী সম্পাদক (উকীল) যে কমিশন দাবী করিয়া থাকেন, তাহা তায়দাদের উপর "আধোত্তরা, একোত্তরা" বা ততোধিক হিসাবে কষা হইয়া থাকে অর্থাৎ মোকদ্দমা বা বেচা-কেনার Value (তায়দাদ)এর উপর একটা শতকরা নির্দ্দিষ্ট হারে পাইয়া থাকেন।

"উত্তর" শব্দের গ্রাম্য ব্যবহারে 'উত্তরা" শব্দের উৎপত্তি। "একোত্তর, দুয়োত্তর" লিখিলে যেমন সুশ্রাব্য হয়, তেমনই ব্যাকরণ-শুদ্ধও হয়। এই শব্দটি সাহিত্যিকেরা গ্রহণ করিলে ভাষার একটি অভাব দূর হইবে। কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালা ভাষার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নে বিশেষ যত্নশীল আছেন। সম্প্রতি যাহাতে মেডিকেল স্কুলসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে পরিষৎ অতিশয় উদ্যোগী হইয়াছেন। এই সুন্দর শব্দটি গ্রহণ করিবার পক্ষে এখনই মাহেন্দ্র যোগ।

নিম্নে প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল;—

$\frac{1}{2}$ percent Commission—আধোত্তর (বা কথোপকথনে আধোত্তরা) কমিশন।

1 Percent solution—একোত্তর দ্রব।

3 Percent solution of Carbolic acid—কার্ব্বলিক এসিডের ত্রিনোত্তর দ্রব।

4 Percent alcoholic solution—চারোত্তর এলকোহলীয় দ্রব, এলকোহলের চারোত্তর দ্রব।

6 Percent watery solution—ছয়োত্তর বা ষড়োত্তর জলীয় দ্রব।

"Percent" এই শব্দের পরিবর্ত্তে ইংরেজীতে যে সাঙ্কেতিক চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়, বাঙ্গালাতে অবিকল তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

শ্রীতারকনাথ দেব

শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটী-মাহাত্ম্য

স্থান-মাহাত্ম্য

"পানিহাটী গ্রামে নানা ভাবের প্রকাশ"—(ভক্তিরত্নাকর)

শ্রীপাট পানিহাটী যাঁহার পুণ্যময় আভায় শ্রেষ্ঠতম তীর্থরূপে আলোকিত, সেই সেবাপরায়ণ রাঘব পণ্ডিতের বিবরণ দিবার পূর্ব্বে পানিহাটীর মাহাত্ম্য ও যৎকিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিবৃত করিলে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ, পানিহাটীর সহিত বৈষ্ণব-জগতের সম্বন্ধ বিশেষ ভাবেই জড়িত ; বহু ভক্তের ইহা লীলাস্থল। বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীপাট পানিহাটী চিন্ময় ভূমি। ইহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের আনন্দ-বিশ্রামের স্থান ; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অতি প্রিয় বিহার-ক্ষেত্র। এই স্থানেই নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেক-লীলা হইয়াছিল ; পানিহাটী সর্ব্ব আদি প্রচারক্ষেত্র ; 'মালসা ভোগ' প্রথার ইহাই প্রথম উদ্ভবস্থান। "জম্বিরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল" এই অনৈসর্গিক ঘটনা এই স্থানেই ঘটিয়াছিল। বুদ্ধ যেরূপ রাজ-ঐশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধত্ব লাভের জন্য গয়া-সন্নিধানে 'বোধিদ্রুম'-তলে উপস্থিত হইয়া ভিখারী সাজিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় পারিষদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীও ঠিক সেইরূপ ভাবে নব লক্ষ মুদ্রা বাৎসরিক আয়ের বিষয়-বৈভব ও অতুলনীয়া সুন্দরী ভার্য্যা তুচ্ছ করিয়া পানিহাটীর শ্রীবটবৃক্ষ-তলে কাঙ্গাল সাজিয়াছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহার আগমন উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে 'স্মরণ উৎসব' হইয়া থাকে, উহারই নাম 'দণ্ড-মহোৎসব'। এই কৃপাদণ্ডের চিড়া মহোৎসব হইতেই সর্ব্বদেশে বৈষ্ণব-সমাজে মালসা-ভোগ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত কত শত ভক্তের পদধূলি যে এই স্থানে পতিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন ;—

> যে স্থানে বৈষ্ণব জন করেন বিজয়।
> সেই স্থান হয় সদা অতি পুণ্যময় ॥—(ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ)

গৌড় মণ্ডলমধ্যে যতগুলি শ্রীপাট আছে, তন্মধ্যে শ্রীপাট পানিহাটীই বর্ত্তমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল শ্রীপাট। অন্যান্য শ্রীধামাদি অপেক্ষা ইহার মাহাত্ম্য বেশী। ইহা অত্যুক্তি নহে, অতি সত্য কথা। কেন ? তাহার কারণ জানাইতেছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে ;—

> শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দের নর্ত্তনে।
> শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে ॥
> এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।—(অন্ত্য—২য় পরি)

অপিচ অন্যত্রে,—

এই মত শচীগৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন দর্শন॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আসি বারে বারে।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে॥—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ২ পরিঃ)

বর্ত্তমান কালে প্রভুর অতি প্রিয় চারিটি স্থানের মধ্যে তিনটি ক্ষেত্র অপ্রকট বা আমার মত অভক্তের পাপ-চক্ষুর বিষয়ীভূত নহে। শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীগৌরপদরজঃকে মাতা সুরধুনী আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন, কণামাত্র রাখেন নাই। কারণ, নবদ্বীপের উক্ত অংশ এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে নিহিত। শচী আয়ির পবিত্র রন্ধন এবং প্রভুর ভোজন-লীলা এক্ষণে কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের ভক্তগণের যে আনন্দদায়ক, তাহা কি করিয়াই বা জানিব? আর মূর্ত্তিমন্ত প্রেম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু "কোথায় যে নাচিছে", তাহাও আমার মত বহির্ম্মুখ কেমন করিয়া দেখিবে? ভক্ত বলেন ;—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এখানেও প্রভেদ ; অর্থাৎ সকল ভাগ্যবানে নহে, মহাভাগ্যবান্ যাঁহারা, তাঁহাদেরই নিত্য-লীলা দেখিবার অধিকার।

আসল কথা, প্রভু সকল ক্ষেত্রগুলি আমাদের চর্ম্ম-চক্ষুর অন্তরালে রাখিলেও তাঁহার 'নিরন্তর আবির্ভাব-ক্ষেত্র রাঘব-ভবনটিকে লুকাইতে পারেন নাই। পতিতপাবন পতিতের জন্য একটি চিহ্ন রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং স্বমুখের বাণীতে এই "রাঘব-ভবনে"ই তিনি চিরতরে আবদ্ধ হইয়া আছেন। এই কারণেই বৈষ্ণব তীর্থ-মধ্যে পানিহাটীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন। গৌর-ভক্তগণের পক্ষে এমন পুণ্যময় স্থান ভূমণ্ডলমধ্যে আর কোথাও নাই।

শুধু ভক্তের নহে, এই স্থানে ঐতিহাসিকেরও বুঝিবার অনেক বিষয় আছে ; পুরাতত্ত্ব-বিদেরও গবেষণার যথেষ্ট উপকরণ আছে ; সৌন্দর্য্যলিপ্সুর উপভোগের দৃশ্যাদিও অতুলনীয়। ১২৫ বৎসর মাত্র বয়সের বটবৃক্ষ দেখিবার জন্য যাঁহারা সাগ্রহে "বোটানিক্যাল গার্ডেনে" গমন করেন, তাঁহারা একবার কলিকাতার এত নিকটে আসিয়া ৫০০ বৎসরের বটবৃক্ষ দেখিয়া কৌতুহল চরিতার্থ করুন। আকবরের ঠাকুর-দাদার পূর্ব্ব হইতেও এই বৃক্ষ বর্ত্তমান।

ঐতিহাসিক তথ্য

পানিহাটীর উত্তরাংশের নাম ভবানীপুর। এই ভবানীপুর সীমার মধ্যে আমাদের 'রাঘব-ভবন'।

মুসলমান-রাজত্ব সময়ে পানিহাটী একটি মহকুমায় পরিণত হয়। এ জন্য এক জন কাজী (বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট স্বরূপ) সৈন্য-সামন্ত লইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকেন।

নিত্যধামগত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় পানিহাটীতে কাজীর বাসের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যথা;—"হোসেন খাঁ, 'সাহা' উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের রাজা হইলেন। তাঁহার অধীনে স্থানে স্থানে এক একজন কাজী রাখিলেন; ঐ সকল কাজী সৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। * * নবদ্বীপে বেলপুখুরিয়াতে 'চাঁদ খাঁ' নামে একজন কাজী, * * শান্তিপুরে 'মলুক' নামে একজন কাজী * * এইরূপ পানিহাটী গ্রামে একজন কাজী বাস করিতেন।"—(অমিয় নিমাই-চরিত, ১ম খণ্ড, ৶০ পৃঃ)

কাজীর আবাস-ভূমি ও বিচারালয় প্রভৃতি সমস্তই কাল-মাহাত্ম্যে লুপ্ত হইয়াছে। তবে গোরস্থান, নমাজের ইদ্‌গা, খাজনাথানা, গেট প্রভৃতির চিহ্ন এবং কাহারও কাহারও নাম এখনও রহিয়াছে। আর চন্দ্রকেতু রাজার খোদিত হংসডিম্বাকৃতি পরিখার পয়ঃপ্রণালী গঙ্গার এক ধার হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিঞ্চিৎ দূরে অন্য ধারে মিশিয়াছিল, তাহা স্থানে স্থানে গড়, ঝিল, পুষ্করিণী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবার দ্বারা বেশ সুস্পষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া দিতেছে। কিন্তু ভবানী দেবীর মূর্ত্তি আর নাই। সহজ অনুমান, মুসলমানগণের আবাসগৃহে দেবীমূর্ত্তির অবস্থান তাঁহারা ভাল বিবেচনা করেন নাই।

৺গঙ্গার গতি

অতি অল্প দিনের মধ্যে ভাগীরথীর যেরূপ রূপান্তর হইয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলে ও শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, পানিহাটীতে সেরূপ কোনই উপদ্রব এ পর্য্যন্ত হয় নাই। চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যে স্থানে জলের সীমা ছিল, অধুনা ঠিক সেই স্থানেই রহিয়াছে। মহাপ্রভু যে ইষ্টকময় ঘাটে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ঘাট এবং সেই স্থান পূর্ব্ববৎ বিরাজমান।

(রেণেল্ড সাহেবের ১৩০ বৎসর পূর্ব্বেকার মানচিত্রে এবং এসিয়াটিক সোসাইটির প্রচারিত ১৫১৮ খৃঃ অব্দের অর্থাৎ ৩৯৮ বৎসর পূর্ব্বেকার রচিত "গাসটলডিসের গালফো দি বাঙ্গলা" নামক মানচিত্রে গঙ্গার এই স্থানে যেরূপ গতি অঙ্কিত আছে, এখনও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত মানচিত্রে পানিহাটীর নাম উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু পানিহাটীর এক মাইল উত্তর দিকে সুখচর গ্রামের নাম রহিয়াছে।)

পানিহাটী কত দিনের গ্রাম

পানিহাটী যে বহু প্রাচীন গ্রাম, তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের দ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

যশোহর জিলায় এক জাতীয় ধান্য দৃষ্ট হয়, তাহার নাম 'পেনিটি ধান'। কৃষকগণ তাহাদের পিতৃপিতামহ হইতে শুনিয়া আসিতেছে যে, বহু পূর্ব্বকালে এই ধান্য গঙ্গার ধারে পেনিটি বা পানিহাটী নামক গ্রাম হইতে সে দেশে আমদানী হয়। শুদ্ধ গঙ্গার ধারে কেন, সারা বাঙ্গলায় ইহা ছাড়া পানিহাটী নামে আর কোন গ্রাম নাই।

প্রেমাবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ১৪৩৮ শকে (ইং ১৫১৬ খৃঃ) পানিহাটীতে শুভাগমন করিয়া তৎকালে ইহাকে বিশেষ সৌষ্ঠবশালী এবং বহু পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের বাসভূমি অর্থাৎ সভ্য জনপদ দেখিয়াছিলেন।—(বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা, ২ বর্ষ, ৪০৬ অঃ)

আরও বহু পূর্ব্বের কথা, রাজা বল্লাল সেনের সময়েও (১১০২ খৃঃ) পানিহাটী যে জনবহুল গ্রাম ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

মেলগ্রন্থে পানিহাটীর 'করবংশ' প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বিস্তর মৌলিক 'কর' উপাধিধারী কায়স্থের বাস ছিল। কর কায়স্থগণ পরিচয়স্থলে 'পানিহাটীর কর' বলিয়া সমাজে পরিচয় দিয়া থাকেন। কায়স্থ-সমাজের মেল-বন্ধন বল্লাল সেনের সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরেই হইয়াছে। কিন্তু অধুনা পানিহাটীতে এক ঘরও কর কায়স্থের বাস নাই।

অতি প্রাচীন কালে পানিহাটী গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। তাহার অন্যতম প্রমাণ 'বন-দেবীর আস্তানা'। (এই আস্তানা গ্রামের মধ্যস্থলে, মেদিনীপুরের বিখ্যাত উকীল বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ফুলপুকুরের বাগানমধ্যে।) বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ প্রতি বৎসর নির্দ্ধারিত দিবসে এই স্থানে আগমন করিয়া হিংস্র জন্তু প্রভৃতির উপদ্রব নিবারণ জন্য বন-দেবীর পূজা দিয়া থাকেন।

এই সকল প্রমাণাদির দ্বারা সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল হইতে যে পানিহাটী সভ্য জনপদরূপে অবস্থিত, তাহা সহজে প্রমাণিত হইতেছে।

বর্ত্তমান

বর্ত্তমানে পানিহাটী একটি বড় গণ্ডগ্রাম, বিস্তর শিক্ষিত লোকের বাসভূমি। ইহার থানা খড়দহ। শিয়ালদহ মুন্‌সিফির অধীনে ২৪ পরগণা মধ্যস্থিত; স্বনাম 'পানিহাটী মিউনি-সিপ্যালিটী'র অন্তর্গত। কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তটভূমির উপরেই স্থিত। ইহার দক্ষিণে আগড়পাড়া, পশ্চিমে ৺গঙ্গাদেবী, উত্তরে সুখচর ও পূর্ব্বে সোদপুর গ্রাম। ১৯১১ খৃঃ অব্দের লোক-গণনায় লোকসংখ্যা ৪ হাজার। এই গ্রাম কালেক্টরী ১৫৫, ১৮০, ১৮১, ১৯৪ নম্বর তৌজিভুক্ত। রাস্তা বাদে মোট ৫১৮ একার জমি। পানিহাটীর উপর দিয়া তিনটি সুবৃহৎ রাস্তা গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক সময়ে যে রাস্তাটি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নাম 'বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড'। ইহা অতিশয় প্রসর এবং দুই ধারে ঘন বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত। ইহা এমন সুন্দর দৃশ্যময় ও সুশীতল যে, শুনা যায়, এরূপ রাজবর্ত্ম ভারতবর্ষমধ্যে খুবই বিরল। দ্বিতীয়, মুরশিদাবাদ রোড বা পুরাণ রাস্তা; পানিহাটীর পূর্ব্ব ধার দিয়া বরাবর কলিকাতায় মিশিয়াছে। নবাবের সৈন্যাদি স্থলপথে কলি-কাতায় আসিতে হইলে এই পথেই যাতায়াত করিত। তৃতীয়, রাজা রামচাঁদের ঘাটের উপর হইতে আরম্ভ করিয়া বারাসত, বাদু, দেগঙ্গা, হাড়োয়া, চৌরশী, বসিরহাট, টাকি ও প্রতাপাদিত্যের পুরাতন যশোহরের উপর দিয়া গিয়াছে। রেল হইবার পূর্ব্বে ঐ সমস্ত জন-

পদবাসী এই রাস্তা দিয়াই ৺গঙ্গাদর্শনে আসিতেন। প্রবাদ, চন্দ্রকেতু রাজা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীপাট পানিহাটীর অতীত এবং বর্ত্তমানের নানাবিধ তথ্যের বিশেষ পরিচয় দিবার একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এই স্থানেই আমরা ক্ষান্ত হইয়া রাঘব পণ্ডিতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি।

শ্রীরাঘব পণ্ডিত মহারাজ

"রাঘব পণ্ডিত বন্দোঁ প্রণতি বিস্তর।"—(চৈতন্যমঙ্গল)

বৈষ্ণব-শাস্ত্রে তিন জন রাঘবনামা ভক্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম রাঘব গোস্বামী, দ্বিতীয় রাঘবপুরী, তৃতীয় রাঘব পণ্ডিত। রাঘব গোস্বামী দাক্ষিণাত্য রামনগরনিবাসী ব্রাহ্মণ, "ভক্তি-রত্নপ্রকাশ" গ্রন্থ-প্রণেতা; পূর্ব্বলীলায় ইহাঁর 'চম্পকলতা' আখ্যা। ইনি সমুদয় ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে ইহাঁর সমাধি বর্ত্তমান।

রাঘবপুরী—ইহাঁর বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না,—

"গরুড়াবধূতদেবঃ পুরী রাঘবসংজ্ঞকঃ।"—(বৈষ্ণব অভিধান)

এইবার আমরা রাঘব পণ্ডিত মহারাজের বিষয় বলিতেছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, যে রাঘব পণ্ডিত অসামান্য ভক্তিবলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, যাঁহার গৃহই প্রভুর আনন্দ-বিশ্রামের স্থান, শ্রীমাধব ঘোষের অর্দ্ধ খণ্ড হরীতকী সঞ্চয় করাতে যে মহাপ্রভু বৈরাগ্যের হানি বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাঘব পণ্ডিতের অপূর্ব্ব প্রেমবলে স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুই বৎসরাধিক কাল সেবার জন্য "রাঘবের ঝালি" হইতে সুস্বাদু আচারাদি খাদ্য দ্রব্য আনন্দে সঞ্চয় করিয়া স্বেচ্ছায় যতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যাঁহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া পানিহাটীকে বাসভূমে পরিণত করিয়াছিলেন—সেই মহাপ্রেমিক, অত্যাশ্চর্য্য সেবাপরায়ণ রাঘব পণ্ডিতের জীবনী বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অংশ হইতে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। অত্যন্ত দুঃখের কথা, এমন মহাপুরুষের পুণ্যময় জনক-জননীর নাম পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। বৈষ্ণব গ্রন্থমধ্যে যে যে স্থানে ইহাঁর বিষয় বর্ণিত আছে, আমরা তৎসমুদয়ই সংগ্রহ করিয়াছি। সংগৃহীত বিষয়গুলি হইতে পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, ইনি ধর্ম্মরাজ্যের কত উচ্চ পদবীতে আরূঢ় ছিলেন। অধিকাংশ বৈষ্ণব গ্রন্থেই ইহাঁর মহিমার কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীপাট পানিহাটী রাঘব পণ্ডিতের জন্মভূমি বলিয়াই আজ ইহা বৈষ্ণবগণের নিকট পরম তীর্থরূপে প্রণম্য।

"যে কুলে যে দেশে ভাগবত অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তারে॥
যে স্থান হইয়া ভক্ত করেন প্রয়াণ।
পুণ্যময় তীর্থ হয় সে সকল স্থান॥
ভক্ত-জন্মস্থানের মহিমা অপার।
* * * *॥—(ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ)

রাঘবকে বক্ষে ধারণের জন্মই ত শ্রীভগবানের পদরজঃ লাভ করিয়া পানিহাটী মহিমান্বিত হইয়াছে! পানিহাটীর নাম শ্রবণে কত মহাপুরুষকে কৃতাঞ্জলিবদ্ধে দণ্ডবৎ করিতে দেখিয়াছি। এ ভক্তি, এ গৌরব শুদ্ধ পণ্ডিত মহারাজের জন্যই। নতুবা বাঙ্গালার বিস্তৃত ভূখণ্ডমধ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রামটি কাহার লক্ষ্যমধ্যে আসিত? কিন্তু হতভাগ্য গ্রামবাসী আমরা, সে পূর্ব্ব-গৌরবে কিছুমাত্র গৌরবান্বিত নহি। অপি চ নেড়ানেড়ির কাণ্ড বলিয়া এতাবৎ ইহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি। এত সভ্য আমরা! এত আভিজাত্য আমাদের! হায়, ভেক যেমন পদ্মের নিকটে বাস করিয়াও মধুর আস্বাদ পায় না, দূরদেশাগত ভ্রমরেরই তাহা লভ্য হয়, আমাদেরও তদ্রূপ অবস্থা।

নিম্নলিখিত প্রামাণিক গ্রন্থে বৈষ্ণব-বন্দনা-প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহারাজের বন্দনা পাওয়া যায়, যথা;—

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—'রাঘব পণ্ডিত বন্দোঁ প্রণতি বিস্তর'।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি, ১০ম)—'রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।'

দৈবকীনন্দনকৃত বৈষ্ণব-বন্দনায় (১৯ পৃঃ)—

'মহা অনুভব বন্দোঁ পণ্ডিত রাঘব।
পানিহাটী গ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব॥'

বৃন্দাবনদাসকৃত ঐ (৩৭ পৃঃ)—

"বন্দিব রাঘবানন্দ যাঁর ঘরে নিত্যানন্দ
অনুভব করিল বিদিত।
বাড়ীর জম্বির গাছে কদম্ব ফুটিয়া আছে
সর্ব্ব লোক দেখিতে বিস্মিত॥"

বৃন্দাবন ঠাকুরের ঐ (১০ পৃঃ)—

"চলিলেন পণ্ডিত শ্রীরাঘব উদার।
গুপ্তে যাঁর ঘরে হইল চৈতন্য-বিহার॥"

বৈষ্ণব অভিধানে (৪৯ পৃঃ)—'রাঘবো জগদানন্দপণ্ডিতঃ শ্রীপুরন্দরঃ।'

শ্রীবৃন্দাবনলীলায় ইনি ধনিষ্ঠা সখী ছিলেন। যথা ;—

"ধনিষ্ঠা ভক্ষ্যসামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্‌ব্রজেঽমিতাম্।
সৈব সংপ্রতি গৌরাঙ্গপ্রিয়ো রাঘবপণ্ডিতঃ॥" ১৬৬॥
—(গৌরগণোদ্দেশদীপিকা)

"ধনিষ্ঠা সখী এবে রাঘব পণ্ডিত।
চৈতন্যের শাখা পানিহাটীতে বসত॥"—(বৈষ্ণব আচারদর্পণ)

নিম্নলিখিত কয়েকখানি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের উদ্ধৃত পয়ারগুলি দ্বারা পণ্ডিত মহারাজের প্রেমভক্তি এবং পানিহাটীর মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি হইবে। যথা ;—

অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবতে ;—

"পানিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ।
আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র॥
প্রভু বোলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া॥
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব আলয়॥"

ঐ অন্যত্রে ;—

"হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ সনে॥"

* * * *

"পানিহাটী গ্রামে হৈল যত প্রেমসুখ।
চারি বেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ;—

"রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার॥"—(অন্ত্য,—৬ষ্ঠ পরিঃ)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (ভাষা) ;—

"এক দিনে নৌকা আইল পানিহাটী গ্রাম।
নৌকা হইতে ভক্ত সঙ্গে নামে ভগবান॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার গ্রন্থে ;—

"ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আর পানিহাটী গ্রাম।
কীর্ত্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম॥"

ভক্তিরত্নাকরে ;—

"ভক্ত সঙ্গে কি অদ্ভুত প্রভুর বিলাস।
পানিহাটী গ্রামে নানা ভাবের বিকাশ॥"

ঐ অন্যত্রে ;—

"রাঘব পণ্ডিত-গৃহে সে নৃত্য কীর্ত্তন।
তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে কোন্ জন॥"

এই পানিহাটীই যে রাঘব পণ্ডিতের জন্মভূমি, তাহার নিশ্চয়তার প্রমাণ ভক্তিরত্নাকরে (৮ম তরঙ্গ, ৫৩৮ পৃঃ) দৃষ্ট হয়। যথা ;—

"রামদাস গদাধর দাসাদি সহিত।
পানিহাটী গ্রামে প্রভু হইলা উপনীত॥
মহাভক্ত রাঘবের জনম তথাই।
ভক্ত-জন্মস্থানের মহিমা অন্ত নাই॥"

রাঘব পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ছিলেন। কেন না, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি ভিক্ষা বা অন্ন গ্রহণ করাইতে সাহস করিতেন না, তিনিও তাহা কখনও অঙ্গীকার করিতেন না। পণ্ডিত উপাধি, শ্রীবিগ্রহ সেবা এবং প্রভুর ইহাঁর হস্তে ভোজন দ্বারা উক্ত প্রমাণ দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদে শ্রীরাঘব পণ্ডিত 'বিপ্র' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা,—"আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি নন্দন রাঘব। শ্রীবাস আদি যত ভক্ত বিপ্র সব॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ;—

"প্রভু বোলে রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক॥
রাঘব প্রভুর প্রীত শাকেতে জানিঞা।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা॥"—(অন্ত্য খণ্ড, ৫ অঃ)

কিন্তু ব্রাহ্মণকুলের কোন্ বংশ তিনি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। অধিকন্তু রাঘবের বংশধর বলিয়া পানিহাটী বা অন্য কোন স্থানে কোন ব্রাহ্মণের বাসের সংবাদ পাওয়া যায় না। গ্রন্থাদিতেও ইহাঁর স্ত্রীপুত্রের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইনি যে চিরকাল কুমার ছিলেন, তাহা সহজানুমেয়। পরিজনমধ্যে ইহাঁর এক ভাগ্যবতী ভগিনী ছিলেন। তিনিও বিধবা ; নাম শ্রীমতী দময়ন্তী দেবী। ইনি মহাপ্রভুর অনুরক্তা দাসী ছিলেন। পূর্ব্বলীলায় তাঁহার গুণমালা আখ্যা। "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা"র রাঘব পণ্ডিতের পরিচয়ের পরেই লিখিত আছে ;—"গুণমালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা॥"১৬৭॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি, ১০ পৃঃ)—

"রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।"

* * *

"তাঁর ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী।"

এই ভাগ্যবতী রমণীই মহাপ্রভুর জন্য অতি পবিত্রভাবে স্বহস্তে সারা বৎসর ধরিয়া নানা-বিধ আচারাদি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। রথযাত্রার সময় সেই সমস্ত দ্রব্য মোট মোট সাজাইয়া রাঘবপণ্ডিত শ্রীক্ষেত্রে প্রভুর নিকট লইয়া যাইতেন। মহাপ্রভু সানন্দে তাহা গ্রহণ করিয়া বৎসরাধিক কাল ভোজনের জন্য সযত্নে রক্ষা করিতে গোবিন্দকে আজ্ঞা দিতেন। ঐ সব দ্রব্যের মোট 'রাঘবের ঝালি' নামে খ্যাত।

শ্রীচরিতামৃতে ;—

"রাঘব পণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥"—(অন্ত্য, ১০ পরিঃ)
"রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
দোঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি ॥"—(অন্ত্য, ১০ম পরিঃ)

ঐ অন্যত্রে (অন্ত্য ১০ম) ;—

"তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী।
প্রভুর ভোগসামগ্রী সে করে বারমাসি ॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া ॥
বার মাস প্রভু তাহা করেন অঙ্গীকার ॥
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার ॥"

ইহা ব্যতীত রাঘব পণ্ডিতের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে মকরধ্বজ কর নামক জনৈক মৌলিক কর উপাধিধারী কায়স্থের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনিও পানিহাটীবাসী; স্ত্রীপুত্র-পরিজনাদি সহিত পণ্ডিত মহারাজের সেবকত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি অতিশয় সুগায়ক ছিলেন। মহাপ্রভু ইহাঁর সঙ্গীত শুনিতে ভালবাসিতেন। ইহাঁদেরই বংশধরগণ 'পানিহাটীর কর' নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীচরিতামৃতে (আদি, ১০ম পরিঃ) ;—

"রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর এক শাখা মুখ্য মকরধ্বজ কর ॥"

কর মহাশয়ও পরম ভক্ত ছিলেন। পূর্ব্বলীলায় ইহাঁর সুকেশী সখী আখ্যা।

"পীতাম্বরস্তু কাবেরী সুকেশী মকরধ্বজঃ ॥"১৬৮॥—(গণোদ্দেশদীপিকা)
"মকরধ্বজ কর বন্দোঁ গুণের নিদান।
প্রভু স্থানে কৃষ্ণগুণ সদা যাঁর গান ॥"—(বৃন্দাবন, বৈষ্ণববন্দনা)
"মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়ন ॥"—(দৈবকিনন্দন, বৈষ্ণববন্দনা)

এই কর মহাশয়ের উপর 'ঝালি' রক্ষণাবেক্ষণের সমুদয় ভার অর্পিত হইত। ইনিও প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞানে বাহকদিগের সহিত পুরুষোত্তমে 'ঝালি' পৌছাইয়া দিতেন।

"ঝালির উপর মোসীন (মুন্‌সিব) মকরধ্বজ কর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর॥"

—(শ্রীচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১০ম পঃ)

এই মহাভাগ্যবান্ কর মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের উপদেশামৃত পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

"মকরধ্বজ প্রতি গৌরচন্দ্র।
কহিলেন সেবিহ তুমি রাঘবানন্দ॥
রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার।
সে কেবল সুনিশ্চয় জানিয় আমার॥"—(চরিতামৃত)

রাঘব-ভবনে যে সমস্ত লীলা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার একটি তালিকা দিয়া একে একে সংক্ষিপ্ত ভাবে তৎসমুদায় বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

১ম। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম প্রচার জন্য পানিহাটী আগমন এবং অভিষেক-লীলা।
২য়। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোৎসব।
৩য়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পানিহাটী আগমন।
৪র্থ। রাঘব পণ্ডিতের ঝালির বিবরণ।
৫ম। রাঘব পণ্ডিতের অদ্ভুত সেবানিষ্ঠা।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর রাঘব-ভবনে আগমন ও অভিষেক-লীলা

"সুরধুনী-তীরে হরি বলে কে ?
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়ালো কিসে ?"

পুরীধামে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে প্রেম প্রচার জন্য বহির্গত হন। তিনি সর্ব্বপ্রথম পানিহাটীতে রাঘব-ভবনে আসিয়া উঁহাকেই আদি প্রচারক্ষেত্রে পরিণত করেন। এই সময়ের বিবরণ বিস্তর প্রাচীন পদে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্ত-মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আমরা দুই একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

বিরলে নিতাই পাইয়া নিজ কাছে বসাইয়া
মধু-ভাষে কহে ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হ'য়ে হরিনাম লওয়াও গিয়ে
যাও নিতাই সুরধুনী-তীরে॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হইল অন্ধ
কেহ ত না পাইল হরিনাম।

এক নিবেদন তোরে   নয়নে দেখিবে যারে
কৃপা ক'রে লওয়াবে নাম ॥
কৃতপাপ দুরাচার   নিন্দুক পাষণ্ডি আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয় ।
কুমতি তার্কিক জন   অধম পড়ুয়াগণ
জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ।
কৃষ্ণ-প্রেম দান করি   বালক পুরুষ নারী
খণ্ডাইও সবাকার দুখ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তখন ;—

গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া   নিতাই বিদায় হইয়া
আইলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে ।
সঙ্গে ভাই অভিরাম   গৌরীদাস গুণধাম
কীর্ত্তন বিহরে কুতূহলে ॥
রামাই সুন্দরানন্দ   বাসু আদি ভক্তবৃন্দ
সতত কীর্ত্তন-রসে ভোলা ।
পানিহাটী গ্রামে আসি   গঙ্গাতীরে পরকাশি
রাঘব পণ্ডিত সহ মেলা ॥
সকল ভকত লৈয়া   গৌর-প্রেমে মত্ত হৈয়া
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায় ।
পতিত দুর্গত দেখি   হইয়া করুণ আঁখি
প্রেম-রত্ন জগতে বিলায় ॥
হরিনাম-চিন্তামণি   দিয়া জীবে কৈল ধনী
পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল ।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সুরধুনী-তীরে পানিহাটী গ্রামে আসিয়া পদার্পণ করিলেন। সঙ্গে অভিরাম (খানাকুল), মাধব ঘোষ (বিখ্যাত গায়ক), গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধর দাস (এড়িয়াদহ), মুরারি, কমলাকর পিপলাই (মাহেশ), সদাশিব, পুরন্দর, কৃষ্ণদাস হোড়, পরমেশ্বর দাস (খড়দহ), মহেশ, গৌরীদাস পণ্ডিত (অম্বিকা), উদ্ধারণ দত্ত (সপ্তগ্রাম) প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভক্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাঘব-ভবনে গমন করিলেন।

রাঘব পণ্ডিত মহাসমারোহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে স্বগৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। 'করগোষ্ঠীর' সহিত রাঘবের আনন্দের পরিসীমা রহিল না ।

"আজি পরাণনাথ আইল মম ঘরে।"

এই বার দয়াল নিতাই কীর্ত্তন করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, মুকুন্দ ঘোষ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, প্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ের চিত্র শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে সুন্দরভাবে পরিদৃষ্ট হয়। (অন্ত্য, ৫ম পরিঃ),—

"হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ সনে॥
নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বই দেহে বাহ্য নাহি আর॥
নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ক সকলে আসি মিলিলা সত্বরে॥

* * * *

মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই॥
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল॥
নিরবধি হরি বলি করেন হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার॥
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে॥" (ইত্যাদি)

এইরূপে প্রভু নিত্যানন্দ অধিকারী অনধিকারী নির্ব্বিশেষে প্রেম বিতরণ করিয়া জীব-জগতের উদ্ধার সাধন করিতে লাগিলেন। ত্রিবেণী হইতে পানিহাটী পর্য্যন্ত অসংখ্য লোক কীর্ত্তন দেখিতে রাঘব-ভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। স্থাবর-জঙ্গম প্রেমানন্দে মগ্ন হইল।

"ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আর পানিহাটী গ্রাম।
কীর্ত্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম॥
দিবসে ভোজন আর রাত্রিতে কীর্ত্তন।
অনন্ত কহিতে নারে আসে কত জন॥"—(বংশবিস্তার গ্রন্থ)

এক দিবস এইরূপ মধুর নৃত্য-কীর্ত্তন হইতেছে, এমন সময়ে নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরাঙ্গদেব যেমন মহাপ্রকাশ-লীলা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাঘবের বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন করিয়া ভক্তবৃন্দের প্রতি আজ্ঞা করিলেন—"আজ আমায় অভিষেক কর"।

ভক্তবৃন্দ এই মহানন্দজনক আজ্ঞা পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। রাঘব পণ্ডিত প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় অভিষেকের কি যে আয়োজন করিবেন, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে

উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। রাঘব পণ্ডিত সহস্র সহস্র মৃৎকলসী আনাইয়া নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য সহ পূত গঙ্গাবারিতে পূর্ণ করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ হইয়া গেল। তখন দামোদর পণ্ডিত অভিষেক-মন্ত্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমস্তকে গঙ্গাবারি ঢালিতে লাগিলেন। হরিধ্বনিতে জল-স্থল কম্পিত হইতে লাগিল।

স্নানের পর রাঘব পণ্ডিত নূতন গামছা দ্বারা শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া নূতন বসন পরিধান করাইলেন। নরহরি শ্রীঅঙ্গে অগুরু, চন্দন-চূয়া চর্চ্চিত করিয়া দিলেন। তুলসী সহিত সুন্দর সুগন্ধি ফুলের মালা গলদেশে লম্বিত হইল। অতঃপর সুন্দর খট্টায় দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতিয়া তদুপরি প্রভুকে বসান হইল। ভাগ্যবান্ রাঘব পণ্ডিত শ্রীমস্তকে ছত্র ধরিলেন। কেহ চামর, কেহ গন্ধ, কেহ তাম্বূল প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া প্রভুর অগ্রে করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। আজ রাজরাজেশ্বরের অভিষেক! কেহ কি স্থির থাকিতে পারে?

"জয়ধ্বনি করিতে লাগিল ভক্তগণ।
চতুর্দ্দিকে হৈল মহা আনন্দ-ক্রন্দন॥
ত্রাহি ত্রাহি সভে বোলেন বাহু তুলি।
কারো বাহ্য নাহি সবে মহা কুতূহলী॥
স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
প্রেম-দৃষ্টি বৃষ্টি করি চারি দিকে চায়॥"—(অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায়)

পানিহাটীতে এই অভিষেক উপলক্ষ্যে বিস্তর প্রাচীন পদ রচিত হইয়াছিল। সকলগুলি উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। এ জন্য একটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

গীত—আশাবরী।

আজু আনন্দে নিতাইচাঁদে।
শোভাময় সিংহাসনে বসাইয়া কেহ না ধৈরজ বাঁধে॥
সুবাসিত গঙ্গাজল লৈয়া।
পড়ি মন্ত্র মাথে ঢালে জল
দামোদর হরষিত হৈয়া॥
জয় জয় ধ্বনি করি।
মানুষে মিশায়ে সুরগণ শোভা
নিরখে নয়ন ভরি॥
কেহ গায় অভিষেক রঙ্গে।
পরাইয়া শুভ্র বাস নরহরি চন্দন দেই সে অঙ্গে॥
—(ভক্তিরত্নাকর, ১২ তরঙ্গ)

প্রভু খট্টার উপর উপবেশন করিয়া রাঘবকে আজ্ঞা করিলেন,—"রাঘব, কদম্বফুল আমার অতি প্রিয়। তুমি কদম্বের মালা আমাকে উপহার দাও।"

রাঘব করযোড়ে কহিলেন,—"শ্রীপাদ, এ সময় ত কদম্বফুল ফোটে না। কি করিয়া আপনার আজ্ঞা পালন করিব ?"

প্রভু। বাটীর মধ্যে গমন করিয়া একবার তোমার উদ্যান দেখ দেখি; পাইলেও পাইতে পারিবে।

রাঘব বাটীর মধ্যে গমন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দেখিলেন, জাম্বিরের গাছে বিস্তর কদম্ব ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। যথা ;—

"আজ্ঞা করিলেন শুন রাঘব পণ্ডিত।
কদম্বের মালা ঝাট আনহ ত্বরিত॥
বড় প্রীত আমার কদম্ব পুষ্প প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি॥
করযোড় করি রাঘবানন্দ কহে।
কদম্ব পুষ্পের যোগ এ সময় নহে॥
প্রভু বোলে বাড়ী গিয়া চাহ ভাল মনে।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোন স্থানে॥
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইলা দেখি মহা অনুভব॥
জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল॥"

—(শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৫ম পরিঃ)

টাবা লেবুর গাছে কদম্বের ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া রাঘব আনন্দে বাহ্য-হারা হইলেন। ভক্তগণ অপূর্ব্ব কদম্বপুষ্পের সৌরভে বিহ্বলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মালা গাঁথিয়া পণ্ডিত মহারাজ প্রভুর গলদেশে অর্পণ করিলেন। তখন সকলে পরানন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন।

এইরূপ লীলাতরঙ্গে ভক্তগণ মগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময়ে আচম্বিতে কোথা হইতে অদ্ভুত দমনক পুষ্পের মহাসুগন্ধ ভক্তগণ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—"কোন সুগন্ধ তোমরা কি নাসিকায় অনুভব করিতেছ ?"

ভক্তগণ। হাঁ প্রভু, দমনক পুষ্পের গন্ধের মত অতি মনোহর সুগন্ধ আমরা পাইতেছি।

প্রভু। ইহার গুপ্ত রহস্য কেহ কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছ ?

ভক্তগণ। আজ্ঞা না।

প্রভু। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু তোমাদের কীর্ত্তন শুনিতে নীলাচল হইতে রাঘব-ভবনে

আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার গলদেশের দমনক পুষ্পের মালার গন্ধই তোমরা পাইয়াছ। অতএব সর্ব্বকার্য্য পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর। এই বলিয়া হুঙ্কার গর্জ্জনে সর্ব্বলোকের উপর প্রেম-দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন ভক্তগণের হইল কি ?—

"নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টিপাতে।
সভার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে॥

* * *

যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে॥"—(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

এইরূপ প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ভক্তগণ কি করিতে লাগিলেন ?—

"কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি না পড়ে॥
কেহো কেহো প্রেম-সুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া॥

* * *

কেহো বা গুবাক-বনে যায় রড় দিয়া।
গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলাল সকল॥"—(ঐ)

আরও কি হইল ?—

"অশ্রু কম্প স্তম্ভ ঘর্ম্ম পুলক হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ বৈবর্ণ্য গর্জ্জন সিংহ-সার॥
শ্রীআনন্দমূর্চ্ছা আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ অনুরাগ॥
সভার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।"—(ঐ)

তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার পারিষদগণকে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন করিয়া প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই পারিষদগণের এক একজন ভুবনপাবন, অতুলনীয় শক্তিধর।

"যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সভাকে হইল সর্ব্ব-শক্তি অধিষ্ঠান॥
সর্ব্বজ্ঞতা বাক্‌সিদ্ধ হইল সভার।
সভে হইলেন যেন কন্দর্প আকার॥
সভে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া॥"—(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নানাবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া তিন মাস যাবৎ শ্রীপাট পানিহাটী ধন্য করিয়াছিলেন।

"এইমত পানিহাটী গ্রামে তিন মাস।
করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিলাস॥

* * *

পানিহাটী গ্রামে যত হৈল প্রেম-সুখ।
চারি বেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক॥"—(শ্রীচৈতন্যভাগবত)।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোৎসব

"ইনি (রঘুনাথ দাস) জীবনের ত্যাগস্বীকারে জগদ্বিখ্যাত শাক্যসিংহেরও সন্নিধানে বসিবার যোগ্য পুরুষ এবং বৈরাগ্যের চরমোৎকর্ষে ঋষি-যোগীরও শিক্ষাস্থল।"—(কালীপ্রসন্ন ঘোষ)

এক দিবস ঐরূপ ভাব-তরঙ্গে সকল ভক্তগণকে ডুবাইয়া নিত্যানন্দপ্রভু পানিহাটীর গঙ্গা-তীরে বটবৃক্ষের চবুতরা উপরে বসিয়া আছেন। চারি দিকেই ভক্তগণের আনন্দকোলাহল এবং হরিধ্বনিতে জল-স্থল কম্পিত হইতেছে। এমন সময়ে একটি সুন্দর যুবক ধীরে ধীরে বৃক্ষের কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যুবকের চরণ চঞ্চল, পিণ্ডার (বেদীর) নিকট অগ্রসর হইতে প্রাণের ইচ্ছা, কিন্তু যাইবেন কি, পা যেন আর উঠিতেছে না। তাই বেদীর দিকে সলজ্জভাবে এক একবার দৃষ্টিপাত করিতেছেন। আর দেখিতেছেন যে,—

"গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডির উপরে।
বসি আছেন যেন কোটী সূর্য্যোদয় করে॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

যুবক বিস্মিত হইলেন। অধিক ক্ষণ আর সে ভাবে থাকিতে পারিলেন না। তাই সেই স্থানেই প্রভুর উদ্দেশে ভূমিতে দেহ বিলুণ্ঠিত করিলেন। এই যে এত ক্ষণ একটি যুবক এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পার্ষদগণের মধ্যে কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করাতে জনৈক সেবক তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন,—"ঐ দেখুন, রঘুনাথ দাস আসিয়া আপনাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন।" প্রভুর দৃষ্টি তখন রঘুনাথের উপর পতিত হইল। রঘুনাথকে দেখিয়া শ্রীপাদ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং রহস্য করিয়া রঘুনাথকে ডাকিয়া বলিলেন;—

"শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন॥"—(ঐ)

শ্রীপাদ ডাকিতেছেন, কিন্তু রঘুনাথ আসিতেছেন না। সলজ্জ এবং সঙ্কুচিতভাবে পূর্ব্ব-

স্থানেই দণ্ডায়মান আছেন। তখন নিত্যানন্দপ্রভু উঠিয়া গিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন। আর—"আকর্ষিয়া তাঁর মাথে প্রভু ধরিল চরণ।"—(চরিতামৃত, অন্ত্য,)

যে পদরজঃ পাইবার জন্য কত শত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিগণ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তপস্যা করিতেছেন, সেই শ্রীপাদপদ্ম আজ নিতাইচাঁদ আমাদের জোর করিয়া রঘুনাথের মস্তকে অর্পণ করিলেন। ধন্য রঘুনাথ দাস! ধন্য তোমার ভক্তি! তাহার পর কি হইল?

"কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥
নিকটে না আইস মোর ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছোঁ দণ্ডিমু তোমারে॥"—(ঐ)

শ্রীপাদ তখন রঘুনাথকে দণ্ড দিতে চলিলেন। দণ্ড কি? না, "চিড়া দধি আনিয়া আমার ভক্তগণকে ভোজন করাও।" অপরূপ দণ্ডবার্ত্তা শুনিয়া রঘুনাথ দাস আনন্দে অধীর হইলেন। ধনীর সন্তান, অর্থের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। একা বিংশতি লক্ষ মুদ্রার অধিকারী। তৎক্ষণাৎ দ্রব্যাদি আহরণ জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। মহোৎসবের বিশেষভাবেই আয়োজন হইতে লাগিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে উৎসব-সংবাদ চারি দিকে প্রচার হইয়া গেল। বিশেষতঃ রঘুনাথ দাসের অতুল বিষয়-বৈভবাদি পরিত্যাগ করণান্তর বৈরাগ্য গ্রহণ-সংবাদে উহাঁকে দর্শন করিবার জন্য লোকের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। অচিরেই বৃক্ষতল সহস্র সহস্র মনুষ্যে পূর্ণ হইল।

এ দিকে অন্যান্য গ্রাম হইতে ভারে ভারে দ্রব্য-সামগ্রী আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। বহুসংখ্যক হোলপা (মালসা) এবং বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা (গামলা) আনা হইল। দধি-দুগ্ধ, ক্ষীর, চিনি, চিড়া, চাঁপাকলা, ঘৃত, কর্পূর প্রভৃতি উপকরণ রাশীকৃত হইল। বড় বড় মাটীর গামলার কতকগুলিতে উষ্ণ দুগ্ধ দিয়া চিড়া ভিজাইয়া তাহাতে দধি, চিনি দিয়া ভোগের যোগ্য করা হইল। অপর গামলাগুলিতে উক্ত গরম দুগ্ধের চিড়া লইয়া তাহার সহিত ক্ষীর, চাঁপাকলা, চিনি, ঘৃত, কর্পূর প্রভৃতি মিশাইয়া সজ্জিত করা হইল। এইরূপে ভোগের আয়োজনাদি শেষ হইলে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ভুবনমোহন বেশে সজ্জিত হইয়া পিণ্ডার উপরে বসিলেন। একজন ব্রাহ্মণ শতটি সুসজ্জিত মালসা প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। নিত্যানন্দের পার্শ্বে রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধরদাস, মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস, মহেশ, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস হোড়, উদ্ধারণ দত্ত প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভক্তগণ শোভা পাইতে লাগিলেন। মহোৎসব দেখিতে যে সকল সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য আসিয়াছিলেন, প্রভু তাঁহাদেরও মাল্য দিয়া স্বীয় পার্শ্বে বসাইলেন। এইরূপে বেদীর উপরের স্থান পূর্ণ হইলে শ্রীবৃক্ষতলায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহুতর লোক উপবেশন করিলেন। ক্রমে এমন ভিড় হইতে লাগিল যে, বৃক্ষতলও পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন লোকে;—

"তীরে স্থান না পাইয়া আর কথো জন।
জলে নামি করে দধি চিপিটক ভক্ষণ॥"—(চরিতামৃত)

শ্রীপাদ তখন প্রত্যেক লোককে দুইটি করিয়া মালসা দিবার আজ্ঞা দিলেন। দুইটি দিবার কারণ, একটিতে দুগ্ধ চিড়া, অপরটিতে দধি চিড়া ভোজনের জন্য। বিংশতি জন পরিবেষক বেদীতে, বৃক্ষতলে এবং গঙ্গার তীরভূমিতে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় রাঘব পণ্ডিত নানাবিধ মনোহর প্রসাদ লইয়া প্রভু ও ভক্তগণকে বিতরণ করিতে করিতে প্রভুকে কহিলেন,—"শ্রীপাদ, আমি আপনার সেবার জন্য গৃহে বহুবিধ প্রসাদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, আর আপনি এখানে সেবা করিতে উদ্যত হইয়াছেন?" প্রভু হাসিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"প্রসাদ রাখিয়া ভালই করিয়াছ; এখন থাকুক, রাত্রে তোমার বাটীতে গিয়া তাহা ভোজন করিব। এখন যে প্রসাদ আনিয়াছ, খাওয়া যাউক। আর জান ত রাঘব, আমি গোয়াল গোপগণের সহিত এইরূপ পুলিন-ভোজন বড়ই ভালবাসি। এক্ষণে তুমিও এখানে আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া প্রসাদ পাও।" এই বলিয়া রাঘবকে দুইটি মালসা প্রদান করিলেন। সমস্ত লোকের পরিবেষণ সমাপ্ত হইলে প্রভু ভাবাবেশে এক লীলা করিলেন, তাহা ভগবান্ অন্তরঙ্গ যাঁহারা, তাঁহারাই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঘটনাটি এই ;—

"সকল লোকের চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সভার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া একেক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস॥"—(ঐ)

গৌরাঙ্গদেবও হাসিয়া হাসিয়া নিত্যানন্দ-মুখে এক এক গ্রাস দিতে লাগিলেন। অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবগণ এ রঙ্গ দেখিয়া মোহিত হইতে লাগিলেন।

"তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া ডাহিনে রাখিলা॥
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাহাঁ বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা॥"—(ঐ)

এইবার নিত্যানন্দ প্রভু সকলকে ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন সকলে মিলিয়া হরিধ্বনি করিয়া মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের সুরধুনীকে যমুনা ভ্রম হইল। তাঁহাদের মনে হইল, তাঁহারা যেন দ্বাপরের লোক, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত আজ পুলিন-ভোজন করিতেছেন। নিত্যানন্দ-কৃপায় সকলেই এই ভাবে বিভোর হইলেন। পানিহাটী বৃন্দাবনে পরিণত হইল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মহোৎসবের সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রচার হওয়াতে চতুর্দ্দিক্ হইতে অনবরত লোক-সমাগম হইতে লাগিল। তাই লোক-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের উপযোগী দ্রব্যাদিরও বিস্তর দোকান-পসারি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের বিবরণ শুনুন ;—

"মহোৎসব শুনি পসারি গ্রাম গ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মূল্য লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য লঞা তাহারে খাওয়ায়॥
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেহো চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

প্রভুর ভোজন শেষ হইলে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাম্বূলাদি যোগাইলেন। ভক্তগণ মাল্য-চন্দনে শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া দিল। পরে রঘুনাথ দাসকে প্রভু আহ্বান করিয়া দেবদুর্ল্লভ স্বীয় অধরামৃত প্রদান করিলেন। রঘুনাথ প্রসাদ প্রাপ্তে মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। ইহাই রঘুনাথ দাসের দণ্ডমহোৎসব। এই উৎসব ১৪৩৯ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে সম্পন্ন হইয়াছিল। অদ্যাবধি উক্ত মাসের উক্ত তিথিতে মহাসমারোহে সেই স্থানেই উৎসব হইয়া থাকে। ঐ দিন প্রেমবন্যায় পানিহাটী গ্রাম ভাসিয়া যায়।

দিবা অবসান হইলে রঘুনাথ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সহ নিত্যানন্দ প্রভু রাঘব-মন্দিরে গমন করিলেন ও কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

"ভক্ত সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায়॥

* * * *

নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিল।
ভোজনের কালে পণ্ডিত নিবেদন কৈল॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

রাঘব পণ্ডিত মহারাজ দিবাভাগে যে সমস্ত প্রসাদ প্রভুর জন্য রাখিয়াছিলেন এবং প্রভু সেই সমস্ত রাত্রে অঙ্গীকার করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কীর্ত্তন-শেষে পণ্ডিত মহাশয় সুযোগ বুঝিয়া সেই সমস্ত আনিয়া প্রভুকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর ডাইন দিকে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর উদ্দেশে একখানি আসন প্রস্তুত হইলে রাঘব দেখিতে পাইলেন ;—

"মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।"—(চরিতামৃত, অন্ত্য ৬)

তখন পণ্ডিত মহারাজ মহানন্দে দুই ভাইকে ভোজন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার॥

* * *

সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই তাহা খাঞা সন্তোষ অপার ॥”—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

পশ্চাৎ সমুদয় ভক্তগণকে প্রসাদ পরিবেষণ করা হইল। এই সময় ভক্তগণ রঘুনাথকে লইয়া এক সঙ্গে প্রসাদ পাইবেন, এ জন্য তাঁহাকে ডাকিতে উদ্যত হইলে, রাঘব তাঁহাদের নিষেধ করিলেন। পরে ভক্তগণের আহার শেষ হইলে সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহারাজ সুন্দর বিছানায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শয়ন করাইয়া পদসেবা দ্বারা তাঁহার নিদ্রা আকর্ষণ করাইয়া নিজে ভোজন করিতে গেলেন। এই সময় তিনি রঘুনাথকে ডাকিয়া—

“কহিল চৈতন্য গোসাঞি করিয়াছেন ভোজন।
তাঁর শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিল বন্ধন ॥”—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)

এই বলিয়া প্রভুদ্বয়ের ভুক্তাবশেষ মহামহাপ্রসাদ প্রদান করিলেন। ইহারই জন্য রঘুনাথকে ভক্তগণ সঙ্গে প্রসাদ পাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এইরূপে রঘুনাথ সে রাত্র রাঘব-ভবনে অবস্থিতি করিয়া পরদিন প্রাতে পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাতীরস্থ শ্রীবৃক্ষরাজমূলে, যেখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সপারিষদে বসিয়া আছেন, তথায় উপস্থিত হইয়া প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ;—

“অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়ে পাঙ চৈতন্য-চরণ ॥
বামন হঞা যেন চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু যাইতে কভু সিদ্ধ নয় ॥
যত বার পলাঙ আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুই জনা রাখয়ে বান্ধিয়া ॥
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেও পায়।
তোমার কৃপা বিনে কেহো চৈতন্য না পায় ॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করোঁ ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোঁসাঞি হইয়া সদয় ॥
মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ কর আশীর্ব্বাদ ॥”—(ঐ)

রঘুনাথ দাসের কাকুতি দেখিয়া প্রভু ভক্তগণের প্রতি চাহিয়া কহিতে লাগিলেন ;—

“হাসিয়া কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইঁহার বিষয়-সুখ ইন্দ্রসুখ সমে ॥

চৈতন্ত-কৃপাতে সেহো নাহি ভায় মনে।
সবে আশীষ দেহ পায় চৈতন্ত-চরণে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি ভায় ॥"—(চরিতামৃত, অন্ত্য,)

এই কথা বলিয়া প্রভু রঘুনাথের মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করিয়া বলিলেন ;—

"তুমি যে করাইলে এই পুলিন-ভোজন।
তোমায় কৃপা করি চৈতন্ত কৈলা আগমন ॥
কৃপা করি কৈল দুগ্ধ চিপীট ভক্ষণ।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে ॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলি রাখিবেন চরণে ॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবনে।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্ত-চরণে ॥"—(ঐ)

সকল ভক্তগণ তখন রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ তাঁহাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া এবং শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিয়া এক শত মুদ্রা এবং ৭ তোলা সুবর্ণ মহান্তগণের দক্ষিণাস্বরূপ নিত্যানন্দ প্রভুর ভাণ্ডারীর হস্তে প্রদান করিলেন এবং প্রভু যাহাতে এ সংবাদ জানিতে না পারেন, তাহার জন্ত বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।

ইহার পর রাঘব পণ্ডিত মহাশয় রঘুনাথকে স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাইলেন এবং প্রসাদি মাল্য-চন্দন ও পাথেয়স্বরূপ প্রচুর প্রসাদাদি সঙ্গে দিয়া সজল-নয়নে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। রঘুনাথ দাস রাঘবের চরণধূলি গ্রহণ করতঃ প্রেমানন্দে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ;—

"তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দ-কৃপায় আপনাকে কৃতার্থ মানিলা ॥"—(ঐ)

রাঘব-মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন

"এক দিনে নৌকা আইল পানিহাটী গ্রাম।
ভক্ত সঙ্গে নৌকা হইতে নামে ভগবান ॥"—(চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক)

এই সেই পানিহাটী! ঐ সেই প্রভুর আনন্দ-বিশ্রামের স্থান রাঘব-মন্দির! ঐ সেই ভাগীরথীতীরে প্রাচীন ৫০০ বৎসরের বটবৃক্ষ! উহারই দক্ষিণ পার্শ্বে ইষ্টক-নির্ম্মিত ঐ ভগ্ন

ঘাট! এই ঘাটেই দেবেন্দ্র-মুনীন্দ্রের সাধনার ধন প্রভুর শ্রীচরণ-ধূলি পতিত হইয়াছিল। ধন্য পানিহাটী তোমার তপস্যা-বলকে! আর আমরাও ধন্য তোমার ক্রোড়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান্ মানবরূপে আমাদের বাস-ভবনের পার্শ্বে আসিয়াছিলেন, এ কথা মনে আসিলেও আনন্দে অধীর হই।

নীলাচলধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন-মানসে মহাপ্রভু যখন বহির্গত হইলেন, তখন উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি মহাভাগবত গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যে যে পথ দিয়া প্রভু গমন করিবেন, সেই সমস্ত পথ সুসজ্জিত করিয়া এবং বিবিধ অনুষ্ঠানে তাঁহার যাত্রার সুবিধা করিয়া দিয়া নিজে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে উড়িষ্যার শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া সাশ্রুনয়নে ভক্তদের বিদায় দিলেন। এইবার মুসলমান-অধিকার। বিশেষ সেই সময় প্রতাপরুদ্রের সহিত মুসলমান বাদসাহের সহিত যুদ্ধ হইতেছিল। সে কারণ এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে যাইবার পক্ষে বড়ই অসুবিধা। এই মুসলমান-অধিকার পার না হইলে অন্যত্র যাইবার উপায় নাই; তাই লীলা-ময় প্রভু এ স্থলে এক লীলা প্রকাশ করিলেন। সেই লীলার ফলে সেই দেশের এক জন সম্ভ্রান্ত যবন রাজকর্ম্মচারী প্রভুর পরম ভক্ত হইয়া বৈষ্ণব হইলেন এবং নিজে নৌকাদি সংগ্রহ করিয়া প্রভুকে তাহাতে আরোহণ করাইলেন, আরও জলদস্যুর ভয়ে অপর কতকগুলি নৌকাতে সৈন্য-সামন্ত পূরিয়া স্বয়ং প্রহরিস্বরূপ থাকিয়া প্রভুর সঙ্গে পিছলদা পর্য্যন্ত আসি-লেন। মহাপ্রভু পিছলদা পর্য্যন্ত আসিয়া ভক্ত মুসলমানকে সৈন্য-সামন্ত সহ বিদায় দিলেন। যবন-রাজকর্ম্মচারী প্রভুর সঙ্গ ছাড়িয়া কোন মতে যাইতে চাহেন না। তিনি,—

"উচ্চৈঃস্বরে হরি বলি কান্দে ফুকারিয়া।
মহাভাগবত হৈলা প্রভু-কৃপা পাঞা॥
ছাড়িয়া না যায় ম্লেচ্ছ কান্দিতে লাগিল।
বহু যত্নে প্রভু তারে বিদায় করিল॥"—(ঐ)

পিছলদা হইতে স্বতন্ত্র নৌকাযোগে এক দিনেই প্রভু পানিহাটী আসিয়া পৌছিলেন। অতি আশ্চর্য্য ঘটনা, নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিবা মাত্র কোথা হইতে অসংখ্য লোক প্রভুকে দেখিবার জন্য সমুদয় স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিল। লোকের হুড়াহুড়িতে এবং প্রত্যেকের মুখে "জয় গৌর হরি, জয় গৌর হরি" শব্দে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। প্রভু লোক-সংঘট্টে উপরে উঠিতে পারিতেছিলেন না। এই সময়ের চিত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। মহানুভব প্রেমদাসকৃত অনুবাদ হইতে সামান্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি;—

"এক দিনে নৌকা আইল পানিহাটী গ্রাম।
ভক্ত সঙ্গে নৌকা হইতে নামে ভগবান্॥

রাজা কহে সার্ব্বভৌম সে গ্রামে কে হয়।
কি নিমিত্ত তথা প্রভু করিল বিজয়॥
ভট্ট কহে তথা আছে রাঘব পণ্ডিত।
পরম মহান্ত তিঁহো জগতে বিদিত॥
বার্ত্তাহারী লোক কহে শুন ভট্টাচার্য্য।
সেই গ্রামে যাইতে হৈল পরম আশ্চর্য্য॥
রাজা কহে কি আশ্চর্য্য হইল তাহা বল।
লোক কহে নরদেব শুন যে দেখিল॥
গঙ্গাতীর-সীমা প্রভু যেই মাত্র গেলা।
অকস্মাৎ কোথা হৈতে লোকময় হৈলা॥
যত লোক আইল তাহা কহিতে না পারি।
এই কথা শুনি মনে কহিবে বিচারি॥
ধরণীতে ধূলিরাশি যতেক আছিল।
হেন বুঝি সেই সব লোকময় হৈল॥
অথবা আকাশে ছিল যত তারাগণ।
নর হঞা পৃথিবীতে করিল গমন॥
গৌরহরি বলি লোকে চতুর্দ্দিকে ধায়।
চলিবারে মহাপ্রভু পথ নাহি পায়॥
বহু কষ্টে আইলা রাঘবের ঘরে।
রাঘব ডুবিলা মহা আনন্দসাগরে॥
সে রাত্রি রহিলা প্রভু তাঁহার মন্দিরে।
নানা যত্নে নানা সেবা করিল প্রভুরে॥"

রাঘব শশব্যস্তে গললগ্নীকৃতবাসে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভু ভাগ্যবান্ নাবিককে নিজ পরিধানের বস্ত্র প্রদান করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করতঃ রাঘব সঙ্গে ভিড়ের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এতদঞ্চলের লোকসমূহ নদীয়া অবতারের সংবাদ কেবল লোকমুখে শুনিয়াই আসিতেছিলেন। আজ তাঁহারা স্বচক্ষে প্রভুকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহাদের ভববন্ধন মোচন হইয়া গেল। প্রভুর সকরুণ দৃষ্টিপাতে সকলেই প্রেম লাভ করিলেন। রাঘব আনন্দ-পাথারে হাবুডুবু খাইতে খাইতে সানুচরে প্রভুর সেবাদির পারিপাট্য করিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এক দিবস মহাপ্রভু এখানে অবস্থিতি করিয়া স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত উদ্ধার করতঃ পর দিন প্রাতে কুমারহট্টে শ্রীনিবাস-সমীপে গমন করিলেন।

এ স্থানে একটি আপাত বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এবং

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমনকালীন শ্রীপাট পানিহাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন লিখিত আছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রভুর গৌড় হইতে নীলাচলে ফিরিয়া যাইবার সময় পানিহাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, লিখিত আছে। এই অসামঞ্জস্য ঘটনার মীমাংসা কি?

মীমাংসা অতি সহজ। শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে যাহা লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পুনরুক্তি-ভয়ে সে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। এ কথা উভয় গ্রন্থেই পাওয়া যায়। বস্তুতঃ নীলাচল হইতে আসিবার সময় ও তথায় যাইবার সময় উভয় সময়েই প্রভু পানিহাটীতে পদধূলি দিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীবৃন্দাবন বা গৌড় যাত্রার বিবরণে পানিহাটীতে প্রভুর পূর্ব্বোক্ত অবস্থিতি-কাহিনী বর্ণন করিয়া পরে লিখিতেছেন,—

"তথা হৈতে প্রভু যৈছে গৌড়েরে চলিলা।
তবে রামকেলী গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা॥

* * *

নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা।
লোকভিড়-ভয়ে বৃন্দাবনে নাহি গেলা॥
শান্তিপুরে পুনঃ কৈলা দশ দিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥
অতএব ইহাঁ তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাঢ়য়ে অপার॥"—(চরিতামৃত, মধ্য, ১৬ পরিচ্ছেদ)

এ জন্য চরিতামৃতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে পানিহাটীতে অবস্থিতি-কাহিনী আদৌ উল্লেখ নাই।

আবার শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির লিখিত পানিহাটীর বিবরণ চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ না করিয়া অতি সংক্ষেপে দুই কথায় নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমনকাহিনী সমাপন করিয়াছেন। যথা,—

"ঠাকুর থাকিয়া কত দিন নীলাচলে।
পুন গৌড় দেশে আইলেন কুতূহলে॥"—(চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৩ অঃ)

তাহা হইলে উক্ত দুই সময়েই প্রভুর পানিহাটীতে আগমন-কাহিনী দুইখানি গ্রন্থ দ্বারা বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল।

শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রভুর শ্রীক্ষেত্রে পুনরায় গমনসময়ে পানিহাটীতে অবস্থানের কথা অতি মধুরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ রাঘব-চরিত্রের অনেক কথা ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই সব মহাশক্তিসম্পন্ন পয়ারগুলি ভক্তমনোরঞ্জন জন্য অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

"কথো দিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটী রাঘব-মন্দিরে ॥
কৃষ্ণ-কার্য্যে আছেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত ॥
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥
দৃঢ় করি ধরি রমা-বল্লভ-চরণ।
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ॥
প্রভুও রাঘব পণ্ডিতেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে ॥
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব-শরীরে।
কোন্ বিধি করিবেন কিছুই না স্ফুরে ॥
রাঘবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
রাঘবেরে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত ॥
প্রভু বোলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥
গঙ্গায় মজ্জন হৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব আলয় ॥
হাসি বোলে প্রভু "শুন রাঘব পণ্ডিত।
কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত ॥"
আজ্ঞা পাই শ্রীরাঘব পরম সন্তোষে।
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমরসে ॥
চিত্তবৃত্তি যতেক মানস আপনার।
সেইরূপে পাক বিপ্র করিলা অপার ॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে আর যত আপ্তগণ ॥
ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত।
সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে একান্ত ॥
প্রভু বোলে রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক ॥
রাঘবো প্রভুর প্রীত শাকেতে জানিঞা।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা ॥

এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন আসি প্রভু করি আচমন ॥"

—ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

এই সময় গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস প্রভৃতি যেখানে যত অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, সকলেই প্রভুর আগমন-বার্ত্তা পাইয়া রাঘব-মন্দিরে ধাইয়া আসিলেন। দয়ার অবতার প্রভু সকলকেই শুভাশীর্ব্বাদ দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে পাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

"পানিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ।
আপনে সাক্ষাতে যথা প্রভু গৌরচন্দ্র ॥"—(ঐ)

পরে মহাপ্রভু রাঘব পণ্ডিতকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন ;—

"রাঘব পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর।
নিভৃতে করিলা কিছু রহস্য উত্তর ॥
"রাঘব! তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই ॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন্ আমারে।
সে-ই করি আমি, এই বলিল তোমারে ॥

* * * *

যেই আমি, সেই নিত্যানন্দ, ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥
মহাযোগেন্দ্রেরো যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা হইব সুলভ ॥
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ—যে হেন ভগবান্ ॥"—(ঐ)

ইহার পর পণ্ডিত মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীমকরধ্বজ কর প্রতি মহাপ্রভু বলিলেন—"মকরধ্বজ, তুমি ভাগ্যবান্, কায়মনোবাক্যে রাঘব পণ্ডিতের সেবা করিও। তুমি রাঘব প্রতি যাহা করিবে, তৎসমুদয় আমারই প্রতি করা হইতেছে, ইহা নিশ্চিত জানিও।"

"হেন মতে পানিহাটী গ্রাম ধন্য করি।
আছিলেন কথো দিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরি ॥"

—ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

রাঘবের ঝালি এবং মহানিষ্ঠায় শ্রীবিগ্রহ-সেবা

"রাঘব পণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া"

—(চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ১০ম পরিঃ)

রাঘব পণ্ডিত প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া পুরীধামে শ্রীগৌরাঙ্গদর্শনে যাইতেন। এ সময় তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি মোট যাইত, তাহারই নাম "রাঘবের ঝালি।" পণ্ডিত মহারাজ এবং তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী দেবী অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে মহাপ্রভুর এক বৎসরের সেবার উপযোগী নানাবিধ স্থায়ী লাড়ু, মিষ্টান্ন ও আচারাদি প্রস্তুত করিয়া এই মোটগুলি পূর্ণ করিতেন। সেই অপূর্ব্ব ঝালির বিবরণ এই বার শ্রবণ করাইব।

ঝালির মধ্যে আমের কাসুন্দি, আমসি, আম্রখণ্ড, আম্রতৈল, আম্রকলির আচার, ঝাল আদা, নেবু আদা ইত্যাদি প্রায় এক শত প্রকার কেবল আচার। এইরূপ ;—

"ধনিয়া মহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনিপাক করিয়া॥
শুণ্ঠিখণ্ড লাড়ু আর আমপিত্তহর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কোথলী ভিতর॥
'কোলিশুণ্ঠি কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লইব শত প্রকার আচার॥
নারিকেলখণ্ড লাড়ু আর লাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত-কর্পূর-আদি অনেক প্রকার॥
শালি কাঁচুটি ধান্যের আতব চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভরি॥
কথোক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে লাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥

* * *

ফুট কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভিজাইল।
চিনিপাকে কর্পূরাদি দিয়া লাড়ু কৈল।
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার॥

রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
তুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি ॥
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাকিয়া।
পাঁপড়ি করিয়া কৈল গন্ধদ্রব্য দিয়া ॥
পাতল মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি নিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কোথলী ॥
সামান্ত ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল।
পরিপাটি করি সব ঝালি ভরাইল ॥
ঝালি বান্ধি মোর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রমশ করিয়া ॥
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার।
'রাঘবের ঝালি' বলি বিখ্যাতি যাহার ॥—(ঐ)

পাছে কোন দিন মহাপ্রভুর গুরু ভোজন জন্ত উদরে আম হয়, এ জন্য ভক্তিমতী দময়ন্তী দেবী—

"যত্ন করি শুণ্ডি করি পুরাণ স্থকুতা ॥
স্থকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
স্থকুতায় যে সুখ প্রভুর, তাহা নহে পঞ্চামৃতে ॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়।
স্থকুতা পাতা কাসুন্দীতে মহা স্থখ পায় ॥
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায় ॥
স্থকুতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস ॥"

এই সব দ্রব্যের ভার মকরধ্বজ করের উপর অর্পিত হইত। তিন জন বাহক লইয়া কর মহাশয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞানে শ্রীপুরুষোত্তমে ঝালি পৌঁছাইয়া দিতেন। প্রভুর সন্নিধানে ঝালি পৌঁছিলে তিনি সাগ্রহে সকল দ্রব্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আস্বাদ লইয়া গোবিন্দকে অতি যত্নের সহিত উহা রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিতেন। কারণ, এ সব সামগ্রী বৎসরাবধি প্রভুর ভোগে ব্যবহৃত হইবে।

"রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল ॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল।
স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল ॥
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া।—(ঐ)

সর্ব্বপ্রথমেই উক্ত হইয়াছে, মাধব ঘোষ আধখানি হরীতকী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, এ জন্য প্রভু বৈরাগ্যের হানি বিবেচনা করিয়া মাধবকে উপদেশ দিয়াছিলেন; সেই আদর্শ-প্রভু রাঘবের অপূর্ব্ব প্রেম-ভক্তির নিকট আজ পরাজিত হইয়া গৃহীর ন্যায় সমুদয় খাদ্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। রাঘবের শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রীতি এতই উচ্চ!

শ্রীশ্রীমদনমোহন-সেবা

এই বার শ্রীরাঘবের অতুলনীয় সেবা-নিষ্ঠার বিষয় উত্থাপন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। এই সেবা-নিষ্ঠার বিষয় স্বয়ং মহাপ্রভু পুরীধামে সকল ভক্তগণ সমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

রাঘব-গৃহে অতি অপরূপ মূর্ত্তি শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ বিরাজিত! এমন মনোহর মূর্ত্তি আর কোথাও আছে কি না, সন্দেহ। মদনমোহন ত প্রকৃতই মদনমোহন। রাঘবের উদ্যানে শত শত নারিকেল বৃক্ষ; তাহাতে কতই না ফল ফলিতেছে। সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যদি তিনি শ্রবণ করেন যে, অমুক গ্রামে বৃহৎ এবং সুমিষ্ট নারিকেল পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে সে গ্রাম ১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইলেও এবং চারি পণ অবধি কড়ি দিয়াও সেই নারিকেল ক্রয় করিয়া আনাইয়া ঠাকুরকে অর্পণ করিতেন।

প্রতি দিন ৫।৭টি নারিকেল ছুলিয়া শীতল জলে ডুবাইয়া রাখা হইত। ভোগের সময় তাহাদের পুনরায় সংস্কার করিয়া মুখটি ছিদ্র করতঃ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইত। রাঘবের অচলা ভক্তিতে;—

কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি।
কভু শূন্য রাখেন কভু জল ভরি॥

শ্রীকৃষ্ণ জল পান করিলে পর রাঘব প্রেমানন্দে শস্যগুলি বাহির করতঃ বহুতর পাত্রে সুসজ্জিত করিয়া পুনরায় তাহাতে শ্রীতুলসী দিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতেন। ভক্তের ভগবান্ পুনরায় শস্যগুলি ভোজন করিতেন।

এক দিন জনৈক সেবক ১০টি নারিকেল লইয়া ভোগ দিতে আসিলেন। দৈবাৎ দরজার উপরের ভিতে তাঁহার হাত স্পর্শ হইয়াছিল এবং সেই হস্তে তিনি নারিকেল-গুলি স্পর্শ করাতে পণ্ডিত মহারাজ তাহা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেইগুলি ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। কারণ, দরজা দিয়া লোকের গতায়াত-সময় পায়ের ধূলা বায়ুতে উড়িয়া উপরের ভিতে লাগিয়াছে, ভিতের উপর হাত দিয়া নারিকেলে হস্ত দেওয়াতে তাহাতেও পদধূলি লাগিল এবং সে কারণ উহা কৃষ্ণ-সেবার অযোগ্য হইল। পুনরায় অন্য নারিকেল আনাইয়া অতি পবিত্র ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গীকৃত হইলে পণ্ডিত মহাশয় তৃপ্ত হইলেন।

কেবল যে নারিকেল এইরূপ ভাবে চড়া দাম দিয়া ও দূর দেশ হইতে আনাইয়া ভোগ দিতেন, তাহা নহে; কলা, আম্র, কাঁটাল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের বিষয় কিম্বা রন্ধনের উপযোগী ফল-মূল, শাক-সবজির বিষয়, আরও চিড়া, হুড়ুম, সন্দেশ, মিষ্টান্ন ক্ষীর, ওদন, কাশীমর্দ্দি, আচারাদি এবং গন্ধ, বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্যের সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই সাগ্রহে আনয়ন করিতেন ও শ্রীমদনমোহন জীউকে অর্পণ করিতেন।

রাঘবের এইরূপ সেবা-পারিপাট্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব চিরতরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত মহারাজ নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া শ্রীশ্রীমদনমোহনকে যেরূপ ভাবে ভোগ দিতেন, ঐরূপ পৃথক্ পাত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্তও একটি ভোগ দিতেন। রাঘবের ঐকান্তিক ভক্তিতে মহাপ্রভু মধ্যে মধ্যে শ্রীরাঘবকে দর্শন দিয়া তাঁহার প্রদত্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া যাইতেন।

রাঘব যখন সজল-নয়নে মহাপ্রভুকে ভোগে বসিবার জন্ত ডাকিতেন, তিনি তখন নীলাচলে ৫২ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাঘব-মন্দিরে ছুটিয়া আসিতেন। প্রভু ইহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। ধন্ত ধন্ত শ্রীল রাঘব পণ্ডিত মহারাজ!

বড়ই পরিতাপের বিষয়, বৈষ্ণব গ্রন্থে এই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ ব্যতিরেকে রাঘব পণ্ডিতের পরিচয় আর কিছুই পাওয়া যায় না। সে কারণ তাঁহার উচ্চ প্রেম-ভক্তির কত বিবরণই না অন্ধকারে রহিয়া গেল।

শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউয়ের শ্রীমন্দির এখনও সুন্দর অবস্থায় আছে এবং এই মহাপ্রেমিকের সমাধিবেদী শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে বর্ত্তমান। তদুপরি মালতী-কুঞ্জ। রাশি রাশি মালতী ফুলে এবং তাহার সুগন্ধে প্রকৃতি দেবী অদ্যাবধিও রাঘবকে ভক্তি-উপহারে ভূষিত করিতেছেন।

শ্রীঅমূল্যধন রায়

নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি*

বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, পদাবলী-সাহিত্যে "নেহ" ও "লেহ" শব্দের প্রয়োগ কত অধিক। নেহ শব্দের মূল কি এবং কোন্ ভাষা হইতে এই শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিতে আমাদের অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। এ সম্বন্ধে বোধ হয়, অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রাকৃত ভাষা হইতেই যে এই শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা অনায়াসে স্বীকার করিতে বোধ হয়, কেহই আপত্তি করিবেন না। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা প্রাকৃত ভাষা হইতে নিম্নে নেহ শব্দের দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম,—

সব্ভাবণেহভরিএ রত্তে রজ্জিজ্জই ত্তি জুত্তমিণম্।
সদ্ভাবস্নেহভরিতে রক্তে রজ্যত ইতি যুক্তমিদম্॥

—গাথাসপ্তশতী, ১।৪১।

বন্ধবণেহব্ভহিও হোই পরোবি বিণএণ সেবিজ্জন্তো।
বান্ধবস্নেহাভ্যধিকো ভবতি পরোপি বিনয়েন সেব্যমানঃ॥

—সেতুবন্ধ, ৩।২৮।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা গেল যে, ণেহ শব্দটি খাঁটি প্রাকৃত। সংস্কৃতে যেখানে স্নেহ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে, প্রাকৃতে সেই স্থলে ণেহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; সুতরাং প্রাকৃত ভাষা হইতেই যে এই শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু আপত্তি হইতে পারে যে, প্রাকৃতে ণেহ শব্দ লিখিতে ণ-কারের ব্যবহার হয়, বাঙ্গালায় উহা ন-কারে পরিণত হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে এ স্থলে কয়েকটি অবান্তর কথার আলোচনা করিতে হইবে এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির বানানের কথাও এখানে আসিয়া পড়িবে।

দুই একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি লইয়া যাঁহারা একটু নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, প্রাচীন পুথির বানান বর্ত্তমানে প্রচলিত বাঙ্গালার অনুরূপ নহে। প্রচলিত বাঙ্গালায় শশী, শীষ, শেষ, শূন্য, শুন (ধাতু), শেজ স্থলে অনেক পুথিতেই সসি, সীস, সেস, সুন, সুন (ধাতু), সেজ লিখিত দেখা যায়। অনেকে ইহা লিপিকরের ভ্রম বলিয়া সহজেই ইহার একটা সুমীমাংসা করিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু আমাদের মত এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূলে নহে। কেন না, অদ্যাবধি যেখানে যত বাঙ্গালা পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোন পুথির সহিতই যখন বর্ত্তমান বানানের অবিকল মিল নাই, তখন বিশেষ ভাবে বিচার

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২শ, ৯ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

না করিয়া, সকল লিপিকরকেই মূর্খ বলিয়া বিবেচনা করা আমাদের ন্যায়-সঙ্গত মনে হয় না। পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যে পুথিকে অনেকে চণ্ডীদাসের জীবিতকালে লিখিত বলিয়া অনুমান করেন এবং কেহ কেহ যে পুথিকে চণ্ডীদাসের স্বহস্ত-লিখিত বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন, সেই পুথিতেও যখন আমরা এইরূপ বানান পাইতেছি, তখন ইহা লিপিকর-ভ্রম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত কি না, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। অবশ্য লিপিকরগণ যে অভ্রান্ত বা মূর্খ লোকে মোটেই পুথি লিখিত না, এ কথা আমরা বলিতেছি না। প্রাচীন পুথিতে ভূরি ভূরি লিপিকরের ভ্রম দৃষ্ট হইবে এবং স্থানে স্থানে এরূপ ভ্রমের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাতে কবির কবিত্ব পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু লিপিকরের ভ্রমের সহিত যদি আমরা প্রাচীন পুথির সমস্ত বানানই পরিবর্ত্তন করিয়া দেই, তাহা হইলে বোধ হয়, আমাদের প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হইবে না। কেন না, প্রাচীন বাঙ্গালার বানান কেবল সংস্কৃতের অনুরূপ ছিল না।

আজ পর্য্যন্ত বঙ্গাক্ষরে লিখিত বঙ্গভাষার যে সকল প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহোদয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়" গ্রন্থ তন্মধ্যে সুপ্রাচীন*। এই গ্রন্থের বানান-পদ্ধতি আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রাচীন বাঙ্গালার বানান প্রাকৃতের অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাষা প্রাকৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন। পাঠকগণের অবগতির জন্য উক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা কয়েকটি শব্দ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। প্রাকৃতের সহিত বঙ্গভাষার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ইহাতে তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

প্রাচীন বাঙ্গালা—	প্রাকৃত—
সঅল	সঅল
গঅণ	গঅণ
তিহুবণ	তিহুঅণ
ণিঅড়	ণিঅড়
নেউর	ণেউর
রঅণ	রঅণ
লোঅ	লোঅ
সীস	সীস
সুহে	সুহ
মুহ	মুহ
ণই	ণই
জউনা	জউণা

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২শ ভাগ, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত কৃষ্ণকীর্ত্তন নামক পুথিতেও আমরা প্রাকৃতের প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি। এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয়, প্রাচীন বঙ্গভাষার বানান-প্রণালী প্রাকৃতেরই অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাষা প্রধানতঃ প্রাকৃত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন পুথির বানানকে লিপিকরের ভ্রম মনে করিয়া বর্ত্তমান রীতি অনুসারে বিশুদ্ধ করা আমাদের সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না এবং এইরূপ শুদ্ধ করিতে যাইয়াই প্রাকৃত "ণেহ" শব্দের ণ-কার ন-কারে পরিণত হইয়াছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।*

"লেহ" শব্দটির মূল কি, এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে কেহ কোন আলোচনা করিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। করিয়া থাকিলেও আমরা তাহা অবগত নহি। সংপ্রতি প্রাচীন সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, পদাবলী-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় এই শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে সতীশ বাবুর আলোচনাটি উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"প্রাচীন পুথির 'ল' ও 'ন' অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। লিপিকরদিগের অপ্রণিধানে অনেক স্থলেই সেই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি রক্ষিত না হওয়ায় 'ল' ও 'ন' অক্ষরের গোলযোগ হেতু পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিয়াছে।

'ল' ও 'ন'-কারের গোলযোগের সর্ব্বপ্রধান দৃষ্টান্ত 'নেহ' ও 'লেহ' শব্দদ্বয়। সংস্কৃত স্নেহ শব্দের অপভ্রংশ হইতে সিনেহ ও নেহ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। পদাবলি-সাহিত্যের হস্তলিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থে 'সুলেহ' ও 'লেহ' শব্দেরও বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'সুলেহ' ও 'লেহ' শব্দ অশুদ্ধ বিবেচনায় সর্ব্বত্রই 'সিনেহ' ও 'নেহ' লিখিয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয়, 'সিনেহ' ও 'নেহ' রূপ দুইটিই প্রাচীনতর। সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থালয়ে রক্ষিত পদকল্পতরুর একখানা পুথিতে আমরা কোথায়ও 'লেহ' বা 'সুলেহ' শব্দ পাই নাই, উহাদিগের পরিবর্ত্তে 'নেহ' ও 'সুনেহ' পাইয়াছি। হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যেও 'নেহ' শব্দেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; সুতরাং ল ও ন অক্ষরের গোলযোগ হইতেই প্রথমে লেহ ও সুলেহ শব্দ দুইটির উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিলে এইরূপ ভ্রান্ত সাদৃশ্যের (false analogy) অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে শব্দ একবার ভাষায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ না হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব।" ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর এই কথা যে সুন্দর যুক্তিপূর্ণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনেক লিপিকর যে 'নেহ' শব্দের স্থলে ল ও নএর সাদৃশ্যবশতঃ 'লেহ' লিখিয়া থাকিবেন, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু পদাবলী-সাহিত্যে এই শব্দটির অতিশয় বাহুল্য

* সিদ্ধহেমচন্দ্র ৮।২।৭৭, ৮।২।১০২ সূত্রের টীকায় "ণেহ" শব্দ পাওয়া গিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের প্রচলিত ভাষাসমূহে "ণ" স্থানে "ন"এর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

দেখিয়া স্বতই মনে হয়, ইহার কোনও মূল থাকিলেও থাকিতে পারে, সমস্ত লিপিকর কি একটি শব্দ সম্বন্ধে এতই ভুল করিয়াছেন ? আর যে যে স্থলে লেহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তথায় যেন লেহ শব্দই বেশ সুন্দর সঙ্গত হয়। নিম্নে "লেহ" শব্দের গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত দিতেছি ;—

"সেই কৃষ্ণ হয় অখিল শকতি
এই কৃষ্ণরূপে দেহা।
এই কৃষ্ণ হয় গোকুল-জীবন
যেই জন রাখে **লেহা** ॥"
— চণ্ডীদাসের পদাবলী, সা-প সংস্করণ, ৩৯ পদ।

"সুন্দরি, বেকত গোপত **লেহা**।
বঞ্চিত আজু করণে নাহি পারবি
সাখি দেয়ল তুয়া দেহা ॥ ধ্রু ॥"—প-ক-ত, ২৩২ পদ।

"তবহুঁ জগত ভরি আঁকিরিতি এহ।
রাধামাধব অবিচল-**লেহ** ॥"—প-ক-ত, ২৩৩ পদ।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত হইতে "লেহ" শব্দের বেশ সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় এবং আরও অনেক গ্রন্থ হইতে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখান যাইতে পারে। এখন কথা এই যে এইরূপ একটা বহুবিস্তৃত শব্দকে কেবল লিপিকরের ভ্রমজাত বলিয়া স্বীকার না করিয়া, উহার কোন মূল অনুসন্ধান করা যায় কি না, তাহাই বিবেচনীয়। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু যে সব স্থলে ঐরূপ প্রয়োগ পাইয়াছেন, তাহা তিনি সমস্তই পরিবর্ত্তন করিয়া 'নেহ' করিয়া দিয়াছেন। পদকল্পতরুর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু কিন্তু সে পথ অবলম্বন করেন নাই। তিনি 'নেহ ও লেহ উভয় প্রয়োগই রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, এ বিষয়ে সতীশ বাবুই উৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, কেন না, তিনি লেহ শব্দটিকে অপপ্রয়োগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও উহার প্রাচীনত্ব বিবেচনা করিয়া, তাহাকে ত্যাগ করা সঙ্গত বোধ করেন নাই। সতীশ বাবুর এই রক্ষণশীলতা এবং তাঁহার এইরূপ আলোচনা হইতেই আমরা আজ এই শব্দটির মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ পাইলাম। এ জন্য সতীশ বাবুকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমাদের বোধ হয়, "লেহ" শব্দের মূলানুসন্ধান ঐ প্রকারে না করিলেও চলিতে পারে। সাতবাহন-বিরচিত "গাথাসপ্তশতী" নামক গ্রন্থ প্রাকৃত-সাহিত্যের একখানি অতি চমৎকার বই। ঐ গ্রন্থে এবং প্রাকৃত অপরাপর গ্রন্থে আমরা "লেহলা" বলিয়া একটি শব্দ পাইয়াছি। উহার অর্থ—"লালসা"।

কহ তংপি তুই ণ ণাঅং জহ সা আসন্দিআণঁ বহুআণম্।
কাউণ উচ্চবচিঅং তুহ দংসণলেহলা পড়িআ॥
কথং তদপি ত্বয়া ন জ্ঞাতং যথা সা আসন্দিকানাং বহূনাম্।
কৃত্বা উচ্চাবচিকাং তব দর্শনলালসা পতিতা॥

—গাথাসপ্তশতী, ৭।৯৭।

অমরসিংহ তাঁহার কোষে লিখিয়াছেন,—"কামোঽভিলাষস্তর্ষশ্চ স মহাল্লালসা।" লালসা অর্থে অতিশয় আকাঙ্ক্ষা। মেদিনীকোষে লালসা শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—ঔৎসুক্য। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"দোহদং দৌহৃদং শ্রদ্ধা লালসা।" সুতরাং এই লেহলা শব্দের লা-লোপে 'লেহ' বা ল-লোপে 'লেহা' উপরিকথিত যে কোন অর্থে পদাবলী-সাহিত্যের লেহরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া আমাদের বোধ হয়। চণ্ডীদাসের পদাবলীর এক স্থলে আছে,—

সে হেন নাগর গুণের সাগর
জগৎ দুর্ল্লভ লেহা।
তু হেন নাগরী প্রেমের আগরী
কেন বাড়াইলি লেহা॥"

উপরিলিখিত পদাংশের যে দুই স্থলে লেহ শব্দ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, লালসা শব্দের কথিত অর্থ অসঙ্গত হইবে না। সখী কহিতেছেন,—সেই গুণের সাগর নাগর শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা করা জগতের (জগদ্বাসীর) পক্ষে দুর্ল্লভ, তুমি প্রেমিকার অগ্রগণ্যা নাগরী হইয়া কেন তাঁহাতে অভিলাষ বাড়াইলে? এই ঔৎসুক্য, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রদ্ধা অর্থ হইতেই পরে পদাবলী-সাহিত্যে স্নেহ, প্রীতি ও প্রেম অর্থে "লেহ" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকিবে, এরূপ বিবেচনা করা, বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

সুশ্রুতে ধর্ম্মভাব*

আয়ুর্ব্বেদে কেবল শারীরিক বিষয় লইয়াই সমুচিত উপদেশ প্রদত্ত হইবে, ধর্ম্মাচরণের কোন কথা ইহাতে কেন থাকিবে, এইরূপ প্রশ্নে সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাস অবলম্বনকারী কোন ব্যক্তিরই আস্থা থাকিতে পারে না। কারণ, ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও পরলোকের প্রতি বিশ্বাস রাখিতে ও আস্তিকতা অবলম্বন করিতে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রেও এই জন্যই "দৈব" ও "মানুষ" এই উভয় প্রকার চিকিৎসার উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ যে সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়া রোগ প্রতীকার করা হইয়া থাকে, তাহাই "মানুষ" চিকিৎসা; আর রোগের প্রতীকারের জন্য যে শান্তি ও স্বস্ত্যয়নাদি দৈব বিধান কৃত হইয়া থাকে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহাই "দৈব" চিকিৎসা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

যাহা হউক, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতাতে যেরূপ ধর্ম্মভাবের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পরিলোচনা দ্বারা প্রাচীনগণ কিরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে তাঁহাদের কিরূপ মতি ও গতি ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বর্ত্তমানের এই নিবিড় অধর্ম্মসঙ্কট যুগে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এই ধর্ম্মভাবও কথঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া সর্ব্বতোভাবে সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়।

১। আয়ুর্ব্বেদের অপৌরুষেয়ত্ব

বেদের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বাগ্রে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কর্ত্তৃকই অভিব্যক্ত হয়। ভগবান্ ধন্বন্তরি এ বিষয়ে স্বশিষ্য সুশ্রুতকে বলিতেছেন,—

"ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভূঃ। ততোঽল্পায়ুষ্ট্বমল্পমেধস্ত্বঞ্চাবলোক্য নরাণাং ভূয়োঽষ্টধা প্রণীতবান্।"

(১অ° সূত্র)

আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ। প্রজা সৃষ্টির পূর্ব্বেই ভগবান্ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা এক সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই আদিসংহিতাতে এক লক্ষ শ্লোক ও এক সহস্র অধ্যায় বর্ত্তমান ছিল। তাহার পরে মনুষ্যের অল্পায়ু বিবেচনা করিয়া, ব্রহ্মা স্বীয় ঐ সুবৃহৎ সংহিতাকে শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, বিষতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণতন্ত্র এই আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদের গুরুপরম্পরার সমুল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

"ব্রহ্মা প্রোবাচ, ততঃ প্রজাপতিরধিজগে, তস্মাদশ্বিনৌ, অশ্বিভ্যামিন্দ্রঃ, ইন্দ্রাদহম্।"—(১অ° সূত্র)

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২শ, ৯ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সর্ব্বপ্রথমে লোকগুরু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদ উপদিষ্ট হয়। ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রজাপতি দক্ষ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের নিকট হইতে এবং আমি (ধন্বন্তরি) ইন্দ্রের নিকটে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম।

২। আয়ুর্ব্বেদপাঠে পুণ্যসঞ্চয় ও ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি

"স্বয়ম্ভুবা প্রোক্তমিদং সনাতনং পঠেদ্ধি যঃ কাশিপতিপ্রকাশিতম্।
স পুণ্যকর্ম্মা ভুবি পূজিতো নৃপৈরসুক্ষয়ে শক্রসলোকতাং ব্রজেৎ ॥"—(১অ° সূত্র°)

সনাতন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সর্ব্বপ্রথমে লোকগুরু স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা প্রকাশ করেন। কাশীপতি ধন্বন্তরি পরম্পরাক্রমে তাহার প্রচার করেন। এই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন করিবেন, সেই ব্যক্তির অক্ষয় পুণ্য সঞ্চিত হইবে; তিনি রাজগণ কর্ত্তৃক সুপূজিত হইবেন এবং নিজের দেহাবসানে পরলোকে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইবেন।

অন্যত্র দেখা যায়,—

"সহোত্তরং হ্যেতদধীত্য সর্ব্বং ব্রাহ্ম্যবিধানেন যথোদিতেন।
ন হীয়তেঽর্থান্মনসোঽভ্যুপেতাদেতদ্বচো ব্রাহ্ম্যমতীব সত্যম্ ॥" (৬৬ অ° উত্তর°)

ব্রহ্মা যেরূপ অধ্যয়ন-বিধির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাহা সম্যক্‌রূপে পরিপালন-পূর্ব্বক উত্তরতন্ত্র সহিত এই সমগ্র সুশ্রুত-সংহিতা অধ্যয়ন করিবেন, তিনি নিজ সাত্ত্বিক প্রকৃতির প্রভাব অনুসারে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাই সুসম্পন্ন হইবে;—কারণ, এই গ্রন্থমধ্যে অভ্রান্ত সত্য ব্রহ্মার বাক্যসমূহই উপনিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। দীক্ষাবিধি

অধ্যয়ন-বিধির ব্যবস্থা প্রণয়নেও সুশ্রুত সনাতন বেদোক্ত অনুশাসনেরই অনুসরণ করিয়াছেন। যথা;—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানামন্যতমং × × × ভিষক্ শিষ্যমুপনয়েৎ। ... ... উপনয়নীয়ন্তু ব্রাহ্মণঃ প্রশস্তেষু তিথিকরণমুহূর্ত্তনক্ষত্রেষু প্রশস্তায়াং দিশি শুচৌ সমে দেশে চতুর্হস্তং চতুরস্রং স্থণ্ডিলমুপলিপ্য গোময়েন দর্ভৈঃ সংস্তীর্য্য পুষ্পৈর্লাজভক্তৈ রত্নৈশ্চ দেবতাঃ পূজয়িত্বা বিপ্রান্ ভিষজশ্চ তত্রোল্লিখ্যাভ্যুক্ষ্য চ দক্ষিণতো ব্রহ্মানং স্থাপয়িত্বাগ্নিমুপসমাধায় ... ... হৌমিকেন বিধিনা স্রুবেনাজ্যাহুতীর্জুহুয়াৎ। সপ্রণবাভির্মহাব্যাহৃতিভিস্ততঃ প্রতি-দৈবতমৃষীংশ্চ স্বাহাকারঞ্চ কুর্য্যাৎ।" (২য় অ° সূত্র°)

ভিষক্, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকুলসম্ভূত যথোচিত গুণসম্পন্ন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য দীক্ষা প্রদান করিবেন। কিন্তু স্বেচ্ছাচারে দীক্ষা প্রদান করা চলিবে না;—অধ্যয়ন-বিহিত তিথি, করণ, মুহূর্ত্ত, নক্ষত্র ও দিক্ প্রশস্ত হওয়া চাই। তাহার পরে বৈদিক বিধান অনুসারে যথাবিহিত স্থণ্ডিল, গোময়, দর্ভ, পুষ্প, লাজ, ভক্ত ও রত্ন প্রভৃতি দ্বারা দেবতা,

ব্রাহ্মণ ও ভিষগ্‌গণের অর্চ্চনা করিতে হইবে। যথাবিধানে সমিধাদি গ্রহণপূর্ব্বক প্রণব উচ্চারণে বেদবিহিত হোম-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

অধিকন্তু গুরু ও শিষ্য উভয়েই অগ্নি সাক্ষী পূর্ব্বক শপথ গ্রহণ করিবেন। শিষ্য কাম ও ক্রোধাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যব্রত অবলম্বন করিবেন; দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, সন্ন্যাসী ও শরণাপন্ন ব্যক্তিগণকে নিজের ঔষধ দ্বারা নীরোগ করিবেন; কিন্তু পাপকার্য্যে সমাসক্ত লোকের রোগ প্রতীকার করিয়া, এ জগতে পাপ অনুষ্ঠানের সাহায্যকারী হইবেন না।

৪। অধ্যয়নের বিধি ও নিষেধ

"কৃষ্ণেঽষ্টমী তন্নিধনেঽহনী দ্বে কৃষ্ণেতরেঽপ্যেবমহর্দ্বিসন্ধ্যম্।
অকালবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুঘোষে স্বতন্ত্ররাষ্ট্রক্ষিতিপব্যথাসু॥
শ্মশানযানাস্ত্রতনাহবেষু মহোৎসবৌৎপাতিকদর্শনেষু।
নাধ্যেয়মন্তেষু চ যেষু বিপ্রা নাধীয়তে নাশুচিনা চ নিত্যম্॥"

(২ অং সূত্রং)

কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় পক্ষের অষ্টমী, পঞ্চদশী (অমাবাস্যা ও পূর্ণিমা), ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে, দিনের উভয় সন্ধ্যাতে, অকাল-বিদ্যুৎ উন্মেষে, অসাময়িক মেঘগর্জ্জনে, পারিবারিক বিপত্তিতে, রাজ্যের বা রাজার কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, শ্মশানভূমিতে, কোনরূপ যান আরোহণে, বধ্যভূমিতে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র, কুবের, মদন ও কৌমুদী প্রভৃতি মহোৎসব ব্যাপারে, ধূমকেতু বা উল্কাপাত প্রভৃতি উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইলে এবং সর্ব্বথা অশুচি অবস্থায় অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ। অধিকন্তু এতদ্ভিন্ন অন্য যে সকল দিনে ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন করেন না, সেই সকল দিনও অনধ্যায় বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পরিগণিত হইয়াছে।

৫। রক্ষাকর্ম্ম

সুশ্রুতে রোগীর রক্ষাবিধানের জন্য যে শ্লোকগুলি উপনিবদ্ধ দেখা যায়, তৎপাঠেও ইহার দৃঢ় প্রতীতি হয়, প্রাচীন কালে কোন কর্ম্মই ধর্ম্মের ছায়া-বিবর্জ্জিত করিয়া কৃত হইত না। আর্য্যগণ প্রত্যেক কার্য্যেই ধর্ম্মের সংশ্রব রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এক 'ব্রহ্ম' দ্বারাই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল পরিব্যাপ্ত দেখিয়াছেন এবং সেই ব্রহ্মেরই বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা-বিশেষরূপে পরিগণিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের সম্পাদকরূপে পরিবর্ণন করিয়াছেন; বাস্তবিক কিন্তু নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তিসমূহেই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই পূর্ণ সত্তার স্ফুরণ তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

সুশ্রুতের রক্ষা-মন্ত্রগুলি এই;—

"কৃত্যানাং প্রতিঘাতার্থং তথা রক্ষোভয়স্য চ।
রক্ষাকর্ম্ম করিষ্যামি ব্রহ্মা তদনুমন্যতাম্॥

নাগাঃ পিশাচা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষরাক্ষসাঃ।
অভিদ্রবন্তি যে যে ত্বাং ব্রহ্মাদ্যা ঘ্নন্তু তান্ সদা॥
পৃথিব্যামন্তরীক্ষে চ যে চরন্তি নিশাচরাঃ।
দিক্ষু বাস্তুনিবাসাশ্চ পান্তু ত্বাং তে নমস্কৃতাঃ॥
পান্তু ত্বাং মুনয়ো ব্রাহ্ম্যা দিব্যা রাজর্ষয়স্তথা।
পর্ব্বতাশ্চৈব নদ্যশ্চ সর্ব্বাঃ সর্ব্বেঽপি সাগরাঃ॥
অগ্নী রক্ষতু তে জিহ্বাং প্রাণান্ বায়ুস্তথৈব চ।
সোমো ব্যানমপানং তে পর্জ্জন্যঃ পরিরক্ষতু॥
উদানং বিদ্যুতঃ পান্তু সমানং স্তনয়িত্নবঃ।
বলমিন্দ্রো বলপতির্ম্মনুর্ম্মন্যে মতিং তথা॥
কামাংস্তে পান্তু গন্ধর্ব্বাঃ সত্ত্বমিন্দ্রোঽভিরক্ষতু।
প্রজ্ঞাং তে বরুণো রাজা সমুদ্রো নাভিমণ্ডলম্॥
চক্ষুঃ সূর্য্যো দিশঃ শ্রোত্রে চন্দ্রমাঃ পাতু তে মনঃ।
নক্ষত্রাণি সদা রূপং ছায়াং পান্তু নিশাস্তব॥
রেতস্ত্বাপ্যায়য়ন্ত্যাপো রোমাণ্যোষধয়স্তথা।
আকাশং খানি তে পাতু দেহং তব বসুন্ধরা॥
বৈশ্বানরঃ শিরঃ পাতু বিষ্ণুস্তব পরাক্রমম্।
পৌরুষং পুরুষশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মাত্মানং ধ্রুবো ভ্রুবৌ॥
এতা দেহে বিশেষেণ তব নিত্যা হি দেবতাঃ।
এতাস্ত্বাং সততং পান্তু দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি॥
স্বস্তি তে ভগবান্ ব্রহ্মা স্বস্তি দেবাশ্চ কুর্ব্বতাম্।
স্বস্তি তে চন্দ্রসূর্য্যৌ চ স্বস্তি নারদপর্ব্বতৌ॥
স্বস্ত্যগ্নিশ্চৈব বায়ুশ্চ স্বস্তি দেবাঃ সহেন্দ্রগাঃ॥
পিতামহকৃতা রক্ষা স্বস্ত্যায়ুর্ব্বর্দ্ধতাং তব।
ঈতয়স্তে প্রশাম্যন্তু সদা ভব গতব্যথঃ॥
ইতি স্বাহা॥" (৫ অ° সূত্র°)

প্রাচীন যুগে চিকিৎসকের কর্ত্তব্য সাধারণ—নিতান্ত ব্যবসায় মাত্র ছিল না। রোগের যন্ত্রণায় পরিপীড়িত মুহ্যমান ব্যক্তিকে চিকিৎসক পিতার ন্যায় এই সকল বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা আশ্বস্ত করিয়া তাহার রোগের দুর্ব্বিসহ ক্লেশসমূহ বিদূরিত করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ হইতেন না। চিকিৎসক কেবল রোগের ব্যবস্থা করিয়াই নিজে রোগীর দায় হইতে পরিমুক্ত হইলেন, এইরূপ ভাবিতেন না; যাঁহার সহিত সকলের অস্তিত্ব, সেই পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রত্যেক সত্তার প্রতি রোগীর প্রকৃত শ্রদ্ধার উৎপাদন পূর্ব্বক তাহার দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের

পরিবর্দ্ধনেই তিনি একান্ত প্রয়াস পাইতেন। এই অমৃতকল্প আর্ষ বিধানের অমোঘ ফলে ঈশ্বরের প্রতি আত্ম-সমর্পণ করিয়া, সম্পূর্ণ সত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক, বাস্তবিক পক্ষে রোগ-পরিক্লিষ্ট ব্যক্তিও আশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইতেন;—ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া সদ্য সদ্যই তাঁহার ব্যাধির ভীষণ আক্রমণ বিদূরিত হইয়া যাইত। উত্তরকালেও চিকিৎসকমণ্ডলী এই বৈদিক রক্ষামন্ত্র দ্বারা পীড়িতের ব্যাধিনিবারণে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। অধুনা যেন ধর্ম্মের সহিত মানবের সকল বন্ধনই পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্র ঐহিক তামসিক স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাপারই পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্মপথ সুদূরে অপসারিত হইতেছে।

লোক-চক্ষুর অগোচরেও কত শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; স্ব স্ব প্রকৃতি-বশে সেই শক্তিনিচয়ই দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস বা পিশাচরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। দেব-প্রকৃতি ক্রূর আচরণসম্পন্ন নহেন, সুতরাং তাঁহাদিগের হইতে জীবগণের মঙ্গলই সংসাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু দানব, যক্ষ, রাক্ষস বা পিশাচ প্রভৃতি ক্রূর ও হিংসা-প্রকৃতিপরায়ণ, সুতরাং লোক-লোচনের অন্তরালে ইহাদের দ্বারা জীবগণের নানারূপ অকল্যাণ সংঘটিত হইয়া থাকে; এই জন্যই সেই সকল নিবারণের জন্য প্রাচীন বৈদিক যুগে এই রক্ষা বিধানের অনুষ্ঠান।

রক্ষা-মন্ত্রগুলির মর্ম্ম এই;—আভিচারিক প্রতিঘাত বা রাক্ষস প্রভৃতির ভয় হইতে তোমার রক্ষা-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি; ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সেই রক্ষাকর্ম্ম অনুমোদিত হউক।

নাগ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, যক্ষ বা রাক্ষসগণ—যাঁহারা তোমার প্রতি আক্রমণ করিতে পারেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তোমার সেই আপৎ বিনাশ করুন।

পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, দিক্‌সকলে বা বাস্তুগৃহে যে সকল নিশাচর বাস করেন, তাঁহা-দিগকে নমস্কার করিতেছি, তাঁহারা সকলেই প্রসন্ন হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মর্ষিগণ, দিব্যর্ষিগণ, রাজর্ষিগণ, পর্ব্বত, নদী ও সাগরসকল তোমাকে রক্ষা করুন।

অগ্নি জিহ্বা, বায়ু প্রাণ, সোম ব্যান, পর্জ্জন্য অপান, বিদ্যুৎ উদান, মেঘ সমান, বলপতি ইন্দ্র বল ও সত্ব, মনু মন্যাধর এবং মতি, গন্ধর্ব্বগণ কাম, রাজা বরুণ প্রজ্ঞা, সমুদ্র নাভিমণ্ডল, সূর্য্য চক্ষু, দিক্‌সকল শ্রবণেন্দ্রিয়, চন্দ্র মন, নক্ষত্রগণ রূপ, রাত্রি ছায়া, জল রেতঃ, ওষধিসকল রোমাবলি, আকাশ ছিদ্র-সকল, পৃথিবী শরীর, বৈশ্বানর শির, বিষ্ণু পরাক্রম, পুরুষশ্রেষ্ঠ (নারায়ণ) পৌরুষ, ব্রহ্মা আত্মা এবং ধ্রুব ভ্রূদ্বয় রক্ষা করুন।

যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল, সেই সমুদয় দেবতাই তোমার শরীরে নিত্য অবস্থান* করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সর্ব্বদাই তোমাকে পালন করুন এবং তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর।

---

* বিশ্বরূপ বিষ্ণুর অবয়বীভূত কোন্ দেবতা কোন্ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, তাহা সুশ্রুতে এইরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে;—"অথ বুদ্ধের্ব্রহ্মা। অহঙ্কারস্যেশ্বরঃ। মনসশ্চন্দ্রমাঃ। দিশঃ শ্রোত্রস্য। ত্বচো বায়ুঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুষোঃ। রসনস্যাপঃ। পৃথ্বী ঘ্রাণস্য। বচোঽগ্নিঃ। হস্তয়োরিন্দ্রঃ। পাদয়োর্ব্বিষ্ণুঃ। পায়োর্ম্মিত্রং। প্রজাপতিরুপস্থস্য।"
(১ অঃ শারীর)

ভগবান্ ব্রহ্মা, চন্দ্র, সূর্য্য, নারদ, পর্ব্বত, অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তোমার মঙ্গল করুন।

পিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যে রক্ষাবিধান জীবগণের মঙ্গল সাধন জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তোমার আরোগ্য লাভার্থ সেই রক্ষা-কর্ম্ম কৃত হইল;—অতএব তোমার মঙ্গল হউক, তোমার আয়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, তোমার সকল প্রকার বাধা ও বিঘ্ন দূরীভূত হউক এবং তুমি সতত ব্যথাশূন্য হইয়া থাক।

বেদাত্মক মন্ত্র দ্বারা তোমার রক্ষাবিধান অনুষ্ঠিত হইল, ইহা হইতে কোন অভিচার বা ব্যাধিনিবন্ধন তোমার কোন ভয় থাকিবে না, নিশ্চয় জানিও। আমি তোমার যে রক্ষা বিধান করিলাম, তাহা হইতে তুমি দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হও।

৬। আয়ুর্ব্বর্দ্ধক সদ্নীতি

সদ্নীতির উপদেশ সুশ্রুতে অনেক আছে। এ স্থলে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গেল;—

"ন দেব-ব্রাহ্মণ-পিতৃ-পরিবাদাংশ্চ, ন নরেন্দ্র-দ্বিষ্টোন্মত্ত-পতিত-ক্ষুদ্র-নীচাচারানুপাসীত।"

(২৪ অ°, চিকিৎসা°)

দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের নিন্দা করিতে নাই। রাজার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, উন্মত্ত, নিজের সদাচার হইতে পরিভ্রষ্ট, জাতিতে হীন বা অসৎকর্ম্মে সমাসক্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কখনও মিলিত হওয়া উচিত নহে।

"দেব-গো-ব্রাহ্মণ-চৈত্য-ধ্বজ-রোগি-পতিত-পাপকারিনাঞ্চ ছায়াং নাক্রমেত।"

(২৪ অ° চিকিৎসা°)

দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, শ্মশান-বৃক্ষ, পতাকা, রোগী বা পাপানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তির ছায়া অতিক্রম করিতে নাই।

"সততাধ্যয়নং বাদঃ পরতন্ত্রাবলোকনম্।
তদ্বিদ্যাচার্য্যসেবা চ বুদ্ধিমেধাকরো গণঃ॥
আয়ুষ্যং ভোজনং জীর্ণে বেগানাঞ্চাবিধারণম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সাহসানাঞ্চ বর্জ্জনম্॥"—(২৮ অ° চিকিৎসা°)

নিরন্তর সৎশাস্ত্রের অধ্যয়ন, বাদ (পরমতের খণ্ডন পূর্ব্বক নিজের ন্যায়ানুমোদিত মত সংস্থাপন), ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রান্তরের অনুশীলন এবং তত্তৎ বিদ্যাভিজ্ঞ আচার্য্যগণের সহবাস, এই সমুদয় বুদ্ধি ও মেধাবর্দ্ধক সদ্গুণ। অধিকন্তু ভুক্ত দ্রব্য পরিপক হইবার পরে আয়ুর্ব্বর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন করা, মল ও মূত্রাদির বেগ ধারণ না

ব্রহ্মা বুদ্ধির, ঈশ্বর অহঙ্কারের, চন্দ্র মনের, দিক্‌সকল শ্রবণেন্দ্রিয়ের, বায়ু ত্বকের, সূর্য্য চক্ষুদ্বয়ের, সলিল রসনেন্দ্রিয়ের, পৃথিবী ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের, মিত্রদেবতা গুহ্যের এবং প্রজাপতি উপস্থ ইন্দ্রিয়ের অধিপতি।

বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্রেও এইরূপ ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের পরিবর্ণনা আছে।

করা, ইন্দ্রিয় সংযম, অহিংসা এবং নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া বলবানের সহিত মল্ল-যুদ্ধ প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত না হওয়া; এই সকল বিধির সম্যক্ পরিপালনে আয়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৭। দৈবব্যপাশ্রয়-চিকিৎসা

ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন গ্রহণপূর্ব্বক ঔষধ ব্যবহারের বিধানও আয়ুর্ব্বেদে প্রদত্ত হইয়াছে। এ স্থলে কিছু উল্লেখ করা গেল।

তৈল-বিশেষ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া ব্যবহার প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে;—

"মজ্জসার মহাবীর্য্য সর্ব্বান্ ধাতূন্ বিশোধয়।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পাণিস্ত্বামাজ্ঞাপয়তেঽচ্যুতঃ॥"—(১৩অ° চিকিৎসা°)

হে মজ্জসার মহাবীর্য্য তুবরক, * তুমি এই পীড়িত ব্যক্তির রস ও রক্তাদি সকল ধাতুকে দোষপরিশূন্য কর; শঙ্খ, চক্র ও গদাপাণি অচ্যুত নারায়ণ তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছেন।

অন্যত্র আয়ুষ্কামীয়ে দেখা যায়;—

"মন্ত্রৌষধসমাযুক্তং সংবৎসরফলপ্রদম্।
বিল্বস্য চূর্ণং পুষ্যে তু হুতং বারান্ সহস্রশঃ॥
শ্রীসূক্তেন নরঃ কাল্যে সমুবর্ণং দিনে দিনে।
সর্পির্মধুযুতং লিহ্যাদলক্ষ্মীনাশনং পরম্॥"—(২৮ অ° চিকিৎসা°)

মন্ত্রদ্বারা অনুপ্রাণিত যথোপযুক্ত ঔষধসহ বিল্বচূর্ণ এক বৎসর পর্য্যন্ত সেবন করিবে। পুষ্যা নক্ষত্রে ঋগ্‌বেদোক্ত শ্রীসূক্ত,—

"হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ॥"—ইত্যাদি

দ্বারা সহস্র বার অভিপূত করিয়া তদনন্তর স্বর্ণভস্ম সহ ঘৃত ও মধুযোগে এই বিল্বচূর্ণ সেবনে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হইবে।

প্রসিদ্ধ সোমরসায়নযোগের অভিমন্ত্রণে উক্ত হইয়াছে;—

"মহেন্দ্র-রামকৃষ্ণানাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি।
তপসা তেজসা বাপি প্রশাম্যধ্বং শিবায় বৈ॥"—(৩০অ° চিকিৎসা°)

মহেন্দ্র, রাম, কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণগণ ও গো-সকলের তপঃ ও তেজঃপ্রভাবে তোমরা মঙ্গলদায়ক হইয়া রোগ দূর কর।

অপস্মার রোগ আরোগ্য বিধানার্থ দেখিতে পাওয়া যায়;—

"পূজাং রুদ্রস্য কুর্ব্বীত তদ্‌গণানাঞ্চ নিত্যশঃ॥"—(৬১ অ° উত্তর°)

অপস্মার রোগ হইতে আরোগ্য লাভের জন্য প্রমথগণের সহিত রুদ্রের সতত অর্চ্চনা করিবে।

---

* তুবরক, কুধান্য (কলাই) বিশেষ, জনার। ইহার ফলের মজ্জাতে তৈল উৎপন্ন হয়। (সুশ্রুত দ্রষ্টব্য)

যে যোগে কোন মন্ত্রের সমুল্লেখ নাই, সেখানে কি করিতে হইবে ?—

"যত্র নোদীরিতো মন্ত্রো যোগেষেতেষু সাধনে।
শব্দিতা তত্র সর্ব্বত্র গায়ত্রী ত্রিপদী ভবেৎ ॥"—(২৮ অ° চিকিৎসা°)

যেখানে যোগবিশেষে কোন মন্ত্রের পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ নাই, তাহার সর্ব্বত্রই "ত্রিপদী গায়ত্রী" দ্বারা ঔষধকে অনুপ্রাণিত করিয়া তৎপরে ব্যবহার করিতে হইবে।

৮। গ্রহোৎপত্তি

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই শিশুগণের যে সকল ব্যাধি * উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা প্রায়শঃ গ্রহগণের পীড়নবশতই ঘটিয়া থাকে, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে। কিরূপে সেই গ্রহগণের উৎপত্তি হইয়াছে ;—

"এতে গুহস্য রক্ষার্থং কৃত্তিকোমাগ্নিশূলিভিঃ।
সৃষ্টাঃ শরবনস্থস্য রক্ষিতস্যাত্মতেজসা ॥"—(৩৭ অ° উত্তর°)

প্রসিদ্ধি আছে, কার্ত্তিকেয় শরবনে নিজের তেজঃপ্রভাবে রক্ষিত হইলেও কৃত্তিকা, অগ্নি, উমা ও মহেশ্বর ইঁহারা সকলেই স্নেহবশতঃ তাঁহার রক্ষার জন্য স্কন্দ প্রভৃতি গ্রহগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

যখন বয়োবৃদ্ধির সহিত আর কুমারের রক্ষার কোন প্রয়োজন রহিল না, তখন কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মহাদেব স্কন্দ প্রভৃতি গ্রহগণকে তাঁহাদের বক্ষ্যমাণ জীবিকার উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন ;—

"কুলেষু যেষু নেজ্যন্তে দেবাঃ পিতর এব চ।
ব্রাহ্মণাঃ সাধবশ্চৈব গুরবোঽতিথয়স্তথা ॥
গৃহেষু তেষু যে বালাস্তান্ গৃহ্নীধ্বমশঙ্কিতাঃ।
তত্র বো বিপুলা বৃত্তিঃ পূজা চৈব ভবিষ্যতি ॥"—(৩৭ অ° উত্তর°)

হে গ্রহগণ, যাহারা দেবতা, পিতৃপুরুষ, ব্রাহ্মণ, সাধু ব্যক্তি, গুরুজন ও অতিথিবর্গের সমুচিত সৎকারে পরাঙ্মুখ, তাহাদের সন্তানগণ তোমাদিগের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে এবং তন্নিবন্ধন সেই ব্যক্তিগণের পূজা লাভ করিয়া তোমরা জীবিকা প্রাপ্ত হইবে।

৯। সৎপুত্র

ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদেও "সৎপুত্র" উৎপাদনে যেরূপ নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য, তাহার যথোচিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই জন্য সুশ্রুত বলিয়াছেন ;—

পুংসবন "ততো বিধানং পুত্রীয়মুপাধ্যায়ঃ সমাচরেৎ ॥"—(২অ° শারীর°)

শুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন সৎপুত্র লাভের জন্য স্ত্রীর ঋতু দর্শনের পরে আচার্য্য শাস্ত্রোক্ত পুংসবন-বিধান যথানির্দ্দেশ সম্পন্ন করাইবেন।

* ইহাকেই পেঁচোয় পাওয়া কহে।

পুংসন ক্রিয়াতে যেরূপ শাস্ত্র-অনুশাসনে ক্রিয়াক্রম বিহিত হইয়াছে, তদনুরূপ সেই ক্রিয়া অনুষ্ঠান সময়ে লক্ষ্মণা প্রভৃতি ঔষধসমূহের প্রয়োগও যথারীতি করিবার বিধান আয়ুর্ব্বেদে আছে। গর্ভাধানের পূর্ব্বে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই এক মাস কাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে হইবে, ইহাই সুশ্রুত আচার্য্যের উপদেশ।

শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপরিউক্ত ক্রিয়ার পরিণামে কি ইষ্ট লাভ হইয়া থাকে ?—

সৎপুত্র "এবং জাতা রূপবন্তো মহাসত্ত্বাশ্চিরায়ুষঃ।
ভবন্তি ঋণমোক্তারঃ সৎপুত্রাঃ পুত্রিণে হিতাঃ॥"—(২ অ° শারীর°)

বিধিপূর্ব্বক গর্ভোৎপাদন-ফলে সন্তান প্রীতিকর অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন, রজ ও তমোগুণ-বিরহিত, শুদ্ধসত্ত্বগুণান্বিত, দীর্ঘ আয়ুযুক্ত ও পিতৃপুরুষগণের ঋণমোক্তা, সুতরাং প্রকৃত সৎ-পুত্র-পদবাচ্য হয়। সংসারে এইরূপ পুত্রই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ-বিধায়ক হইয়া থাকে।

পিতা ও মাতা যথেচ্ছাচারসম্পন্ন হইলে ত কোন কথাই নাই, কিন্তু স্থলবিশেষে শান্ত-স্বভাব দম্পতির পুত্রও বিকৃতিপ্রাপ্ত হয় কেন ?

"আহারাচারচেষ্টাভির্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ।
স্ত্রীপুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্রোঽপি তাদৃশঃ॥"—(২অ° শারীর°)

গর্ভাধানকালে পিতা ও মাতা যেরূপ আহার, আচার ও কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সন্তানও ঠিক সেইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

এই জন্যই পিতা ও মাতার সংযম ও শুদ্ধাচার অবলম্বন করিতে ধর্ম্ম ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এত অনুশাসন। তাই এ বিষয়ে সুশ্রুত আরও বলিতেছেন ;—

কুপুত্র "দেবতাব্রাহ্মণপরাঃ শৌচাচারহিতে রতাঃ।
মহাগুণান্ প্রসূয়ন্তে বিপরীতাস্তু নির্গুণান্॥"—(৩অ° শারীর°)

যাঁহাদের দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে এবং যাঁহারা কায়শুদ্ধি, মনঃশুদ্ধি, সদাচার ও পরহিতে অনুরক্ত, তাঁহাদের সন্তান মহাগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে ; আর ইহার অন্যথা ঘটিলেই নির্গুণ, দুঃশীল পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে।

জীবপ্রবাহ যে অনাদি, তাহাও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ;—

জন্মান্তর "কর্ম্মণা নোদিতো যেন তদাপ্নোতি পুনর্ভবে।
অভ্যস্তাঃ পূর্ব্বদেহে যে তানেব ভজতে গুণান্॥"—(২ অ° শারীর°)

জীব স্বীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের বিধান অনুসারে পুনর্জ্জন্মে অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, মূক, পণ্ডিত, মূর্খ বা জাতিস্মর প্রভৃতি হইয়া থাকে। ফলতঃ পূর্ব্বজন্মে প্রাণী যে যে প্রকৃতির অনুশীলন করিয়া আসিয়াছে, পরজন্মেও সেই সকল গুণই তাহাকে আশ্রয় করে।

এই জন্যই মনুষ্যের প্রতি সদনুষ্ঠান করিতে ও সদা সাধুসঙ্গে নিরত থাকিতে আর্য্যশাস্ত্রের এত উপদেশ।

দৌহৃদকে প্রচলিত কথায় দোহদ বা সাধ বলে। যখন গর্ভের চারি মাস বয়ঃক্রম হয়, তখনই তাহাতে চেতনার সঞ্চার হইয়া থাকে। অচিন্তনীয় ঐশ্বরিক শক্তিপ্রভাবে গর্ভস্থ ভ্রূণের অভিপ্রায় অনুসারে এই সময়ে গর্ভিণীর নানাবিষয়ক অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহাই দৌহৃদ বা দোহদ। দৌহৃদ পূর্ণ না হইলে কি হয়?—

দৌহৃদ "সা প্রাপ্তদৌহৃদা পুত্রং প্রজায়েত গুণান্বিতম্।
অলব্ধদৌহৃদা গর্ভে লভেতাত্মনি বা ভয়ম্॥"—(৩অ° শারীর°)

গর্ভিণীর দৌহৃদ পূর্ণ হইলে সন্তান পূর্ণাঙ্গ ও সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে, আর তাহার অন্যথায় সন্তানের কোন অঙ্গের বা স্বভাবের বিকৃতি অথবা গর্ভিণীর নিজেরও ঐরূপ বিকার-বিশেষ সংঘটিত হইতে পারে। এই জন্যই গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার বিধান বিহিত হইয়াছে।

যদি রাজদর্শনে গর্ভিণীর অভিলাষ হয়, তাহা হইলে ভাগ্যবান্ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন নৃপতি সদৃশ পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে। এইরূপ গর্ভাবস্থায় রমণীর বস্ত্রালঙ্কারে ইচ্ছা হইলে বস্ত্র ও অলঙ্কার-প্রিয়, তাপসাশ্রম দর্শনেচ্ছু হইলে ধর্ম্মশীল ও শান্তস্বভাব এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর দর্শনে ইচ্ছা হইলে হিংসা ও ক্রূরাচারপরায়ণ পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে।

গর্ভিণীকে কখন্ সূতিকাগৃহে প্রবেশ করাইতে হইবে?—

সূতিকাগৃহে প্রবেশ "নবমে মাসি সূতিকাগারমেনাং প্রাবেশয়েৎ প্রশস্তে তিথ্যাদৌ॥"
—(১০ম অ° শারীর°)

তিথি ও নক্ষত্র প্রভৃতি শুভশংসী দেখিয়া নবম মাসে গর্ভিণীকে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করাইবে।

ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বালকের নামকরণ-বিধানে সুশ্রুত বলেন,—

নামকরণ "ততো দশমেঽহনি মাতাপিতরৌ কৃতমঙ্গলকৌতুকৌ স্বস্তিবাচনং কৃত্বা নাম কুর্য্যাতাং যদভিপ্রেতং নক্ষত্রনাম বা॥"—(১০ অ° শারীর°)

শিশু যখন দশ দিনের হইবে, পিতা ও মাতা বংশানুক্রম বিধান অনুসারে যথাবিধ মঙ্গল আচারের অনুষ্ঠান করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক নিজেদের অভিলাষ অনুসারে বা জন্মনক্ষত্রের নির্দ্দেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অনুশাসনে শিশুর নামকরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন।

ক্রমে ক্রমে বালক যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, তখন পিতা কি করিবেন?—

বিদ্যাশিক্ষা "শক্তিমন্তঞ্চৈনং জ্ঞাত্বা যথাবর্ণং বিদ্যাং গ্রাহয়েৎ॥"
—(১০ অ° শারীর°)

বালক যখন ক্রমে কোন বিষয়ের অভ্যাস করণে সমর্থ হইবে, সেই সময়ে (অর্থাৎ জন্ম সময় হইতে শিশুর পঞ্চম বর্ষে) পিতা তাহাকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধানে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত করাইবেন।

বিদ্যাভ্যাস সমাপ্তি প্রাপ্ত হইলে পুত্র যখন ক্রমে যুবক ও শক্তিসম্পন্ন হইবে, তখন ;—

বিবাহ "অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবার্ষিকীং পত্নীমাবহেৎ পিত্র্যধর্ম্মার্থকামপ্রজাঃ প্রাপ্স্যতীতি।"—(১০অ° শারীর°)

বিদ্যাশিক্ষার পরে পিতা যখন দেখিবেন, পুত্রের পঞ্চবিংশতিতম বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, তখন তাহার সহিত দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিবেন; কারণ, এই বয়সেই সন্তানগণ স্বীয় পিতৃঋণ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, অর্থ উপার্জ্জন, বিষয় উপভোগ ও সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে।

পুরুষের পঞ্চবিংশতি ও স্ত্রীর দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমেই যে সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও দীর্ঘজীবী সন্তানের উৎপাদনের সমর্থতা জন্মিয়া থাকে, এই প্রমাণে সুশ্রুত তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন; অধিকন্তু আরও বলিয়াছেন ;—

* "ঊনদ্বাদশবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥"

—(১০ম অ° শারীর°)

অপূর্ণ পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পুরুষ ও অপ্রাপ্ত দ্বাদশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রীর যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে হয় ত গর্ভেই মৃত হয়, আর যদি বা জীবিত অবস্থায় প্রসূত হয়, তাহা হইলেও দীর্ঘজীবী হয় না, অথবা জীবিত থাকিলেও চিরজীবন ক্ষীণবলই থাকে।

স্ত্রীলোকের সন্তান উৎপাদনের বয়ঃপ্রসঙ্গে সুশ্রুত আরও বলেন ;—

"রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃসংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে।
তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥"—(১৪অ° সূত্র°)

আরও,—

"তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমানমসৃক্ পুনঃ।
জরাপক্বশরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥"—(৩অ° শারীর°)

---

* তিন শত বৎসরের প্রাচীনতম হস্তলিখিত গ্রন্থে আমরা "ঊনদ্বাদশ" এই পাঠই প্রাপ্ত হইয়াছি। সুশ্রুতের যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক দেখা গিয়াছে, তাহার তিনখানিতেই মূলে ও ডল্লনের টীকায় এই পাঠই আছে। এ পর্য্যন্ত সুশ্রুতের যত মুদ্রাঙ্কণ হইয়াছে, তাহাতে "ঊনষোড়শ" পাঠ দেখা যায়। কোন কোন হস্তলিপিতেও "ঊনষোড়শ" পাঠ আছে। কিন্তু সুশ্রুতের সর্ব্বত্রই যখন দেখা যায়, "দ্বাদশবর্ষীয় স্ত্রীর সহিত পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষের বিবাহ হওয়া বিধেয়"—তখন এই স্থলে "ঊনদ্বাদশ" পাঠই অধিক সমীচীন। কারণ, স্বাভাবিক রজঃপ্রবর্ত্তনই স্ত্রীলোকের যৌবন ও গর্ভধারণকাল অবধারিত করিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের রজঃ রসধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহা দ্বাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে; তৎপরে দেহের জরানিবন্ধন ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিবাহের বয়ঃক্রম নির্দ্দেশে,—

"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।"

ধর্ম্মশাস্ত্রের এই প্রমাণেও কন্যার বিবাহের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়; তবে পুত্রের বয়সের পরিমাণ আরও একটু বাড়িয়া গেল।

যাহা হউক, এই সকল প্রমাণপরম্পরায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই শরীরের নীরোগতা ও মানসিক প্রসন্নতা যে সর্ব্বথা সৎ পুত্র লাভের প্রধান প্রয়োজন, তাহা সুশ্রুতে সবিশেষ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

১০। সুশ্রুত-প্রণেতা কি ছিলেন?

আমরা এই প্রবন্ধে সুশ্রুত গ্রন্থে ধর্ম্মভাবের যে বিকাশ আছে, তাহা অতি সংক্ষেপে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। তবে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে এ বিষয়ে কত দূর সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। সুশ্রুত-প্রণেতা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন?—বর্ত্তমানে কেহ কেহ তাহাতে একরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন যে, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য্য নাগার্জ্জুনই * বর্ত্তমান সুশ্রুতের সংস্কর্ত্তা বা প্রণেতা। সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্লনাচার্য্য সন্দেহপ্রায় বলিয়া গিয়াছেন,— নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা। তাহাতেই এই অভিমতের উদ্ভব হইয়াছে। বিশেষতঃ সুশ্রুতের এক স্থানে "সুভূতি গৌতম" উল্লিখিত হইয়াছেন, এই প্রমাণবলে নাগার্জ্জুনই সুশ্রুতের প্রণেতা নিশ্চিত হইবেন, ইহাই কাহারও কাহারও অভিমত। ও দিকে কিন্তু সুশ্রুতের যে অন্য প্রতিসংস্কর্ত্তা ছিলেন না, প্রাচীন টীকাকারদিগের মধ্যে যে এইরূপ অভিমত ছিল, ডল্লন নিজেই স্বগ্রন্থেও তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত সুশ্রুতসংহিতার অন্যতম টীকাকার। তিনিও সুশ্রুতের বাস্তবিক প্রতিসংস্কর্ত্তা কেহ ছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিয়াই গিয়াছেন। সংহিতাগ্রন্থে চারি প্রকার সূত্রের মধ্যে প্রতিসংস্কর্ত্তার সূত্র অন্যতম, ডল্লনের আত্মমত পোষণের ইহাই প্রমাণ যাঁহারা মনে করেন,—চক্রপাণি, জতুকর্ণের ও গ্রন্থান্তরের

---

* আয়ুর্ব্বেদের উত্তরকালীন সংগ্রহকারবৃন্দ ও চক্রপাণি প্রভৃতি আচার্য্য নাগার্জ্জুন রসায়নবেত্তা ছিলেন, ইহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা নাগার্জ্জুনকে "মুনীন্দ্র" আখ্যায়ও সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। নাগার্জ্জুন বহু গ্রন্থের প্রণেতা; কিন্তু রসায়নবেত্তা নাগার্জ্জুন ও বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুন এক ব্যক্তি কি না—তাহার নিশ্চায়ক প্রমাণ কি? যদি এক নাগার্জ্জুন হয়েন, তাহাতে আপত্তিই বা কি? যাহা হউক, আমরা নাগার্জ্জুন নামধেয় গ্রন্থকার-প্রণীত "যোগসার" নামক গ্রন্থে মাধবকর, চক্রপাণি (চক্র) ও বঙ্গসেনের প্রমাণও সংগ্রহ দেখিতে পাইয়াছি। ইনি আবার কোন্ নাগার্জ্জুন?

প্রমাণ নিবদ্ধ করিয়া কেবল ঐ প্রমাণই যে এ বিষয়ে নিশ্চয়ত্বজ্ঞাপক নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। চক্রপাণি, জতুকর্ণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানে দুর্ল্লভপ্রায় ভেলসংহিতা * দেখিবার সুবিধা পাইয়া তাহাতেও আমরা চক্রপাণির পরিপোষক প্রমাণই প্রাপ্ত হইয়াছি। অথচ জতুকর্ণ বা ভেলের গ্রন্থ যে প্রতিসংস্কৃত হয় নাই, প্রত্যুত বিলুপ্তই হইয়া গিয়াছে, এ কথা সকলেই জানেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণের নাম গ্রন্থমধ্যে থাকিলেই তাহা প্রতিসংস্কৃত বা অন্যের কৃত, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। † তান্ত্রিক বা পৌরাণিক দেবতার সমুল্লেখ দেখিয়াও গ্রন্থের অর্ব্বাচীনতা প্রতিপন্ন হয় না। ‡ অধিকন্তু অগ্নিবেশকৃত সংহিতার, "চরক" ও চরকসংহিতার অংশবিশেষের "দৃঢ়বল" প্রতিসংস্কর্ত্তা, চরক গ্রন্থেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুশ্রুতের ঐরূপ কোন প্রতিসংস্কর্ত্তা থাকিলে, গ্রন্থমধ্যে চরকের ন্যায় তাহারও সমুল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত।

আয়ুর্ব্বেদে ব্রহ্মসংহিতা ও অশ্বিনীকুমারসংহিতা প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুশ্রুত, অগ্নিবেশ, ভেল বা চরক কত কালের, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহাঁরা যখন নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তখন যে তাঁহাদিগের হইতে প্রাচীনতম কালে ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। খুব সম্ভব, প্রাচীনতম সংহিতার শ্লোকপরম্পরাও উত্তরকালীন সুশ্রুত, অগ্নিবেশ ও ভেল প্রভৃতি

---

* "অথাতঃ পুরুষনিচয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

তত্র ভেল আত্রেয়মিদমুবাচ। * *

অত্রোবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ।" * * (শারীরে ভেলসংহিতা)

"তত্র ধান্বন্তরীয়াণামধিকারঃ ক্রিয়াবিধৌ।" (চিকিৎসা, চরকে)

"ধান্বন্তরং পিবেৎ সর্পিঃ প্রাজাপত্যমথাপি বা।"

"সুকুমারং বলাতৈলং তৈলং শৈরিষমেব বা।

ধান্বন্তরং চাপি ঘৃতং পায়য়েদ্বাতশোণিতম্।" * *

"কিং জন্তস্য গর্ভস্য প্রথমং সংভবতি হস্তং পাদাবিতি * *

ইতি শৌনকঃ।"

"কথং গর্ভো মাতুরুদরে তিষ্ঠতীতি শৌনকঃ।"—(ভেলসংহিতা)

"যস্মিন্ যস্মিন্ বিকারে তু যোগোঽয়ং সংপ্রযুজ্যতে।

তং তং নিহন্তি বৈ রোগং দেবারীন্ কেশবো যথা।"—(ভেলসংহিতা)

প্রসিদ্ধ সুশ্রুতসংহিতার ইংরাজি অনুবাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ভিষগ্‌রত্ন মহোদয় সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া বহু অর্থব্যয়ে সুদূর তাঞ্জোর রাজকীয় লাইব্রেরীর আদর্শ গ্রন্থ অবলম্বনপূর্ব্বক ভেল-সংহিতার যে প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ভেলসংহিতা দেখিতে পাইয়াছি। এই জন্য কুঞ্জবাবুর নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

স্ব স্ব গ্রন্থে সমুদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শ্লোক এ স্থলে দেখাইতেছি ;—

সুশ্রুতে আছে,—

"রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জ্ঞঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥"—(১৪ অ° সূত্র°)

ভেলসংহিতায়ও দেখিতে পাই ;—

"রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদস্ততোঽস্থি চ।
অস্থ্নো মজ্জা ততঃ শুক্রং শুক্রাদ্গর্ভস্য সম্ভবঃ॥"
(১১ অ° সূত্র°)

ভেল ও চরকের পরস্পর একতার এত প্রাচুর্য্য আছে যে, তাহার সমুল্লেখে প্রবন্ধান্তর সঙ্কলিত হইয়া পড়ে। এইরূপ ঐক্য দেখিয়া প্রাচীনতম সংহিতার অস্তিত্বই অনুমিত হয়।

"সুভূতি গৌতম" নাম দেখিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেবের শিষ্য সুভূতিই যে নিশ্চয় হইবেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কি? এইরূপ বলাকে অনুমানই বলিতে পারা যায়, প্রকৃত প্রমাণ নহে। বিশেষতঃ গৌতম নাম বংশপরিচায়ক, সুতরাং শাক্যসিংহের বহু পূর্ব্বকাল হইতেই উহা বর্ত্তমান ও প্রসিদ্ধ ছিল।

সুশ্রুতের গুরু ভগবান্ অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরি, আত্রেয় পুনর্ব্বসুর ন্যায় মহর্ষি ভরদ্বাজেরই অন্যতম শিষ্য ছিলেন, পৌরাণিক প্রমাণান্তরে আমরা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি ;—

"তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেবো ধন্বন্তরিস্তদা।
কাশিরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগপ্রণাশনঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহ সভিষগ্জিতম্।
তমষ্টধা পুনর্ব্বস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥"—(২৯ অ° হরিবংশে)

কাশীরাজ ধন্বের গৃহে ভগবান্ ধন্বন্তরি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহামুনি ভরদ্বাজের নিকটে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন এবং অতঃপর তাহা শল্য প্রভৃতি আট ভাগে বিভাগ করিয়া শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

এই প্রমাণ দ্বারা আত্রেয়-সংপ্রদায় ও ধন্বন্তরি-সংপ্রদায়েরও মেলন প্রতিপন্ন হয়, চরক, সুশ্রুত বা ভেলে তাহা দেখা যায়।

প্রাচীন গ্রন্থ মাত্রেই নানারূপ পাঠের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে, উহা প্রধানতঃ অনবধানপ্রসূত ভ্রম হেতুই আপতিত হইয়া থাকে। বৈদ্যক গ্রন্থসমূহে, সুতরাং সুশ্রুত-সংহিতাতেও সেইরূপ ব্যতিক্রম কিছু যে না ঘটিয়াছে, এরূপ নহে। আমরা সুশ্রুতের এইরূপ পাঠ-পরিবর্ত্তনের দিঙ্মাত্র "সুশ্রুতের আদর্শ" * নামক প্রবন্ধে প্রকটিত করিয়াছি।

---

* সাহিত্যসংহিতা, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ সাল।

যাহা হউক, ঐরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়াই একেবারে অপরকে সংস্কর্ত্তা বা প্রণেতা বলিয়া গণ্য করা সমীচীন কি ?

অষ্টাঙ্গহৃদয়-প্রণেতা বাগ্‌ভট আচার্য্য, সুশ্রুত ও চরক সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, "আয়ুর্ব্বেদে আর্য গ্রন্থ ও ঋষিরহস্য" * নামক প্রবন্ধে আমরা তৎসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। বাহুল্য-ভয়ে এ স্থলে আর তাহা উল্লিখিত হইল না।

বুদ্ধদেব সূর্য্যবংশীয় রাজর্ষির পুত্র ছিলেন। তিনি জননির্ব্বিশেষে সকলকেই নির্ব্বাণ কামনায় বৈদিক বর্ণাশ্রম আচারের বহির্দ্দেশে নিয়া গিয়াছিলেন, যাহাতে সকলেই একবারে মুক্তি-পথে উপনীত হইয়া পুনরাবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু সংসারের সকল লোকই কি ভগবান্ বুদ্ধদেবের স্থায় কামিনী ও কাঞ্চনের হেয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতে পারিয়াছিল ? সুতরাং দুর্ব্বার কালস্রোতে পড়িয়াই অতঃপর তথাগত বুদ্ধদেবের উচ্চতম আদর্শ নির্ম্মল ধর্ম্মেও ঘুণ প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সুশ্রুত-সংহিতার সর্ব্বত্রই আমরা সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের অনুশাসনই দেখিতে পাইতেছি, এই প্রবন্ধেও তাহা সম্যক্ সমর্থিত হইয়াছে। সুশ্রুতের কোথায়ও ভগবান্ বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের গন্ধও অনুভূত হয় না ; সুতরাং সুশ্রুত-সংহিতা যে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের সুযোগ্য পুত্র শ্রুতর্ষি সুশ্রুত কর্ত্তৃক প্রণীত, এই সুপ্রাচীন বৈদ্য অভিজ্ঞানের অন্যথা কিরূপে সমীচীন হইতে পারে ? অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার

---

* প্রভাত, ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২০ সাল

বাঁশে লিখিত ঠিকুজী*

চট্টগ্রামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্থান পান নাই। তন্ত্র-মতের যথাসম্ভব উন্নতি হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলিত জ্যোতিষ এক সময়ে তন্ত্রের এক অঙ্গ-মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। ফলিত জ্যোতিষেব গণনায় লোক আশ্চর্য্যান্বিত হয়। হস্ত-রেখা, কপাল এবং নখ দেখিয়া জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে পণ্ডিতগণও বিস্মিত হয়েন। সাধারণ লোক যে তাহাতে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? গণিত জ্যোতিষ অর্থাৎ জাতকের লগ্ন, গ্রহ, নক্ষত্র দ্বারা গণনা করিয়া তাহার ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গণনাও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার আত্মজীবনীতে এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, এক জন পণ্ডিত কুষ্ঠী ও ঠিকুজী প্রস্তুত করিয়া যত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটি করিয়া তাহা পারেন নাই। এখনও এখানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের যথেষ্ট সম্ভ্রম আছে। শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যাকরণ, ন্যায় ও স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ পড়িবার নিয়ম আছে। ইহাতে পণ্ডিত মহাশয়েরা ঠিকুজী ও কুষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করেন। ইহা ছাড়া কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হইলে, ঠিকুজী বা কুষ্ঠী প্রস্তুত করিবার জন্য যখন লগ্নাচার্য্যকে আহ্বান করা হয়, সেই সঙ্গে দুই তিন জন অধ্যাপকও নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। লগ্নাচার্য্যের গণনার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার-ভার তাঁহাদের। সুতরাং অধ্যাপকগণের জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হয়। ভদ্র লোকদিগের যেখানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি এত শ্রদ্ধা, সেখানে নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে যে ইহার প্রতিপত্তি হইবে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। ক্রমে ক্রমে ইহা মুসলমান ও বৌদ্ধদিগের মধ্যেও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। দরিদ্র মুসলমান ও পার্ব্বত্য মগগণও সেই জন্য আপন আপন সন্তানের জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করাইতেন এবং এখনও অনেকে করান। দরিদ্রদিগের বাক্স-পেটেরা নাই। তাহারা বংশ-নির্ম্মিত ঘরে বাস করে। সুতরাং সে নিমিত্ত তাহাদের জন্য বংশে খোদিত ঠিকুজীর প্রথা হইয়াছিল। চারি অঙ্গুল পরিমিত এক বংশখণ্ডে জাতকের জন্মলিপি বা ঠিকুজী প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিবার পদ্ধতি সৃষ্টি হইল। বংশ-খণ্ডখানি হাঁড়ী বা কলসীর মধ্যে অন্য দ্রব্যের সঙ্গে রাখা যাইতে পারে; আবার গৃহদাহের সময় অনায়াসে উদ্ধার হইতে পারে। বংশনির্ম্মিত গৃহে অগ্নিদাহের ভয় অধিক; আবার এক সময়ে ঐ জেলায় গৃহদাহের ভয় অধিক ছিল। আমি প্রথমে যে ঠিকুজীটি দেখি, তাহা এত সুন্দর যে, প্রথমে উহা হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যে ঠিকুজী বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইতেছে, উহা দেখিতে তত সুন্দর না হইলেও, না বলিয়া দিলে হঠাৎ বংশনির্ম্মিত

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বলিয়া কাহারও উপলব্ধি হইবে না। এই ঠিকুজীতে জাতকের নাম, তাহার পিতা-মাতার নাম, যে আচার্য্য ঠিকুজী প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাঁহার নাম এবং জাতক কোন্ মানে, মাসে, বারে ও লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি সমুদয় প্রয়োজনীয় কথা আছে। এই ঠিকুজীখানি একটি ধুপী কন্থার এবং ৭১ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের সাহায্যে ইহার যে অর্থ করিয়াছি, তাহা নিম্নে দিলাম। ন্যায়ভূষণ মহাশয় বলেন যে, সাধারণতঃ কোষ্ঠী বা ঠিকুজীতে অঙ্ক দ্বারা তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি লেখা হয় না। এই অঙ্ক সঙ্কেত দ্বারা লগ্নাচার্য্য অল্প স্থানে অনেক কথা লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন। একটি লৌহশলাকা দ্বারা বংশখণ্ডের উপর ঠিকুজীর কথা খোদা হইয়াছে। প্রথম অক্ষরে লেখা আছে যে, ১৭৭২ শকে ২৪শে শ্রাবণ কৃষ্ণ পক্ষে, চতুর্থী তিথিতে রাত্র ১৯শ দণ্ড ১০পল গতে মিথুন লগ্নে শ্রীপোতন্ ধুপীর কন্থা শ্রীমতী রাজেশ্বরী, তাহার মাতা চন্দ্রার গর্ভে মীন রাশিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বকলম দস্তখত ২নং শান্তিরাম আচার্য্য। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সেখানে একাধিক শান্তিরাম আচার্য্য ছিলেন এবং শান্তিরাম ঠিকুজী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ হাতে বাঁশের উপর খোদেন নাই। বং দং অর্থে বকলম দস্তখত।

"শ্রীহরি স্মরণম্

শকে ১৭৭২ শ্রাবণস্য ২৪ দিবসে ৩ বাসরে কৃষ্ণপক্ষে $\frac{১}{৪}$ যস্তিথৌ রাত্র ১৯।১০ গতে মিথুন লগ্নে শ্রীপোতন ধোবীর কন্থা ২৬[২] মিনরাশি মাতা চন্দ্রার গর্ভে শ্রীরাজেশ্বরীর জং পীং ব দা ২ শান্তিরাম।

৩ ৬ল		২ ৯
৪ ১		
৮ ৫		

৩	২৫
১৮	৩৪
১২	১৪
৪৭	২৪

৬ ৪	৩	৫ ৭
২		৭
১ ৪	৬	৫ ৩

প্রথম ক্ষেত্রের অর্থ যে, জাতকের জন্মকালীন বৃষ রাশিতে মঙ্গল (৩) ছিল এবং মিথুন রাশিতে শুক্র (৬) ছিল; কর্কট রাশিতে বুধ ও রবি (৪, ১), সিংহ রাশিতে রাহু ও বৃহস্পতি (৮, ৫), কুম্ভরাশিতে কেতু (৯) এবং মীন রাশিতে চন্দ্র (২) ছিল।

দ্বিতীয়টি আতাহ। তাহার অর্থ ন্যায়ভূষণ মহাশয় এইরূপ করিয়াছেন। জাতকের মঙ্গল বারে (৩) জন্ম হইয়াছিল। সে দিন তিথি কৃষ্ণা তৃতীয়া (১৮) ছিল। ঐ দিবস কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া ১২ দণ্ড ৪৭ পল স্থিতি ছিল। ঐ দিনের নক্ষত্র ছিল পূর্ব্বভাদ্রপদ (২৫) এবং ঐ নক্ষত্রের স্থিতি ছিল ৩৪শ দণ্ড ১৪ পল। জাতকের জন্ম মাসের ২৪শ তারিখে হইয়াছিল। তৃতীয়টিও একটি ক্ষেত্র; উহার অর্থ নিম্নে দেওয়া গেল।

মেষ রাশির অধিপতি মঙ্গল (৩), বৃষের অধিপতি শুক্র (৬), মিথুনের অধিপতি বুধ (৪), কর্কটের অধিপতি চন্দ্র (২), সিংহের অধিপতি রবি (১), কন্যার অধিপতি বুধ (৪), তুলার অধিপতি শুক্র (৬), বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল (৩), ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি (৫), মকর ও কুম্ভের অধিপতি শনি (৭), মীনের অধিপতি বৃহস্পতি (৫)।

চট্টগ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্থান পান নাই, কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এখান হইতেও চারি জন পার্ষদ ভক্ত পাইয়াছিলেন। ইহাঁরা ভক্তগণের মধ্যে অতি উচ্চ ছিলেন। এই চারি জন যেমন ভাগবত, আবার সেইরূপ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা (১) শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, (২) শ্রীল বাসুদেব দত্ত, (৩) শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ও (৪) পণ্ডিত গদাধর মিশ্র। এই মহাত্মগণের সম্বন্ধে আমি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় লিখিয়াছি। তাঁহাদের সম্বন্ধে জানিবার জন্য শ্রীল বিদ্যানিধির বংশধরগণের বর্ত্তমান বাসস্থান মেখল ও দত্ত ঠাকুরদিগের বাসস্থান ছনহরায় গিয়াছিলাম। বিদ্যানিধিবংশীয়গণ সকলেই বিদ্বান্। তাঁহা হইতে বর্ত্তমান ১৩ পুরুষ সকলেই শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থভাণ্ডারে অনেক হাতে লেখা পুথি, তালপাতার, শোলায় ও কাগজে লেখা আছে। ঐ সকল দেখিতে দেখিতে একখানা তালপাতার পুথি পাইয়াছিলাম। পুথিখানি বহু কাল পূর্ব্বে কেহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু পুথিতে কিছু লিখেন নাই। ইহা দেখিলে কি প্রণালীতে পূর্ব্বে তালপাতার পুথি প্রস্তুত হইত, তাহা বুঝা যাইবে; সেই জন্য বিদ্যানিধিবংশীয় পূজনীয় শ্রীল হরকুমার স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে লইয়া ইহা পাঠাইতেছি। শুনিলাম, তালপাতার পুথি প্রস্তুতের নিয়ম এই যে, পাতাগুলি প্রথমে জলে সিদ্ধ করিতে হয়। তাহার পর মহিষের রক্তদ্বারা এক প্রকার কালি প্রস্তুত করিয়া উহা লেখা হইত।

শ্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী

পানিহাটী—রাঘব পণ্ডিতের মদনমোহন বিগ্রহ
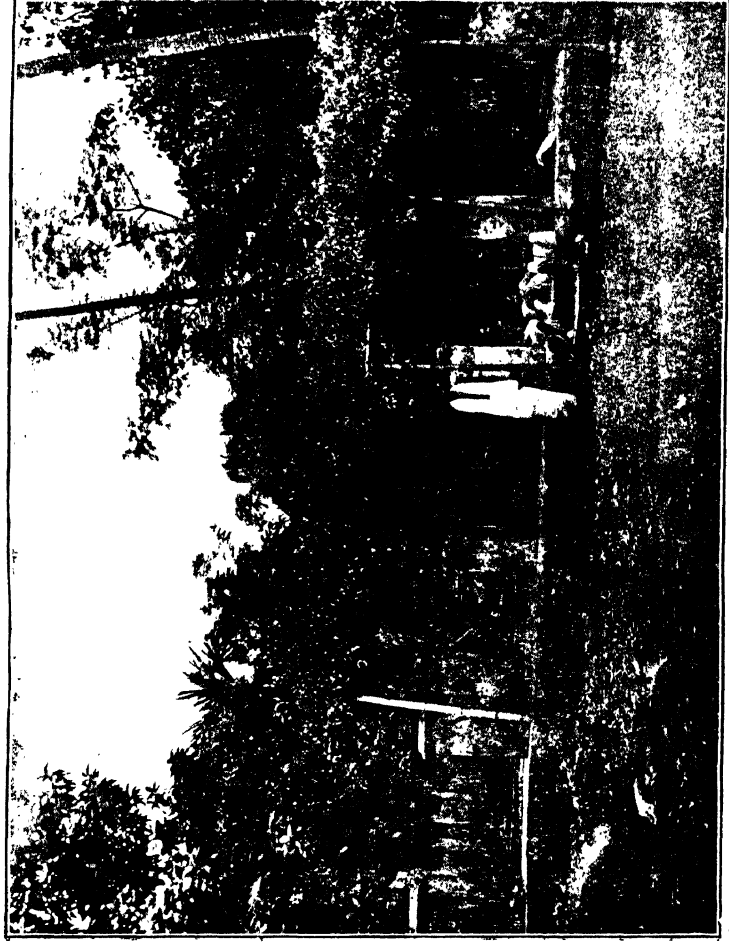
পানিহাটী—রাঘব পণ্ডিতের সমাধি-বেদী ও মাধবী-কুঞ্জ
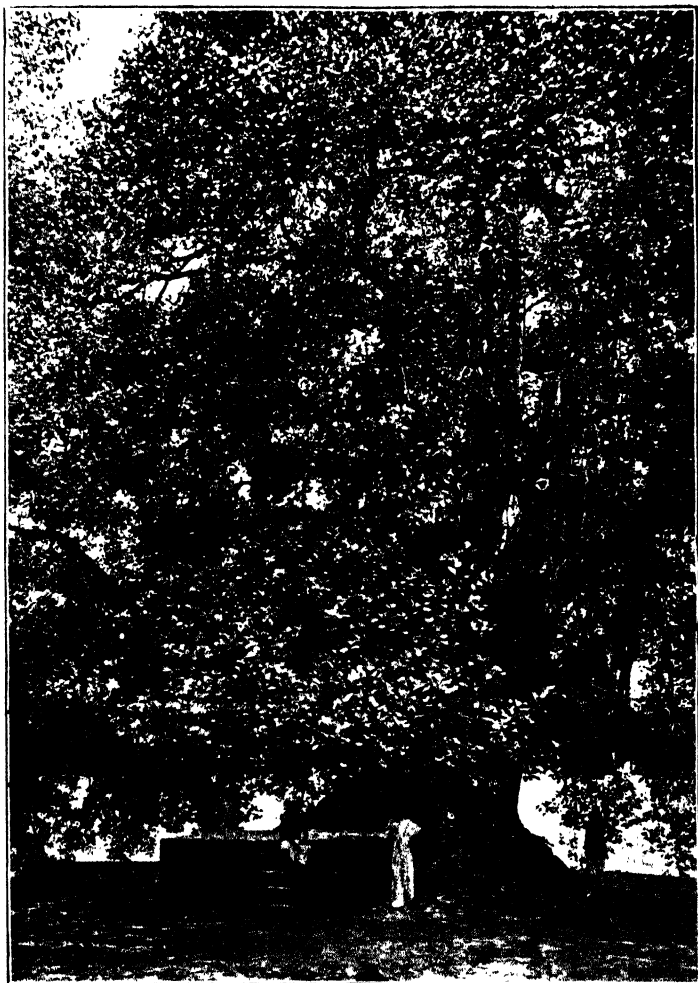
পানহাটী—রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ডমহোৎসব ক্ষেত্র
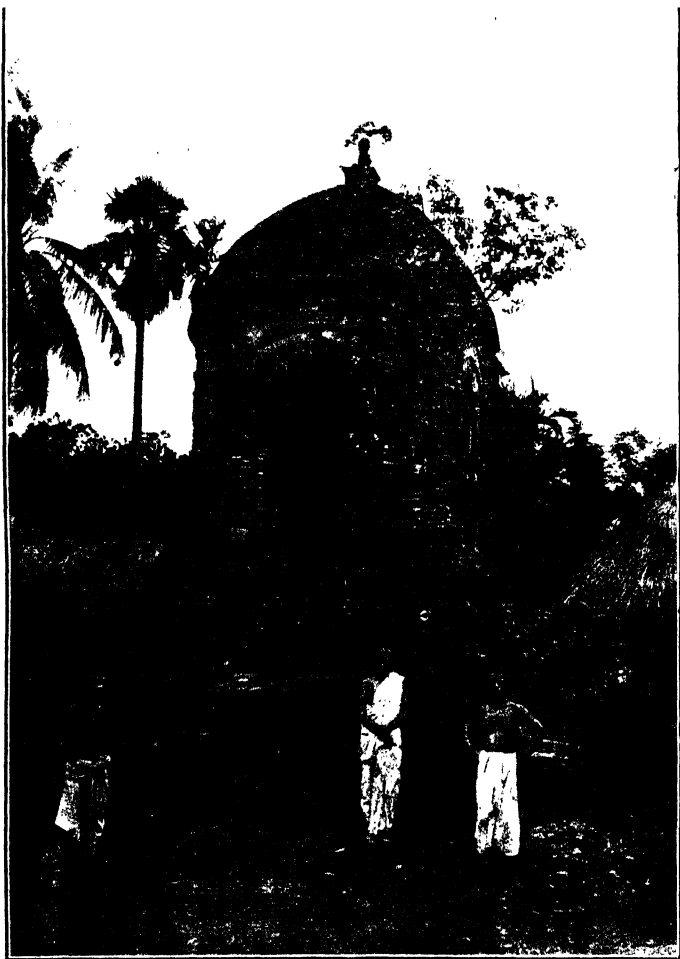
পানিহাটী—মদনমোহনের দোলমঞ্চ

দশম মাসিক অধিবেশন

২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, ৬ই জুন ১৯১৫, অপরাহ্ণ ৬৷০টা

আলোচ্য বিষয়—১। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি,—(ক) কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (খ) কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, (গ) সদস্য-নির্ব্বাচন। ২। মেদিনীপুর, মানভূম ও মীরাটে শাখা-পরিষৎ স্থাপন-সংবাদ জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) বীরভূম চাঁদপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কন্দর্পনারায়ণ মজুমদার-প্রদত্ত বরাহমূর্ত্তি, (খ) মুর্শিদাবাদ ঝিল্লী নামোপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘটক-প্রমুখ ব্যক্তি-গণের প্রদত্ত বরাহমূর্ত্তি, (গ) বীরভূম সোণারকুণ্ডুনিবাসী শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র দাস বিশ্বাস-প্রমুখ ব্যক্তিগণের প্রদত্ত হস্তিমূর্ত্তি। ৪। প্রবন্ধপাঠ,—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "গুপ্তবলভী-সংবৎ"। ৫। শোকপ্রকাশ,—অতুলনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন
" নবকৃষ্ণ রায় (মীরাট)
" নিরারণ চন্দ্র ঘটক
" শশধর বিদ্যাভূষণ (যশোহর)
" রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
" মিঃ পি এন্ দত্ত
" মধুসূদন দাস মোহান্ত (বর্দ্ধমান)
" শুদ্ধানন্দ স্বামী
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" বলাইচাঁদ মল্লিক
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত
" আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ
" কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত
" জানকীনাথ গুপ্ত
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" সত্যেন্দ্রনাথ রায়
" রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
" হরপ্রসাদ মজুমদার
" সুরেন্দ্রনাথ সরকার
" কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত
" মন্মথনাথ রায়
" ননীগোপাল রায়
" বামাচরণ মজুমদার
" বসন্তরঞ্জন রায়
" অমৃতলাল দত্ত
" ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" গিরিশচন্দ্র দত্ত
" নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত
" সুরেন্দ্রনাথ রায়
" খগেন্দ্রনাথ বসু
" ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
" গিরিজাকুমার বসু
" কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (হেতমপুর)
" ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" ডাঃ প্রভাসনাথ পাল
" জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" পুলিনবিহারী দত্ত
" কুমুদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" কামিনীকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" সূর্য্যকুমার পাল
" ডাঃ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল
" তারকনাথ ভট্টাচার্য্য
" অমৃতগোপাল বসু
" বিধুভূষণ দত্ত
" বিধুভূষণ সেন
" রামকমল সিংহ
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" ভোলানাথ কোঁচ
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" ভুবনমোহন রায়
" মহেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
" ললিতমোহন দাশগুপ্ত
" অনন্তকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী
} সহকারী সম্পাদক।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত হইল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীচন্দ্রনাথ কবিরত্ন সাতক্ষীরা হাউস, কাশীপুর।
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় জমিদার, কাশীনগর, যশোহর।
"	"	শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ প্রধান শিক্ষক, কাশীনগর, যশোহর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	শ্রীপ্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ, ৬৩ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীঅবনীকুমার সেন এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, চিকান্দী, ফরিদপুর।
”	”	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, ৬৯ বেলেঘাটা মেন রোড।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ ৩ ভালুকপাড়া লেন।
”	”	ডাঃ শ্রীকুঞ্জলাল সাহা পাবনা।
শ্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	মৌলবী নসরৎ আলী সব্‌ ডেপুটী কালেক্টর, ফরিদপুর।
শ্রীকালীচরণ মিত্র	”	শ্রীজীবনধন চক্রবর্ত্তী ৩৩ ঘোষের লেন।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত কলিকাতা বজেট আফিস, ১০ আতাবাগান লেন, গোয়াবাগান।
”	”	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, পুরুলিয়া।
”	”	রায় বাহাদুর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বল্লভ ২৬ গ্যালিফ ষ্ট্রীট।
শ্রীরামকমল সিংহ	”	শ্রীভবেশচন্দ্র দাস বিশ্বাস সোনারকুণ্ড, বীরভূম।
”	”	শ্রীকন্দর্পনারায়ণ মজুমদার চাঁদপাড়া, বীরভূম।
”	”	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী খুলনাবাজার, খুলনা।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীবিধুভূষণ সেন ৩এ হরিমোহন বসুর লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	কবিরাজ শ্রীহরপ্রসাদ মজুমদার ১১ হরিমোহন বসুর লেন।
"	"	কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রলাল সেন কবিরত্ন ১৫৫।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহারাণচন্দ্র দে রসিকপুর, ডুমকা।
"	"	শ্রীযদুনাথ দে বরহি, রাজনগর পোঃ, দারভাঙ্গা।
"	"	শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক হেডমাষ্টার, যুগবাড়িয়া ডে নাইট স্কুল। সোদপুর, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক ২২।১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় সাতক্ষীরা, খুলনা।
"	"	শ্রীঅমূল্যধন চট্টোপাধ্যায়
"		Dyer's Solan Brewery, P. O. (K. S. Ry.)
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীহরেন্দ্রমোহন লাহিড়ী এম্ এস্ সি, ৭৭ ল্যান্সডাউন রোড, বালীগঞ্জ।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	ডাঃ শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার এল্ এম্ এস্ ৮৯।১ গ্রে ষ্ট্রীট।

নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার শর্ম্মা	ঈশ্বরের স্বরূপ।
" কুলদাচরণ সরকার	নবীনা।
" কিরণচাঁদ দরবেশ	সঙ্গীত-সুধা।
" মোহিনীমোহন বসু	মায়ের আহ্বান।
" জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়	ধূলিকণা।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র	চন্দ্রকলা নাটক, দ্রৌপদী হরণ, পরিচয় ও পুষ্পাঞ্জলি, বিবাহ-সঙ্কট, হিন্দু-বিবাহ, মানস-কুসুম, জুবিলী, সাহিত্য ও সমাজ, শান্তিকানন, মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের জীবনচরিত।
„ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	আহুতি।
„ সতীশচন্দ্র সরকার	শান্তি।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	গীতাপাঠ,
	রেখাক্ষরবর্ণমালা (১ম খণ্ড)
	ঐ
	ঐ
	ঐ
	ঐ
	ঐ

Supdt. Govt Printing India,	(1) Publication of the Department of Education 1911—14.
„ Govt Press, Madras,	(2) Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS. in the Oriental M S Library Madras, Vol. 18.
Officer in charge, Bengal Sectt. Book Depot	(3) Annual Report of the Expert Officers of the Department of Agriculture, Bengal. For the year ending June 1914.
Asst. Secy, Marine Depot.	(4) Annual Reports of the Health Officers of the Ports of Calcutta & Chittagong.
Officer in charge, Bengal Sect. Book Depot	(5) Resolution on the Working of the District Boards in Bengal, during 1913-14.
Supdt. Govt. Printing, India.	(6) Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, for March 1915.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র	(7) Brahma Dharma.
	(8) Arther Blanc.
	(9) Popular Mineralogy.
	(10) Rudiments of Vegetable Physiology.
	(11) Stray Thoughts of Spiritualism.

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বীরভূমে প্রাপ্ত বরাহমূর্ত্তি ও হস্তিমূর্ত্তি, মুরশিদাবাদে প্রাপ্ত বরাহমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—মূর্ত্তিগুলি শিল্পকার্য্য হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট। বরাহ-মূর্ত্তির হিরণ্যাখ্য দৈত্য অর্দ্ধনাগ-মূর্ত্তিতে প্রস্তুত। যাঁহারা এই সকল মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথারীতি ধন্যবাদ জানান হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার গুপ্তবলভী-সংবৎ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—অমূল্য বাবু গুপ্তবলভী-সংবৎ সম্বন্ধে স্বপক্ষে বিপক্ষে যেখানে যাহা কিছু আলোচনা হইয়াছে, সে সমস্তের সারভাগ সঙ্কলন করিয়া তাহার বিচার করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এত সাবধানতা সহকারে যে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, একবার শুনিয়া তাহার সমালোচনা করা যায় না। তবে তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া ইহাতে যেরূপ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ করিতে হয়। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—এত সংগ্রহ যে প্রবন্ধে আছে, তাহা না পড়িয়া কিছু বলা যায় না। অতএব আমিও অমূল্য বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, মীরাটের বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন, মেদিনীপুরের বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ এবং মানভূমের সাহিত্য-সমিতিকে যথাক্রমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মীরাট-শাখা, মেদিনীপুর-শাখা ও মানভূম-শাখা বলিয়া গণ্য করা হইল। এই তিনটি লইয়া সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টি শাখা স্থাপিত হইল।

মীরাটের শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় বলিলেন,—মীরাট-শাখার সহকারী সভাপতিরূপে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমরা সেখানে যে কয় জন প্রবাসী বাঙ্গালী আছি, সকলে মিলিয়া এই সাহিত্য-সম্মিলনের সাহায্যে সরস্বতী পূজা, দুর্গোৎসব ও দোল করিয়া থাকি। বীণা লাইব্রেরী নামে একটি লাইব্রেরীও করিয়াছি এবং আমোদ আহ্লাদের জন্য সেইখানে একটি থিয়েটারও করিয়াছি। এখন আমরা সাহিত্য-পরিষদের সাহায্যে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও কিছু কিছু আলোচনা করিতে পারিব। আপনারা আমাদিগকে সাহায্য করিবেন, আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন এবং তজ্জন্য আমরা ধন্যবাদ করিতেছি।

তৎপরে অমূজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ করা হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

বিশেষ অধিবেশন

গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, ৬ই জুন ১৯১৫, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে কবিবর ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের তৈলচিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

কবি কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসের ৬ই তারিখে একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় ইহার সম্পাদক ছিলেন। পরে "নন্দিনী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ মহাশয় ঐ সমিতির সম্পাদক হইয়াছিলেন। কবির বাসভূমি খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামে তাঁহার ভিটাবাড়ীতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য সেখানকার গ্রামবাসীরা একটি স্মৃতিসমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। উভয় স্মৃতিসমিতি শেষে একপরামর্শ হইয়া কাজ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই উভয় সমিতি উভয় স্থানে কবির স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে সকল ব্যবস্থা করেন, কলিকাতা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ মহাশয় তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিবেন বলিয়া স্থির হয়।

এই দিন সভাগৃহে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সেনহাটীনিবাসী কবির বহু আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন। (দশম মাসিক অধিবেশনের বিবরণে সকলের নামাদি দেওয়া হইল)।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে, কৃষ্ণচন্দ্র-স্মৃতিসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ মহাশয় সংক্ষেপে এখানকার ও সেনহাটীর স্মৃতিসমিতির যে কার্য্য-বিবরণ পাঠ করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ তারিখে কৃষ্ণচন্দ্র অস্তমিত হওয়ার পর সেনহাটী-নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন, মুন্সী শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত দাশগুপ্ত বি এ প্রমুখ মহোদয়গণের ঐকান্তিক যত্নে গ্রামে একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত দাশগুপ্ত বি এ মহাশয় ঐ সমিতির সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন। তাহার পর ধীরে ধীরে শুধু সেনহাটী-বাসিগণের নিকট সাহায্য লইয়া ভৈরবের কূলে মজুমদার-কবির বসতবাটীর সীমানায় একটি

স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে—১০´×১০´×১½´ খোয়া ইত্যাদি ও ১০´×১০´×১´ গাঁথনি—১০ ফিট্ দীর্ঘ, ১০ ফিট্ প্রস্থ ও ২½ ফিট্ উচ্চ ভিত্তির উপর ৭½´×৭½´×১´ পরিমিত একটি ও তাহার উপর ৫´×৫´×১´ পরিমিত একটি ইষ্টক-বেদিকা প্রস্তুত করা হয়। স্থানীয় সংগৃহীত অর্থ এই কার্য্যেই খরচ হইয়া যায়। এই ভাবে ১৩১৮ সাল পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। ১৩১৮ সনের চৈত্র মাসে আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কবিবর ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতি-স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করি এবং আমার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ১৩১৯ সনের ৬ই আশ্বিন তারিখে পরিষদের অধীনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয় ;—

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ (নন্দিনীর সম্পাদক, শিবপুর, হাওড়া)
২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ।
৪। „ „ হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ।
৫। „ „ ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। „ „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ।
৭। „ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদক, বঙ্গদর্শন)।
৮। কবিরাজ „ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী—সম্পাদক।
৯। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এল্।
১০। মৌলবী মঞ্জুরান হাফেজ সাহেব (নড়াইল)।
১১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি।
১২। ডাক্তার „ বনোয়ারীলাল চৌধুরী ডি এস্ সি।
১৩। কবিরাজ „ যামিনীভূষণ রায় এম্ এ, এম্ বি।
১৪। „ „ হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরত্ন।
১৫। „ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় সমিতির সম্পাদক মনোনীত হন।

১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষ তারিখে স্মৃতি-সমিতির প্রথম অধিবেশনে সমিতি সেনহাটীবাসিগণের সহিত একযোগে (১) পরিষৎ মন্দিরে তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা, (২) সেনহাটী গ্রামে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন—এই দুই কার্য্যভার গ্রহণ করেন। স্বর্গগত ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তৈলচিত্রের সম্পূর্ণ ব্যয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। সমিতি সেনহাটীবাসিগণ কর্ত্তৃক আরব্ধ ভিত্তির উপর মর্ম্মর-মণ্ডিত স্তম্ভ প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতে প্রস্তুত হন। এই ভাবে ১৩২১ সালের আষাঢ় পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ সেন শাস্ত্রী মহাশয় এই সময়ের মধ্যে বিশেষ কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ হন না। অতঃপর ১৩২১ সনের ৮ই শ্রাবণ তিনি সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করায় সমিতি আমার উপর এই কার্য্যভার অর্পণ করেন।

আমি ১৩২১ সনের আশ্বিন মাসে স্থানীয় জনসাধারণের সহিত পরামর্শ করতঃ কার্য্য আরম্ভ করিবার আশায় সেনহাটী গমন করি। তথায় গিয়া এক সমস্যায় পতিত হই। পরিষৎকে কার্য্যে দ্রুত অগ্রসর হইতে না দেখিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় এম্ এ প্রমুখ সেনহাটীর কয়েকটি যুবক নিজেরাই যে কোনও প্রকারে স্তম্ভ শেষ করিবার মতলব করেন। আমি যাওয়ার পর পরিষদের হাতে কাজ দেওয়া যাইবে, কি নিজেরাই শেষ করিয়া ফেলিলে ভাল হইবে—ইহা লইয়া গ্রামে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। অতঃপর ১৪ই আশ্বিন তারিখে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভায় পরিষদের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করাই স্থিরীকৃত হয়।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আমি অর্থ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু চারি দিক্ হইতেই উদ্যোগী গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ দেশের দুরবস্থায় আমাদিগকে কিছু দিনের জন্য বিলম্ব করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে থাকেন। আমরাও ঐ প্রকার অনুরোধ কার্য্যতঃ সঙ্গত বিবেচনা করি, অথচ ধীরে ধীরে যতটা পারা যায়, কার্য্য করিতে থাকি। এই ভাবে এই আট মাস কাটিয়া গেল। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে দেশের অবস্থা ক্রমেই অধিকতর শোচনীয় হইতেছে; কবে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, ভগবান্‌ই জানেন। আমার কিন্তু আর বিলম্ব না করিয়া যেরূপেই হউক, কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলাই সঙ্গত বোধ হয়। তাই আজ আমরা এই পরিষৎ মন্দিরে কবিবরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করিয়া স্মৃতিস্থাপনা-কার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে আবাহন করিয়াছি। যাঁহার প্রদত্ত অর্থে এই তৈলচিত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তিনি আজ ইহ জগতে নাই। আমরা সকলে মিলিয়া আজ সেই শৈলেশচন্দ্রের স্বর্গগত আত্মার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এখনও স্তম্ভ নির্ম্মাণ-কার্য্য বাকী রহিয়াছে। আবার ইতিমধ্যে কবিবরের অর্দ্ধমূর্ত্তি সংস্করণ ও তাঁহার নামে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব আসিয়াছে। আলিপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, বি ই মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক মূর্ত্তি ও স্তম্ভের যে নক্‌সা ও প্ল্যান পাঠাইয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৬০৬৲ টাকার হিসাব পাওয়া যায়। শুধু স্তম্ভে সর্ব্ব সমেত ৬০০৲ টাকা খরচ হইবে। কাজেই এই কার্য্যের নিমিত্ত আমাদিগকে ২০০০৲ দুই সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইবে। সেনহাটী গ্রাম হইতে এ পর্য্যন্ত ১২২৲ টাকা আদায় হইয়াছে; তাহার ১০৮৲ ব্যয় হইয়াছে ও ১৪৲ হাতে আছে। বাহির হইতে ৩২৷৷ পাইয়াছি, উহার মধ্যে পত্রাদিতে, যাতায়াতে ও ছাপার খরচ, কাগজ, খাতার খরচ ইত্যাদিতে ২৬৷৴১০ আজ পর্য্যন্ত খরচ হইয়াছে, বাকী ৬৶১০ আমার নিকট আছে। দেশের জনসাধারণের এই কার্য্যে তাঁহারাই সাহায্য করিবেন; আমি তাঁহাদের সেবক মাত্র। সাধারণের সহায়তা ব্যতীত আমাদের দ্বারা এ কার্য্য হওয়া অসম্ভব। বঙ্গের বিভিন্ন জেলার কয়েক স্থানে আমরা চাঁদা আদায়ের নিমিত্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছি, অনেক স্থানে আমার নিজের যাইতে হইবে। এই সাত কোটী নরনারীর বঙ্গদেশে কবির স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত ২০০০৲ টাকা

সংগ্রহ করা একটা বেশী কিছুই নয়। আশা ও প্রার্থনা করি, মহাশয়গণ মুক্তহস্ত হইয়া এই প্রার্থিত কার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন ও অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে ইতস্ততঃ বোধ করিবেন না।

অতঃপর আশুবাবু কবি কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা এই স্থানে উদ্ধৃত হইল ;—

আজ আমরা সকলে তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সমবেত হইয়াছি; কিন্তু যিনি নিজে সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া স্মৃতি-সমিতিকে এই তৈলচিত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই স্বর্গীয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাদের মধ্যে নাই, এ দুঃখ—এ অভাব কিছুতেই দূর হইবার নহে। অগ্রজপ্রতিম শৈলেশচন্দ্র কবিবরের স্মৃতিস্থাপন-কার্য্যে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার স্বর্গগত শান্ত আত্মা আজ আমাদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ উপভোগ করতঃ আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে মঙ্গলাচরণ করুন, আমরা সকলে এই প্রার্থনা করি। তার পর যিনি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বর্গীয় কবির জীবন-চরিত প্রণয়ন করিয়াছেন, আমাদের স্মৃতি-সমিতির অন্যতম উদ্যোগী সদস্য সেই শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপস্থিতির নিমিত্তও আমার মনে একটা অভাব বোধ হইতেছে। তিনি আমেরিকায় আছেন বলিয়া আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেও পারি নাই এবং সে জন্য আমি দুঃখিত।

আজ আমরা যে মহাপুরুষের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছি, তিনি বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত, বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান তাঁহার নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। ১২৬৭ বঙ্গাব্দে "সদ্ভাবশতক" প্রকাশিত হয়। সভাপতি মহাশয় ছাত্র-জীবনে সম্ভবতঃ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে সদ্ভাবশতক পাঠ করেন। আজিও ঐ গ্রন্থের আদর্শ কবিতাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ আছে—এ কথা তিনি অস্বীকার করিবেন না। এইরূপ বঙ্গদেশে এমন লোক নাই, যিনি সদ্ভাবশতকের নীতি দ্বারা নৈতিক বল লাভ না করিয়াছেন এবং জীবন-গঠনে সাহায্য না পাইয়াছেন। আজিও অর্দ্ধাধিক বঙ্গবাসী কথায় কথায় কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতা আদর্শস্বরূপ আবৃত্তি করিয়া গৌরব বোধ করেন। বঙ্গবাসীর পক্ষ হইতে এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আজ আমরা তাঁহার স্মৃতি স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। স্মৃতিরক্ষার কথা মনে হইলেই আমার কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কথা মনে জাগে, তাঁহার বড় দুঃখের উক্তি—"সত্যই আমরা সেই জাতি, যাহারা চিতায় দেয় মঠ"—"থাকিতে দিলাম না এক কই, মরিলে দিব সাত কই"—"থাকিতে দিলাম না ভাত-কাপড়, মরিলে করির দানসাগর"; কথাগুলি বড়ই মূল্যবান্। মধুসূদন দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কবি কৃষ্ণচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় অপূর্ণ উদরে দিন কাটিয়াছে, এ সকল স্মৃতির দাহন সহস্র সৌধ দ্বারাও আবৃত করিয়া রাখা যায় না। তথাপি অনুতপ্ত হৃদয়কে তৃপ্ত করিবার জন্য এবং ভবিষ্যদ্বংশধরগণের নিমিত্ত একটা মহৎ আদর্শের ও দেশমাহাত্ম্যের গৌরব-স্মৃতি রক্ষণের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আমাদের মহাত্মাগণের স্মৃতি রক্ষা।

করিতেই হয়। বর্ত্তমানের সহিত অতীত মিশ্রিত করিয়া ভবিষ্যৎ গঠনের নিমিত্ত অতীতের ইতিহাস ও নিদর্শন বহু মূল্য বহন করে। তাই আমরা স্মৃতিস্থাপনের পক্ষপাতী। নতুবা কবির স্মৃতি তিনি নিজেই সংরক্ষণ করিয়া যান, তাহার নিমিত্ত অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক কবিবরের জীবন-চরিত প্রণীত হইয়াছে। তিনি নিজেও "রা সের ইতিবৃত্ত" অর্থাৎ রামচন্দ্র দাসের (কবিবরের বাল্যকালের গুপ্ত নাম) জীবনচরিত নাম দিয়া প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত আপন জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সময় অভাবে আজ তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আমি বিশেষ আলোচনা না করিলেও বিশেষ কোনও দোষ হইবে না। যাঁহারা কবিবরকে না জানেন, তাঁহারা উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় পড়িলেই তাঁহাকে জানিতে পারিবেন। ১২৪৪।৪৫ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে তদানীন্তন যশোহর (বর্ত্তমান খুলনা) জেলার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৩১৩ বঙ্গাব্দে ২৯শে পৌষ তারিখে ঊনসপ্ততিবর্ষ বয়সে জ্বর রোগে সেনহাটীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। যে যশোহর জেলা মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু ও শিশিরকুমারের জন্মস্থান, সেই যশোহর জেলা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মে পবিত্রিত। যশোহর প্রাচীনকাল হইতে কবিত্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত। আজিও কবি মানকুমারী যশোহরের কবিত্ব-মান সংরক্ষণ করিতেছেন। সেনহাটী গ্রামকেও কবিত্বের ও প্রতিভার উর্ব্বর ক্ষেত্র বলিতে পারা যায়। কাব্যকুঞ্জ-কোকিল কৃষ্ণচন্দ্রের পরেও এই গ্রামের "বালকবন্ধু" ও "সখা"-প্রবর্ত্তক প্রমদাচরণকে মনে পড়ে। প্রমদাচরণের প্রতিভা ও সাহিত্য-সাধনার বলে "সখা" বঙ্গের বালক-জীবনে কত কার্য্য করিয়াছে, তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। "সখা" মরিয়া যাওয়ার পর বঙ্গদেশের বালকদের ভাগ্যে আর তেমন "সখা" আজ পর্য্যন্ত মিলে নাই। অল্প বয়সে লোকান্তরিত না হইলে প্রমদাচরণের দ্বারা বঙ্গভাষা অনেক রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বনামধন্য ৺ত্রিগুণাচরণ সেন, স্বর্গীয় পণ্ডিতরত্ন হরিনাথ বেদান্তবাগীশ ও পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু এই সেনহাটী গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পরেই সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের কবি-প্রতিভা ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের গভীর গবেষণাপূর্ণ কঠোর সাহিত্য-সাধনার কথা মনে পড়ে। ইহাঁদেরই সহিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। "সখা"র পরে "সাথী" তাহার স্থান অধিকার করে। এই "সাথী" বর্ত্তমান সভায় উপস্থিত ভুবনমোহনের সম্পত্তি। "সখা ও সাথী" কিছু দিন একত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার পর উহাদের মৃত্যু হইলে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন মহাশয় সখার স্মৃতিস্বরূপ "সখাপ্রেস" ও ভুবনমোহন সাথীর স্মৃতিস্বরূপ "সাথীপ্রেস" সংরক্ষিত করেন। এখনও ঐ দুইটি প্রথম শ্রেণীর ছাপাখানা সখা ও সাথীর এবং তৎসহ সেনহাটীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহাঁদের পরেই আমাদের বাল্যাবস্থা। আমাদের বাল্যকালেও আমরা কয়েক জন সাহিত্য-রসের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। আমরা পাঠ্যাবস্থায় শিক্ষার নিমিত্ত হাতে লিখিয়া ভাই-বোন, একতা, স্রোত প্রভৃতি নামের মাসিক পত্রিকা চালাইতাম। ভাই-বোন্ ও একতা ছাপাও হইয়াছিল।

যাহা হউক, এই সময়ে অনেকের মধ্যেই সাহিত্য-রসের ও কবি-প্রতিভার উৎস জাগিয়া উঠে। তন্মধ্যে আমার পরলোকগত বন্ধু ৺সতীভূষণ সেনের কথা মনে পড়িলেই আমার চক্ষে জল আসে। সতীভূষণ অল্প বয়সেই "মুকুল" নামে একখানি কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। তারপর অনেক আশা প্রাণে লইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আমাদের দলের মধ্যে সুপরিচিত গল্পলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন গুপ্ত, বগুড়ার উকীল ও তত্রস্থ সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত এখন সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত। আমাদের পরবর্ত্তিগণের মধ্যেও কয়েক জনকে আবার এই রসাস্বাদন করিতে দেখিতে পাইতেছি। আমার সম্পাদিত "নন্দিনী"তে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অজিৎকুমার, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রবোধচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন মুন্সী মহাশয়ের পুত্র শচীন্দ্রনাথ কবিতা ও গল্পাদি লিখিয়া থাকে।

এই কবিত্বস্মৃতির উপযুক্ত ভূমি সেনহাটীতে ভৈরব নদের তীরে কবিবরের নিজ বসত বাটীতে বিকসিত কামিনী-কুসুম তরুতলের অদূরে আমরা বাঙ্গালী জাতির প্রাণস্বরূপ বঙ্গের দ্বিতীয় স্বভাব-কবি (প্রথম ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত) স্বভাবের প্রতিপালিত, সংসারে অনাসক্ত, আজীবন সতত ধ্যানাত্মমনা কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত করিবার সংকল্প করিয়াছি। এই তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা তাহারই আনুসঙ্গিক কার্য্যমাত্র।

কবিবর কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্য-জীবন সম্বন্ধে তাঁহার জীবনীতে আলোচনা করা হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়, তদ্বিষয়ে আজ আমার আলোচনা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই; কারণ, নিশ্চয়ই আমাপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতাবান্ উপস্থিত সুধীগণ তদ্বিষয়ে সমালোচনা করিবেন, তথাপি না বলিলে চলে না—আমাদের বর্ত্তমান সমস্যায় জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে যথার্থ উপযুক্ত মূল্যবান্ অনেক উপকরণ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বঙ্গের পর্ণ-কুটীরের খাঁটী স্বদেশী কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতা সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী জাতির স্বাভাবিকতায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি হাফেজ ও অন্যান্য সুফী কবিগণের অনুকরণ অনুসরণে বাহ্যজ্ঞানহীন ধ্যানীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন; তাই সাধারণ অনভিজ্ঞগণ তাঁহাকে উন্মাদ বলিত। প্রকৃতির সরল শান্ত শিশুর অন্তর বাহির একই ছিল। বাহিরেও তিনি সর্ব্বপ্রকার অপ্রার্থিতের অত্যাচার হইতে স্বাধীন ছিলেন; অন্তরেও সেই একই ব্যবস্থা। তিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে বিলাসিতা-বর্জ্জিত ছিলেন—তাঁহার লেখনীও জলন্ত অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে,—

"হে বিলাসী ভোগসুখ-অভিলাষী নর,
ভুলেছ কি দেহ তব নিতান্ত নশ্বর?
পরিণাম ভস্ম অঙ্গে কেন বিলেপন,
কেন বেশ-ভূষা তার সৌষ্ঠব সাধন?

কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়।
শোভাধার পূর্ণ শশী রাহুগ্রস্ত হয়।"

বর্ত্তমান যুগে আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে বিলাসিতা বর্জ্জন না করিলে আমরা কোনও কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব না। কবির আদর্শ উক্তি সতত চক্ষের সম্মুখে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রাখিয়া দৈববাণীরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়।

তার পর কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হওয়ার সময়ে অবসাদ উপস্থিত হইতে পারে। যাতনার নিষ্পেষণে ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। কর্ম্মী! ঐ শুন, তোমার উন্মাদ কবি কৃষ্ণচন্দ্র তোমাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন,—

"কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ?
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?"

তার পর স্বকার্য্য সাধিতে যদি জীবনের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে চিত্ত প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে। কর্ম্মী! তাই তোমার জাতীয় জীবনের স্বভাব-কবি উন্মত্ত আবেগে বলিতেছেন,—

"ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
* * * *
প্রস্তুত সর্ব্বদা আছি তোমার কারণ,
এস সুখে তোমায় করিব আলিঙ্গন।"

এইরূপ কত কি বলিব? সদ্ভাবশতকের প্রতি পৃষ্ঠা এইরূপ অমূল্য উপদেশ ও আদর্শে পরিপূর্ণ। জাতীয় জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে এত বড় সহায়ক কবি জগতে অতি অল্প দেশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র যেমন আদর্শ-কবি, তেমনি আদর্শ-চরিত্রের লোক ছিলেন। একাধারে তেমন সত্যনিষ্ঠা, চিত্তের স্বাধীনতা, আত্মাবস্থায় তৃপ্তি, বিলাসবিহীনতা, অনাড়ম্বর, পরোপকার-ব্রত, বিষয়ে অনাসক্তি, অসহ্য বাহ্যিক যাতনায় চিত্তের প্রসন্নতা ও ঈশ্বরাসক্তি, সর্ব্বজীবে সম প্রেম, স্বার্থত্যাগ, শারীরিক ও মানসিক সহিষ্ণুতা, সময়ের মূল্যজ্ঞান বোধ হয় জগতে অতি অল্প জীবনেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এরূপ মহাপুরুষ যে দেশে জন্মে, সে দেশ পবিত্র হয়, ধন্য হয়। দুঃখের বিষয়, জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে সকলে পাগল জ্ঞান করিয়া যে জ্ঞানে তিনি অজ্ঞান ছিলেন, তাহার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করে নাই। এখন তাহার নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইতেছে। পল্লীগ্রামে দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় অনাদরে অনশনে অজ্ঞাতে তাঁহাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অবস্থান্তরের মধ্যে অবস্থিতি করিলে, আত্মপ্রকাশ করিবার বাসনা তাঁহার থাকিলে, তিনি বোধ হয়, অনেকের উপরে আসন পাইতেন।

কৃষ্ণচন্দ্র সদ্ভাবশতক, রা-সের ইতিবৃত্ত, মোহভোগ ও কৈবল্যতত্ত্ব—এই চারিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন, তদ্ব্যতীত (৫) নলোদয়ের বঙ্গানুবাদ, (৬) রাবণবধ নাটক, (৭) সংপ্রেক্ষণ (দৃশ্যকাব্য), (৮) সংস্কৃত গদ্য-পদ্য স্থাপনাবিধি, (৯) অনুবাদিত স্তোত্র, (১০) সংস্কৃত ব্যাকরণ, (১১) ভারতেশ্বরীর নিকট প্রার্থনীয়া রাজনীতি, (১২) বিবিধ সঙ্গীত, (১৩) সংস্কৃতে রচিত চম্পুকাব্যম্, (১৪) ছাত্রনীতি ও সঙ্গীতবীথিকা প্রভৃতি অপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে। ঐ সকল গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয় ; নতুবা উহার বিনাশের সহিত বঙ্গের অনেক রত্ন বিলুপ্ত হইবে। তিনি যথাক্রমে ঢাকাপ্রকাশ, বিজ্ঞাপনী ও দ্বৈভাষিকী নামক পত্রিকা সম্পাদকের কার্য্য করেন। আমি তাঁহার দ্বৈভাষিকী কয়েক খণ্ড, রা-সের ইতিবৃত্ত ও কৈবল্যতত্ত্ব—তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়া অদ্য পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনারা যে কেহ ঐ সকল গ্রন্থ না পড়িয়াছেন, তাঁহারা পড়িয়া দেখিতে পারেন।

এই বার ইন্দুবাবুর লিখিত কবিবরের জীবনীতে উল্লিখিত হয় নাই, এইরূপ দুই একটি কথা সংক্ষেপে বলিয়াই অদ্যকার সংক্ষিপ্ত সভায় আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। আমা অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক অধিক জানেন, এরূপ অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন ; তাঁহারা কবিবরের বিষয়ে অনেক নূতন কথা বলিবেন।

কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে যশোহর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সেনহাটী আসেন। আমিও ঐ বৎসর ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া সেনহাটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হই। তদবধি সাত বৎসর আমি কৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিয়াছি। তিনি একাধারে কবি ও সাধক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি আজীবন শিশুর ন্যায় সরল ছিল। শেষ জীবনে তিনি অতিরিক্ত মদ্য পান করিতেন, তাহাতে প্রায় কোনও সময়েই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না—কিন্তু সুরা কোনও দিন তাঁহার অন্তর্জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য জন্মাইতে পারে নাই। তিনি কালীবাড়ী পড়িয়া থাকিতেন। পরিধানে ছিন্ন মলিন ছোট কাপড়—মুখে হাসি ও শ্যামাবিষয়ক গান, এই ভাবে দেখিতে দেখিতে সময় সময় তাঁহাকে ধ্যানস্থ বলিয়া বোধ হইত। আমরা তদবস্থায় কালী-মাতাকে প্রণাম করতঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতাম। তিনি নিজে রচনা করিয়া প্রায় সময়ই নূতন নূতন গান গাহিতেন, কেহই পাগল ভাবিয়া তাহা লক্ষ্য করিত না। গীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল গান লুপ্ত হইয়া যাইত। মজুমদার মহাশয়ের নিজেরও এ বিষয়ে কোনও লক্ষ্য ছিল না। তখন ঐ সকল গানের মূল্য বুঝিতাম না—বুঝিলে লিখিয়া রাখিলে কাজ হইত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমি কিছু দিনের নিমিত্ত মজুমদার মহাশয়ের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। তাঁহার বাড়ীতে গিয়া পড়িতাম। তিনি তখন চক্ষে দেখিতেন না। টীকা টীপ্পনী সমেত মুগ্ধবোধ মুখে মুখে পড়াইতেন। তখনও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ-খানি আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত মূল ও টীকা সম্পূর্ণ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। যেমন পারসী ভাষায়, তেমনি সংস্কৃতে তাঁহার অসীম জ্ঞান ছিল। ইংরাজী ভাষা তিনি অতি সামান্যই শিখিয়া-

ছিলেন। তিনি ছোট ছোট কাগজের খণ্ডে অনবরত কি লিখিয়া ফেলিয়া দিতেন; কেহই তাহা সংগ্রহ বা গ্রাহ্য করিত না। কলম মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিয়া (মুটকলমা) কাগজখানি একেবারে চক্ষের সম্মুখে নিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিতেন। তখন তত বুঝিতাম না। বুঝিলে ঐ সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। শুনিয়াছিলাম, ঐ সময়ে তিনি "নীতিশতক" নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ও কেহ তাঁহার ঘর হইতে উহার পাণ্ডুলিপি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তার পর সে বিষয়ে আর কিছুই শুনি নাই। তিনি আমাদিগকে সন্তানের ন্যায় আদর করিতেন। হাতে পয়সা হইলে কোনও কোনও দিন স্কুল ছুটীর পূর্ব্বে মেঠাই কিনিয়া লইয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন ও ছাত্রগণকে উহা বিতরণ করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন। কন্যার বয়স প্রায় ১৬ বৎসর। বিবাহের চেষ্টার বিষয়ে কথা উঠিলে তিনি বলিলেন,—"যিনি কন্যা দিয়াছেন—তিনি বিবাহ দিবেন। আমার মাথাব্যথা নাই।" এরূপ লোককে গৃহস্থ মাত্রেই পাগলই বলে। কিন্তু এই পাগলের প্রতি বিষয়েই ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল। যে দিন তাঁহার মুখ হইতে ঐরূপ কথা বাহির হইল, তাহার অল্প দিন পরেই একজন আশাতীত সুপাত্র উপযাচক ভাবে আসিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধের সময়ে জীবিত মৎস্য বাড়ী আনা হইয়াছিল। অহিংসা পরমো ধর্ম্মের সাধক তাহা টের পাইয়া সকল মাছ নদীতে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। ফলে চাকর-বাকরেরা সেগুলি সরাইয়া ফেলিয়া বলিল,—নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। চৈত্র মাস—ধান দুর্ম্মূল্য। একজন আত্মীয় আসিয়া বলিলেন—"মজুমদার মহাশয়, আমার খাবার ধান নাই, আপনার গোলা হইতে কিছু ধান দিন, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে আমি ধান পাইলে শোধ দিব।" নিরাপত্তিতে মজুমদার কবি হুকুম দিলেন, ধানের গোলা হইতে যাহা দরকার, নেও। আত্মীয় ইচ্ছামত ধান লইয়া চলিয়া গেলেন। মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী বাড়ী ছিলেন না। বাড়ী আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন—কি খাবেন? যে ধান আছে, তাহাতে কুলাইবে না। দুর্ম্মূল্যের সময় টাকা দিয়া কিনিতে হইবে, পরে সস্তার সময় আত্মীয় ধান শোধ করিবেন। বাজারে জিনিষ কিনিতে গিয়াছেন। গোপাল বেহারা কাঁঠালের দর বলিল /১০; মজুমদার মহাশয় /১০ দিলেন। গোপাল ৴১০ ফিরাইয়া দিয়া বলিল, 'ইহার উচিত দাম /০।' মজুমদার কবি গালাগালি দিয়া বলিলেন,—"তুই মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর—তোর জিনিষ নিবুনা।" আর কোনও দিন তাহার নিকট কোনও জিনিষ কিনিতেন না। এইরূপ কত কি বলিব? আমাদের কবি কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ এক ভাবের পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বভাব-কবি ও জাতীয় কবি। তদ্ভিন্ন তিনি ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। যদি তিনি গুপ্ত না থাকিয়া প্রকাশিত হইতেন—তাহা হইলে জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত একাসনে তাঁহার স্থান হইত। এখন আমরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষা-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব।"

এই প্রবন্ধ পাঠের পর আশু বাবু কবির রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ এবং তাঁহার সম্পাদিত সংস্কৃত-বাঙ্গালায় দোভাষী মাসিকপত্রের কয়েকখানি সংখ্যা এবং রাসের ইতিবৃত্ত নামে কবির

স্বলিখিত একখানি মুদ্রিত আত্মজীবন-চরিত সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দান করেন। কবি রামচন্দ্র দাস—এই গুপ্ত নামে এই জীবন-চরিতখানি লিখিয়া নামের আরও সংক্ষেপ করিয়া রা-মের ইতিবৃত্ত নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে কবির প্রৌঢ়-জীবনের ঘটনা পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে।

বহু ধন্যবাদ জানাইয়া আশু বাবুর এই সকল দুষ্প্রাপ্য উপহার গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় সভায় অন্য সকলকে কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে স্ব স্ব বক্তব্য বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

"মালঞ্চ"-সম্পাদক ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—আজ আমরা যাঁহার স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, আমি তাঁহার স্বগ্রামবাসী এবং জ্ঞাতি। তিনি কবি ছিলেন, শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, ভক্ত কবি ছিলেন, সাধক কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতায় তাঁহার সেই সমস্ত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি যে কবিতাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন, সেগুলি খাঁটী বাঙ্গালা কবিতা, খাঁটী বাঙ্গালীর কবিতা। আমার অপেক্ষা তাঁহার কবিত্ব বুঝেন, তাঁহার কবিত্ব বুঝাইয়া দিতে পারেন, এমন বহু ব্যক্তি আজ এইখানে উপস্থিত আছেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বময় জীবনের কথা তাঁহার গ্রামের বাহিরে ফুটিয়া উঠে নাই, গ্রামের বাহিরেও তাহা কেউ জানে না। কৃষ্ণচন্দ্রের হাব-ভাবে, চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত। বাস্তবিকও তিনি কতকটা পাগলের মতই ছিলেন। সাধক কবি মাত্রই অতীন্দ্রিয় ভাবে বিভোর থাকেন, কাজেই তাঁহাদের পাগল বলা চলে। কবির ও সাধকের এইরূপ পাগলামির ভাব অনেকেই বুঝিতে পারেন না। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের একটা বিশেষত্ব এই যে, সর্ব্বদাই তাঁহাকে একটা কোন ভাবে বিভোর থাকিতে দেখা যাইত। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্পর্কে গুরুজন ছিলেন বলিয়া আমরা দূর হইতে লক্ষ্য করিতাম যে, তিনি যেন আমাদের কেহ নন, বাহিরের কেউ। তাঁহার কথায় বার্ত্তায়, ভাবে ভঙ্গীতে এই ভাবটা বেশ অনুভব করা যাইত। তাঁহার এই পাগল ভাবের আর একটা বিশেষত্ব ছিল যে, সকল মানুষের দোষ-গুণেরই একটা বিশেষত্ব থাকে, আমাদের মত বুদ্ধিমানেরা সেগুলাকে মানিয়ে নিয়ে চলে, আর কবি কৃষ্ণচন্দ্রের ধাতের লোকেরা সেগুলাকে মানিয়ে নিয়ে চলিতে চাহেন না বা পারেন না। তাঁহার সরলতা, নির্ভীকতা, সাধুতা, দৃঢ়তা এমন ছিল যে, লোকে তাহাকে অত্যন্ত অধিক মনে করিয়া সেইগুলির জন্যই পাগল বলিত। দু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া উচিত,—তিনি মলিন বস্ত্রে, খালি পায়ে থাকিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ঐ বেশে কোথাও যাইতে বিরক্ত হইতেন না। তাঁহাকে পরিষ্কার কাপড় পরিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনেই পরে না।

২। যশোহর স্কুলে তিনি পণ্ডিতী করিতেন। স্কুলের কাছেই বাসা ছিল। খাইতে খাইতে স্কুল বসিবার ঘণ্টা বাজিতেছে শুনিয়া সেই উচ্ছিষ্ট হাতেই ছুটিয়া গিয়া ক্লাসে পড়াইতে বসিতেন।

৩। তাঁহার মত ছিল, ষোল বৎসরের কমে মেয়ের বিবাহ দিবেন না। ইতিমধ্যে পাত্র

পাওয়া গেল, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া তাঁহাকে বলিতে পারিল না। শেষে অন্ত বাড়ীতে গোপনে আয়োজন করিয়া গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। তখন তিনি জানিতে পারিয়া মহা রাগ করেন, কিন্তু তখন আর উপায় নাই দেখিয়া বিবাহ দিতে বাধ্য হন।

৪। বাজারে গিয়া দ্রব্যাদির দর করিতেন না, ফাউ নিতেন না। বাড়ী আসিয়া দ্রব্যাদি দরের উপর গণনায় বেশী হইলে তাহা লইয়া গিয়া ফেরত দিয়া আসিতেন।

৫। তাঁহার পৌত্রের অন্নপ্রাশনের সময় তাঁহাকে আয়োজন করিতে বলিলে তিনি বলিলেন, টাকা নাই, দিব না। শিশুর মাতামহ খরচ-পত্র দিতে চাহিল। কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন,—দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন দেওয়ার নিয়ম নাই। আমার পৌত্রের অন্নপ্রাশনের খরচ তারা দিবে কেন? আমিই বা তাহাদের কাছে লইব কেন? অবশেষে জোর করিয়া আয়োজন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, তবে এ কাজ যখন আমার নয়, তাহাদের, তখন তাহারা আমার বাড়ীর ভাড়া দিক। এ ভাড়া আদায় হইয়াছিল কি না, জানি না। কিন্তু এমনই তাঁহার সততা, নির্ভীকতা, দৃঢ়তা। আর সেগুলা এইরূপ উৎকট ছিল বলিয়াই লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত। তিনি দারিদ্র্যের কষ্ট অনুভব করিতেন না। তিনি এই পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীটা সর্ব্বপ্রকারে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন। পৃথিবীর কিছুতেই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিত না।

ভূতপূর্ব্ব সখা ও সাথীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় মহাশয় বলিলেন,—কবি কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার, কালীপ্রসন্ন বাবু সবই বলিয়াছেন। আমার বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। আমরা যখনই তাঁহাকে দেখিয়াছি, ভাবে বিভোর থাকিতে দেখিয়াছি, কখনও তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেন না। তিনি নিরহঙ্কার পুরুষ ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ এই পল্লী-কবির স্মৃতি রক্ষার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা সে জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দাস গুপ্ত বি এ (প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্) মহাশয় বলিলেন,—আমিও তাঁহার জ্ঞাতি, স্বগ্রামবাসী। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিবার, কালীপ্রসন্ন বাবু সকলি বলিয়াছেন। আমি তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিও না। আমরা তাঁহার জ্ঞাতি হইলেও তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করি নাই। সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যের ভার নিয়াছেন, এ জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। সাহিত্য-পরিষদের এই চেষ্টায় আমাদেরও লজ্জা রক্ষা হইল। সেনহাটিতেও যে চেষ্টা হইতেছে, সাহিত্য-পরিষৎ পশ্চাতে না দাঁড়াইলে সে চেষ্টার ফল কি হইত, তাহা বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মণ্ডল মহাশয় বলিলেন,—কবি কৃষ্ণচন্দ্র যশোহর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার যেমন সহজেই রাগ হইত, আবার তেমনি অতি সহজেই ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেন। তাঁহার সততায় এবং ধর্ম্মভীরুতায় বাজারে কেহ তাঁহাকে ঠকাইত না। বেশ-ভূষার অভাব তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। আমি তাঁহার ছাত্র ছিলাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন,—পূর্ব্বের বক্তারা তাঁহার জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও ছাত্র; আমি তাঁহার স্বদেশবাসী। এ জন্য গৌরব অনুভব করি। তাঁহার গ্রামের

৬।৭ মাইল দূরে আমার বাড়ী হইলেও আমি কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। বাল্যকাল হইতে তাঁহার গুণগ্রামের কথা শুনিয়া আসিতেছি। গল্প-প্রবাদের মত তাঁহার চরিত্র-মহিমা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের অঞ্চলে তাঁহার কথা কাহাকেও চেষ্টা করিয়া শুনিতে হয় না। আমরা যখন পড়িতাম, তখন সাধু চরিত্রের মহত্ব দেখাইবার জন্য শিক্ষকেরা তাঁহার কবিতা সজীব করিয়া তুলিতেন। তাঁহার কবিত্ব খাঁটী বাঙ্গালী পণ্ডিতের কবিত্ব; তিনি সভাপণ্ডিত, দ্বার-পণ্ডিত বা বৈঠকখানার কবিদের মত কবি ছিলেন না। তাঁহার জীবন তাঁহার কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে কালের ও এ কালের শিক্ষিতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এমন কবি কৃষ্ণচন্দ্রের মত আর নাই। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—অমরা যখন মাইনর ছাত্রবৃত্তি পড়ি, তখন সদ্ভাবশতক পড়িতাম। অবসর পাইলে ইঁহার কবিতা পড়িতে ভাল লাগিত। আমরা পড়িতাম, আর আমাদের পরিবারের স্ত্রীলোকেরা এবং বৃদ্ধেরা অত্যন্ত আদরের সহিত শুনিতেন। অনেক কবিতা এখনও আমাদের মুখস্থ আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এরূপ কবির জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। তথাপি একেবারে কিছু না হওয়ার অপেক্ষা কিছুও করা ভাল। এই তৈল-চিত্রখানি আমাদের পরম আদরের বস্তু হইবে। এখন এই পর্য্যন্তই হউক, পরে আরও বিশেষ ব্যবস্থা হইতে পারে।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন মহাশয় বলিলেন,—কবিবর কৃষ্ণচন্দ্রের শব্দ প্রয়োগ বড়ই সার্থক। শাস্ত্রে পড়িয়াছি, একটি শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ হইলে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে অভীষ্ট দান করে। আমার বিশ্বাস, কবিবরের কবিতা দ্বারা অনেকে মানুষ হইয়াছেন; এই বৈদ্য কবির স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ কেবল যে সেনহাটীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন, তাহা নহে, বৈদ্য জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

যশোহরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—কবি কৃষ্ণচন্দ্র দয়ার আধার, দেবতার মত মানুষ ছিলেন। এক দিন ট্রেণে তাঁহার সহিত আসিতেছিলাম। গাড়ীতেই জ্বরে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। সারা রাস্তা তিনি আমার সেবা করিয়াছিলেন। শেষে আমার গন্তব্য স্থানে আমার সহিত নামিয়া দুই দিন থাকিয়া আমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া সে যাত্রা আমাকে রোগমুক্ত করেন। সদ্ভাবশতকে উচ্চ ভাব আছে বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতা তাহাতে ফুটিয়াছে কি না, সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—কবি কৃষ্ণচন্দ্র যখন ঢাকায় ছিলেন, সেখানে তাঁহার কথা শুনিয়াছি। আমি তাঁহার ব্যক্তিগত কিছু জানি না। তবে কবির স্মৃতি কাব্যে আদর। একজন খাঁটী বাঙ্গালী কবির স্মৃতি রক্ষার্থ আজ আমরা যে এই বিদেশী-ভাবের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ইহা আমাদের বিদেশী সংস্রবের মনুষ্যত্ব শিক্ষার ফল। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই কলম ধরিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই সে চেষ্টা যেন লোপ হইয়াছে। তাঁহার কবিতাগুলিতে বঙ্গভাষা ধন্য ও গৌরবান্বিত।

মিরাট শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় বলিলেন,—আমি সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে—বিশেষতঃ একজন মহাকবির স্মৃতিরক্ষার সভায় উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। কবি কৃষ্ণচন্দ্র যশোহরের নয়, খুলনার নয়, তিনি সমস্ত বাঙ্গালা দেশের—সমস্ত বাঙ্গালীর কবি। খগেন্দ্র বাবু যেমন বলিয়াছেন, তেমনি আমারও বাল্য-জীবনে সদ্ভাবশতকের প্রভাব খুব বেশী হইয়াছিল। এখন ঘটনাচক্রে মাতৃভূমি হইতে আমাকে বহু দূরে থাকিতে হয়। কিন্তু এখনও আমি তাঁহাকে কবি বলিয়া পূজা করি। তিনি বৈষ্ণ-কবি নহেন, তিনি বাঙ্গালীর কবি, তিনি সেনহাটীর কবি নহেন, তিনি সমস্ত বাঙ্গালার কবি। আমাদের এইরূপ সব সঙ্কীর্ণ ভাব ত্যাগ করা উচিত। বহু দূরের প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের পক্ষ হইতে আমি এ ভাব আপনাদিগকে জানাইতেছি। আমার এ দেশে আসা ঘটে না। সাহিত্য-পরিষৎ দেখা ঘটে না। আমি আজ কৃতার্থ হইয়াছি। আমি যেন তীর্থযাত্রায় আসিয়া অভীষ্ট দর্শন করিয়াছি। আপনাদের ন্যায় একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবীদিগকে দেখিয়া ধন্য হইলাম। আমরা প্রবাসে থাকিয়া কয়জন বাঙ্গালী মাতৃভাষার আলোচনার একটি ক্ষুদ্র আয়োজন করিয়াছি। মিরাটে সেই ক্ষুদ্র সাহিত্য-সম্মিলনকে আপনারা সাহিত্য-পরিষদের শাখা করিয়া লইয়াছেন। আমরা ধন্য হইয়াছি। মিরাটবাসীর পক্ষ হইতে সে জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। কয়েকটিমাত্র বাঙ্গালী জীবন ভ্রাতৃস্নেহ হারাইয়া বহু দূরে পড়িয়া আছে, আপনারা আমাদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন না। আমরাও কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছি, অপনারা আমাদিগকে সাহায্য করিতে ভুলিবেন না। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—আমরা ভুলিয়া থাকিব না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের লিখিত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রবাসী ভ্রাতৃবর্গকে আমাদের অতি নিকটে আনিয়া দিয়াছে। প্রবাসী ভ্রাতৃবর্গ সর্ব্বত্রই মাতৃভাষার আলোচনা করিতেছেন, কাজেই আর তাঁহাদিগকে দূরে ফেলিয়া রাখিতে পারিব না।

অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—কবি কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিসভার নিমিত্ত আধ ঘণ্টামাত্র সময় ছিল। তাঁহার ন্যায় কবির কথা আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইতে পারে নাই, তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। বালককাল হইতে তাঁহার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে আমি তাঁহাকে এমন করিয়া খাটো করিতে পারি না। এখনও যদি কবির সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকে, বলিতে পারেন। আমি আজ তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। সদ্ভাবশতকের কবিকে আমি গুরুর ন্যায় পূজা করি এবং এখনও পূজা করিতেছি। তাঁহার অনেক কবিতা এখনও আমার মুখস্থ আছে। তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট আজ অনেক কথাই শুনা গেল। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার এই চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইলেন। সেনহাটীরও দুঃখ করিবার কিছুই নাই। ধীরে ধীরে চেষ্টা করুন, সফল হইবেন। ইহার জন্য ঢাক-ঢোল লইয়া ছুটিতে হইবে না। স্মৃতি স্থাপনের এষ্টিমেট মাত্র

দুই হাজার টাকা। আলিপুরের ইঞ্জিনিয়ার করুণাবাবু এবং কবির এতগুলি কৃতবিদ্য আত্মীয় একত্র চেষ্টা করিলে এই সামান্য টাকা উঠাইতে কষ্ট পাইতে হইবে না। শীঘ্র না হউক, লজ্জার কথা নয়; ধীরে ধীরে উঠাইবার চেষ্টা করা হউক।

অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া বলিলেন,—যাঁহার অনুগ্রহে ছবিখানি আজ এখানে প্রতিষ্ঠা করিলাম, সেই শৈলেশচন্দ্র আজ আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি এখন ধন্যবাদের অতীত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যারম্ভ করা হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

৺পিয়ারীচাঁদ মিত্রের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে

বিশেষ অধিবেশন

৬ই শ্রাবণ, ১৩২১

সভাপতি—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু

গত ৬ই শ্রাবণ বুধবার ৺পিয়ারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের শততম জন্মদিন উপলক্ষ্যে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সমর্থনে প্রবীণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আজ যে মহাত্মার শততম জন্মের দিনে সভা হইতেছে, তাঁহার প্রতি আমার প্রভূত সম্মান ও শ্রদ্ধা থাকিলেও আমাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও সভাপতি হইলে শোভন হইত। সেরূপ কেহই উপস্থিত না থাকায় অশোভন হইলেও সভার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

তৎপরে সুকবি, হুগলীর জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়া হইল।

শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনার ১লা শ্রাবণ তারিখের কার্ড ও ২রা শ্রাবণ তারিখের পত্র একত্রে প্রাপ্ত হইলাম। টেকচাঁদ ঠাকুর মহাশয় যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনকর্ত্তৃগণের মধ্যে একজন বিশেষ

ভাবে অগ্রণী ছিলেন, তদ্‌বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই এবং তাঁহার শততম জন্মদিনের স্মৃতি সমারোহে রক্ষিতব্য ও অনুষ্ঠেয়। এ সভায় যোগদান করা আমি একটি কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণনা করি। বঙ্গসাহিত্য টেকচাঁদ ঠাকুরের নিকট যে প্রকার বিশেষভাবে ঋণী, তাহার জন্ত ত বটেই, অধিকন্তু টেকচাঁদ ঠাকুরের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সহিত আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের ও সেই সূত্রে আমার নিজের যে প্রকার ঘনিষ্ঠ ও প্রীতিমূলক সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে এই অনুষ্ঠানে যোগদান আমি একটি পবিত্র কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এখন কঠিন পীড়ায় শয্যাগ্রস্ত। বহু বর্ষ পূর্ব্বে, টেকচাঁদ ঠাকুরের জীবিতকালে, আর একবার অন্ত প্রকারের কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলাম। তখন যে প্রকার স্নেহের সহিত, সেই ব্যাধি হইতে মুক্তিকল্পে টেকচাঁদ ঠাকুর কায়মনোবাক্যে যত্ন ও আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, প্রতি দিন রুগ্নশয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া স্বীয় সুকোমল করস্পর্শে রোগের যন্ত্রণা অপনোদনের জন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতেন, তাহা স্মরণ করিলে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র জন্মভূমির যে মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন, তদ্‌ব্যতিরিক্ত মানব-জীবনের অন্তান্ত পথও তাঁহার প্রগাঢ় চিন্তাশক্তির দ্বারা আলোকিত ও উজ্জ্বল করিয়াছেন। জীবে দয়া তাঁহার মানসিক বৃত্তির মধ্যে একটি অতি সুকোমল ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বৃত্তি ছিল। অনাবিল ও অশ্লীলতা-দোষ-পরিশূন্ত হাস্তরস, যাহা প্রাতঃসূর্য্য-চুম্বিত সরসী-লহরীর ন্তায় বিমল কান্তি বিচ্ছুরিত করে, যাহার প্রত্যেক হিল্লোলে তরঙ্গায়িত মুক্তাহার গড়াইয়া যায়, এবম্বিধ বৈঠকী হাস্যরস তাঁহার পূর্বে কেহ অবতারণা করিতে সক্ষম ছিলেন কি না, বলিতে পারি না। তাঁহার লিখিত পুস্তকে [illegible]র কতক আভাষ পাওয়া গেলেও তাঁহার কথোপকথনেই ইহার মাধুর্য্য প্রকটিত ও মনোরঞ্জনে বিশেষভাবে সমর্থ হইত। সামাজিক সভাস্থলে তিনি নানাবিধ পারদর্শিতায়, বিশেষতঃ সময়োপযোগী হাস্য-রসের অবতারণায় একচ্ছত্রী সম্রাট্‌রূপে অধিরাজমান হইতেন। এ সব কথা কিছু বিস্তৃত করিয়া বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ অপারগ, বড় অনুতাপের বিষয়। সভাক্ষেত্রে আমার অনুপস্থিতি মার্জ্জনা করিবেন ও সেই অনুপস্থিতির কারণ জানিয়া আমাকে কথঞ্চিৎ সহানুভূতি প্রদান করিবেন।

বশংবদ
শ্রীবরদাচরণ মিত্র

পরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—যাঁহারা বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্যের ভাষা গড়িয়া গিয়াছেন, ৺পিয়ারীচাঁদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। টেকচাঁদ ঠাকুর নাম লইয়া তিনি যে কয়খানি বহি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে পণ্ডিতী বাঙ্গালার সংস্কার করিবার পথ পাওয়া গিয়াছিল। তিনি ১২২১ সালের এই এমন দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আজ তাঁহার শততম জন্মদিন। বাঙ্গালী সাহিত্যিকের শততম জন্মদিনে উৎসব বোধ হয় এই প্রথম। বন্ধুবর হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র

রায় মহাশয় এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেন। তাই সাহিত্য-পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশনরূপে এই সভা অদ্য আহূত হইয়াছে। যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রসে সে কালের সাহিত্যে পিয়ারীচাঁদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, এ কালের সাহিত্যে সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রস-রচনায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ রহস্যপটু অমৃতলালকে আজ আমরা সভাপতিরূপে পাইয়াছি। তাঁহার দ্বারা সভার কার্য্য বেশ ভালরূপেই চলিবে, এরূপ আশা করিতে পারি।

পিয়ারীচাঁদ বাঙ্গালা ১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখে এবং ইংরাজী ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন, আর ইংরাজী ১৮৮৩ সালে ২৩শে নবেম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

তাহার পর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি মহাশয় বলিলেন,—৺পিয়ারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা সাহিত্য গঠন-কালে একজন অগ্রণী ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার স্থান চিরদিনই অনেক উচ্চে থাকিবে। এ দিকে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে, সাহিত্যক্ষেত্রে, প্রেততত্ত্বের আলোচনায় সকল দিকেই গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। সকল সভা-সমিতিতে তাঁহার যোগ ছিল, সকল সমাজেই তিনি বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতেন। তাহার ফল তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি গ্রন্থে নানা সমাজের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। আজ পিয়ারীচাঁদের শত বর্ষের জন্মদিনে বড় একটা উৎসব না করিয়া ইহাঁদের মত লোকের জন্মোৎসব বছরে বছরে করিলে ভাল হয়। কারণ, উৎসব হউক আর না হউক, ইহাঁদের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী।

পরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—পূর্ব্বকালের স্বদেশভক্তগণের মধ্যে টেকচাঁদ অন্যতম। তিনি শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নহে, সর্ব্বক্ষেত্রেই বরেণ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্য কাজের কথা ছাড়িয়া, তিনি কেবলমাত্র সাহিত্যের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা ঘোষিত হইবার সময় আসিয়াছে। আলালের ভাষায় তিনি ঘরের কথা লইয়া দেশের ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। মৌলিক বাঙ্গালা উপন্যাস সৃষ্টিই তাঁহার মহৎ কার্য্য। তাঁহার সাহিত্য-সেবা-প্রণালী পরতন্ত্রমূলক নহে, তাহা স্বতন্ত্র। "আলালী" ভাষা সম্বন্ধে তখনকার কলিকাতা রিভিউ তাঁহাকে ditcher বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। বহু বর্ষ পরে ঐ মন্তব্য ব্যর্থ হইয়াছে। আবার পিয়ারীচাঁদ হইতেই স্বদেশীয় ভাবের সূত্রপাত। সেই জন্যই তিনি বরণীয়। তাঁহাতে স্বদেশী স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট। তিনিই স্বদেশী সাহিত্যের গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য বিদেশী গন্ধভরা! সাহিত্যে মহাপুরুষ পিয়ারীচাঁদের ইঙ্গিত মানিয়া চলিলে ভাল হয়। বিদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত সাহিত্যে কি উপকার হইবে? আসুন, সকলে মিলিয়া পিয়ারীচাঁদকে স্মরণ করিয়া বলি,—"তোমারি চরণ করিয়া শরণ, চলিব তোমারি পথে।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ ৺পিয়ারীচাঁদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত চতুর্দ্দশপদী কবিতা পাঠ করিলেন,—

'সাগর'-সম্ভূত রত্নে ভূষিত যে বেশ,
হেরিয়া প্রসন্ন নহে হৃদয় তোমার,
কল্পনা-কাননে তাই করিয়া প্রবেশ,
গাঁথিলে স্বভাব-জাত কুসুমের হার।
জননীর পদাম্বুজে করিলে প্রদান,
'মধুরে মধুর' হ'ল অপূর্ব্ব মিলন,
হাসিল সুধীন্দ্র কত আনন্দিত প্রাণ
সাহিত্যে দেখিয়া পুন নবীন কিরণ।
রত্ন সম্ভব বিভা, গন্ধ পরিমল
একাধারে বিরাজিত দেখাতে ভাষায়
তব পরে হ'য়েছিল সাধনা সফল
অপার্থিব বঙ্কিমের দিব্য প্রতিভায়
প্রণমি পিয়ারীচাঁদ বঙ্গের দুলাল,
তব স্থান অতি উচ্চে রবে চিরকাল।

(নায়ক—৭ই শ্রাবণ, ১৩২১ সাল)

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন,—টেকচাঁদ ১০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পর কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। শত বর্ষ পরে ১৯১৪ সালে জন্মাইলে, তিনি অত বড় হইতে পারিতেন না। সাহিত্যক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে, সমাজক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। সমসাময়িক হিন্দুকলেজের অন্যান্য কৃতবিদ্য ছাত্রগণের ন্যায় তাঁহার ধর্ম্মমতে, আচর-ব্যবহারে, ভাবে ভাষায় কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ৺রাজনারায়ণ বসুর জীবনচরিত পাঠে জানা যায়, নূতন ইংরাজী শিক্ষার প্লাবনে অনেক ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পিয়ারীচাঁদ ভাসেন নাই। বিদেশী ভাব তাঁহাকে কিছুমাত্র টলায় নাই। তাঁহার ১৮৮১ সালে মুদ্রিত on the soul নামক পুস্তিকার ভূমিকা পড়িলে বুঝা যায়, ইংরাজি-শিক্ষিত হইয়াও ভগবানে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি ২১ বৎসর কাল প্রেততত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, যোগ ও প্রেততত্ত্বের শিক্ষা এক। মায়ার্স ও লজের মতে পিয়ারীচাঁদের প্রেততত্ত্বের আলোচনা আলেয়ার পশ্চাতে দৌড়ান মাত্র নহে। সম্প্রতি ইউরোপে mysticismএর আলোচনায় পিয়ারীচাঁদের সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া দাঁড়াইতেছে। কর্ণেল অলকটের সম্বর্দ্ধনা-সভায় পঠিত প্রবন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছিল। সাহিত্যে তাঁহার অনুকরণ করা যেমন মঙ্গল-কর, ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তির অনুসরণ করাও উচিত।

এই সময় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভায় আগমন করায় সভাপতি মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি বলিলেন,—আজ পিয়ারীচাঁদের শততম জন্মোৎসব। সে

কালে আশীর্ব্বাদ ছিল, "স জীবে শরদঃ শতং" পিয়ারীচাঁদ ঐহিক জীবনে শত শরৎ জীবিত ছিলেন না, কিন্তু কীর্ত্তি-জীবনে তাঁহার আয়ু বোধ হয় শত শত শরৎ অতিক্রম করিয়া যাইবে। আত্মীয়দের কাছে তিনি গত হইলেও আমাদের কাছে তিনি গত নহেন, কারণ, আমরা আলালের ঘরের দুলালের চির-সঙ্গ লাভ করিতেছি। হীরেন্দ্রবাবু বহু শাস্ত্রবিৎ বলিয়া যে দিক্‌টা ধরিয়া পিয়ারীচাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন, সেটা অতি উচ্চ দিক্। পিয়ারীচাঁদ নানা দিকে যথেষ্ট কাজ করিয়া যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে ৺বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্তের সমসাময়িক বলিলেও চলে। ঈশ্বরচন্দ্র আর অক্ষয়-কুমার ভাবগুলিকে সংস্কৃত পরিচ্ছদে অর্থাৎ পোষাকী পরিচ্ছদে সাজাইতেন, আর পিয়ারীচাঁদ সকল সময় পোষাক পরিয়া কাজ চলে না বুঝিয়া আটপৌরে পোষাকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাঁদের ভাষার তুলনায় বিবাদ চিরকালই থাকিবে। বঙ্কিমের ভাষা, আলালী ভাষা ভাঙ্গিয়াই গঠিত হয়। আলালী ভাষার কাছে অদ্যকার সভাপতি মহাশয়েরও ঋণ, বোধ হয়, বঙ্কিমের অপেক্ষাও বেশী। বিদ্যাসাগরী ভাষা আর আলালী ভাষা যেন আমাদের ভাষাজননীর দুই হাতের দুই বাইশখ। মার অঙ্গে শোভাসম্পাদনে কেহ কম-বেশী নহে। চাঁদকে চন্দ্র বলিয়া ডাকিলে সাড়া পাওয়া দুষ্কর। আইবুড়ভাত বা আইবড়ভাত অব্যূঢ়ান্ন ও আয়ুর্বৃদ্ধান্ন হওয়ার জিনিষটাকে চেনা দায়। অব্যূঢ়ান্ন তবু কতক পদে আছে। আয়ুর্বৃদ্ধান্ন ত একেবারে অবোধ্য। এক কথায় পিয়ারীচাঁদ মোটা অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরাইয়া ভাষা-জননীকে সাজাইতে ভালবাসিতেন। শেষ কথা, সাহিত্য-পরিষৎ এক জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের শততম জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া মহৎ কাজ করিয়াছেন। মৃত-সাহিত্যিকগণের স্মরণ-দিনগুলির প্রতি পরিষদে দৃষ্টি রাখা উচিত।

ইহার কিছু পূর্ব্বে মাননীয় ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আসিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া পিয়ারীচাঁদ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। মাননীয় দেবপ্রসাদ বাবু বলিলেন,—পিয়ারীচাঁদের সকল দিকের গুণাবলী স্মরণ করিলে, তাঁহাকে মহর্ষি বলিতে পারা যায়। আজ কায়স্থ মহর্ষির জন্মোৎসব-সভায় কায়স্থ সভাপতি হইয়াছেন, কায়স্থ বিদ্বানেরা ভাবব্যাখ্যাতা হইয়াছেন, আমিও কায়স্থ বলিয়া বড় গৌরব অনুভব করিতেছি। আমরা জীবিতের সম্বর্দ্ধনা করিতে পারি না। মৃতের প্রতি সম্মান দেখাইতে আমরা বড়ই ব্যস্ত। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণের মৃত্যাহে সভাসমিতি অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু শততম জন্মোৎসব এই প্রথম। মৃত মহাত্মাদিগকে স্মরণ করিবার জন্য নূতন পথ খুলিয়া দেওয়ায় পরিষৎকে ধন্যবাদ করিতে হয়। এমন উৎসব হয়ও কম, হইবেও কম। কিন্তু এই উৎসবের একটি স্বতন্ত্র গাম্ভীর্য্য আছে। ৺পিয়ারীচাঁদ আমাদের আত্মীয়। তাঁহাকে বিশেষভাবে আমরা জানিতাম। তিনি কাজের লোক ছিলেন, অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির সহিত তুলনায় তাঁহার কাজের কথা মনে করিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা বেশী হয়। আবার কাজে ও কথায় তিনি এক ছিলেন। পিয়ারীচাঁদ Colasworthy grant.

মিলিয়া কলিকাতা পশুক্লেশ-নিবারিণী সভা স্থাপন করেন। তখন অনেকের ধারণা ছিল, মদ না খাইলে শিক্ষিত, সভ্য ও বড়লোক হওয়া যায় না। এই মন্দ ধারণার উচ্ছেদের জন্য তিনি মাদক-নিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সভা প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বে প্যারীচাঁদ "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়" নামক পুস্তিকা রচনা করেন। পিয়ারীচাঁদের সমাজ সংস্কারের কশাঘাত বড় কড়াই ছিল। আলালের ঘরের দুলাল ছাপা হইবার পর হইতে ক্রমশঃ দুলালেরা গা ঢাকা দিয়াছেন, যাঁহারা আছেন, তাঁহারা নিজেদের ঘরে দুলালী করেন মাত্র, কিন্তু আলালেরা একবারে লোপ পাইয়াছেন। তাঁহার পর ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোমের মুখে আর একবার সমাজকে কশাঘাত করিয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—পিয়ারীচাঁদ আমাদের নিকট আত্মীয় ছিলেন বলিয়া তাঁহার অনেক কথা জানা শুনা আছে। পিতামহের কাছে উপদেশ পাইয়াছিলাম, অর্থ-ব্যবহারে ও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে ব্যক্তি খাঁটি, সেই ত মানুষ। এই কথার জীবন্ত উদাহরণ পাইয়াছিলাম পিয়ারীচাঁদ মিত্রে। এই বলিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু পিয়ারীচাঁদের ন্যায়পরতা, সততা, ভদ্রতা, দয়া, মমতা, ভৃত্য-বৎসলতা, ধর্ম্মবিশ্বাস ও সকল ধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সম্বন্ধে কতগুলি গল্প শুনাইলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—এত ক্ষণ যিনিই যত কথা বলিলেন, তিনি পিয়ারীচাঁদের কথাই বলিলেন, টেকচাঁদের কথা বলা ঠিক হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে টেকচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল একটা বেদী। এই বেদী হইতে অনেক যজ্ঞ হইয়াছে—যাহার ফলে আজ বাঙ্গালায় রত্ন ধরে না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতী বাঙ্গলার তারগুলি দেখিয়া তখনকার চীফ জষ্টিস্ সার এডওয়ার্ড রায়ান বলিয়াছিলেন—'কথায় কথায় বাঙ্গালী শেখালে কি ফল হবে, কিন্তু তেমন পুথি কোথা'। আলালের ঘরের দুলাল [illegible] টা Fielding থেকে লওয়া। সমাজপতি মহাশয় যে বলিয়াছেন, তাঁহার সবটাই [illegible], তাহা নয়, তাঁহার উপকরণ দেশী হইলেও ধরণটা বিদেশী। বিদ্যাসাগরী দল বলেন [illegible] ভাষায় প্রাদেশিকতা ছিল, উদাহরণ—'কবিকঙ্কণ', 'মনসামঙ্গল'। ভারতচন্দ্রে প্রাদেশিকতা কম, তাই সেটা বেশী চলে। মালদহ থেকে শ্রীহট্ট, ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত স্থানে চলিবে, এমন ভাষাই আবশ্যক। 'বোধোদয়', 'কথামালা' সমস্ত স্কুলে না চলিলে শ্রীহট্টের ভাষা যে আমাদের সঙ্গে এক, কেহ তাহা বলিত না। নানা প্রদেশের ভাষার ঐক্য হইয়াছে বঙ্কিমের প্রতিভাবলে বেশী। বঙ্কিমের মনীষা একটা সামঞ্জস্য আনিয়া দিয়াছিল। পিয়ারীচাঁদের আর সব কাজ চাপা পড়িয়া যাইলেও তিনি চিরজাগরূক থাকিবেন টেকচাঁদরূপে। টেকচাঁদের সাহিত্যের ধরণটা দেশের মুখ চাহিয়া, পরিষৎ বজায় করুন, ইহা আমারও অনুরোধ।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন,—পিয়ারীচাঁদকে শেষজীবনে প্রেততত্ত্বের আলোচনায় নিযুক্ত দেখিয়াছি। তাঁহাদের সিমলার বৈঠকে আসন কাঁপিত, এলাচ,

আবেশ আসিত, আমি সে আসন ধরিয়াছিলাম। পিয়ারীচাঁদের নানা কাজ সময়ে লোক ভুলিয়া যাইতে পারে, তাঁহার আলালের ঘরের দুলালকে কেহ কখনও ভুলিবে না। উহা সাহিত্যে যে প্রতিক্রিয়া আনিয়াছিল, সেটা স্থায়ী। 'আলালের' পূর্ব্বে ভাষা-জননী কেতাব পাতার পাতায় বদ্ধ থাকিতেন; অভিধান, ব্যাকরণ ভিন্ন তাহা খুলা যাইত না, পিয়ারী তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি হুগলী জেলার লোক, চিরদিন কলিকাতায় বাস করিতেন বলিয়া কলিকাতার ভাষাই তাঁহার আদর্শ হইল। কলিকাতাতেই পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন-স্থান হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ও বঙ্কিমের চেষ্টায় কলিকাতার ভাষাই সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ হইল। কিন্তু এখন সিলেটী চাট্‌গেঁয়ের ন্যায় কলিকাতার ভাষায় প্রাদেশিকতাটুকু বর্জ্জনের সময় আসিয়াছে, এ কথাও আমি অবশ্য বলিব।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—বাঁচিয়া থাকিতে আমাদের দেশের লোক সম্বর্দ্ধনা করে না—তা না করুক, করিবে, যখন জাগিবে, তখন করিবে। আমরা যত দিন বাঁচিয়া থাকি, তত দিন মতামত, দলাদলি আর স্বার্থ লইয়া ঝগড়া করিতেই দিন যায়। কে করিতেছে না করিতেছে, তাহা দেখিবার অবসর থাকে না। মরিয়া গেলে ও কাজগুলা, কথাগুলা কুড়াইয়া আনিয়া দেখিতে বসি, তাহার মধ্যে কি রত্ন পূর্ব্বে আমাদের দেশে এক রকম সাদাসিদে সভ্যতা ছিল,—আমরা দাসীকে কি কর্ত্তা বলি, অমুকের মা বলিয়া ডাকি, চাকরের নাম ধরিয়া ডাকি, কিন্তু কখন খানসামা, নওকর, বান্দা প্রভৃতি বলি নাই। আহার ব্যবহারে কখন তাহাদের অনুভব করাই নাই, এ রকম ছোটকে বড় করার ভাব আর কোন সভ্যতায় নাই। আলালের ঘরের দুলালের ভাষা আমাদের টেঁকের জিনিস, টেঁকেই টাকা, আর টেকচাঁদ, টেকচাঁদ আমাদের ভাষার যেটুকুর দাম আছে, তাহাই দিয়া গিয়াছেন। আমরা ভাষা শিখাইতে গিয়া আদর করিয়া ছেলেদের মাথা খাইতেছি। পিয়ারীচাঁদ যে আদর্শ গড়িব বলিয়া তাল ঠুকিয়া একটা কিছু করিতে বসিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি বৈঠকী ভাষায় মিঠা গল্প বলিয়াছেন মাত্র এবং সে ভাষা বড় কাজে লাগিবে, ইহাই তিনি দেখিতেছেন। পিয়ারীচাঁদ সম্বন্ধে এত কথা বলা হইয়াছে যে, আমার আর নূতন বলিবার কিছু নাই। এ রকম স্মৃতি-স্মরণীয় ব্যক্তির কীর্ত্তিকথা, রাজকৃষ্ণবাবুর ন্যায় গল্পের মত বলিতে পারিলেই ভাল হয়। লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ান হয়। আজ নূতন ধরণের অনুষ্ঠান করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য হইলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী
সভাপতি।